উচ্চ মাধ্যমিক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান

উৎপল রায়
সুধীর রায়

কলিকাতা বুক হাউস

বিহ

Written in accordance with the Revised syllabus w.e.f. session 1985-86 (H. S. Exam.—1987) of West Bengal Council of Higher Secondary Education.

উচ্চমাধ্যমিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

[প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র]

অধ্যাপক উৎপল রায়, এম. এ., এল. এল. বি.

বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কাটোয়া কলেজ।

রাষ্ট্রতত্ত্বের রূপরেখা, তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, জনপ্রশাসন, An Introduction to Political Science প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

এবং

অধ্যাপক সুধীর রায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ।

সংশোধিত নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সংস্করণ

১৯৮৫

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংশোধিত, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৮৫

মূল্য : বত্রিশ টাকা মাত্র

ছাপা : শ্রীপবিত্রলাল দত্ত কর্তৃক প্রিণ্টোগ্রাফ, ১০১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বাঁধাই : এম. শর্মা বুক বাইণ্ডার্স

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল কর্তৃক ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত।

সংশোধিত সংস্করণের (১৯৮৫) ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (১৯৮৫-৮৬) থেকে উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করে নতুন কলেবরে **উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান** প্রকাশ করা হ'ল।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিন্যাস, বিগত আট বছরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র এবং সর্বোপরি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স এবং মানসিকতার সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে **উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান** বইটি রচিত হয়েছে। তত্ত্বমূলক বিষয়কে যথাসম্ভব সহজ ও উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে ৫২-তম সংবিধান সংশোধনী পর্যন্ত সকল সাংবিধানিক পরিবর্তন যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় আলোচনার শেষে সম্ভাব্য সকল রচনাধর্মী এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বইটি লেখার ব্যাপারে আমরা আমাদের উভয় কলেজের সহকর্মীদের এবং বাইরের অন্যান্য অনেক বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান পরামর্শ এবং সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো। প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশনা সংস্থার শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল এবং শ্রীচঞ্চল ভাওয়ালের উদ্যোগ ছাড়া এ বই যথাসময়ে প্রকাশিত হতে পারতো না। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশনা সংস্থা এবং প্রেসের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা যে ভাবে সাহায্য পেয়েছি তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি।

আমাদের বিশ্বাস, **উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান**-এর নতুন সংস্করণটি প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের আরও বেশী সমাদর লাভে সমর্থ হবে।

ইতি—

২. ৬. ৮৫

উৎপল রায়

সুধীর রায়

সংশোধিত, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৮৫

মূল্য : বত্রিশ টাকা মাত্র

ছাপা : শ্রীপবিত্রলাল দত্ত কর্তৃক প্রিণ্টোগ্রাফ, ১০১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বাঁধাই : এম. শর্মা বুক বাইণ্ডার্স

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল কর্তৃক ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত।

সংশোধিত সংস্করণের (১৯৮৫) ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (১৯৮৫-৮৬) থেকে উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করে নতুন কলেবরে **উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান** প্রকাশ করা হ'ল।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিন্যাস, বিগত আট বছরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র এবং সর্বোপরি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স এবং মানসিকতার সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে **উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান** বইটি রচিত হয়েছে। তত্ত্বমূলক বিষয়কে যথাসম্ভব সহজ ও উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে ৫২-তম সংবিধান সংশোধনী পর্যন্ত সকল সাংবিধানিক পরিবর্তন যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় আলোচনার শেষে সম্ভাব্য সকল রচনাধর্মী এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বইটি লেখার ব্যাপারে আমরা আমাদের উভয় কলেজের সহকর্মীদের এবং বাইরের অন্যান্য অনেক বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান পরামর্শ এবং সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো। প্রকাশনের ব্যাপারে প্রকাশনা সংস্থার শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল এবং শ্রীচঞ্চল ভাওয়ালের উদ্যোগ ছাড়া এ বই যথাসময়ে প্রকাশিত হতে পারতো না। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশনা সংস্থা এবং প্রেসের কর্মীদের কাছ থেকে আমরা যে ভাবে সাহায্য পেয়েছি তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি।

আমাদের বিশ্বাস, **উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান**-এর নতুন সংস্করণটি প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের আরও বেশী সমাদর লাভে সমর্থ হবে।

ইতি—

২. ৬. ৮৫

উৎপল রায়
সুধীর রায়

Revised Syllabus (w. e. f. Session 1985-86) of

POLITICAL SCIENCE

PAPER—I (Marks—100)

1. What is Political Science ? Definition, Nature and Scope—Relation with other Social Sciences : History, Economics, Sociology, Psychology and Ethics.
2. The State—Definition of the State : Characteristics of the State.
3. Sovereignty ; its characteristics.
4. Theories of State Origin : (*a*) Divine Origin Theory ; (*b*) Force Theory ; (*c*) Social Contract Theory ; (*d*) Evolutionary Theory.
5. Nationality, Nation and Nationalism ; Right of self-determination, Nationalism and Internationalism.
6. The United Nations—Objects, structure and functions.
7. Citizenship—Definition of citizen—Acquisition and loss of citizenship : Rights and duties of a Citizen—Civil and Political Rights ; Fundamental Rights and duties of an Indian Citizen—Economic and Social Rights ; Directive principles in the Indian Constitution.
8. Some Major Political Theories : Liberalism, Marxism, Democratic Socialism—Basic principles.

PAPER—II (Marks—100)

1. Constitution—Classification—Nature of the Indian Constitution : Salient features of the Indian Constitution.
2. Forms of Government—Unitary and Federal ; Nature of the Indian Federation—Presidential and Parliamentary ; Nature of the Indian Government—Presidential or Parliamentary ? Monarchy—Republic—India as a Republic.
3. Democracy—Its different forms—Merits and Demerits—Conditions for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects.
4. Organs of Government ; Functions of the different Organs of Government—Theory of Separation of powers—Executive—Functions of Political Executive—Union and State Executives in India—President of India ; powers and Position—Prime Minister ; powers and position of the Prime Minister—Legislature ; Unicameral and Bicameral—Union Legislature of India ; Its composition and functions—West Bengal Legislature ; its composition and functions—Processes of Law Making—Judiciary—Independence of the Judiciary—The Indian Judiciary.
5. Public Opinion ; Its importance in a Democracy—Different Organs of Public Opinion—Party System—types of Multi-party System—Importance of the Party System in Democracy.
6. Adult Franchise ; Arguments for and against.

সূচীপত্র

প্রথম পত্র

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু

এক ঃ শাস্ত্রের নামকরণ সম্পর্কে সমস্যা···2. দুই ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা···3. তিন ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র···5. চার ঃ অতিরিক্ত আলোচনা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তাধারা···7. পাঁচ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান, না কলা ?···10. ছয় ঃ আন্তঃশাস্ত্রকেন্দ্রিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা···13. সাত ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস···14. আট ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি···16. নয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব···18 দশ ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান···19. এগার ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র···20

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···21

২. রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা এবং উপাদান

এক ঃ রাষ্ট্র কাকে বলে ?···24. দুই ঃ রাষ্ট্রের উপাদান···26. তিন ঃ রাষ্ট্র ও সরকার···31. চার ঃ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান···33.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···34

৩. সার্বভৌমিকতা

এক ঃ সার্বভৌমত্ব ঃ প্রকৃতি ও সংজ্ঞা···36. দুই ঃ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য···40. তিন ঃ সার্বভৌমত্বের নানা রূপ···41. চার ঃ অস্টিনের তত্ত্ব···45. পাঁচ ঃ বহুত্ববাদী মতবাদ···47.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···49

৪. রাষ্ট্রের উৎপত্তি

এক ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ বিভিন্ন মতবাদ···51. দুই ঃ ঐশ্বরিক মতবাদ···51. তিন ঃ বলপ্রয়োগ মতবাদ···53. চার ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ···56. পাঁচ ঃ সমষ্টিগত ইচ্ছা···59. ছয় ঃ হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য...60. সাত ঃ রুশো হবস্ ও লকের মিলন ঘটিয়েছেন···62. আট ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিষেধক···63. নয় ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব···64. দশ ঃ ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ···65. এগার ঃ অতিরিক্ত আলোচনা ঃ পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ···69.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···69

৫. জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

এক ঃ জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ···72. দুই ঃ [illegible] উপাদানসমূহ···75. তিন ঃ ভারত কি একটি জাতি ?···77. চার ঃ [illegible] অধিকার···78. পাঁচ ঃ জাতীয়তাবাদের গুণ ও সীমাবদ্ধতা···81. ছয় ঃ [illegible] ও সভ্যতা···82. সাত ঃ আন্তর্জাতিকতা···83. [illegible] আন্তর্জাতিকতা···85.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···86

৬. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

এক : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তির পটভূমিকা···89. দুই : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি···89. তিন : জাতিসংঘের সঙ্গে জাতিপুঞ্জের তুলনা···90. চার : জাতিপুঞ্জের গঠন ও কাঠামো···91. পাঁচ : সাধারণ সভা···93. ছয় : নিরাপত্তা পরিষদ···96. সাত : আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ···98. আট : অছি পরিষদ···99. নয় : আন্তর্জাতিক আদালত··99 দশ : সম্পাদকীয় দপ্তর···100. এগার : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন···102. বার : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ···103.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···105

৭. নাগরিকত্ব : অধিকার ও কর্তব্য

এক : নাগরিক কে ?···107. দুই : নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি···109. তিন : নাগরিকত্ব বিলোপের কারণ···111. চার : সুনাগরিকতার গুণাবলী···111. পাঁচ : সুনাগরিকের অন্তরায়···113. ছয় : অন্তরায়গুলো দূর করার উপায়···114. সাত : ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন···116. আট : অধিকার : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি···117. নয় : অধিকারের শ্রেণীবিভাগ···119. দশ : নাগরিক কর্তব্য···122. এগার : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক···125. বার : ভারতের জনগণের মৌলিক অধিকার···126. তের : ভারতে নাগরিকদের মৌল কর্তব্য···132. চৌদ্দ : সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার···133. পনের : রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতি···134.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···137

৮. কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব

এক : উদারনীতি বা উদারনৈতিক মতবাদ 141. দুই : মার্কসবাদ···145. তিন : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ···147. চার : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ···148. পাঁচ : উদ্বৃত্তমূলক তত্ত্ব···149. ছয় : মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব···150. সাত : শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব···153. আট : বিপ্লবের তত্ত্ব···155. নয় : গণতান্ত্রিক সমাজবাদ···156.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···160

দ্বিতীয় পত্র

১. সংবিধান

এক : সংবিধান কাকে বলে ?···3. দুই : সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ···4. তিন : ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি···10. চার : উত্তম সংবিধানের বিষয়বস্তু ও গুণ···13. পাঁচ : ভারতের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য···15.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···18

২. সরকারের রূপ

এক : সরকার কাকে বলে ?···19. দুই : আরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ···20. তিন : আধুনিক শ্রেণীবিভাগ···21. চার : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা···22. পাঁচ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা···24. ছয় : যুক্তরাষ্ট্রগুলোতে কেন্দ্রিকতার সাম্প্রতিক প্রবণতা···27. সাত : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দোষগুণ···28. আট : ভারতের

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য…29. নয় : ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন…34. দশ : কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক…35. এগার : আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার…38. বার : মন্ত্রি-পরিষদ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি…41. তের : ভারত সরকারের প্রকৃতি…42. চৌদ্দ : রাজতন্ত্র…44. পনের : প্রজাতন্ত্র কাকে বলে ?…45. ষোল : প্রজাতান্ত্রিক ভারত…46.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন…47

৩. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

এক : গণতন্ত্র…49. দুই : গণতান্ত্রিক আদর্শ…52. তিন : গণতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ…53. চার : গণতন্ত্রের দোষ ও গুণ…54. পাঁচ : গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্ত-সমূহ ?…57. ছয় : ভারতে গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্তগুলো আছে কি ?…59. সাত : একনায়কতন্ত্র…60. আট : গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র…62. নয় : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ…62.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন…64

৪. সরকারের বিভিন্ন অংগ

এক : সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও এদের কাজ…66. দুই : ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি…66. তিন : বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ…70. চার : সরকারের শাসনবিভাগ…71. পাঁচ : রাজনৈতিক প্রশাসক ও তাঁর ক্ষমতা…74. ছয় : এক সদস্যাবিশিষ্ট শাসক ও বহু সদস্যাবিশিষ্ট শাসক…77. সাত : ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ…78. আট : ভারতের রাষ্ট্রপতি…79. নয় : রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা…87. দশ : মন্ত্রিসভার সংগে সম্পর্ক…89. এগার : ভারতের রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হতে পারেন ? 93. বার : ভারতের উপরাষ্ট্রপতি…94. তের : ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা…94. চৌদ্দ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী…96. পনের : অংগরাজ্যের শাসনবিভাগ…101. ষোল : অংগরাজ্যের রাজ্যপাল…101. সতের : রাজ্যপালের পদমর্যাদা…104. আঠার : অংগরাজ্যের মন্ত্রিসভা…107. উনিশ : অংগরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী…108. কুড়ি : মুখ্যমন্ত্রী কি রাজ্যের প্রকৃত শাসক ?…111. একুশ : আইনবিভাগ…113. বাইশ : দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা…115. তেইশ : ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা (সংসদ) লোকসভা ও রাজ্যসভা…118. চব্বিশ : সংসদের কার্যাবলী ও ক্ষমতা…119. পঁচিশ : ভারতীয় সংসদের মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা…122. ছাব্বিশ : স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার…124. সাতাশ : ভারতীয় সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক…126. আঠাশ : পশ্চিমবংগ বিধানসভা…127. উনত্রিশ : বিধান পরিষদের গঠন ও এর যৌক্তিকতা…129. ত্রিশ : ভারতে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি…131. একত্রিশ : বিচারবিভাগের সংগঠন ও কার্যাবলী…134. বত্রিশ : বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা …136. তেত্রিশ : ভারতের বিচারবিভাগের সংগঠন…137. চৌত্রিশ : অধস্তন আদালত…138. পঁয়ত্রিশ : হাইকোর্ট…139. ছত্রিশ : সুপ্রীম কোর্ট…141. সাঁইত্রিশ : আমলাতন্ত্র…145.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন…149

৫. জনমত ও রাজনৈতিক দল

এক : জনমত কাকে বলে ?…153. দুই : গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব…156. তিন : জনমত গঠনের উপাদান…157. চার : রাজনৈতিক দল কাকে বলে ?…160.

পাঁচ : দলীয় ব্যবস্থা···162. ছয় : রাজনৈতিক দলের কাজ···163. সাত : দলীয় শাসনের দোষগুণ···165. আট : দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার উপায় 167. নয় : দলীয় প্রথা সাফল্যের শর্ত···168. দশ : দলীয় ব্যবস্থায় সাফল্যের শর্তগুলো ভারতে আছে কি ? ···169. এগার : একদলীয় ব্যবস্থা···170. বার : একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র···171. তের : দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা···172. চৌদ্দ : বহুদলীয় ব্যবস্থা···173. পনের : বহুদলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ···175. ষোল : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব···177.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···179

৬. **প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার**

এক : প্রতিনিধিত্ব কাকে বলে ?···180. দুই : প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার···181. তিন : নারীজাতির ভোটাধিকার···184. চার : ভোটদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য···186. পাঁচ : ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা···187.

● নমুনা প্রশ্ন ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন···189

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নপত্র (১৯৭৮—১৯৮৫) ··· **i—xiv**

ত্রিপুরা মাধ্যমিক বোর্ডের (+2) প্রশ্নপত্র (১৯৮৫) ··· **i—ii**

"Political Science is a historical investigation of what the has been, an analytical study of what the state is and a Politico-ethical discussion of what the State should be."
—R. G. Gettell

১

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু
Definition, Nature and Scope of Political Science

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীস দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছিল। বস্তুত বিখ্যাত গ্রীক-পণ্ডিত প্লেটো ও আরিস্টটলকে যথাক্রমে রাষ্ট্রদর্শন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা এত প্রাচীন এবং এর আবেদন সার্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আবির্ভাব কিন্তু একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এমনকি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও শাস্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন একশত বছরের আগে শুরু হয়নি। কিন্তু আমাদের জীবনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রভাব এবং সার্বজনীন আবেদন থাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছে।

গ্রীক চিন্তাধারা ও আদর্শে সমৃদ্ধ হয়ে যে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার একদা আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এতদিন পর্যন্ত তা পাশ্চাত্য সভ্যতার দানে পুষ্ট হয়ে ঐতিহ্যমূলক এবং সনাতন (traditional) ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এই সনাতন ধারা ও পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও বর্তমানে তা আগের একচেটিয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিগত শতকের প্রথম থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বিশেষ করে মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এতদিন ধরে পশ্চিমী সভ্যতায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার উপর আঘাত হেনেছে। সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আড়াই হাজার বছরের সনাতন ধারা ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন পশ্চিমী

দুনিয়ারই কিছু কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তাঁদের এ জেহাদকে আচরণবাদী বিপ্লব (Behavioural Revolution) নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের চিন্তাধারাকে আচরণবাদ (Behaviouralism) বা অভিজ্ঞতাবাদ (Empericism) নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আচরণবাদীদের মতে, বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে চর্চা হয়েছে তার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এতদিন পর্যন্ত তথ্য ও রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃত সম্পর্ক এবং তত্ত্বের ভূমিকার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।[১]

ফলে, সমাজবিজ্ঞানের মানচিত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এখন ব্যাপক পালা বদল চলছে। পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগমন, সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার পরিমণ্ডলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চরিত্র এবং প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনছে ; রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে তাই দেখতে পাওয়া যায় বহু নতুন নতুন তত্ত্বের পদচারণা, বিভিন্নধর্মী এবং পরস্পর বিরোধী বহু রাজনৈতিক দর্শনের সমাহার। বিভিন্নধর্মী তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা (concept) তৈরী হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখে এ পুস্তকের আলোচনার সূত্রপাত করা হল।

এক : শাস্ত্রের নামকরণ সম্পর্কে সমস্যা (Problems of Nomenclature)

আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রকে বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল (Aristotle) আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রকে 'রাজনীতি' বা 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics) নামে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে 'রাষ্ট্রদর্শন' (Political Philosophy), 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Theory of the State) ইত্যাদি নামও এই শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political Science) নামেই আলোচ্য শাস্ত্র ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের প্রচলিত নামগুলির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রনীতি (Politics)

আধুনিক যুগে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সে অর্থে-ই আরিস্টটল 'রাষ্ট্রনীতি' বা *Politics* শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রাষ্ট্রনীতি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি বোঝাবার জন্য। পরবর্তীকালে সিজউইক, লর্ড অ্যাক্টন প্রমুখ পণ্ডিতেরা ঐ নামকরণ সমর্থন করেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রনীতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি (theoretical politics) এবং ফলিত রাষ্ট্রনীতি (applied politics)। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, গঠন ইত্যাদি বিষয়বস্তু তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতির অধীন। অন্যদিকে, ফলিত রাষ্ট্রনীতি বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন সরকার ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় আলোচনা।

আধুনিক কালের অনেকে মনে করেন যে 'রাষ্ট্রনীতি' শব্দটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের সকল আলোচ্য বিষয়বস্তুকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই তাঁরা 'রাষ্ট্রনীতি' নামকরণের বিরোধী। 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামকরণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য শাস্ত্রের এক্তিয়ার ও পরিধি যতটা সম্প্রসারিত হয়, 'রাষ্ট্রনীতি' নামের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রনীতি নামটি এই শাস্ত্রের আলোচনার গণ্ডীকে কিছু পরিমাণে সীমিত করে বলে মনে করা হয়।

রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy)

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রদর্শন' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। রাজনৈতিক চিন্তার পেছনে রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে সম্ভবত অনেকে এ শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রদর্শন' নামে অভিহিত করতে চান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত, 'রাষ্ট্রদর্শন' রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের আদর্শ এবং দর্শন বাদে আরও নানা ধরনের বিষয়

১. David Easton—*Political System*, P. 4.

নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে। সুতরাং 'রাষ্ট্রদর্শন' নামকরণ করলে আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে সীমিত, খণ্ডিত ও অপূর্ণ রাখা হবে। তাই 'রাষ্ট্রদর্শন' অপেক্ষা 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামকরণ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

রাষ্ট্রতত্ত্ব (Theory of the State)

কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহারের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রের তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে মূলত 'রাষ্ট্রতত্ত্ব'-র আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে বলে তা রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গঠন বৈচিত্র্য এবং শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে না। সুতরাং 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' নামের দ্বারা আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

ক্রমশ বেশি সংখ্যক পণ্ডিত আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি, ব্যাপকতা এবং গভীরতা লক্ষ্য করে এই শাস্ত্রকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করছেন। বর্তমানে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, শাসন সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সরকার সম্পর্কীয় সকল আলোচনা এ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' শাস্ত্রকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় ও প্রতিষ্ঠানের সুসংগঠিত আলোচনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান-ভাণ্ডার বলে মনে করা হয়। অনেকে আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পরিধি বোঝাবার জন্য শুধুমাত্র 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' না বলে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন পদ্ধতি' (Political Science and Government) নামকরণের পক্ষপাতী।

দুই : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বহু আলোচিত বিষয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। এর কারণ সম্পর্কে এস. এল. ওয়াসবি (S. L. Wasby) মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিবর্তিত চরিত্র এবং অনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও মতানৈক্যের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞাকে নির্ভুল বলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। ফলে, বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক-একটি সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা না থাকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঐ সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র-সংক্রান্ত আলোচনার পটভূমিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। অন্যদিকে, আর একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন তাতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত আলোচনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

ক. রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক সংজ্ঞা

একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, যেহেতু মানুষ মূলত রাজনৈতিক জীব তাই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন আবর্তিত ও বিকশিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ধারাই মানুষের জীবনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। তাই তাঁদের মতে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে সকল আলোচনা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ব্লুনৎস্লি (Bluntschli) উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা উপস্থিত করে বলেছেন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান হল রাষ্ট্র বিষয়ক বিজ্ঞান (Science of the State)। প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাস্কি মনে করেন যে, সংগঠিত রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের

জীবন বিশ্লেষণ করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ (Political science concerns itself with the life of men in relation to organised states)। গার্নার (Garner) আরও পরিষ্কার করে বলেছেন, রাষ্ট্রকে নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ (Political science begins and ends with the state)। জন সিলিও মনে করেন, সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে (Political science investigates the phenomena of Government)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো একান্তভাবেই রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংজ্ঞা। **শুধুমাত্র রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে ম্যাকেঞ্জী (W. J. M. Mackenzie) 'রাষ্ট্রশিল্পকর্ম' (statescraft) নামে অভিহিত করেছেন।** তাঁর মতে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা অতিমাত্রায় আইন-মুখী (legalistic), কৃত্রিম (artificial) এবং খামখেয়ালীপূর্ণ (arbitrary) হতে বাধ্য। ডেভিড ইস্টনও মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনা হল ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাখ্যা মাত্র। যে সকল উপাদান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজনৈতিক সত্তা ও উৎকর্ষ আরোপ করতে পারে, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনা তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

খ. রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা

তাই আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ বা রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার প্রবক্তা। তাঁরা মনে করেন, কর্তৃত্ব, প্রভাব, সংঘাত বা ক্ষমতা নিয়ে আলাপ-আলোচনাকেই **রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।** মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাসওয়েল (H. Lasswell) বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অভিজ্ঞতাবাদী শাস্ত্র, যা ক্ষমতার গঠন ও বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে এবং ক্ষমতাবিন্যাসের পটভূমিকায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে (Political science as an empirical discipline is concerned with the study of the shaping and sharing of power and it refers to political acts performed in power perspectives)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রবক্তা। অনেকের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ ধরনের সংজ্ঞা উপস্থিত করার ক্ষেত্রে সযত্নে রাষ্ট্রকে পরিহার করে অভিজ্ঞতা ও আচরণভিত্তিক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হবার পেছনে একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে। শ্রেণী শাসিত ও শোষিত সমাজে রাষ্ট্র শোষণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রের ঐ শোষণ চরিত্রকে আড়াল করার জন্যই সম্ভবত আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনা বর্জন করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

গ. সমন্বয়

রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ বা রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার নিছক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে পারে না; কেবলমাত্র রাষ্ট্র নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখলে রাষ্ট্রের বাইরেও যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের আচার-আচরণ রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে প্রভাবিত করে, তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোকপাত করতে পারবে না। উপরন্তু, সামাজিক ও আর্থিক পটভূমিকা বাদে নিছক আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথার্থ আলোচনাকে তুলে ধরতে পারে না।

এ সব কারণের জন্য বলা যেতে পারে যে, **রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমাজবিজ্ঞানের সেই শাখা যা বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের তত্ত্ব, সংগঠন, শাসনব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আচার-আচরণ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার্যাবলী, রাজনৈতিক ক্ষমতা, আদর্শ, প্রভাব, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক মনোভাব, রাজনৈতিক কার্যে অংশ গ্রহণ ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করে।**

তিন : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র (Scope of Political Science)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা পরিধি কি—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলেছেন যে, স্বভাবের দিক থেকে মানুষ রাজনৈতিক জীব **(Man is by nature a political animal)**। মানুষ রাজনৈতিক জীব, কারণ সে সমাজে ও রাষ্ট্রে বসবাস করে। সমাজের বাইরে কোনো মানুষ থাকতে পারে না, সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের কথা পরিকল্পনা করা যায় না। যে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের বাইরে বাস করে হয় সে দেবতা, নয় সে পশু **(either above humanity or below it)**।

মানুষ কেন সমাজবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন যাপন করতে চায় সে-বিষয়েও আরিস্টটল বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে সমাজের বাইরে একা জীবন যাপন করে কোনো মানুষ সুখী হতে পারে না, তার জীবন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। কোনো মানুষ কেবলমাত্র বাঁচতে চায় না, সুখী ও সুন্দর ভাবে বাঁচতে চায়। নিছক জীবন-যাপন নয়, সুখী ও সুন্দর জীবনযাপনই মানুষের লক্ষ্য **(the purpose of a man is not only to live, but to live a good life)**। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রের আবির্ভাব। সমাজ মানুষকে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা শেখায়, রাষ্ট্র তার জীবনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনে। ব্যক্তি-জীবন তাই সমাজ ও রাষ্ট্রে পূর্ণতা লাভ করে।

আরিস্টটলের মত

রাষ্ট্র, সরকার, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। রাষ্ট্র, সরকার, আইন ইত্যাদি এবং এদের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিষয়ই রাজনৈতিক এবং এদের নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। মানুষের কল্যাণ সাধন, তার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা এবং তার নিরাপত্তা বিধান করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন যা প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্যকে তুলে ধরে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়: প্রথমত, রাষ্ট্রের তত্ত্বগত আদর্শ, দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সংগঠন, কাজকর্ম এবং রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয় ধারার অন্তর্গত রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে।

অধ্যাপক গার্নার (Garner) বলেছেন, *Political science begins and ends with the state.* অর্থাৎ রাষ্ট্রকে নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার উৎপত্তি ও সমাপ্তি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। রাষ্ট্রের উৎস থেকে শুরু করে এর গঠন, কার্যপদ্ধতি, বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা সৃষ্টি করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। তবে বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে আমরা যে ভাবে দেখতে পাই কেবলমাত্র তাকে বিশ্লেষণ করলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে যায় না। রাষ্ট্রের কর্তব্য, লক্ষ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত এ শাস্ত্র তাও আলোচনা করে। সুদূর অতীতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তার পর ক্রমাগত সেই রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটে চলেছে—অতীত থেকে বর্তমান ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে। এই বিবর্তনের গতিপথে যে সকল ঘটনা-প্রবাহ ও বিষয়গুলো রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাদের নিয়েও আলোচনা করে।

রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনা

পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়ে দেখা দেয়। আইন প্রণয়ন করা, আইন প্রয়োগ করা, আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করা—রাষ্ট্রের এ সকল কাজকর্মের ভিত্তি হল কর্তৃত্ব (authority) ও ক্ষমতা (power)। ক্ষমতার ভিত্তি কি, কি ভাবে তা প্রয়োগ করা যায়—এ সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বাস্তবে রাষ্ট্রের এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার (government)। সুতরাং সরকারের গঠন, কার্যাবলী ও শ্রেণীবিভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে

সরকারের আলোচনা

স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এগুলিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্গত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা অনেক। প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের নানাভাবে যোগাযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রের প্রসারণ ঘটেছে। আজকের দিনে কোন রাষ্ট্রই নিঃসঙ্গ, উদাসীন, বিচ্ছিন্ন থেকে আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে নিজেকে আর গুটিয়ে রাখতে পারছে না। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের ফলে যুদ্ধ, শান্তি, চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণা

১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোর (UNESCO) অধীনে "আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন"-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্পর্কে আলোচনার পরে যে সব বিষয়কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা হ'ল: ১. রাষ্ট্রীয় মতবাদ ও তার ইতিহাস, ২. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, তাদের সংবিধান ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক আলোচনা, ৩. রাজনৈতিক দল ও মতবাদ, ৪. আন্তর্জাতিক বিধান, রাজনীতি ও সংস্থা।

কেবল আলোকদায়ী নয়, ফলদায়ীও

যা ঘটেছে কেবলমাত্র তা বিশ্লেষণ করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ অথবা যা ঘটা উচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাও আলোচনা করবে—এ নিয়ে সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে এক তত্ত্বগত বিতর্ক চলছে। ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করে কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গড়ে উঠুক—এ কথা আচরণবাদী নামে পরিচিত একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন। অনেকে মনে করেন, ভাল-মন্দ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ না করে বা মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থেকে কেবল নিছক জ্ঞানের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান করা (knowledge for the sake of knowledge) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাস্ত্রের দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান লক্ষ্য ও আদর্শহীন কোন শাস্ত্র হতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানব-কল্যাণ—ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে নিশ্চিত করে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা-পূর্ণ জীবনযাপনের সম্ভাবনা নিশ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা। অর্থাৎ, কেবল আলোকদায়ী নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ফলদায়ীও হতে হবে।

মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়

গ্রীভস্ (Greaves) বলেছেন যে, মূল্য-বিচার বা ভালমন্দ সম্পর্কে সঠিক ধারণা উপস্থিত করতে না পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বহুলাংশে কমে যাবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রবসন্ (Robson)-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুমাত্র যা আছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না—যা হওয়া উচিত তাও আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কোন শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্পর্কে বা এর ভালমন্দ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীরব ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। **সুতরাং মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হতে পারে না—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুধুমাত্র কি আছে তাতেই সীমাবদ্ধ নয়, কি হওয়া উচিত তা বিশ্লেষণ করাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কর্তব্য।**

এখনই পরিধি সম্পর্কে সীমারেখা টাকা ঠিক নয়

সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় সীমারেখা টেনে দেয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। চলমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে নিত্য নতুন ঘটনা প্রবাহের আবির্ভাব ঘটছে। এর ফলে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং ঐ সব সমস্যার চাপে রাজনৈতিক জীবনের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি ঐ সব নতুন ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে বিষয়বস্তু ও আলোচনা ক্ষেত্রের বিন্যাস ঘটাতে না পারে, তা হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে।

চার ঃ অতিরিক্ত আলোচনা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাম্প্রতিক চিন্তাধারা (Modern Theories on Scope of Political Science)

এতদিন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার ধারাই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সম্প্রতিকালে কয়েকজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু উপস্থিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবার্ট ডাল, আব্রাহাম ক্যাপলান, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, ডেভিড ইস্টন, জে. ডি. ভি. মিলার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত কয়েকটি চিন্তাধারা উপস্থিত করা হ'ল।

১. রাষ্ট্র সম্পর্কে অনুসন্ধানের নাম রাজনীতি (Politics is the study of the State)

এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রই ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। এবং মনে করা হত যে, রাষ্ট্রকে নিয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও সমাপ্তি। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে কোন বিষয় হল রাজনৈতিক এবং যেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সেখানেই রাজনীতি।

'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের' এই রাষ্ট্রসর্বস্ব সংজ্ঞাকে অনেকে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁরা বলেন, এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যাদের আমরা যাযাবর বলি, যাদের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই, ফলে তারা কোন রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হয় না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলেও ঐরূপ জনগোষ্ঠীতেও কোন-না-কোন কর্তৃত্ব (বা সরকার) থাকে—যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ের অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় সংগঠন না থাকলেও ঐরূপ সমাজে কোন-না-কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিয়ম-কানুন তৈরী করে, প্রয়োগ করে, বশ্যতা আদায় করার জন্য শক্তি ব্যবহার করে। ঐরূপ সমাজে ঐ ধরনের কাজকর্মই হল রাজনীতি, যদিও সেখানে রাষ্ট্র নামে কোন আনুষ্ঠানিক সংস্থা নেই। সুতরাং ঐ সকল সমাজের রাজনীতি রাষ্ট্র সম্পর্কিত নয়—বরং বলা যায় রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যা রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত নয়। যেমন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণ, প্রভাব, দ্বন্দ্ব, বিরোধ—এগুলো হ'ল রাজনীতির উপজীব্য বিষয়, যদিও এর সঙ্গে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করে।

২. রাজনীতির বিষয়বস্তু হল মতবিরোধ ও সংঘাত (Politics is concerned with Conflict and Disagreement)

সাম্প্রতিক কালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, মতবিরোধ ও সংঘাত নিয়েই রাজনীতি। যেখানে কোনো দ্বিমত নেই, বিরোধ নেই, সংঘাত নেই সেখানে রাজনীতির কোন অস্তিত্ব নেই। কেউ যদি এমন কোন কাজ করতে চায় যে-বিষয়ে মতপার্থক্য আছে, তখনই একটি রাজনৈতিক অবস্থা দেখা দেয় এবং ঐরূপ অবস্থাতেই আইন প্রণয়ন ও সেই আইনের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিরোধ-সংঘাতের প্রকাশ, প্রচার ও মীমাংসা—এ নিয়েই রাজনীতি। তাই অধ্যাপক মিলার (Miller) বলেছেন, *Conflict lies at the heart of politics. In a world of universal agreement, there would be no room for it.* অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতির গভীরে বিরোধ নিহিত -- সার্বজনীন মতৈক্যের জগতে রাষ্ট্রনীতির কোন স্থান নেই।

অধ্যাপক অ্যালান বল মনে করেন, মতবিরোধ এবং ঐ মতবিরোধের মীমাংসা নিয়েই রাজনৈতিক কার্যাবলী সংগঠিত এবং সে কারণে যে কোন স্তরে রাজনৈতিক কার্যাবলী সংগঠিত হতে পারে। রবার্ট ডাল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অবিরাম বিরোধের অবস্থান লক্ষ্য করেছেন।

রাজনীতির বিষয়বস্তু কেবলমাত্র মতবিরোধ ও সংঘাত—এ ধারণা খুবই সরল এবং সেজন্য গ্রহণযোগ্য নয়। সংঘাত ঘটার জন্য সম্মতি প্রয়োজন। সংঘাতে বিভিন্ন পক্ষ একমত হতে না পেরে পরস্পর বিরোধিতা করতে সম্মত হয়। সুতরাং সম্মতি এক্ষেত্রে বড় কথা। যুদ্ধের সময়েও দুটি শত্রু পক্ষ বন্দীবিনিময়, বড়দিনের উৎসবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা ইত্যাদি বিষয়ে ঐক্যমত হয়। দ্বিতীয়ত,

সমাজে বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে ঠিকই, কিন্তু যেখানে বিরোধ ও সংঘর্ষ সেখানেই রাজনীতি—একথা ঠিক নয়। ফুটবল ক্লাবে, পাড়ার নাটক দলে, কোনো স্কুলের শিক্ষকদের সভায়, কোম্পানীর পরিচালক সমিতির সভায় নীতি, কৌশল ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সব সময়ই মতবিরোধ দেখা দেয়। এমন কি একটি পুতুল নিয়ে দুটি শিশুর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের বিরোধ নিশ্চয় রাজনৈতিক নয়, রাজনীতিশাস্ত্র বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও নয়। বলা যায়, সংঘাত এবং বিরোধ নিয়ে এ শাস্ত্র আলোচনা করে ঠিকই, কিন্তু কেবল সংঘাত ও বিরোধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অ্যালান বল যে অর্থে 'বিরোধ'-কে রাজনীতির বিষয়বস্তু বলে অভিহিত করেছেন, সেই অর্থে না হলেও মার্কসীয় চিন্তায় রাজনীতির নির্যাস হ'ল 'বিরোধ' বা দ্বন্দ্ব। মিলিব্যাণ্ড (Ralph Miliband) বলেছেন, *At the core of Marxian politics, there is the notion of conflict.* এই বিরোধ সর্বত্র, যেমন—শোষণ ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া—শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা—সমাজটাকে পাল্টে দেওয়া ইত্যাদি।

৩. রাজনীতি হ'ল প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা (Politics is the study of Influence)

আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল প্রভাব। অধ্যাপক ল্যাস্‌ওয়েল (Lasswell) তাঁর *Politics : Who gets—What, When and How ?* নামক বই-এ বলেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভাব এবং প্রভাবশালীদের নিয়ে আলোচনা করে (The study of politics is the study of influence and the influential)।

কিন্তু প্রশ্ন হল, 'প্রভাব' কাকে বলে ? রবার্ট ডাল (Robert Dahl) বলেন যে, প্রভাব হল এমন এক সম্পর্ক যার দ্বারা কয়েকজন অভিনেতার মধ্যে একজন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অনিচ্ছুক অপরাপর অভিনেতাদের অভিনয় করতে প্ররোচিত করে। আমি নিজে যা করছি বা করতে চাই তা যদি অন্যকে দিয়ে আমি করিয়ে নিতে পারি, তবে আমি প্রভাবশালী এবং আমার এ ক্ষমতাকেই বলা হয় প্রভাব।

'প্রভাব' শব্দটি এত ব্যাপক যে এর দ্বারা কোন্ বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থাৎ কোন্‌টি এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হতে পারে তা স্থির করা সম্ভব নয়। ছাত্রদের উপর শিক্ষকের প্রভাব, রোগীর ওপর ডাক্তারের প্রভাব, মক্কেলের উপর উকিলের প্রভাব, ক্রেতার উপর বিজ্ঞাপন-দাতার প্রভাব আমরা সর্বদা দেখতে পাই। ঐ সকল প্রভাবশীল ব্যক্তিদের আচার-আচরণ নিশ্চয়ই অরাজনৈতিক এবং ঐগুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। রাজনৈতিক পটভূমিতে যে প্রভাব ব্যবহৃত হয় তাই রাজনৈতিক প্রভাব। কিন্তু কোন্‌টি 'রাজনৈতিক প্রভাব' এবং কোন্‌টি 'অ-রাজনৈতিক প্রভাব' তা স্থির করা সম্ভব নয়। বস্তুত 'প্রভাব'-এর ধারণা রাজনীতির ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রাধান্যের বা শ্রেষ্ঠত্বের (Elitism বা প্রবরবাদ) ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় হ'ল ক্ষমতা বা শক্তি (Political Science is concerned with Power)

আধুনিক কালের কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে, রাজনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল ক্ষমতা। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই নিয়েই রাজনীতি। ফ্রেডারিক ওয়াটকিন্‌স বলেন, ক্ষমতার সমস্যাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি নির্ধারণ করে। সাম্প্রতিককালে আরও কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন যে, ক্ষমতা ও ক্ষমতার লড়াই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অধ্যাপক ল্যাস্‌ওয়েল বলেন, *The subject-matter of political science is the study of shaping and sharing of power* অর্থাৎ ক্ষমতা গড়ে তোলা ও ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনাই এ শাস্ত্রের বিবেচ্য। অধ্যাপক রবসন্‌-ও (W. A. Robson) বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল সমাজের মধ্যে অবস্থিত ক্ষমতা—এর প্রকৃতি, ভিত্তি, গতিধারা, পরিধি ও ফলাফল। রবার্ট ডাল (Dahl) ক্ষমতা,

শাসন ও কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে গণ্য করেছেন (Political analysis deals with power, rule or authority)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান হ'ল ক্ষমতা—এই বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না। ক্ষমতা কাকে বলে তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্যমত দেখা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও ক্ষমতার লড়াই কিছু কম দেখা যায় না। কিন্তু ঐ সকল লড়াই নিশ্চয় এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

৫. রাষ্ট্রনীতি হ'ল মূল্যদ্যোতক বস্তু বা মর্যাদার কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টন (Politics is the Authoritative Allocation of Values)

ডেভিড ইস্টন (David Eston) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মূল্যদ্যোতক বস্তু বা মর্যাদার কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টন নামে অভিহিত করেছেন, তাঁর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্ষমতার বণ্টন ও ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত (Political science is the study of the authoritative allocation of values as it is influenced by the distribution and use of power)। ইস্টনের মতে, যে কোন সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার ন্যূনতম শর্ত হল এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে বস্তুগত ও অপার্থিব (material and spiritual) বস্তু ও মর্যাদার বণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তিনি মনে করেন, মূল্যদ্যোতক বস্তু বা মর্যাদার কর্তৃত্বসম্পন্ন বণ্টন যে কোন সমাজে অস্তিত্ব রক্ষার পথে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়, একে একমাত্র কাজ বলে গণ্য করা উচিত নয়। যখন বস্তু বা মর্যাদার বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে বা ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করা যায় না। তখন সামাজিক কর্তৃত্বের সমর্থনে একটা নীতি প্রণয়ন করা হয়। সমাজ ঐ নীতি বা সিদ্ধান্তকে কর্তৃত্বসম্পন্ন বলে গণ্য করে। ইস্টনের মতে কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দের ব্যবস্থা ক্ষমতার বণ্টন এবং ব্যবহারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক কর্তৃত্ব প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করেও নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে পারে।

ইস্টনের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলা যায় যে, কেবলমাত্র বস্তু ও মর্যাদার কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করার মধ্যেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সীমিত থাকতে পারে না। বস্তু ও মর্যাদার কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি বলে পরিগণিত হতে পারে—একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে না।

৬. কয়েকটি বৃহৎ সমস্যা রাজনীতির বিষয়বস্তু (Politics consists of certain Great Issues)

লেসলী লিপসন (Leslie Lipson) তাঁর *Great Issues of Politics* গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে কয়েকটি সমস্যাকে উপস্থিত করেছেন। প্রতিটি সরকারকেই ঐ সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হয় এবং সমাধান বের করতে হয়। রাজনীতি হল একটি পথ, একটি উপায়—এর মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী জটিল ঐ সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রাজনীতির গতিপথে কোন্ কোন্ বড় সমস্যা দেখা দেয়? কোন্ কোন্ সমস্যা নিয়ে রাজনীতির গতিপথ তৈরী হয়? লিপসনের মতে এদের সংখ্যা হল পাঁচটি।

প্রথম সমস্যা রাষ্ট্রের সদস্যদের নিয়ে। প্রত্যেকটি নাগরিকেরই অপর নাগরিকের ওপর অধিকার আছে, কর্তব্যও আছে। ঐ অধিকার ও কর্তব্য পারস্পরিক। প্রত্যেকটি সমাজে শাসক এবং শাসিতের দুটি বিভাগ থাকে, ফলে এদের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে। সকল নাগরিক কি সরকার বা প্রশাসন চালাতে সক্ষম বা অধিকারী? অন্য সকলের থেকে কি কেউ কেউ কম বা বেশী দক্ষ? সমাজের সকলে কি সমান মৌলিক অধিকার ভোগ করে? রাষ্ট্রের সদস্যদের নিয়ে এ ধরনের সমস্যাকে লিপসন প্রথম সমস্যা হিসেবে দেখেছেন।

দ্বিতীয় বড় সমস্যা হ'ল রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিধি বা সীমারেখা সম্বন্ধে। রাষ্ট্রের কাজের পরিধি কি সীমাবদ্ধ, না সীমাহীন? প্রাচীনকাল থেকেই এ বিষয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে।

এক দলের মতে রাষ্ট্রের সকল কাজ করার অধিকার থাকা উচিত, অন্য দল বলেন রাষ্ট্রের কাজকর্ম সীমিত করে দেয়া উচিত। লিপ্‌সনের মতে, এ ব্যাপারে বহুত্ববাদী এবং একাত্ববাদী তত্ত্বের মধ্যে একটিকে আমাদের পছন্দ করতে হবে।

তৃতীয় বড় সমস্যা হল, কর্তৃত্বের উৎস (source of authority)। বিপুলসংখ্যক নাগরিকের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজন সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। স্বভাবতই সরকার ও নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক নানারূপ বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। অনেকে বলেন যে, যাঁরা প্রশাসক, অর্থাৎ সরকার পরিচালনা করেন, তাঁরা নিজেদের কাজের জন্য সাধারণ নাগরিকদের কাছে কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নন। জনসাধারণ তাঁদের প্রতিটি নির্দেশ, অর্থাৎ আইন মেনে চলতে বাধ্য। যেন নাগরিকদের তুলনায় প্রশাসকেরা উচ্চতর বলে ঐ কর্তৃত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত আছে। আবার অপরপক্ষ ঐ দাবি একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সরকার বা প্রশাসকবৃন্দ তাঁদের প্রতিটি কাজের জন্য জনগণের কাছে উত্তর দিতে বাধ্য। কারণ, সরকারের ক্ষমতার উৎস হ'ল জনগণ।

চতুর্থ সমস্যা হ'ল, ক্ষমতা সংগঠিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে। ক্ষমতা কোন একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে অথবা বিকেন্দ্রীভূত বা ছড়ানো অবস্থায় থাকতে পারে। সরকারের বিভিন্ন স্তর থাকে, যেমন—জাতীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, আঞ্চলিক সরকার ইত্যাদি। এদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করতে হয়। কোথাও কোথাও আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলো জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট মাত্র, আবার কোথাও ঐ প্রাদেশিক সরকারগুলো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হাত থেকে কিছুটা পরিমাণ স্বাধীন। ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কে দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল একই স্তরের বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা যাতে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।

লিপসনের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রাজনীতিশাস্ত্রের পঞ্চম মৌলিক সমস্যা হ'ল রাষ্ট্রের আয়তন এবং এর বাহ্যিক সম্পর্কগুলো সম্পর্কে। যেমন, একটি সরকারের আয়তন কত বড় হওয়া উচিত? ভাল কাজ করার জন্য রাষ্ট্রটি কত বড় বা কত ছোট হলে ভাল হয়? রাষ্ট্রের কি কোনও সর্বোত্তম আয়তন আছে? একটি রাষ্ট্রের কি নিজস্ব ভূখণ্ড থাকা একান্ত জরুরী? নিজস্ব স্থায়ী ভূখণ্ড না থাকলে অন্যভাবে কি রাষ্ট্র গঠন করা যায় না? অনেক রাষ্ট্র যখন একই সঙ্গে পৃথিবীতে আছে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আইন এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কি বোঝা যায়? পৃথিবীতে বহুসংখ্যক রাষ্ট্র থাকা উচিত অথবা একটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত?

ওপরের ঐ সকল আলোচনা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নিজেরাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একমত নন।

পাঁচ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি : রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান, না কলা? (Nature of Political Science : Is it Science or Arts?)

'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বিজ্ঞান, না কলা—এই আলোচনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি বা চরিত্র অনুধাবন করা যেতে পারে।

'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বিজ্ঞান পদবাচ্য কিনা এ সম্পর্কে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক আরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিজ্ঞান বলে মনে করতেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বোঁদা (Bodin), হবস্ (Hobbes), সিজউইক (Sidgwick) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একে 'বিজ্ঞান' হিসাবে স্বীকার করেছেন। অপর দিকে বার্ক (Barke), মেট্‌ল্যান্ড (Maitland), বাক্‌ল্ (Buckle) প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞান' বলে মানতে প্রস্তুত নন। মেট্‌ল্যান্ড বলেছেন যে, যখন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের শিরোনামায় তিনি 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' লেখা দেখেন তখন প্রশ্নপত্রের জন্য নয়, শিরোনামার জন্য

এ সম্পর্কে মতপার্থক্য

তিনি দুঃখবোধ করেন। বাক্‌ল্‌ মনে করেন যে, বর্তমান অবস্থায় 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে' 'বিজ্ঞান' বলা তো চলে-ই না, এমনকি কলা বিষয়গুলির মধ্যেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান খুবই অনুন্নত (In the present state of knowledge, politics so far from being a science is one of the most backward of all arts)।

আচরণবাদী বক্তব্য

সাম্প্রতিককালে 'আচরণবাদী' নামে পরিচিত একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'রাষ্ট্রনীতির বিজ্ঞান' (science of politics) প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সযত্নে দর্শন ও মূল্যবোধ পরিহার করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ (value free) শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য এবং রাজনৈতিক বাস্তবতাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য তাঁরা পরিসংখ্যান ও পরিমাপ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আচরণবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার জন্য 'সাধারণ তত্ত্ব' (general theory) গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর বৈজ্ঞানিক সত্তা আরোপের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের আলোচনায় গাণিতিক তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের ব্যাপক প্রয়োগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রেখে ওয়াজবি (Wasby) বলেছেন যে, পদার্থবিজ্ঞান যে অর্থে বিজ্ঞান সে অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে রীতিসিদ্ধভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা করা যায় (Political science is, not a science in the same sense as physics, but politics can be studied systematically with the scientific method)।

যা হোক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' কিনা তা পর্যালোচনার জন্য **দুটি পদ্ধতি** প্রয়োগ করা যেতে পারে :

১. **ঐতিহাসিক পদ্ধতি** (Historical Method)
২. **বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি** (Analytical Method)

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, আরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক বক্তব্য ১৫৮টি দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। আরিস্টটলের ঐ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আরও উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতালীর বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)। তিনিই সর্বপ্রথম নীতিশাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে আলাদা করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র থেকে মুক্ত করেন। অর্থাৎ যা আছে এবং যা প্রয়োজন তাই রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর সঙ্গে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিতবোধ যুক্ত নয়—এটাই ম্যাকিয়াভেলির দর্শন। বস্তুত এই পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের জন্যই তাঁকে প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে বোঁদা, হবস্‌, হার্বার্ট স্পেনসার, মঁতেস্কু প্রমুখ দার্শনিকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, মঁতেস্কুকেই (Montesquieu) প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে। তিনি তাঁর *The Spirit of the Laws*. গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বক্তব্য উপস্থিত করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামনে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত সৃষ্টি করেন।

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' কিনা এবার তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে যে সকল কারণে 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্বীকার করতে আপত্তি করা হয় তা নীচে তুলে ধরা হল :

১. বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয়।
২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি নেই, কারণ এর বিষয়বস্তু খুবই জটিল।

৩. রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণাগারে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব নয়, কারণ এর বিষয়বস্তু খুবই ব্যাপক।

৪. পরিবর্তনশীল সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংস্থা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার। গবেষণার বিষয়বস্তু সদা পরিবর্তনশীল হলে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয়। তাই রাষ্ট্রনীতির গবেষণার ফল সর্বদাই অনিশ্চয়তাপূর্ণ।

৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন ধারাবাহিকতা নেই, কারণ এর বিষয়বস্তু সতত পরিবর্তনশীল।

এ সব যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' কিনা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের জানতে হবে 'বিজ্ঞান'এর প্রকৃত সংজ্ঞা কী? কেবলমাত্র যুক্তির ধারাবাহিকতাকে আমরা 'বিজ্ঞান' বলব? অথবা কোনরূপ ব্যতিক্রম বাদে নির্দিষ্ট কারণে যদি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটে (যেমন পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে) এমন বিষয়কেই কেবলমাত্র 'বিজ্ঞান' বলব? অথবা রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে যদি কোন বিষয় থেকে প্রচুর জ্ঞান লাভ করা যায় তবে তাকে 'বিজ্ঞান' বলব? আমাদের মতে শেষোক্ত ধারণাই সঠিক এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি 'বিজ্ঞান' পদবাচ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ তাঁদের বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। আবিষ্কৃত ঐ সকল সূত্র সর্বদা অভ্রান্ত না-ও হতে পারে। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগার হ'ল পৃথিবী জুড়ে এবং এর বিষয়বস্তু হচ্ছে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা।

বিজ্ঞান কাকে বলে?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আরিস্টটলের সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে বহু রাষ্ট্রের গঠন, সরকারের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন ধরনের শাসনপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাঁরা সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং কোন্ শ্রেণীর সরকার কী উপায়ে চলবে এবং তা দ্বারা জনগণ কতটা পরিমাণ উপকৃত হবে তাও অনুমানের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আরিস্টটল ১৫৮টি দেশের সংবিধান নিয়ে গবেষণা করে বিপ্লবের কারণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। লর্ড ব্রাইস (Bryce) তাঁর *Modern Democracies* নামক বইতে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি তুলনা করে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এ শাস্ত্র যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে একে 'বিজ্ঞান' বলা চলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনকে 'বিজ্ঞান' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এবার দেখা যাক রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' হিসেবে বিশ্লেষণের অসুবিধে কোথায়। ১. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিকতা লক্ষ্য করা যায় বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সহজ, সরল এবং স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হয়। সেজন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য সহজে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জটিল অভিব্যক্তির অন্তর্নিহিত সত্যকে সহজে আবিষ্কার করা যায় না। ২. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণার নানা সুযোগ আছে। পরীক্ষাগারে একই বস্তু নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে কোন একটি উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে এ ধরনের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ৩. যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব রচনা করেন তিনিও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান তাঁর নিজস্ব চিন্তাকে প্রভাবিত করে বলে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তিনি হয় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও এর বিশেষ সুযোগ-সুবিধার পক্ষে অথবা তার বিপক্ষে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নিরপেক্ষতা একটি অবাস্তব ধারণা। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণী চরিত্র নেই। ৪. পদার্থ ও রসায়ন-বিদ্যার বিষয়বস্তু জড় পদার্থ এবং ওগুলোর স্বাধীন কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু মূলত মানুষই রাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু। মানবসমাজ সম্পর্কে এমন

অসুবিধে

কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না যা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সত্য হতে বাধ্য। অর্থনীতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এজন্য ধনবিজ্ঞানী মার্শাল (Marshall) অর্থনীতির সিদ্ধান্তকে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন—যা সর্বদা অভ্রান্ত নাও হতে পারে। ব্রাইসকে অনুসরণ করে সেরূপভাবে আমরা রাষ্ট্রনীতিকে আবহবিজ্ঞানের (Meteorology) সমপর্যায়ে স্থাপন করতে পারি। বৃষ্টি, মেঘ ও ঝড় সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী যেমন সব সময় অভ্রান্ত নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তও তেমনি স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সব সময় অভ্রান্ত হবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

আগেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা করার তেমন কোন সুযোগ নেই। তাই মূলত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে হয়। সে জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (experimental science) না বলে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান (observational science) বলা উচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি দেখা যায় যে বিশেষ এক ধরনের শাসনব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে বিভিন্ন গণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এরূপ কেন হল তা জানার জন্য গবেষণাগারে পরীক্ষা হয়তো করতে পারবেন না; কিন্তু ঐ ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে, ঐ বিশেষ শাসনতন্ত্র স্থায়ী সরকার গঠনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

সুতরাং সব কিছু বিশ্লেষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, রীতিসম্মত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনা ও তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করে বিশেষ জ্ঞান লাভ করাকে যদি 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্বীকার করা হয়, তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নিশ্চয়ই 'বিজ্ঞান' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, **পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নবিজ্ঞান যে অর্থে 'বিজ্ঞান' রাষ্ট্রবিজ্ঞান সে অর্থে বিজ্ঞান নয়। ব্রাইসের ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'অপরিণত বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করা যায়।** লিপসনকে অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যতদূর অবধি আমরা সত্যকে জানার চেষ্টা করি, নিখুঁতভাবে ঘটনাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করি এবং কারণকে তার ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনাও ততদূর অবধি বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে (**The study of politics can be considered 'scientific' only to the extent that we seek to know the truth, to discover the facts with accuracy and to correlate causes with their consequences.**)।

অপরিণত বিজ্ঞান

ছয় : আন্তঃ-শাস্ত্র কেন্দ্রিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা (Need for Inter-Disciplinary Approach)

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এরা প্রত্যেকেই সমাজ জীবন থেকে নিজেদের রসদ সংগ্রহ করে এবং সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও চরিত্রগত পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে কোন সামাজিক বিজ্ঞানই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত শাস্ত্রগুলোর চরিত্র, পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয় এবং নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রভাব কোন নতুন ঘটনা নয়। প্লেটো রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করার সময়ে পরিবার ও শিক্ষা কাঠামোর আলোচনা করেছেন। আরিস্টটল বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থায় সামাজিক মর্যাদা ও সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস রাজনৈতিক জীবন তথা সমাজ বিকাশের ধারা আলোচনার জন্য সামাজিক শ্রেণী কাঠামো ও প্রযুক্তি বিদ্যাগত অগ্রগতির মাপকাঠি প্রয়োগ করেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও আন্তঃ-শাস্ত্র পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট

সীমারেখা টেনে দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহযোগিতার পথ অবরুদ্ধ হবে এবং চিন্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর পরিণতি হবে খুবই মারাত্মক। ডেভিড ইস্টন মনে করেন, অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের প্রসারের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে আন্তঃ-শাস্ত্র বিজ্ঞান কেন্দ্রিক আলোচনার নূতন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার এই ঘটনাকে তিনি *cross fertilization* আখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে তত্ত্বগত কৌশল গ্রহণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠতার প্রসার ঘটেছে; সুতরাং বলা যায়, **সমাজ জীবনের নানা দিক অনুধাবনের জন্য আন্তঃশাস্ত্র কেন্দ্রিক আলোচনার প্রসার ঘটা উচিত—কারণ, এর মাধ্যমেই সমগ্র সমাজজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব।**

সাত : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের দুটি ঘনিষ্ঠ শাখা এবং ঐ শাস্ত্র দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাগার বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ইতিহাস হ'ল অতীতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল বর্তমানের ইতিহাস (History is past Politics and Politics is present History)। লর্ড অ্যাকটন (Lord Acton) বলেছেন, ইতিহাসের স্রোতোধারায় বালুকণার মধ্যে স্বর্ণরেণুর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞান জমে উঠেছে।[১] বার্জেস (Burgess) মনে করেন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্র দুটিকে আলাদা করলে একটি বিকলাঙ্গ হবে এবং অপরটি আলেয়ার মত অবাস্তব হয়ে যাবে।[২]

এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বক্তব্য

ঐতিহাসিক সিলি (Seely) বলেছেন: "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিন্ন ইতিহাস ফলপ্রসূ হয় না; ইতিহাস ভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় থাকে না" (History without Political Science has no fruit, Political Science without History has no root)। সিলি বলতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় রয়েছে অতীতের মধ্যে। ইতিহাসের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ না করলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনা সার্থক হতে পারে না, এর প্রকৃত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় অতীতে কি ঘটেছে, কেন ঘটেছে এবং তার ফল কি হয়েছে। অতীতের ঐ শিক্ষার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্ভব। আরিস্টটল দেখিয়েছেন, ইতিহাসেই মানুষের চিন্তা ও সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়—ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'জাতীয়তাবাদ', 'সমাজতন্ত্রবাদ' ইত্যাদি রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন এদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্ঞান। ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত না হলে ঐ সকল তত্ত্ব মূল্যহীন হতে বাধ্য। এ জন্য মনে করা হয়, ঐতিহাসিক তথ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধিশালী করে। উইলোবীর ভাষায় বলা যায়, ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সামনে নতুন দিগন্ত (third dimension) সৃষ্টি করে।[৩] এ দুটি শাস্ত্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রসঙ্গে সিলি আরও বলেছেন, ইতিহাসের দ্বারা বিশদীকৃত না হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রাম্য ভাবাপন্ন হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক হারালে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না—সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়।

ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সম্পর্ক

---

১. 'The science of Politics is the one science that is deposited by the stream of history like the grains of gold in the sand of a river.'

—Lord Acton.

২. 'Separate them……and the one becomes a cripple, if not a corpse, the other a will-o-the-wisp.'

—Burgess.

৩. History provides the third dimension of Political Science.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য যেমন ইতিহাসের সাহায্য প্রয়োজন, তেমনি ইতিহাসও নানাভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে ঋণী। সিলি তো মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিন্ন ইতিহাস ফলপ্রসূ হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে মানুষের রাজনৈতিক কল্পনা ও সংগঠনের প্রয়োজন ইতিহাস গ্রহণ করে। হিটলার বা মুসোলিনীর ইতিহাস জানতে হলে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের রাজনৈতিক তত্ত্ব জানতে হবে। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই হিটলার ও মুসোলিনীর মূল্যায়ন সম্ভব। গান্ধীবাদের পটভূমিকাতেই গান্ধীজীর জীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে (আমার জীবনই আমার বাণী)। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাষ্ট্রচিন্তা এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মধারা বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস শাস্ত্র দুটি নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এ শাস্ত্র দুটির সম্পর্কের প্রকৃতি সঠিক ভাবে অনুধাবনের জন্য জানা প্রয়োজন, ইতিহাস কাকে বলে? গতানুগতিক ভাবে ইতিহাস বলতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ঘটনার সংকলনকে বোঝান হত। কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন যে, প্রতি যুগেই শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য শোষক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সমাজের একদিকে দেখা যায়, উৎপাদনের উপাদানের মালিকদের—যারা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা-হীন শ্রমজীবী মানুষের শ্রম শোষণ করে নিজেদের মুনাফা বর্ধিত করে। অপর দিকে আছে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদনের উপাদানের বা সম্পদের মালিকদের দ্বারা শোষিত হয়। **মার্কস মনে করেন, প্রতি যুগে প্রতি দেশে ঐ পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী দুটির দ্বন্দ্বই ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়।** তাই তিনি বলেছেন, সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস (The history of all hitherto existing society is the history of class struggles)। ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় বক্তব্য গ্রহণ করলে দেখা যাবে, **অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র সীমারেখা থাকছে না, উভয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে।**

ইতিহাস কি?
—মার্কসীয় বক্তব্য

সমালোচনা

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভংগী ও আলোচনা পদ্ধতির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই বার্জেস, অ্যাকটন, সিলি প্রমুখ পণ্ডিতগণ যে ভাবে এ দুটি শাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য নয়—আংশিক সত্য। ঐ সব আলোচনা কিছুটা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের সংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকলেও সকল ধরনের ইতিহাসের সংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, চারুবিদ্যার ইতিহাস বা মুদ্রা ব্যবস্থার ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় কোন সাহায্য করতে পারে না। ইতিহাসের বাছাই করা কিছু কিছু ঘটনার সাহায্য গ্রহণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ইতিহাসের পরিধি অনেক ব্যাপক—এর সকল বিষয়বস্তুর সংগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই। সকল রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা বা তত্ত্ব ইতিহাসকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে না। প্লেটোর 'রিপাবলিকের আদর্শ' বা বেন্থামের 'হিতবাদ' ইতিহাসকে ভিত্তি করে রচিত হয়নি। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলো ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়নি বা যা ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচার করার প্রয়োজন হয় না বা বিচার করা সম্ভব নয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এই শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একদিন নিশ্চয়ই সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত হবে, কিন্তু বর্তমানের সীমায় এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই এলাকা ও আলোচনার বিষয়। এ সকল কারণে ইতিহাসকে নিছক 'অতীতের

সকল ইতিহাসের সঙ্গে
সম্পর্ক নেই

রাষ্ট্রবিজ্ঞান' এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'বর্তমানের ইতিহাস'[১]—বার্জেস, সিলি বা ফ্রীম্যানের এ বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না।

অধ্যাপক সিজউইক সম্ভবত এ কারণেই ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে গৌণ স্থান দিয়েছেন ; সিজউইক বলেন, তত্ত্ব ও আদর্শ হিসেবে ইতিহাস ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার জন্ম দেয় না। ইতিহাস অতীতের ধারণাকে বহন করে মাত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদর্শ, আদর্শের গুরুত্ব ইত্যাদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে জানতে পারা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইতিহাসে ততটুকু থাকে যতটুকু সেকালে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যা সম্পূর্ণ-ই নূতন, যা গঠনের কথা ভাবা হচ্ছে, তার পরিচয় ও মাত্রা বর্তমান কালের কল্পনা ও সংকল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেকেই করতে হবে। তত্ত্বের আলোতে স্বাধীনভাবে পথ নির্ধারণ করতে ইতিহাসের প্রাচীন তথ্য কোন সাহায্যই করতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যা ও পথ তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব। একথা মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শাস্ত্র। অর্থাৎ লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে চলতে হয়। কিন্তু ইতিহাস কোন অর্থেই উদ্দেশ্যমূলক শাস্ত্র নয়। যা আছে বা যা ছিল তাকে যথাযথ চিত্রিত করাই ইতিহাসের কাজ।

তাই কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব গভীর নয়, ইতিহাসকে বাদ দিয়ে সহজেই রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করা যায়। বার্কার এ ধরনের মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন: **ইতিহাসকে ভিত্তি না করেও শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের সৃষ্টি হতে পারে।**[২] বার্কারের এ মন্তব্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসকে দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের পারস্পরিক অবদানকে অস্বীকার করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস পরস্পরের পরিপূরক—এ কথা অস্বীকার করার কোন সংগত কারণ নেই। বরং লীকক-কে (Leacock) অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, **ইতিহাসের কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ।**[৩]

আট : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Political Science and Economics)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে দুটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার নীতি সাম্প্রতিককালের ঘটনা। আগে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান একই শাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঐ শাস্ত্রকে বলতেন রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি বা *Political Economy*। প্লেটো ও আরিস্টটল থেকে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) পর্যন্ত প্রায় সব পণ্ডিতই মনে করতেন যে, সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে কোনো-না-কোন ভাবে রাষ্ট্রতত্ত্বের সংযোগ আছে। তাই আরিস্টটল রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনা করার সময় অর্থনীতির আলোচনা করেছেন। কৌটিল্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র'এ রাজ্যের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আঠারো শতকে ফিজিওক্র্যাটরা (Physiocrats) অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতির একটি শাখা বলে ঘোষণা করেন। পক্ষান্তরে অনেকে মনে করেন যে, ঐ শাস্ত্র দুটোর আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র, সুতরাং এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাঁদের মতে রাষ্ট্র যতটুকু আর্থনীতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ততটুকুই ঐ শাস্ত্র দুটির সম্পর্ক।

যা হোক, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা প্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন ইংরাজ পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ। তিনি মনে করেন যে, জনগণ ও সার্বভৌমকে শক্তিশালী করাই রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য (Political economy proposes to enrich the people and the sovereign)। তাঁর মতে, জগতে একটি অদৃশ্য 'প্রাকৃতিক নিয়ম' আছে যার লক্ষ্য হল স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজের সম্পদ নির্ভর করে শ্রমবিভাগজনিত উৎপাদন

১. History is past Politics, Politics is present History.

২. "We must admit the possibility of a great and influential theory of politics which has no definite basis in history." —Barker

৩. "Some history is part of Political Science." —Leacock

ব্যবস্থার ওপর ; এ ব্যবস্থায় স্বাধীন উৎপাদকেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করে এবং স্বাধীন ক্রেতা নিজের সামর্থ্যমত ভোগ করে। ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন সম্পর্কের ফলে সমাজের ভারসাম্য ও মঙ্গল রক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের কর্তব্য ঐ নিয়মটিতে হস্তক্ষেপ না করা এবং উৎপাদন ও বণ্টনকে নিজের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত না করা। অ্যাডাম স্মিথ যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রকে অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল বলেননি, কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই অর্থনীতি রক্ষা করেই রাষ্ট্র তার সত্তা এবং সমাজমঙ্গলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখে—হস্তক্ষেপ করলেই তা নষ্ট হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রকৃত সত্তা ও সমাজমঙ্গল পরোক্ষভাবে অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁর ঐ মতবাদের ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেসেফেয়ার (Laissez faire) তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে, তবুও পরোক্ষভাবে রাজনীতির অন্তরালে অর্থনীতি ঐ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, বিশেষ চরিত্র দেয়।** যেমন অর্থনীতির লেসেফেয়ার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রও লেসেফেয়ারের রূপ নেয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা যায় উনিশ শতকে বিখ্যাত পণ্ডিত কার্ল মার্কসের (Karl Marx) আলোচনা থেকে। মার্কস অর্থনীতি ও রাজনীতিকে গভীর যোগসূত্রে আবদ্ধ বলে মনে করতেন। তিনি দেখান যে, সম্পদ উৎপাদন করা এবং মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু রেখে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হয়। সমাজ শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় কতকগুলো আর্থনীতিক সম্পর্ক এবং নিয়মে। সমাজে সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক হয় রাষ্ট্র। উৎপাদন ব্যবস্থা যাদের নিয়ন্ত্রণে তাঁরাই রাষ্ট্রের কর্ণধার হন ও তাদের মুখপাত্র হিসাবেই রাষ্ট্র অন্যান্য শ্রেণীকে দমন ও শোষণ করে। আইন, প্রশাসন যন্ত্র, সেনাবাহিনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী শ্রেণী অন্য শ্রেণীদের দমন করে। রাষ্ট্র কার্যত তাই শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার মাত্র ; রাষ্ট্রের আদর্শ তাই সম্পদশালী শ্রেণীর আদর্শ। **মার্কসবাদ অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যকার কৃত্রিম প্রাচীর স্বীকার করে না। মার্কসীয় তত্ত্বে অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখার কোন অস্তিত্ব নেই—উভয় শাস্ত্র মার্কসীয় দর্শনে একাকার হয়ে গিয়েছে।** লেনিন যথার্থই বলেছেন যে, রাজনীতি হল অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ।

মার্কস ঃ রাষ্ট্র শোষণের হাতিয়ার

বস্তুত, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে আলাদা করা যায় না। প্রতিটি দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থা সেখানকার শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন। পুঁজিবাদী রাজনৈতিক নিয়মের জন্যই সেখানকার আর্থনীতিক ব্যবস্থায় দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতি, মন্দা ও বেকারী। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক নিয়মের জন্য সেখানকার আর্থনীতিক ব্যবস্থা ঐ সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি তত্ত্বকে অর্থনীতি-নিরপেক্ষ নিছক রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করেন তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত রাখেন। যেখানে ধন উৎপাদন ও বণ্টনের ভেতর কোনরূপ সামঞ্জস্য নেই। অন্যদিকে যাঁরা **সমাজতান্ত্রিক** আদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রসারিত করে দেশের আর্থনীতিক বিধিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীনে এনেছেন। **বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দর্শন-নিরপেক্ষ কোন আর্থনীতিক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না** বা আর্থনীতিক পটভূমিকাকে অস্বীকার করে কোন রাষ্ট্রদর্শন বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

আর্থনীতিক ব্যবস্থা—রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সম্পর্ক খুবই নিবিড়, কোন সীমারেখা টেনে এদের আলাদা করা যায় না। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতি বিশেষ সম্মান ও প্রাধান্য পেতে থাকে। রাজদরবারের তুলনায় ব্যবসায়ীর আড়ৎ যতই গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকে রাষ্ট্রনীতির তুলনায় অর্থনীতি ততই স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে 'মর্যাদা' পেতে থাকে। একদিকে অর্থনীতির এই বিশেষ 'মর্যাদা' এবং অন্যদিকে নিত্যনূতন তত্ত্বে ও তথ্যে উভয় শাস্ত্রই এত

শাস্ত্র দুটিকে আলাদা করার কারণ

সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে আলাদা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি দুটি আলাদা শাস্ত্র হলেও এরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এরা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির এই পারস্পরিক সহযোগী মনোভাব এদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করেনি (they co-operate, and yet they maintain their autonomy)।

নয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব (Political Science and Sociology)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎস হ'ল সমাজবিজ্ঞান (Politics is embeded in the Social)। সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) একটি সমৃদ্ধিশালী শাখা হিসেবে মানুষের সামাজিক জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে সমাজতত্ত্ব (Sociology)। অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব সামাজিক জীব মানুষের সামাজিক কাজকর্ম সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র মানুষের জীবনের রাজনৈতিক দিকটা এবং ঐ রাজনৈতিক দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক মানুষের সমগ্র জীবনের একটি অংশ মাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান যা আলোচনা করে তা হ'ল সমাজতত্ত্বের সর্বব্যাপী আলোচ্য বিষয়ের একটা অংশ মাত্র। মানুষের সামাজিক জীবন সমাজতত্ত্বে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তার একটা অংশ, রাজনৈতিক দিকটাই শুধুমাত্র প্রতিফলিত হয়। তাই ফরাসী দার্শনিক পল জানে (Paul Janet) বলেন, **সমাজবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্রের মূলভিত্তি ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।** মানুষের রাজনৈতিক আচার আচরণ, রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল আলোচনা সমাজ-তত্ত্বের অন্তর্গত, কিন্তু সমাজতত্ত্বের সকল আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, দর্শন এইসকল শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এগুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের একটি অংশ

সুতরাং বলা যায়, সমাজতত্ত্ব হল সমগ্র, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল তার একটি বিশেষ দিক বা অংশ। বহু ব্যক্তির সমষ্টি নিয়ে গঠিত সমাজ সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু, অন্যদিকে সমাজের রাজনৈতিক দিকটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজতত্ত্ব সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিশ্লেষণ করে। এখানে ব্যক্তিকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে দেখা হয়। তাই সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু রাষ্ট্রকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন রূপে গণ্য করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেন্দ্রে রয়েছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সকল বিষয়কে রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে। **তৃতীয়ত**, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবলমাত্র রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা নিয়ে আলোচনা করে। **চতুর্থত**, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে একটি রাজনৈতিক জীব হিসেবে দেখে এবং সেই পটভূমিকায় সব কিছু বিশ্লেষণ করে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গ্রহণ করে এবং সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু বিশ্লেষণ করে। **পঞ্চমত**, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই সমাজতত্ত্বের এক্তিয়ার ও পরিধি অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি তুলনামূলক ভাবে সীমিত।

এদের বিষয়বস্তুর পার্থক্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যগুলো থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উভয় শাস্ত্র পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। রাষ্ট্র সম্পর্কে সমাজতত্ত্বকে তথ্য সরবরাহ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র একটি

বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান। মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান যন্ত্র হল রাষ্ট্র এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তাই সমাজতত্ত্বের কোন ছাত্রের পক্ষে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণের প্রকৃতি বুঝতে হলে রাষ্ট্রের সংগঠন, কাজকর্ম এবং প্রকৃতি সম্পর্কে পুরো তথ্য জানা দরকার। সমাজতত্ত্ব ঐ জ্ঞান লাভ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছ থেকে। অন্যদিক সমাজতত্ত্বও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নিয়ম-কানুন কিভাবে গড়ে ওঠে এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জ্ঞান লাভ করেন সমাজতত্ত্বের কাছ থেকে। রাজনৈতিক কাজকর্মের ধারা আর্থনীতিক শক্তির উপর প্রধানত নির্ভরশীল—এ ধারণা সমাজতত্ত্বের দান। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে সংঘাত চালায়—যা রাজনৈতিক জীবনে গতিশীলতা, চঞ্চলতা এবং উত্তালতার সৃষ্টি করে। কিভাবে গোষ্ঠী মনোবৃত্তি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সৃষ্টি করে তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমাজতত্ত্বের কাছ থেকে জানতে পারে। বস্তুত সমাজতত্ত্বের জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পূর্ণ হতে পারে না।

পারিবারিক সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞানের আসরে এতদিন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সমাজতত্ত্ব ছিল উপেক্ষিত। কিন্তু বর্তমানে সমাজতত্ত্ব খুবই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে এবং ক্রমশ বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী হয়ে উঠছে। সমাজতত্ত্বের পরিধির প্রসার ও পুষ্টি এবং আলোচনার বিন্যাসের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানও উপকৃত হচ্ছে। সমাজতত্ত্বের যে অংশ রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়া, কর্ম ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে তাকে **রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতত্ত্ব** (Political Sociology) নামে অভিহিত করে একটি নতুন শাখার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব এই শাস্ত্র দুটির যোগসূত্র হিসেবে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজতত্ত্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দশ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology)

সমাজবিজ্ঞানের আসরে এতদিন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে মনোবিজ্ঞান ছিল অবহেলিত। কিন্তু আচরণবাদী চিন্তাধারার প্রসারের ফলে মনোবিজ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের মনোজগতের জটিল কর্মপ্রক্রিয়া এবং আচরণকে বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীমনের প্রভাব এবং এদের আচরণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় ব্যক্তি ও সমাজ (বা রাষ্ট্র) উভয়েরই কাজকর্মের উৎস ব্যক্তিমন। সুতরাং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীমনের চিন্তা, ভাবনা, আচার, আচরণ ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

কোঁত (Comte), স্পেনসার (Spencer) প্রমুখ দার্শনিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের আলোচনা এবং বিচার-বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বেজ্‌হট (Bagehot) তাঁর *Physics and Politics* বই-এ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বৃটিশ সংবিধান মূলত বৃটিশ জাতির মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বার্কার মনে করেন, বেজ্‌হটের ঐ বই প্রকাশিত হবার পর থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সামাজিক-মনোবিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ব্রাইস মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড় নিহিত রয়েছে মনোবিজ্ঞানের মধ্যে (political science has roots in psychology)।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব

টার্ডে, লি'ব, ম্যাকডুগাল, গ্রাহাম ওয়ালাজ, ট্রটার প্রমুখ পণ্ডিতেরা সমাজবিদ্যায় মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা আনেন। ফরাসী পণ্ডিত টার্ডে প্রথম ব্যক্তিসত্তার সংগে মনস্তত্ত্বকে সংযোগ করেন, আর লি'ব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে দেখান যে ব্যক্তির মন গোষ্ঠীমনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইংরাজ মনস্তাত্ত্বিক ম্যাকডুগাল ব্যক্তিমনের ঝোঁকের (propensity) সাহায্যে সমাজ-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

ব্যক্তি দুভাবে রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করে। প্রথমত মানুষই রাষ্ট্রের পরিচালক এবং তারাই টার্ডের বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতির প্রত্যয়গুলি গড়ে তোলে। দ্বিতীয়ত, সমাজ বা গোষ্ঠীর

মধ্যে ব্যক্তিসমষ্টির আবেগ-প্রবণ মন কাজ করে। ঐ মনটিই সকল চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-যুক্তি ও কর্মের উৎস। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনস্তত্ত্বের খোঁজ না রেখে উপায় নেই।

সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, আবেগ ও মানসিক গঠন, ঝোঁক ইত্যাদির প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, কোনও জাতির মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের দ্বারা ঐ জাতির জাতীয়তাবাদের মানসিক অনুভূতি গড়ে উঠে এবং এর রূপ ও চরিত্র স্থির হয়। আবার বলা যায়, জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেশ কিছুটা পরিমাণে মনোবিজ্ঞনের উপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞান প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক ধারাকে সর্বদা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

এগার : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (Political Science and Ethics)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঊষা লগ্নে প্লেটো ও আরিষ্টটলের দ্বারা নীতিশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীকালে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐ নিবিড় সম্পর্ক যথার্থ কিনা সে সম্পর্কে সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দেয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক গিলক্রাইস্ট (Gilchrist) বলেছেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক নিয়মকানুনের বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে এবং এর সঙ্গে নৈতিক নিয়মকানুনের বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর ভাষায়, *Political Science, the science of political order, is also connected with ethics, the science of moral order*। নীতিশাস্ত্র মূলত মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎ নিয়ে চিন্তা করে। নীতিশাস্ত্র মনে করে চিন্তা ও বিবেকের বিশুদ্ধতা দ্বারা ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব। আদর্শগত দিক থেকে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত তা নীতিশাস্ত্র নির্ধারণ করে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের বাহ্য আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বাহ্য আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সুস্থ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এই মৌল পার্থক্য সত্ত্বেও এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

নীতিশাস্ত্রের বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদর্শ

নীতিশাস্ত্র আমাদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত নির্দেশ করে। ঐ ঔচিত্য বোধ থেকে সমাজের শৃংখলা তৈরী হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় রাজনৈতিক শৃংখলা। নীতিবোধ আছে বলে নাগরিকেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে এবং অন্যের অধিকার মেনে চলে এবং সাধারণত অপরের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে না। লেনিন থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক নেতাই তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামে নৈতিক আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মনে করতেন নীতিশাস্ত্রের সম্প্রসারিত রূপ ; এঁরা রাষ্ট্রের দোষগুণ বিচারের ক্ষেত্রে নৈতিকবোধ বা ন্যায়বোধ দ্বারা চালিত হতেন। তাই এঁরা নীতিশাস্ত্র থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। সরকার কি করছে, (অর্থাৎ সরকারের কার্যাবলী) জানা প্রয়োজন, কিন্তু সরকারের কি করা উচিত তা (what ought to do) জানার প্রয়োজন আরও বেশী। নীতিশাস্ত্র আমাদের এটা জানতে সাহায্য করে। বার্ক মনে করতেন, নীতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাপকতর ভাবে রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

বিখ্যাত দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আছে বলে মনে করতেন না। বরং মধ্যযুগে ধর্ম ও নীতির সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করার প্রয়াসকে তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে নীতি ও রাজনীতির এলাকা স্বতন্ত্র। ম্যাকিয়াভেলির মতে শাসক তাঁর নিজের এবং রাজ্যের স্বার্থে যা করেন তাই হ'ল রাজনীতি এবং তাঁর ঐ রাজনীতি নীতিশাস্ত্রসম্মত

নাও হতে পারে। রাজনীতির লক্ষ্য হ'ল শাসকের স্বার্থ রক্ষা এবং ঐ লক্ষ্য পালনের জন্য যে কোন পন্থা রাষ্ট্রনীতিতে গৃহীত হতে পারে। এইভাবে নৈতিক ও অ-নৈতিক ধ্যান-ধারণা থেকে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মুক্ত করেন।

ম্যাকিয়াভেলির বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলে এ যুগের এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নীতিশাস্ত্র থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পৃথক্ করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রের কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, কি ভাবে মানবজীবনের সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হবে সেই আলোচনা যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান না করে তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপযোগিতা অনেকটা হ্রাস পাবে। রাজনীতি শুধু কূটনীতি নয়, তাই মানবকল্যাণ বিরোধী এবং নৈতিকদোষে দুষ্ট কোন বক্তব্য বা পন্থা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্থান পাবার যোগ্য নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান উভয়ের লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ ও মঙ্গল। সুতরাং লক্ষ্যের দিক থেকে উভয় শাস্ত্র খুবই ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যাতে যথাযথভাবে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে নীতিশাস্ত্রের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে।

নমুনা প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাকে বলে? তোমার মতে এই শাস্ত্রের নামকরণ কি হওয়া উচিত?
(এক এবং দুই দেখ)

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর।
(দুই, আট এবং নয় দেখ) [Tripura Secondary Board (+2) '81]

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নির্দেশ কর। (তিন দেখ)

৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থবিদ্যার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?
(তিন এবং আট দেখ) [H. S. C. '78 ; '84]

৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা চলে? তোমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য দেখাওঃ (পাঁচ এবং সাত দেখ) [H. S. C. '79, T. S. B. '81]

৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?
(দুই এবং নয় দেখ) [H. S. C. '80]

৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাস ও অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।
(সাত এবং আট দেখ) [H. S. C. '82]

৮. তুমি কি মনে কর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান?—যুক্তিসহ আলোচনা কর।
(পাঁচ দেখ) [Tripura Secondary Board (+2) '78]

৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য?
(তিন এবং পাঁচ দেখ) [H. S. C. '81]

১০. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা কর। (তিন দেখ)।

১১. আন্তঃ-শাস্ত্র আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আলোচনা কর।
(ছয় এবং সাত দেখ)

১২. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক আলোচনা কর। (সাত দেখ) [T. S. B. '82]

১৩. "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের ফল, ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিকড়"—আলোচনা কর। (সাত দেখ)

১৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। (আট দেখ) [T. S. B. '78]

১৫. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক আলোচনা কর। (নয় দেখ)

১৬. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর। (দশ দেখ)

১৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর। (এগার দেখ)

১৮. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর।
(দশ এবং এগার দেখ) [H. S. C. '83]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বন্ধনীর ভিতরে সঠিক উত্তরে টিক্ দাও ঃ

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসেবে (প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কার্ল মার্কস)-কে অভিহিত করা হয়।

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক, প্রাকৃতিক, নৈতিক) বিজ্ঞানের একটি শাখা। [H. S. C. '68, '82]

(গ) সিলি ইতিহাসকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (ফুল, ফল, শেকড়) বলেছেন।

(ঘ) সিলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ইতিহাসের (ফুল, ফল, শেকড়) বলেছেন।

2. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে যে সকল শাস্ত্রের সম্পর্ক আছে সেগুলি টিক্ চিহ্ন দিয়ে দেখাও ঃ পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল।

The state is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonism. It is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another. —V. I. Lenin

২

রাষ্ট্র : সংজ্ঞা এবং উপাদান
State : Definition and Elements

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই নাগরিক জীবনের চরম অভিব্যক্তি ঘটে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র হল কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রকে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উপ-ব্যবস্থা (sub-system) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইটালীর বিখ্যাত কূটনীতিবিদ্ ও দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি প্রথম 'রাষ্ট্র' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রাচীনকালে সাধারণত ছোট আয়তনবিশিষ্ট ও অল্প জনসংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হত। যেমন গ্রীক দেশের বিখ্যাত নগরী এথেন্স একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল। গ্রীক ও রোমানগণ এরূপ ছোট ছোট নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বাস করত। ঐ সকল নগর রাষ্ট্রকে পলিস (Polis) বা সিভিটাস (Civitus) নামে অভিহিত করা হত। পরবর্তী যুগে রাষ্ট্রের আয়তন ক্রমশ বাড়তে থাকে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিরাট আয়তনের রাষ্ট্র এবং ভারত ও চীনের মত বিপুল জনসংখ্যা-বিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাওয়া যায়।

এক : রাষ্ট্র কাকে বলে ? (What is State ?)

আরিস্টটল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথা দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা উপস্থিত করেছেন। রাষ্ট্রের সংজ্ঞাগুলো সংখ্যায় যেমন বহু, বক্তব্যের দিকে থেকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। রাষ্ট্রকে কেউ সমাজের উন্নত স্তর বলে চিহ্নিত করতে চান, কারও কাছে রাষ্ট্র আইনের অভিব্যক্তি, কেউ বা একে শ্রেণী স্বার্থের প্রতিফলন বা ক্ষমতার সংগঠিত রূপ বলে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্র হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা-সম্পর্ক (power relationship)। অনেকে মনে করেন, সমগ্র রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার একটা উপ-ব্যবস্থা হল রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা অনেক

রাষ্ট্রের কয়েকটি সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক আরিস্টটল বলেছেন, "পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী অর্থাৎ সুখী এবং সম্মানজনক জীবনের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক পরিবার ও গ্রামের সমাবেশকে রাষ্ট্র বলে" (An union of families and villages, having for its end perfect and self-sufficing life by which we mean a happy and honourable life)। বর্তমান যুগে যে ধরনের রাষ্ট্র আমরা দেখতে পাই তা আরিস্টটলের সময়ে ছিল না। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ ও স্বাবলম্বী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মিলিত পরিবার ও গ্রামের সংগঠিত রূপকে রাষ্ট্র বলেছেন। রোমের বিখ্যাত পণ্ডিত সিসিরো (Cicero) বলেছেন, রাষ্ট্র হল "অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও সুযোগ-সুবিধার পারস্পরিক অংশ গ্রহণে ঐক্যবদ্ধ সাধারণ জনসমাজ।"[১]

বোঁদা (Bodin) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "রাষ্ট্র হল বিভিন্ন পরিবার ও তাদের সাধারণ ধন সম্পত্তির একটি মিলিত সংস্থা, যা চরম ক্ষমতা ও যুক্তির দ্বারা পরিচালিত।"[২] ব্লুনৎস্লীর (Bluntschli) মতে, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই হ'ল রাষ্ট্র।[৩]

আন্তর্জাতিক আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক হল (Hall) বলেছেন, "রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত, বাইরের শাসন-মুক্ত জনসমাজকে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলা যেতে পারে।"[৪] রাষ্ট্রপতি উইলসন (Wilson) আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন, "রাষ্ট্র হল আইন অনুসারে সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"[৫]

রাষ্ট্রের ভাববাদী সংজ্ঞা

ভাববাদী দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের সংগে ব্যক্তির সম্পর্কের পটভূমিকায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্র হল, "পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রা" (God's march on earth)। সুতরাং রাষ্ট্রের নির্দেশ নির্ভুল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অলঙ্ঘনীয়। তাঁর মতে লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় বা পথ হিসেবে রাষ্ট্রকে দেখা উচিত নয়—কারণ, রাষ্ট্র হল মানব সভ্যতার চরম পরিণতি। হেগেল রাষ্ট্রকে স্বাধীনতার উপলব্ধি হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন। ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক গ্রীন (T. H. Green), ব্রাডলে (Bradley), বোসাঙ্কেত ইত্যাদির লেখায়ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মোটামুটি একই বক্তব্য

---

১. The state is "a common society united by a common sense of right and a mutual participation in advantages." —Cicero

২. "An association of families and their common possessions governed by a supreme power and reason." —Bodin

৩. "The state is politically organised people of a definite territory." —Bluntschli

৪. "The marks of an independent state are that the community consisting it is permanently established for a political end, that it possesses a definite territory and that it is independent of external control." —Hall

৫. "A state is a people organised for law within a definite territory." —Wilson

ধ্বনিত হয়েছে। বোসাঙ্কেত মনে করেন, রাষ্ট্র হল অধিকারের একমাত্র সংগঠক এবং নৈতিক মূল্যবোধের অভিভাবক (the sole organiser of rights···the guardian of moral values)। ভাববাদীরা রাজা বা সম্রাটকে রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে সকল যুক্তি ও সারবত্তার মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করতেন।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

মার্কসবাদীরা বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি পর্যালোচনা করেছেন। কার্ল মার্কস এবং তাঁর বন্ধু ও সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলস সমাজ ব্যবস্থার ধারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সম্পদের (ক্ষেত, খামার, কল, কারখানা—অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান) মালিকেরা শ্রমজীবী মানুষকে (কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি) শোষণ করে নিজেদের মুনাফাকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু ঐ শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন একটি হাতিয়ারের—যার সাহায্যে অসংখ্য শোষিত জনগণের উপর শোষণ ও শাসন কায়েম রাখা যায়। রাষ্ট্র হল ঐ হাতিয়ার **বা যন্ত্র** (যা পুলিশ, সৈন্য, জেল, আইন, আদালত ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত)—যার সাহায্যে সমাজের সম্পদশালী শ্রেণী নিজেদের শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখে। তাই তাঁদের মতে, একটি শ্রেণী দ্বারা অন্যান্য শোষিত শ্রেণীগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তারের সংগঠন হ'ল রাষ্ট্র (an organisation of one class dominating over the other classes)। লেনিনের ভাষায় বলা যায়, রাষ্ট্র হল পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যকার চিরন্তন বিরোধিতার প্রকাশ ও ফলশ্রুতি। **রাষ্ট্র হল এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে শোষণ করার যন্ত্র।** মার্কস বলেছেন যে, সাম্যবাদে সমাজে যখন পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী থাকবে না, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে, তখন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে (the state will wither away)।

অতিরিক্ত আলোচনা ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও রাষ্ট্র

মার্কসবাদী দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মানব ইতিহাসের সামাজিক-আর্থনীতিক (Socio-economic) ব্যবস্থার আবির্ভাব, বিকাশ ও পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মকে সূত্রায়িত করেছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থারই একটি নির্দিষ্ট আর্থনীতিক ভিত্তি (Base) আছে এবং ঐ ভিত্তি অনুসারে গড়ে ওঠে উপরিসৌধ (Superstructure)। ভিত্তি বলতে বোঝায় কোন সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টিগত রূপকে বা সামগ্রিক-আর্থনীতিক কাঠামোকে। কোন সমাজ ব্যবস্থায় ভিত্তি অনুসারে সে সমাজের উপযোগী যে-সকল ধ্যান-ধারণা এবং সংস্থা গড়ে ওঠে তাদেরই সমষ্টি হল সে সমাজের উপরিসৌধ। যেহেতু আর্থনীতিক ভিত্তি উপরিসৌধের প্রকৃতি নির্ধারণ করে, তাই উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনেও উপরিসৌধের পরিবর্তন হয়। যেমন, সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে সেখানকার উৎপাদন সম্পর্কসহ আর্থনীতিক কাঠামোর (base) পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র (Superstructrue) চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বলা যায়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক আর্থনীতিক কাঠামো হ'ল ভিত্ এবং **রাষ্ট্র, আইন ইত্যাদি হল সমাজ ব্যবস্থার উপরিসৌধ বা উপরিসৌধের অংগ।** উৎপাদন সম্পর্কের বা ভিত্-এর পরিবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্র চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে।

গার্নারের সংজ্ঞা

সবশেষে অধ্যাপক গার্নার প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা আলোচনা করা প্রয়োজন। গার্নারের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের আবশ্যিক উপাদানগুলো সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হবার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। গার্নারের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের ধারণায় **রাষ্ট্র হল বহু সংখ্যক জনগণকে নিয়ে গঠিত একটি সমাজ যা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বাস করে, যা বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন বা প্রায় সেরূপ এবং যার এমন একটি সংগঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে, যে শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের ব্যাপক অংশ অভ্যাসবশত আনুগত্য জ্ঞাপন করে** (The state as concept of political science and public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of a

territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience)।

দুই : রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of State)

গার্নার প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র মূলত চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত। ঐ উপাদানগুলো হল :

রাষ্ট্রের চারটি অপরিহার্য উপাদান

ক. জনসমষ্টি (Population)
খ. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory)
গ. শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার (Government)
ঘ. সার্বভৌমিকতা (Sovereignty)

রাষ্ট্রের এ চারটি উপাদান একান্তভাবেই অপরিহার্য—এদের কোন একটি উপাদানের অভাব হলে সেই সংস্থাকে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা যায় না।

রাষ্ট্রের উপরোক্ত উপাদানগুলোকে আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল।

ক. জনসমষ্টি

ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং জনসমষ্টি বাদে রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। জনসমষ্টি ছাড়া কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না, জনহীন মরুভূমিকে বা নির্জন দ্বীপকে কেউ রাষ্ট্র বলবে না। জনসমষ্টি রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। কোন রাষ্ট্রের বসবাসকারী জনসমষ্টিকে, নাগরিক, বিদেশী ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

রাষ্ট্রগঠনের জন্য কি পরিমাণ বা কত সংখ্যক জনগণ প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমানগণ ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রে বাস করত। ঐ সকল নগর-রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল কম। সেজন্য প্লেটো ও আরিস্টটল মনে করতেন, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অল্প হওয়া কাম্য এবং স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্রই শক্তিশালী হয় বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে গার্নার 'মোটামুটি বহুসংখ্যক' কথাটি ব্যবহার করেছেন, এর দ্বারা অবশ্য জনসমষ্টির পরিমাণ অনুমান করা কঠিন। ম্যাকআইভার, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনসমষ্টির চেয়ে রাষ্ট্রের সামাজিক সংগঠনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে ভারত বা চীনের মত বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখা যায়, আবার অন্যদিকে সুইজারল্যান্ড বা পানামার মত স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্রও দেখা যায়। অনেকের মতে জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে একদিকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। একটি রাষ্ট্র নিজের সম্পদের দ্বারা যতটা পরিমাণ জনসংখ্যার ভার বহন করতে পারে তাকেই রাষ্ট্রের 'কাম্য জনসংখ্যা' বলা হয়।

জনসংখ্যা যাই হোক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মানসিক ঐক্য ও সংহতিই হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে কি একজাতীয় বা সমভাবাপন্ন (homogeneous) হতে হবে? কোন জনসমষ্টির এক ভাষা, এক ধর্ম থাকলে ঐ সমভাব (homogeneity) সহজেই আসতে পারে। আবার কোথাও কোথাও দেখা যাবে যে, ভাষা বা ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের প্রেরণা একটি রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলেছে। বস্তুত 'জাতীয় রাষ্ট্র'-র আবির্ভাবের পর থেকে 'জাতীয়তাবাদ' প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ জনগণের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সমভাব সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমরা যখন একটি "জাতীয় রাষ্ট্র" কল্পনা করি তখন আমরা ঐ রাষ্ট্রের এরূপ সমভাবাপন্ন জনসমষ্টির কথা মনে করি। শাসনের সুবিধের জন্য রাষ্ট্রের লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে পূরণের জন্যে ঐ ধরনের সমভাব থাকা প্রয়োজন। আজকাল রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণত বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের লোকজন নিয়ে

গঠিত হয়। এরাই জনসমষ্টির মধ্যে একপ্রকার ভাবগত ঐক্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। আজকাল অবশ্য দলীয় শাসন প্রচলিত থাকে বলে ঐ ধরনের সমভাব দরকার হয় না। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের জনগণ নিয়ে গঠিত হয় এবং ঐ দলের সদস্য ও অনুগামীদের মধ্যে সমভাব গড়ে তোলে।

খ. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

কেবলমাত্র জনসমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। জনসমষ্টি যদি নির্দিষ্ট কোন স্থানে বসবাস না করে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায় তবে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জনসমষ্টি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়ে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস না করছে ততক্ষণ রাষ্ট্র গঠিত হয় না। অর্থাৎ ভূ-খণ্ড রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। স্থায়িভাবে বসবাস করার জন্য জনসমষ্টির ভূখণ্ড প্রয়োজন—না হলে জনসমষ্টি যাযাবর শ্রেণীতে পরিণত হয়। ব্লুনৎস্লী তাই বলেছেন, 'রাষ্ট্রের শারীরিক ভিত্তি যেমন আছে জনসমষ্টিতে, তেমন বাস্তব ভিত্তি আছে ভূমিতে। জনসমাজ যতক্ষণ না ভূখণ্ড লাভ করছে ততক্ষণ রাষ্ট্রে পরিণত হয় না।'[১] গেটেলও বলেছেন যে, ভূমিগত সার্বভৌমিকতাই (territorial sovereignty) রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে বসবাস করত—এরা যখন প্যালেস্টাইনে স্থায়িভাবে বসবাস করল তখন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড লাভ করে এদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল।

ভূখণ্ড রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান

এখন প্রশ্ন হল, ভূখণ্ড বলতে কি বোঝায়? রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'ভু-খণ্ড' শব্দটির বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার অস্তিত্বের কথা বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'ভূখণ্ড' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড দ্বারা শুধু ভূমির উপরিভাগকেই বোঝায় না, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতল, নদ-নদী, পাহাড় পর্বত এবং সমুদ্র উপকুলবর্তী জলভাগের কিছু অংশ (territorial waters) রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের মধ্যে ধরা হয়। রাষ্ট্রের সীমা শুধু জল ও স্থলের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের উপরিভাগে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তার উপরও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যাপ্ত। যদিও এ ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যতিক্রমগুলি পরে আলোচনা করা হচ্ছে। **প্রতিটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐ রাষ্ট্রের উন্নতি, অবনতি এবং স্থায়িত্বের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।**

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভু-খণ্ড'-এর অর্থ

রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভুখণ্ডের আয়তন কতটা হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তাই আমরা যেমন ভারত ও চীনের মত বিরাট ভৌগোলিক আয়তনবিশিষ্ট রাষ্ট্র দেখতে পাই, তেমনি লুজেমবার্গ (Luxembourg) বা মোনাকো (Monaco)-এর মত ক্ষুদ্র আয়তনের (মাত্র ৯৯৯ বর্গ মাইল) রাষ্ট্রও পৃথিবীতে আছে। আরিস্টটল বলেছেন যে গাছপালা, পশু পাখির মত রাষ্ট্রের আকারেরও একটা সীমা আছে। এর কম বা বেশী হলে রাষ্ট্র তার স্বরূপ হারায়। প্রাচীন কালে ধারণা ছিল ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র সম্ভব। রুশো (Rousseau) মনে করতেন যে, বড় আয়তনের রাষ্ট্র থেকে ছোট রাষ্ট্র শক্তিশালী। মণ্টেস্কু (Montesquieu), টকভিল (Toqueville) প্রমুখরা মনে করতেন যে, গণতন্ত্র ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট রাষ্ট্রেই চলতে পারে। অন্যদিকে ট্রিটশকে (Trietschke) রাষ্ট্রের ছোট আয়তনকে পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। যা হোক, রাষ্ট্রের কাম্য আয়তন কতটা সে সম্পর্কে বাঁধা-ধরা কোন নীতি নেই। তবে দেখা গিয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রাধান্য, গুরুত্ব, শক্তি, মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের আয়তনের ওপর নির্ভর করে। আয়তন যেমনি হোক না কেন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমানা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, কেন না রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এর অধীনস্থ ভূখণ্ডের উপরই প্রয়োগ করা চলে।

'ভূখণ্ড'-এর আয়তন কতটা হবে

---

১. "As the state has its personal basis in the people, so it has material basis in the land. The people do not become a State until they have acquired a territory."

—Bluntschli

আন্তর্জাতিক আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক হল (Hall) রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। দ্যুগোয়া (Duguit) বলেছেন, রাষ্ট্র সেখানেই সম্ভব যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে এবং ঐ শ্রেণী বিভাগের জন্য কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন হয় না।[১] দ্যুগোয়ার এ বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। মার্নাসক ঐক্যের ভিত্তিতে ইহুদীদের মত রাষ্ট্রহীন জনসমাজ গড়ে উঠতে পারে সত্য, কিন্তু তা দ্বারা রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বাতিল হয়ে যায় না। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রচিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নির্দিন্ট ভূখণ্ডের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তাই এঙ্গেলস (Engels) বলেছেন যে, "প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য ঘটেছে মূলত নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ভিত্তিতে"।[২]

ভূ-খণ্ডের প্রয়োজনীয়তা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থাকতেই হবে, ভূখণ্ড না থাকলে তা রাষ্ট্র পদবাচ্য হবে না। সাধারণভাবে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের ওপর এককভাবে আধিপত্য বিস্তার করে এবং অন্য কোন ক্ষমতাকে রাষ্ট্র নিজের এলাকায় স্বীকার করে না। কিন্তু এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার নিজস্ব এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করতে বা এককভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। ঐ ব্যতিক্রমগুলোকে নীচে আলোচনা করা হল।

১. যে সকল ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে দুই বা বেশী রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয় এবং ঐ বিবাদের আশু মীমাংসার সম্ভাবনা থাকে না, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রগুলো চুক্তিদ্বারা একই সঙ্গে ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর তাদের যৌথ অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। একসময়ে সুদানে বৃটিশ ও মিশরের ঐ ধরনের যৌথ অধিকার ছিল। একে সহ-মালিকানা বা *Co-dominium* বলে। এরূপ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর কোন একটি রাষ্ট্রের একক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে না।

কোন ক্ষেত্রে ভূখণ্ডের উপর সার্বভৌমের কর্তৃত্ব থাকে না

২. কোন একটি রাষ্ট্রের ভেতর যে সব বিদেশী দূতাবাস থাকে ঐ সকল দূতাবাসের অধীনস্থ এলাকাকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সকল বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর ভূখণ্ড বলে গণ্য করা হয়।

৩. যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন এক রাষ্ট্রের শাসক পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের দেশের বিধিসঙ্গত সরকার বলে স্বীকৃত হতে পারে, যদিও সে ক্ষেত্রে নিজের রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে তাঁর শাসন চলে না।

গ. শাসন প্রতিষ্ঠান বা সরকার

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসমাজ বাস করলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ঐ জনসমষ্টিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা এবং ঐ জনসমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটি শাসনযন্ত্র দরকার। রাষ্ট্রের ঐ শাসন যন্ত্রকেই সরকার বলা হয়। অধ্যাপক গার্নারের ভাষায় বলা যায়, সরকার এমন একটি সংস্থা বা যন্ত্র যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত নীতি নির্ধারিত হয় এবং যার দ্বারা সমষ্টিগত ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রিত এবং সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষিত হয়।[৩] মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র ও সরকার এক নয়। সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান। সরকারের শাসনকে জনসমষ্টির বেশির ভাগ লোক মেনে চলে। সরকারের সাহায্যেই রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করা হয় এবং রাষ্ট্রের আইন ও শৃংখলা রক্ষা

১. "Territory is not an indispensable element in the formation of a state."

২. "As against the ancient gentile organizations, the primary distinguishing feature of the state is the division of the subjects of the state according to territory." —Engels

৩. Government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted. —Garner

করা হয়। একটি রেল গাড়ির ইঞ্জিন চালাতে হলে যেমন ড্রাইভার, গার্ড ইত্যাদি দরকার, সেরূপ রাষ্ট্রের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সচল রাখতে হলে সরকারের প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যক লোক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সরকার গঠিত হয়। সরকারই রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালনা করে। সরকারের ক্ষমতা ও কাজকর্মকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ঐগুলো হল শাসন বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয়।

ঘ. সার্বভৌমিকতা

রাষ্ট্রগঠনের প্রধান উপাদান হল সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা—সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের প্রাণ। সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন প্রতিষ্ঠানের ঐ চরম ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা না থাকলে তাকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়, রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে বলেই রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধ ভাবে পরিচালিত হতে পারে। সরকারের আইন ও শাসনব্যবস্থা দেশের অধিকাংশ লোক মেনে চলে। রাষ্ট্রের শাসনকে অমান্য করতে পারে এমন কোন শক্তি রাষ্ট্রের মধ্যে থাকতে পারে না। তাছাড়া রাষ্ট্রের ওপর কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার জন্য রাষ্ট্র নিজে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, নিজেই সন্ধির শর্ত ঘোষণা করতে পারে, নিজেই সন্ধি স্থাপন করতে পারে।

কোন একটি বিদেশী রাষ্ট্র যদি অন্য একটি দেশের উপর প্রভুত্ব করে তবে ঐ দেশের সার্বভৌমিকতা নেই ধরা হবে এবং ঐ সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্র বলা চলবে না। যেমন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বা ত্রিপুরা রাজ্য রাষ্ট্র নয়। যদিও ঐ সকল রাজ্যের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি ও সরকার আছে। কিন্তু এদের নিজস্ব সার্বভৌমিকতা না থাকার জন্য এরা রাষ্ট্র নয়। অনেক ব্যাপারেই এদের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত চলতে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সার্বভৌমিকতাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সার্বভৌম ক্ষমতা ঃ অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রবহিঃস্থ

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে অভ্যন্তরীণ এবং রাষ্ট্রবহিঃস্থ বা আন্তঃরাষ্ট্র এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অধীনস্থ জনসাধারণ ও সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনুগত্য দাবী করতে পারে। আবার রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে চলতে পারে।[১]

এবার রাষ্ট্রের উপরোক্ত উপাদানগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে বিচার করে দেখা যেতে পারে সেগুলো রাষ্ট্র পদবাচ্য কিনা।

কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার যদি জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা থাকে তবে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাটি একটি রাষ্ট্র। উপরোক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে কোন একটি বা একাধিক উপাদানের অভাব থাকলে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করছি।

ভারত কি একটি রাষ্ট্র ?

ভারতের নিজস্ব জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, কার্যকর সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। অপরিহার্য চারটি উপাদানই থাকার জন্য **ভারত একটি রাষ্ট্র**। একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, প্রজাতান্ত্রিক চীন, নেপাল, বাংলাদেশ ইত্যাদি রাষ্ট্র।

ভারত / যুক্তরাষ্ট্র → [জনসংখ্যা] + [ভূখণ্ড] + [সরকার] + [সার্বভৌমিকতা] = রাষ্ট্র

১. সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা, সিকিম কি রাষ্ট্র ?

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, সিকিম ইত্যাদি প্রত্যেক সংস্থার নামের আগে 'রাষ্ট্র' শব্দটি যুক্ত করা হয় (যেমন, State of West Bengal) ; যদিও এগুলো ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত এক-একটি অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ। এখানে 'state' শব্দটি ভারতের অঙ্গরাজ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল অঙ্গরাজ্য প্রত্যেকেরই নিজস্ব জনসমষ্টি, ভূখণ্ড এবং সরকার আছে। কিন্তু এদের কারও সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকার জন্য **পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালা, সিকিম এরা কেউই রাষ্ট্র নয়। কলকাতা, আগরতলা, লণ্ডন** ইত্যাদি নগর বা শহরের জনসমষ্টি এবং ভূখণ্ড আছে। এবং এদের পৌর কর্তৃপক্ষকে যদি সরকার বলে বিবেচনাও করা হয় তাহলেও সার্বভৌমিকতা না থাকার জন্য এরাও রাষ্ট্র নয়।

পশ্চিমবঙ্গ / কেরালা / সিকিম → জনসংখ্যা + ভূখণ্ড + সরকার + ~~সার্বভৌমিকতা~~ = রাষ্ট্র নয়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি রাষ্ট্র ?

পৃথিবীর বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। রাষ্ট্রের সংগে জাতিপুঞ্জের কিছু কিছু আপাত-সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ একে রাষ্ট্র পর্যায়ভুক্ত করেন ; আবার কেউ কেউ একে অভিভাবক রাষ্ট্র (super state) নামে অভিহিত করেন। প্রশ্ন হল ঃ রাষ্ট্রের যে সকল অপরিহার্য উপাদান থাকা প্রয়োজন তা কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আছে ? প্রথমত, জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন জনসমষ্টি নেই এবং দ্বিতীয়ত এর কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই। তৃতীয়ত, যদি জাতিপুঞ্জের শাসনযন্ত্র বা সরকার আছে বলে ধরে নেয়া যায়, তবে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো হল জাতিপুঞ্জের নাগরিক। কিন্তু জাতিপুঞ্জ কর্তৃক কোনও বিধি-নিষেধ অন্য রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করার ক্ষমতা বাস্তবে সীমিত। চতুর্থত, বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ সার্বভৌম ক্ষমতা পরিত্যাগ না করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়। জাতিপুঞ্জের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার সাহায্যে এর আইন ও নির্দেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যায়। তাই জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করার অসংখ্য নজীর দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত জাতিপুঞ্জের কার্যকারিতা অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সুতরাং **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলা যায় না।**

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ → ~~জনসংখ্যা~~ + ~~ভূখণ্ড~~ + সরকার + ~~সার্বভৌমিকতা~~ = রাষ্ট্র নয়

অপরিহার্য নয় রাষ্ট্রের এমন কয়েকটি উপাদান

১৹ স্থায়িত্ব

অনেকে মনে করেন যে, জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা ছাড়াও রাষ্ট্রের আরও কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন। এদের মধ্যে একটি হল **স্থায়িত্ব** (Permanence)। তাঁদের মতে সরকার পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র স্থায়ী। হিউগো গ্রোটিয়াসের (Hugo Grotius) ভাষায় বলা যায়, "রাষ্ট্রের মৃত্যু নেই" (states are immortal)। স্থায়িত্ব বলিতে কি বুঝব ? রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ও আয়তনের স্থায়িত্ব ? সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি অংশ 'পূর্ববাংলা' পাকিস্তানের সংগে সম্পর্ক ছেদ করে **'বাংলা দেশ'** নামে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে পাকিস্তানের ভূখণ্ড ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটেছে—এর ভূখণ্ড ও আয়তনের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়েছে। তবে কি স্থায়িত্ব বলতে রাষ্ট্রের নামের স্থায়িত্বকে বুঝব ?

পুরানো গোল্ডকোস্ট নতুন নামকরণ হয়েছে ঘানা, ফরমোসার নামকরণ হয়েছে তাইওয়ান। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রের নামের স্থায়িত্বই বা কোথায় থাকলো? অনেকে বলেন, রাষ্ট্র হিসাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখাকে 'স্থায়িত্ব' বলা হয়। এর উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর অতীত মানচিত্রে যে সব রাষ্ট্র ছিল তাদের অনেকগুলোই বর্তমান মানচিত্র থেকে মুছে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কয়েক বছর আগেও ইউরোপে প্রাশিয়া (Prussia) নামে একটি রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রাশিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাশিয়ার ভূখণ্ড ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে রাষ্ট্র হিসেবে প্রাশিয়ার অস্তিত্বের বিলোপ ঘটেছে। সুতরাং বলা যায়, বিজয়ী শক্তি কর্তৃক ভূখণ্ড অধিকার, ঔপনিবেশিকতার অবসানে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, বিপ্লব ইত্যাদি নানা কারণে অনেক সময়ই একটি রাষ্ট্র নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। তাই স্থায়িত্বকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকার করা যায় না।

২. অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কেউ কেউ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিকে (International recognition) রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ বক্তব্য সঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জনগণতান্ত্রিক চীনের কথাই ধরা যাক। বাস্তবে এবং ব্যবহারিক দিক থেকে রাষ্ট্র বলতে আমরা যা বুঝি সে দিক থেকে বিচার করে বলা যায় জনগণতান্ত্রিক চীন একটি 'পূর্ণাঙ্গ' রাষ্ট্র। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রেরা চীনকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং ভোটের জোরে চীনকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে বহু রাষ্ট্রের সম্মতি না পাওয়া সত্ত্বেও বা জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ না করা সত্ত্বেও এতদিন রাষ্ট্র হিসেবে চীনের কোন হের-ফের ঘটেনি। বরং বলা যায়, পৃথিবীর অনেক 'স্বীকৃত' রাষ্ট্রের চেয়ে তথাকথিত 'অ-স্বীকৃত' জনগণতান্ত্রিক চীন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে নিজের পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। **সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিকে রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান মনে করার কোন সংগত কারণ নেই।**

তিন ঃ রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে অনেকে একই অর্থে শব্দ দুটি প্রয়োগ করে থাকেন। হবস্ তাঁর 'লেভিয়াথান' পুস্তকে একই অর্থে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, 'আমিই রাষ্ট্র' (I am the State)। অধ্যাপক লাস্কি, জি. ডি. এইচ. কোল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যকার পার্থক্য মূলত তত্ত্বগত এবং এর কোন বাস্তব তাৎপর্য (practical significance) নেই। লাস্কি মনে করেন, বাস্তব প্রশাসনের দিক থেকে রাষ্ট্র হল সরকার (The state for the purpose of practical administration is the government)। কিন্তু অনেকেই রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র হল একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, আর সরকার হল ঐ প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার রূপকার। রাষ্ট্র হল একটি বিমূর্ত ধারণার বাস্তব প্রতিনিধি বা মূর্ত প্রতীক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুটি স্বতন্ত্র ধারণা ব্যক্ত করে, তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ দুটি শব্দকে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়।

চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত, তার মধ্যে সরকার একটিমাত্র উপাদান। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে 'সমগ্র' ধরলে সরকার এর একটি 'অংশ' মাত্র। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হতে পারে না। সরকার হল রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র, এর মাধ্যমে রাষ্ট্র কাজকর্ম চালায়, নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করে, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে কিন্তু সরকারকে রাষ্ট্র বললে ভুল হবে। মানুষ যা করতে চায়, হাতের সাহায্যে সে তা করে। কিন্তু মানুষ বললে শুধু হাতটিকে

বোঝায় না। সরকার রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করলেও তাকে রাষ্ট্র বলা চলে না। অধ্যাপক গার্নার তাই যথার্থই বলেছেন যে, রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হল সরকার। কিন্তু কোন একটি প্রাণীর মস্তিষ্ক বলতে যেমন প্রাণীটিকে বোঝায় না, বা কোন সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী বললে যেমন ঐ সংস্থাকে বোঝায় না, তেমনি সরকার বলতে রাষ্ট্রকে বোঝায় না। গার্নার মনে করেন, রাষ্ট্র যেন একটি যৌথ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। সরকার তার পরিচালকমণ্ডলী মাত্র। পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে যেমন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়, তেমনি সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

রাষ্ট্র সমগ্র, সরকার অংশ— রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র

দ্বিতীয়ত সমগ্র দেশের জনসমষ্টি নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত। ভারতের জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটির বেশি। এর মধ্যে সামান্য অংশ আইন, শাসন ও বিচার কাজে অর্থাৎ সরকার পরিচালনার ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন—এদের নিয়ে সরকার গঠিত। আমরা সকলে ভারতীয়, ভারত রাষ্ট্রের সদস্য—কিন্তু আমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক কয়েক জন মাত্র সরকারের সদস্য।

সকলে রাষ্ট্রের সদস্য, কিন্তু সরকারের নয়

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে বোঝায়—একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমাকে নির্দেশ করে। কিন্তু সরকারের সঙ্গে ভূখণ্ডের ধারণা বা ভৌগোলিক সীমার ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত নয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান (a permanent and stable entity)। সরকারের পরিবর্তন হতে পারে, এক সরকারের পতন হলে অন্য সরকার ক্ষমতাসীন হ'তে পারে। যদিও রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে এ-কথা বলা যেতে পারে। আজ ভারতে কেন্দ্রে কংগ্রেস (ই) দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। কিছুদিন আগে ছিল জনতা দলের সরকার, হয়তো ভবিষ্যতে অন্য দলীয় সরকার স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ফলে ভারত রাষ্ট্রের কোন হেরফের বা পরিবর্তন ঘটে না।

রাষ্ট্র মোটামুটি স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল

পঞ্চমত, সব রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রগত আকার ও রূপ এক। রাষ্ট্রের বহিরঙ্গের দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে ভারতের সঙ্গে অন্য কোন রাষ্ট্রের—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু এদের সরকারের কাঠামো, সরকারের নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন জাতীয়। যেমন ভারতে মন্ত্রিসংসদ-শাসিত সরকার—আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার। ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রচলিত—কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চলছে।

সব রাষ্ট্রের রূপ এক, সরকারের নয়

ষষ্ঠত, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার থাকতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সমালোচনা থাকতে পারে, সরকারকে বিরোধিতা করার অধিকার থাকতে পারে। কিন্তু কারও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের অধিকার থাকতে পারে না, বা কেউ রাষ্ট্রবিরোধী হতে পারে না (এই পার্থক্য না বোঝার জন্য অনেক সময় সরকার-বিরোধিতাকে রাষ্ট্রবিরোধী বা রাষ্ট্রদ্রোহী নামে অভিহিত করা হয়)। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ব্যক্তির সকল অধিকারের উৎস হল রাষ্ট্র, তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার থাকতে পারে না।

সরকারের বিরুদ্ধে অধিকার থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়

সপ্তমত, সরকার একটি বাস্তব সত্তা, কিন্তু রাষ্ট্র হল ভাবাত্মক ধারণা (idea or concept)। অনেকে তাই উপমা দিয়ে বলেছেন, সরকার দেহ এবং রাষ্ট্র তার আত্মা। সরকার পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র আত্মার ন্যায় অবিনশ্বর। সুতরাং বলা যায় রাষ্ট্র একটা ভাবাত্মক ধারণা, কিন্তু সরকার একটা মূর্ত সত্তা।

সরকার দেহ, রাষ্ট্র আত্মা

অষ্টমত, সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকে, সরকারের হাতে নয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সরকার প্রয়োগ করে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,

কিন্তু সরকার নয়। অনেকে রাষ্ট্র ও সরকারকে সমার্থক মনে করার জন্য সরকারকে সার্বভৌম মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।

চার ঃ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and Other Associations)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের নানা প্রয়োজন, আবেগ এবং প্রবণতা থাকে। কেউ খেলাধুলায় দক্ষ হতে চায়, কেউ সাহিত্য চর্চা পছন্দ করে, কেউবা অন্য ব্যাপারে পারদর্শিতা লাভ করতে চায়। আবার একই মানুষের মধ্যে একসঙ্গে একাধিক প্রবণতা থাকতে পারে। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রবণতা চরিতার্থ করার জন্য সমাজে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি সমাজের ঐক্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পালন করে।

প্রতিষ্ঠান কি ও কেন ?

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মৌল কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেন না। আমরা জানি যে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কিন্তু বহুত্ববাদী (Pluralist) দার্শনিকরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রই একমাত্র সার্বভৌম নয়। ক্রীড়া সংঘ, শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রসহ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির কারণ হ'ল মানুষের প্রয়োজন মেটান। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির কোন-না-কোন প্রয়োজন মেটায়, সকল প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনীয়। তাই বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রসহ সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সার্বভৌম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুত্ববাদীদের স্বীকার করতে হয়েছে যে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অন্যান্য সংস্থার চেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্ব বেশি। বহুত্ববাদীদের অবদান এই যে, এতদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল উপেক্ষিত, বহুত্ববাদীরা সমাজ জীবনে ঐ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

বহুত্ববাদী বক্তব্য

যাহোক, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক নয়, এমনকি সমমর্যাদাসম্পন্নও নয়। এবার আমরা রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যগুলো আলোচনা করবো।

প্রথমত, রাষ্ট্রের কাজকর্ম রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কোন একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে। যেমন, রেডক্রস্ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত নয়—একাধিক রাষ্ট্রে প্রসারিত। সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্রের মত একটা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রীভূত নাও থাকতে পারে—সমগ্র পৃথিবীতে বা একাধিক রাষ্ট্রে এদের কাজকর্ম পরিব্যাপ্ত হতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের মত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমানা নেই।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র মোটামুটি একটি স্থায়ী সংঘ, কিন্তু সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তুলনামূলক ভাবে অতটা স্থায়ী নাও হতে পারে। সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিভেদে প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু সরকারের পরিবর্তন হলেও রাষ্ট্র মোটামুটি স্থায়ীভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে।

তৃতীয়ত, প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল ধর্মের প্রচার ; যেমন ব্যাপটিস্ট মিশন। কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় আর্তের সেবার জন্য ; যেমন—ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং রেডক্রস্। কোন প্রতিষ্ঠান খেলাধুলার জন্য প্রতিষ্ঠিত ; যেমন কোলকাতার মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই। এর উদ্দেশ্য বহুমুখী—সমাজের সর্বাত্মক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নিযুক্ত থাকে।

উদ্দেশ্য বহুমুখী

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারে। একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে পাড়ার ফুটবল ক্লাবের সদস্য হতে পারে, রেডক্রসের সদস্য হতে পারে, আবার কলেজ ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে। কিন্তু একজন ব্যক্তি একসঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য বা নাগরিক হতে পারে না।

পঞ্চমত, প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য হতেই হবে—রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সংঘের সভ্য হওয়া ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছা করলে ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করে চলে আসতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ইচ্ছেমত রাষ্ট্রের সদস্যপদ ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠত, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং প্রথম পার্থক্য হ'ল রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা আছে—তার নাম সার্বভৌম ক্ষমতা। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের অধীন ভূখণ্ড এবং জনগণের ওপর প্রযোজ্য হতে পারে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও চূড়ান্ত। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তার সভ্যদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করলেও সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে—কিন্তু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার ওপরে নির্ভরশীল নয়।

তবে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকলেও বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে বা তাদের সীমিত স্বাধীনতার অধিকারে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হস্তক্ষেপ করতে চায় না। সমাজের ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বরং রাষ্ট্রই উদ্যোগী হয়ে এদের কাজকর্মে সামঞ্জস্য এনে এদের মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করে। এ কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের ওপরে হস্তক্ষেপ করতে হতে পারে।

নমুনা প্রশ্ন

1. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দাও। (এক দেখ)
2. রাষ্ট্রের উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর। রাষ্ট্রের কোন্ উপাদানকে তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কর? (দুই দেখ) [H. S. C. '80 ; T. S. B. '81]
3. পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—এগুলি কি রাষ্ট্র? যুক্তিসহ আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '79]
4. রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (তিন দেখ)
5. রাষ্ট্র কাকে বলে? রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নির্দেশ কর। (এক এবং চার দেখ) [H. S. C. '79, '81 এবং T. S. B. '79]
6. রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। (চার দেখ) [H. S. C. '84]
7. রাষ্ট্র কি? রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র? (i) আগরতলা, (ii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, (iii) লণ্ডন। (এক এবং দুই দেখ) [T. S. B. '83]
8. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর। (এক এবং দুই দেখ) [H. S. C. '83]
9. রাষ্ট্রের একটি উপাদান হিসাবে 'ভূ-খণ্ড' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা কর। (দুই-এর ভূখণ্ড অংশ দেখ)
10. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব আলোচনা কর। (এক এবং দুই-এর ঘ দেখ) [H. S. C. '81]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বন্ধনীর ভিতরে সঠিক উত্তরে টিক্ দাও ঃ

1. রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র—একথা বলিয়াছেন (আরিস্টটল, রুশো, কার্ল মার্কস)।

2. রাষ্ট্র শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন (ম্যাকিয়াভেলি, হবস্, হেগেল)।

3. রাষ্ট্র শ্রেণীশাসনের যন্ত্র—একথা বলেছেন (আরিস্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস, গ্রীণ) [H. S. C. '79 and '83]

4. গার্নারের মতে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান (4, 5, 6)টি।

5. কোন ব্যক্তি একইসঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের) সদস্য হতে পারে। [H. S. C. '80 and '83]

6. (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ) একটি রাষ্ট্র। [H. S. C. '82]

7. পশ্চিমবঙ্গ একটি (রাষ্ট্র, অঙ্গরাজ্য)।

8. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও সমাপ্তি রাষ্ট্রকে নিয়ে —একথা বলেছেন (হবস্, মার্কস, গার্নার)। [T. S. B. '79]

9. রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান পার্থক্য (জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমিকতা)কে নিয়ে।

10. রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া জনগণের পক্ষে (বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক)।

11. রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সংস্থার সদস্য হওয়া (বাধ্যতামূলক, ঐচ্ছিক)।

12. (বলপ্রয়োগ মতবাদ, ঐশ্বরিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ) মনে করে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি।

13. রাষ্ট্র একটি মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান —একথা মনে করে (বলপ্রয়োগ মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ)।

14. নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি রাষ্ট্র তা টিক্ দিয়ে দেখাও ঃ

রেডক্রস সোসাইটি, সিকিম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বাংলাদেশ, নেপাল, দিল্লী, ভারত, কেরালা।

"The concept to Sovereignty is the basis of modern Political Science. It underlies the validity of all laws and determines all institutional relations."

—R. G. Gettle

৩

সার্বভৌমিকতা
Sovereignty

সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বস্তুত, সার্বভৌমিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর অনেক তত্ত্ব আলোচিত ও পরিবেশিত হয়। গেটেল যথার্থই বলেছেন, সার্বভৌমিকতার ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি। অতীতে সার্বভৌমিকতার ধারণাটি সংকীর্ণ এবং সীমিত ছিল। সার্বভৌমিকতাকে ব্যক্তি বিশেষের (রাজার) ক্ষমতা হিসেবে দেখা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে সার্বভৌমিকতাকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং মনে করা হয় যে সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রকাশ।

এক : সার্বভৌমত্ব : প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Sovereignty : Nature and Definition)

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে কোন আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন সার্বভৌমিকতা কাকে বলে। সাধারণভাবে আমরা জানি যে, প্রতিটি রাষ্ট্রই সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। অর্থাৎ রাষ্ট্র হতে হলে ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সার্বভৌমিকতা থাকতে হবে—সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের মূল উপাদান।

কোন ব্যক্তি-বিশেষ আমাদের কোন নির্দেশ দিলে বা আমাদের উপর কোন কর আরোপ করলে আমরা তা মান্য করতে বাধ্য নই। কিন্তু রাষ্ট্র কোন নির্দেশ জারী করলে বা কর আরোপ করলে আমরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তা মান্য করি। কারণ আমরা জানি যে, রাষ্ট্রের একটি চরম শক্তি আছে যার জন্য রাষ্ট্র তার নির্দেশকে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করতে পারে এবং কেউ তা অমান্য করলে রাষ্ট্রের সেই চরম শক্তি তার প্রতিবিধান করতে পারে—শাস্তি দান করতে পারে। রাষ্ট্রের এ চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকার জন্য আমরা রাষ্ট্রের আইন মান্য করি, রাষ্ট্র আমাদের উপর যে কর বসায় তা দি। রাষ্ট্রের ঐ চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বলে সার্বভৌমিকতা।

সার্বভৌমিকতার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন *Superanus* শব্দ থেকে, এর অর্থ ঊর্ধ্বতন কর্তৃত্ব। সার্বভৌমিকতা হচ্ছে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, চরম, সীমাহীন ও অপ্রতিহত ক্ষমতা। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে প্রতিটি অধিবাসী ও প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা আছে, এ ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রয়োগ করতে পারে। সমাজের প্রত্যেকে মেনে চলতে বাধ্য এমন কতকগুলি নিয়ম বা আইনকানুন রচনা করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নানা প্রকার ইচ্ছে থাকতে পারে, তারা বিভিন্ন ইচ্ছে ও মতামত ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার সঙ্গে রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধ ঘটলে রাষ্ট্রের ইচ্ছা-ই জয়লাভ করে, তাকেই সকলে মেনে চলে—অন্যান্য ইচ্ছাগুলোকে পথ ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াতে হয়। রাষ্ট্র যে-বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে-বিষয়ে রাষ্ট্রের নির্দেশই চরম এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য। নিজস্ব ভৌগোলিক সীমারেখার অধীন প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র নির্দেশ দেয়, কিন্তু রাষ্ট্র নিজে কারও কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে না। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার মধ্যে বিরোধ ঘটলে রাষ্ট্রই বিচারক, রাষ্ট্রের রায়ই সকলের কাছে বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিটি বিরোধ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয় রাষ্ট্রের দরবারে। রাষ্ট্র ঐ সকল বিরোধ মীমাংসা করে, ঐ মীমাংসা সকলে মানতে বাধ্য, কারণ এ ব্যাপারে চরম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রই ভোগ করে।

কেবল দেশের মধ্যে নয়, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র স্বাধীন। অন্য কারও ইচ্ছায় রাষ্ট্র চলে না, কার সঙ্গে রাষ্ট্রের কি ধরনের সম্পর্ক হবে, তাও রাষ্ট্রই স্থির করে। কেবল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রবহির্ভূত ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ঐ চরম ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তাই চরম, সর্বজনীন ও অবিভাজ্য।

মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রের আইনগুলো নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা করে না, আপনা-আপনি তাদের প্রয়োগও হয় না। প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী থাকেন; ভারতে যেমন রাষ্ট্রপতি-সহ-সংসদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন রাষ্ট্রপতি, ব্রিটেনে যেমন রানী-সহ-পার্লামেণ্ট সার্বভৌম। ঐ প্রয়োগ কর্তাদের নির্দেশ (command), অর্থাৎ যা আইন নামে পরিচিত সেগুলো নাগরিকেরা মেনে চলতে অভ্যস্ত বা অভ্যাসবশতই নাগরিকেরা তা মেনে চলেন (habitually obeyed)। নাগরিকেরা ঐগুলো না মানলে বলপ্রয়োগের সাহায্যে তাদের তা মান্য করতে বাধ্য করা ঐ নির্দেশ-কর্তাদের প্রধান দায়িত্ব।

উপরের আলোচনা হতে এ ধারণা হতে পারে যে, সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র শক্তির ওপরই নির্ভর করে। সার্বভৌম ক্ষমতার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র স্থূলশক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, কেবল শক্তির ভরসায় ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলা সম্ভব নয়। তা সম্ভব হলে দুনিয়ার সর্বাধিক অত্যাচারী শক্তিশালী নায়কেরা কখনও ক্ষমতাচ্যুত হতেন না। মানুষ সার্বভৌমের নির্দেশ ভয়ে মানে ঠিকই, কিন্তু তা কিছুদিনের জন্য, তার পর তারা ভয় কাটিয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের আইন তখনই কার্যকর হয় যখন জনগণ অনুভব করে যে, রাষ্ট্রের নির্দেশ কেবল সঠিক নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। আইনের প্রয়োগ নির্ভর করে তা মেনে চলার জন্য জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতির উপর।

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা

জাঁ বোদাঁই প্রথম বলেছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই একটি সার্বভৌম শক্তি থাকতে হবে (there must be a sovereign in every state)। তাঁর মতে, সার্বভৌমত্ব হল নাগরিক এবং প্রজার উপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, যা কোন আইনের দ্বারা সীমিত নয় (the supreme power of the state over citizens and subjects, unrestrained by law)। বোদাঁর অর্ধশতক বছর পরে গ্রোটিয়াস সার্বভৌমত্বের আলোচনা করেন। গ্রোটিয়াসের ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব হল কোন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা—যাঁর প্রণীত আইন ও কার্যকলাপ অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যাঁর ইচ্ছাকে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। বার্জেসের মতে সার্বভৌমত্ব হল "ব্যক্তি এবং ব্যক্তির দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আরোপিত মৌলিক, চরম এবং অসীম ক্ষমতা" (original, absolute, unlimited power over the individual subjects)। জেলিনেকের ধারণা অনুসারে সার্বভৌমত্ব হল "রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন রকম ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়, যার ফলে নিজের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতার দ্বারা এর শক্তি সীমাবদ্ধ নয়" (That characteristic of the state in virtue of which it cannot be legally bound except by its own will, or limited by any other power than itself)।

বার্জেস (Burgess) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন ঃ "সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর আদি, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা বলে।" ব্ল্যাকস্টোনের (Blackstone) মতে সার্বভৌমিকতা হল চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন, সীমাহীন কর্তৃত্ব (...the supreme, irresistible, absolute, uncontrolled authority)। বার্কারও (Barker) মনে করেন যে, আইনানুসারে সংগঠিত জনসমাজ বা রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে সকল আইনসঙ্গত দ্বন্দ্বের আইনসঙ্গত মীমাংসার জন্য যে চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, তাই হ'ল সার্বভৌমিকতা।

আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জন অস্টিন (John Austin) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। অস্টিনের সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও তত্ত্ব আমরা পরে আলোচনা করব। লক্ষণীয় যে, শুধুমাত্র অস্টিনের সংজ্ঞা নয়, উপরোক্ত প্রতিটি সংজ্ঞাই সার্বভৌমিকতাকে একটি আইনানুগ ধারণা (legal concept) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ম্যাকআইভার বলেছেন, রাষ্ট্র আইনপ্রণেতা অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণে আইনসিদ্ধ অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হল আইনের অনুশাসন বজায় রাখা। সার্বভৌমিকতা স্বয়ং আইনের আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ আইনগত যে মূল্যবোধ রাষ্ট্র বজায় রাখতে চায় তার দ্বারা রাষ্ট্র নিজেও আবদ্ধ।

সাম্প্রতিক কালে অনেকে মনে করেন, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি উপস্থিত করা হয়েছে তার দ্বারা বাস্তব রাজনীতিকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই অনেকে **সার্বভৌমিকতাকে 'আইনানুগ কর্তৃত্ব'** (legal authority) **হিসেবে না দেখে 'শক্তি'** (power) **হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান। এঁদের মতে শেষ বিচারে দেখা যাবে যে, সার্বভৌমিকতা শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।** উদাহারণ হিসেবে বলা যায়, চরম ক্ষমতার অধিকার নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পোপ (Pope) ও রাজার মধ্যে দ্বন্দ্বে উচ্চতর শক্তির অধিকারী বলে রাজারা জয়ী হয়েছিলেন। কোন ব্যক্তি মনে করতে পারেন যে, কোন একটি রাষ্ট্রীয় আইন তিনি অমান্য করার অধিকারী, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ 'শক্তি' থাকার জন্যে তিনি ঐ আইন মান্য করতে বাধ্য থাকেন। সার্বভৌমিকতার 'শক্তিতত্ত্ব'-এর (power theory of sovereignty) প্রবক্তারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তি থাকার জন্যই রাষ্ট্র সার্বভৌম। অর্থাৎ **সার্বভৌমিকতাকে বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যায়ে দেখা যাবে, সার্বভৌমিকতা নিছক 'শক্তি' ছাড়া কিছু নয়।**

সাম্প্রতিক মত

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিটি সমাজেই এক বা একাধিক **প্রভাবশালী গোষ্ঠী** (Elite) থাকে এবং ঐ সকল প্রভাবশালী

গোষ্ঠীর প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করে। তাই প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোকে সার্বভৌমিকতার নিয়ামক মনে করা হয়।

তাত্ত্বিক জটিলতা এবং বাক্যবিন্যাস পরিহার করে স্ট্যানলি বেন সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সার্বভৌমিকতার মধ্যে যে দিকগুলো (aspects) খুঁজে পেয়েছেন তা হলঃ ১. কোন একটি আইনানুগ ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, ২. আইনগত দিক থেকে কোন নিয়মের প্রাধান্য, ৩. আইন বিভাগের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব, ৪. সামরিক বাহিনী কর্তৃক বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করার ক্ষমতা এবং ৫. কোন স্বার্থগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা। বলা বাহুল্য, স্ট্যানলি বেনের সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত ধারণায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মার্কসীয় বক্তব্য

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা সার্বভৌমত্বের গতানুগতিক ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সার্বভৌমত্বের ধারণা ও চরিত্রকে মার্কসবাদ কোন প্রকার বিমূর্ত (abstract) তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে না। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার (historical materialism) আলোতে মার্কসবাদীরা সার্বভৌমিকতার আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, সার্বভৌমত্ব বা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র অনুধাবন করা প্রয়োজন; রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের মাধ্যমেই সার্বভৌমিকতাকে তুলে ধরা সম্ভব; কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আর্থিক কাঠামো দ্বারা সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়।

মার্কসীয় দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী প্রতিটি শোষিত সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের মালিকদের অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কাজ করে। শোষিত সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতা কখনই শ্রেণী-নিরপেক্ষ নয়। তাই সার্বভৌমিকতাকে যদি রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রকাশ বলে অভিহিত করা যায়, তা হলে সার্বভৌমিকতা কোন অবস্থাতেই শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি শোষিত সমাজব্যবস্থার আর্থিক শক্তি বা সম্পদের মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিজেদের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত করেছে। ক্রীতদাসভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক এবং আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যথাক্রমে ক্রীতদাসের মালিক, সামন্তপ্রভু এবং বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদনের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতাও প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার রূপে কাজ করে। সুতরাং দেখা যায়, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা সমাজের সম্পদশালী শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত থাকে। ক্রীতদাসভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্রীতদাসের মালিকরা উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন হলেও এর চরিত্রের মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল জমি। সে যুগে জমির মালিকদের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের ওপর বুর্জোয়া ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সে ব্যবস্থাতেও উৎপাদনের উপাদানের অধিকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

সার্বভৌমত্ব সমাজে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ার

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারাশ্রেণী মুষ্টিমেয় শোষকের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গুণগত দিক থেকে এক নতুন ধরনের বিপ্লব। এর প্রধান লক্ষ্য হল, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে উৎপাদনের উপাদানের সামাজিকীকরণ, শ্রেণী শোষণের অবসান ঘটানো, শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকার অবসান ঘটানো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করা। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাই শোষণের উৎস এবং শোষিত সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতা

শোষকের স্বার্থেই কাজ করে। তাই সকল শোষিত সমাজে রাষ্ট্র শোষকশ্রেণীর শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতা বা রাষ্ট্রক্ষমতাও মুষ্টিমেয় শোষকের রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিণত হয়।

দুই ঃ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty)

গেটেল সঠিক ভাবেই বলেছেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি হল সার্বভৌমত্বের ধারণা, সার্বভৌমিকতাই সব আইনকে অনুমোদন দেয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণ করে (The concept of sovereignty is the basis of modern political science. It underlies the validity of all laws and determines all international relations)। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নীচে সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হ'ল।

১. চরমতা (Absoluteness)

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম, আদি ও সীমাহীন ক্ষমতা। রাষ্ট্রের মধ্যে আইনানুমোদিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ক্ষমতার আধার নেই যা সার্বভৌমত্বের উর্ধ্বে। সার্বভৌমিকতা কারও দান নয়, অন্য কোন শক্তির ইচ্ছা বা সম্মতির ওপর ইহা নির্ভরশীল নয়, কোনো সীমারেখা দ্বারা ইহা আবদ্ধ নয়। সার্বভৌমিকতা আইনের উর্ধ্বে নয়, কিন্তু সার্বভৌমিকতা হ'ল সব আইনগত প্রশ্নের সর্বশেষ মীমাংসাকারী, (a legal power of setting finally legal questions in a legal way)।

সার্বভৌমিকতার এই বৈশিষ্ট্য (চরমতা) সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। হেন্‌রি মেইন্ (Henry Maine) মনে করেন যে, আইনগত কোন সীমাবদ্ধতা না-থাকলেও নৈতিক দিক থেকে সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ। ব্লুনৎস্লী মনে করেন যে, সার্বভৌম শক্তি দেশের মধ্যে নিজস্ব প্রকৃতি ও নাগরিকদের অধিকার দ্বারা সীমিত এবং দেশের বাইরে তা অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমিত।

তাই, আইনগত দিক থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা চরম হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে জনমত বা জনবিক্ষোভের আশঙ্কায় সর্বজনগ্রাহ্য পরিসীমার মধ্যেই ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ঠিকই—তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সমালোচনা করা, অমান্য করা, এমন কি বিরোধিতা করা সব সময় নীতিহীন, অসামাজিক বা অসম্ভব নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা হল রাষ্ট্রের মধ্যে আইনানুমোদিত এমন এক ক্ষমতা যা সকল আইনসংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সর্বশেষ মীমাংসাস্থল (a power of final adjustment of all legal issues which may arise in its ambit)। এর তাৎপর্য অত্যন্ত সহজ, আইনগত দিক থেকে রাষ্ট্র হল সকলের উর্ধ্বে। যদি রাষ্ট্রের নির্দেশ কেউ না-মানে তবে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তা মান্য করানোর ক্ষমতা রাষ্ট্র ভোগ করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন কম, একনায়কপন্থী রাষ্ট্রের শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বেশি। তাই বলা চলে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে হয় শক্তি, নয় সম্মতি অথবা উভয়ের ওপর।

২. সর্বজনীনতা (Universality)

তত্ত্বগত দিক থেকে রাষ্ট্রের অধীন সকল ব্যক্তি, সংগঠন, ভূ-খণ্ড এবং সমাজের সর্বস্তরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সমভাবে প্রযোজ্য হয় এবং একেই সার্বভৌমিকতার সর্বজনীনতা বা সর্বব্যাপকতা বলা হয়। সর্বজনীনতা সার্বভৌমিকতার একটি বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্যই সমাজের সকল স্তরে সার্বভৌমিকতার গতি অবাধ ও অপ্রতিহত। অবশ্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় এবং আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসন অনুযায়ী কোন কোন অধিকারকে নিজের এক্তিয়ারের বাইরে বলে স্বীকার করে থাকে এবং ঐ সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ হ'তে পারে না। যেমন, নিজের ভূখণ্ডে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসের ওপর সার্বভৌম কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল ব্যতিক্রম দ্বারা সার্বভৌমিকতার সর্বজনীনতা ব্যাহত হয় না। সুতরাং বলা যায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি সর্বজনীন।

৩. **স্থায়িত্ব (Permanence)**

রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব জড়িত, কারণ সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রের প্রাণ, সার্বভৌমিকতা না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও থাকতে পারে না। সরকারের পরিবর্তন হয়, রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ আসে-যায়, কিন্তু সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন নেই, সার্বভৌমত্ব স্থায়ী। অর্থাৎ সরকারের পরিবর্তন ঘটলে বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলেও সার্বভৌমিকতার অবসান ঘটে না। কারণ সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের উপাদান, সরকারের নয়। তাই সরকারের উত্থানপতনের সঙ্গে সার্বভৌমিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে না। যতক্ষণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, ততক্ষণ সার্বভৌমিকতাও বজায় থাকবে। যেহেতু মনে করা হয় যে, রাষ্ট্র মোটামুটিভাবে স্থায়ী, তাই সার্বভৌমিকতার স্থায়িত্ব আছে, ইহা সরকারের মত ক্ষণজীবী নয়।

৪. **অবিভাজ্যতা (Indivisibility)**

সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য, একে ভাগ করা যায় না। আয়তনের দিক থেকে একটি রাষ্ট্রকে ভাগ করলে দুটি রাষ্ট্র হবে, কিন্তু একটি বিভক্ত রাষ্ট্র থাকতে পারে না। রাষ্ট্র বিভক্তিকরণের অর্থ হল ক্ষমতার কেন্দ্রকে ভাগ করা, কিন্তু একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষমতার কেন্দ্র থাকা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হত তবে চরম ক্ষমতার প্রতিভু সার্বভৌমত্বের অবলুপ্তি ঘটত। সার্বভৌম শক্তি আইনসভার হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে, রাজার হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে, রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠনের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতে পারে না। জেলিনেকের ভাষায় *A divided sovereignty is a contradiction in terms.*

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, সরকারের কাজকর্ম যেহেতু বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত, তাই সার্বভৌম ক্ষমতাও বিভক্ত। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়েই শাসনকার্য চলে, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতার কেন্দ্রকে বিভক্ত করে নয়। রুশোর ভাষায়, *Power may be divided, though "sovereign will" never can be.*

অনেকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার—দু জায়গায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হয়ে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমের প্রকৃতি সম্পর্কে বহু বিতর্ক উঠেছে। কিন্তু উইলোবির ভাষায় **(Willoughby)** বলা যায়, মাঝামাঝি কোনো ব্যবস্থা নেই, সার্বভৌম অবিভাজ্য—হয় কেন্দ্রীয় শক্তি সার্বভৌম, অথবা ব্যক্তি সাধারণ (আঞ্চলিক সরকার) সার্বভৌম।[১]

৫. **হস্তান্তরযোগ্য নয় (Inalienability)**

সার্বভৌম ক্ষমতা অন্যকে হস্তান্তর বা সমর্পণ করা যায় না। মানুষ যেমন নিজের প্রাণ অন্যকে দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না। অবশ্য সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয়—একথার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের ভুখণ্ড ছেড়ে দেয়া যায় না বা ক্ষমতার কেন্দ্র হতে অন্যকে ক্ষমতা বণ্টন করা যায় না। এককালে সামাজিক চুক্তির প্রবক্তারা সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় কিনা এ বিষয়ে তুমুল বিতর্ক করেছেন। দার্শনিক হবস্ প্রাক্-সামাজিক অবস্থায় জনসাধারণকে ক্ষমতার কেন্দ্র মনে করার পরেও তাদের দিয়ে শাসকের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়েছেন। কিন্তু লক্, রুশো প্রমুখ দার্শনিকরা ঐ তত্ত্ব কখনও স্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্নার বলেছেন যে, এই বিতর্কের মূল্য যাই হোক না কেন, বর্তমানে একথা স্বীকৃত যে আইনগত দিক থেকে সার্বভৌমিকতা হস্তান্তরযোগ্য নয়।

তিন : সার্বভৌমত্বের নানারূপ (Various Forms of Sovereignty)

সার্বভৌমিকতার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ফলে সার্বভৌমিকতা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ এবং বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ

১. "There is no middle ground, sovereignty is indivisible, and either the central power is sovereign and the individual members not, or vice versa".

আবার সার্বভৌমিকতার ঐ বিভিন্ন রূপকে সার্বভৌমিকতার শ্রেণীবিভাগ বলে মনে করেন। সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন রূপকে আলাদা করে আলোচনা করে এদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হ'ল।

ক. উপাধিসূচক এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular and Actual Sovereignty)

উপাধিসূচক বা নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতা দ্বারা এমন সার্বভৌমকে নির্দেশ করা হয় **যিনি বা যাঁরা লিখিত বা অলিখিত নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন, অথচ বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না বা করতে পারেন না।** নামসর্বস্ব সার্বভৌমের ক্ষমতা নামমাত্র ক্ষমতা, নামসর্বস্ব সার্বভৌম চূড়ান্ত এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উপাধিসূচক বা নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতার সঙ্গে প্রকৃত সার্বভৌমিকতার পার্থক্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। উপাধিসূচক সার্বভৌম শক্তি সর্বদাই দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি **উপাধিসূচক সার্বভৌমের নামে প্রকৃত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে থাকেন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে প্রকৃত সার্বভৌম** (Actual Sovereign) **বলা হয়।**

ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধান অনুযায়ী সেখানকার রাজা বা রানী তাঁদের উপাধি বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। ঐ ক্ষমতা লাভের জন্য রাজা বা রানীর কোন ব্যক্তিগত দক্ষতা বা যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না ; রাজা বা রানী উপাধি দ্বারাই তাঁরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। রাজা বা রানীর নামেই দেশ শাসন করা হয়। এ জন্যই ব্রিটেনের রাজা বা রানীকে অনেক সময় সার্বভৌম (Sovereign) নামে অভিহিত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন উপাধিসূচক সার্বভৌম। কার্যক্ষেত্রে বা বাস্তবে তাঁদের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। অথচ উপাধিসূচক সার্বভৌম হবার জন্য ব্রিটেনের রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাঁদের নামে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁরা দেশ শাসন করেন না। সেখানকার মন্ত্রিসভা (Cabinet) হল প্রকৃত শাসক—অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় প্রকৃত সার্বভৌম (Actual Sovereign)। বর্তমানে ভারতে রাষ্ট্রপতির নামে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে তাঁকে কাজ করতে হয়। সুতরাং ভারতে রাষ্ট্রপতিকে উপাধিসর্বস্ব সার্বভৌম এবং মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত সার্বভৌম বলা যায়।

খ. আইনসম্মত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Legal and Political Sovereignty)

যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে, অর্থাৎ দেশের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, তাকে আইনসম্মত সার্বভৌম বলা হয়। আইনসম্মত সার্বভৌমের নির্দেশ অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও থাকে না। নিজের শক্তিতে আইনসম্মত সার্বভৌম স্বপ্রকাশ।

আইনসম্মত সার্বভৌমিকতা একটি আইনানুগ ধারণা। আইনের চোখে তিনিই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। আইনসম্মত সার্বভৌমই কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনের মাধ্যমে রূপদান করতে পারে।

অন্যদিকে **আইনসম্মত সার্বভৌমের পেছনে যে শক্তি কাজ করে,** আইনের **চোখে যাঁদের পরিচয় অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট,** আইনের মাধ্যমে যাঁদের আদেশ বা ইচ্ছা প্রকাশিত হয় না, অথচ কার্যত যে অসংগঠিত শক্তির সমর্থনে আইনসম্মত সার্বভৌমের প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ ঘটে **তাকেই রাজনৈতিক সার্বভৌম বলে।** ডাইসীর ভাষায় বলা যায়, *The body is politically sovereign the will of which is ultimately obeyed by the citizens of the state.* ডাইসীর মতে শেষ পর্যন্ত যাঁর হাতে ক্ষমতা যোগাবার শক্তি থাকে তাকেই সার্বভৌম বলতে হবে। তাঁর মতে ব্রিটেনে রাজনৈতিক সার্বভৌম হল নির্বাচকমণ্ডলী—যারা ভোট দিয়ে পার্লামেণ্ট গঠন করে। আইনের চোখে রাজনৈতিক সার্বভৌম অজ্ঞাত, তাই বিচারকেরা রাজনৈতিক সার্বভৌমকে মানেন না, তাদের কথা জানেন না।

অনেকে মনে করেন সংকীর্ণ অর্থে নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক সার্বভৌম, কিন্তু ব্যাপক অর্থে সমগ্র জনসাধারণ (তারা ভোটদাতা হোক, বা না হোক) বা জনমত হল রাজনৈতিক সার্বভৌম। বস্তুত জনমতই নির্বাচকমণ্ডলীর মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে, তাই জনমতই বাস্তবে রাজনৈতিক সার্বভৌম। বস্তুত রাজনৈতিক সার্বভৌম কে—এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নয়।

অনেকে সার্বভৌমিকতার এ ধরনের শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে। তাঁরা এরূপ শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে বিভ্রান্তি ঘটে, ধারণা জন্মায় যেন সার্বভৌমত্বকে ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। আইনসম্মত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব দুটো আলাদা সত্তা। একই শক্তির দুটি বিভিন্ন প্রকাশ, যেমন একই মুদ্রার দুটি দিক। যে ক্ষেত্রে আইনসম্মত সার্বভৌমের সঙ্গে রাজনৈতিক সার্বভৌমের মৌলিক বিরোধ ঘটে সেক্ষেত্রে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসম্মত সার্বভৌমত্বকে নতুন করে মনোনীত করা হয়। বাস্তবে আইন হল জনসাধারণের ইচ্ছা-নির্ভর এবং শেষ পর্যন্ত তা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে। অধ্যাপক রীচি (Ritchie) যথার্থ বলেছেন যে, ভালো শাসনব্যবস্থার চরিত্র নির্ভর করে, শাসক অর্থাৎ আইনসম্মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং জনসাধারণ অর্থাৎ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী—এ দুই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ওপর। শুদ্ধ গণতন্ত্রে (যেমন রুশোর কল্পনায়) হয়তো ঐ অবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব-মূলক গণতন্ত্রে সর্বদাই ঐ দুই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা রক্ষার সমস্যার উদ্ভব হয়।

গ. আইনানুমোদিত ও কার্যকর সার্বভৌমত্ব (De Jure and De Facto Sovereignty)

সার্বভৌমিকতাকে আইন অনুমোদিত ও কার্যকর বা বাস্তব—এ দুভাগে বিভক্ত করা হয়। বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতা কে প্রয়োগ করেন এবং কে করেন-না এর ভিত্তিতেই এরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কখনও কখনও যুদ্ধ বা বিপ্লব বা অন্য কোন কারণে কোন দেশের শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার জন্য দেখা যায় যে, সে দেশের আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হন যে তিনি বা তাঁরা স্বদেশ থেকে চলে গিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং আইনসিদ্ধ ক্ষমতা নিজের দেশে প্রয়োগ করতে অসমর্থ হন। অথচ আইনের দিক থেকে তখনও এঁরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং এঁদের নির্দেশই কার্যকর হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায়, আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি দেশ শাসন করছে এবং তাঁদের নির্দেশই কার্যকর হচ্ছে। **এরূপ অবস্থায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে আইনানুমোদিত সার্বভৌম এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে কার্যকর বা বাস্তব সার্বভৌম বলে অভিহিত করা হয়।**

আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতার ক্ষমতার উৎস হল আইনগত স্বীকৃতি ; অন্য দিকে কার্যকর সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হল শাসনতান্ত্রিক শক্তি ও বাস্তব অবস্থা। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের সময় ক্রমওয়েল পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন এবং কার্যকর সার্বভৌম বলে পরিগণিত হন, যদিও দ্বিতীয় চার্লস তখনও আইনানুমোদিত সার্বভৌম। নেপোলিয়ন, আয়ুব খাঁন, মুজিবর রহমান সকলেই কার্যকর বা বাস্তব সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে বাস্তব সার্বভৌম আইনের পদ্ধতির সাহায্যে নিজেকে আইনানুমোদিত করে নেয়। বিদেশী আক্রমণ বা দেশের সৈন্যবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে অনেক সময় আইনানুমোদিত সার্বভৌমের পরিবর্তন হয়। সুতরাং লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করে বলা যায়, যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি আইনসঙ্গত বা আইনবিরুদ্ধ-ভাবে নিজেদের ইচ্ছা কার্যকর করতে পারেন এবং জনগণের আনুগত্য লাভ করে থাকেন, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে কার্যকর সার্বভৌম বলা হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, আইন অনুসারে গঠিত শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে দিয়ে কোন সামরিক নেতা ক্ষমতা দখল করেন। তাঁকে প্রথমে কার্যকর সার্বভৌম হিসেবে স্বীকার করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি যখন ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন আর কেউ তথাকথিত আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার কথা মনে রাখে না। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর সার্বভৌম নির্বাচন বা

আইনগত পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর শাসনব্যবস্থাকে আইনের মন্ত্রে অভিষিক্ত করে যথাযোগ্য স্বীকৃতি আদায় করে নেন। এরূপ অবস্থায় আইনানুমোদিত ও কার্যকর সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য বিলীন হয়ে যায়।

অস্টিন সার্বভৌমিকতার এরূপ শ্রেণীবিভাগে আপত্তি করেছেন। কারণ, তাঁর মতে সার্বভৌমিকতাই আইনের উৎস। সুতরাং সার্বভৌম কখনই বে-আইনী হতে পারে না। বে-আইনী সরকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সে সরকারকে কোনরূপ সার্বভৌমিকতার দ্বারা অভিষিক্ত করা চলে না।

ঘ. রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty)

কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্রের অধীনস্থ জনমণ্ডলী এবং ভূখণ্ডের উপরই চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, রাষ্ট্রের বাইরেও ইহা স্বাধীন ও চরম কর্তৃত্বের অধিকারী এবং অপর কোন রাষ্ট্র বা শক্তিদ্বারা এর ক্ষমতা সীমিত নয়। **রাষ্ট্রের ঐ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা বলে।** রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা থাকার জন্য রাষ্ট্র অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না।

অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার ধারণাটি বহুত্ববাদীগণের সমালোচনার আঘাতে এবং জনগণের (Popular) সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের আলোড়নে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতার নীতি বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইন, অনুশাসন ও সংস্থার দ্বারা বহুল পরিমাণে শক্তিশালী হয়েছে। ব্লুনৎস্লী মনে করেনঃ "রাষ্ট্র বাইরের দিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিজস্ব চরিত্র ও সাধারণ সদস্যদের অধিকারের দ্বারা সীমিত।" ডঃ গার্নার মনে করেন যে, **অন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকা ছাড়া রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতা অন্য কোন অর্থ বহন করে না।** সেদিক থেকে রাষ্ট্রবহিঃস্থ সার্বভৌমিকতাকে নেতিবাচক (negative) ক্ষমতা ছাড়া কিছু বলা যায় না।

ঙ. জনগণের সার্বভৌমকত্ব বা গণসার্বভৌমত্ব (Popular Sovereignty)

গণসার্বভৌমত্ব তত্ত্বের মূল কথা হ'ল সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত। সরকার তার ক্ষমতা আহরণ করে শাসিতের সম্মতি থেকে, অর্থাৎ আইনের ভিত্তি হল গণসমর্থন। অত্যাচারী ও জনবিরোধী রাজাকে নির্বাসন বা প্রয়োজনবোধে বিপ্লবের মাধ্যমে অপসারণ করার অধিকার জনসাধারণের আছে।

তৎকালীন অবাধ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সমর্থন আদায় করার জন্য যোড়শ-সপ্তদশ শতকে গণসার্বভৌমত্বের ধারণা প্রচারিত হয়। রাজতন্ত্রের বিরোধী লেখকেরা, যেমন, পাদুয়ার মার্সিগ্লিও (Marsiglio of Padua), অক্হামের উইলিয়াম (William of Ockham), জর্জ বুসম্যান (George Buchman), আলথুসিয়াস্ (Althusius) প্রমুখেরা প্রাকৃতিক নিয়ম ও চুক্তিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গণসার্বভৌমত্বের নীতি প্রচার করে গিয়েছেন। আদিতে সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল জনগণের, তারা নিজেরা রাজাকে ঐ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে না—সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতেই ন্যস্ত থাকে। আঠারো শতকে গণসার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রচার-ব্যাপকতা লাভ করে। লক্ (Locke) ঘোষণা করেন যে, চরম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে (remains in the people)। প্রশাসকরা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। শাসক তাঁর দায়িত্ব পালন না করলে জনসাধারণের তাঁকে অপসারণের অধিকার আছে।

রুশোর লেখায় এ সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তিনি বলেন "জনগণের কণ্ঠস্বর ভগবানের কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি" (*Vox Populi Vox dei*). তাঁর 'সামাজিক চুক্তি'গ্রন্থে তিনি ঘোষণা করেন যে, জনগণের 'সাধারণ ইচ্ছা'-ই সার্বভৌম এবং সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায় সরকারী কাজকর্মে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। এভাবে রুশোর গণসার্বভৌম তত্ত্ব ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় (American Declaration of Independence) বলা হয় যে, সরকার তার ন্যায়সঙ্গত

শক্তি লাভ করে শাসিতের সম্মতি থেকে। ফরাসী বিপ্লবও সাম্য এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের আদর্শের কথা ঘোষণা করে। সেই সময় থেকে গণসার্বভৌমত্বের তত্ত্ব গণতন্ত্রের প্রাণ বলে পরিগণিত হচ্ছে। ব্রাইস (Bryce) ঠিকই বলেছেন, জনগণের সার্বভৌমিকতা গণতন্ত্রের ভিত্তি ও সংকেত-ধ্বনি (popular sovereignty is the basis and watchword of democracy)।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করলে জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটিকে ফাঁপা বলে মনে হয়। জনগণ বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 'জনগণ' একটি ধারণা, এর যথার্থ পরিচয় আজও কেউ দিতে পারেনি। জনতা বললে সাধারণভাবে বোঝা যায় অনির্দিষ্ট জনসমাজ, অথবা তাদের সেই অংশটি যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ নির্বাচকমন্ডলী। অনির্দিষ্ট জনতার হাতে নিশ্চয় সার্বভৌমত্ব দেয়া যায় না। সার্বভৌম ক্ষমতা তাদেরই, আইন যাদের নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে।

নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে সার্বভৌমত্ব থাকে বলাও সবসময় সমীচীন নয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, সংখ্যাধিক্য তো নেই-ই, হয়তো দু-পঞ্চমাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ ঘটছে। অনেক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে এক-পঞ্চমাংশ ভোট পেয়েও একটি দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। সুতরাং সেখানে গণসার্বভৌমিকত্ব কাজ করে না।

রুশো নিজেও জনগণের সার্বভৌমত্বের রূপরেখা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর ধারণায় প্রতিটি আলাদা আলাদা ব্যক্তি হ'ল সমাজের পরিপূর্ণ ক্ষমতার ছোট ছোট অংশবিশেষ। তাই জনসাধারণ তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ রূপ দেয়। অথচ মনস্তাত্ত্বিক কারণে রুশোই বলেছিলেন যে মানুষের মধ্যে নীচতা, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ছড়িয়ে আছে। ঐ সকল লোকের ইচ্ছা যোগ করলেই 'সাধারণ ইচ্ছা' আত্মপ্রকাশ করে না। সাধারণ ইচ্ছা 'আদর্শ ইচ্ছা' মাত্র, আদর্শ ইচ্ছার লক্ষ্য হল সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা, ঐ সাধারণ ইচ্ছার নিয়ামক ও নির্ধারক স্থির করবে কে ?

সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে কেউ কেউ বর্তমানে জনতার সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝেন গণভোট (Referendum), গণউদ্যোগ (Initiative) ও পদচ্যুতি (Recall)। প্রতিনিধিদের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণকেই গণসার্বভৌমত্ব বোঝায়। মার্কসীয় মত অনুসারেও গণসার্বভৌমত্বের তত্ত্ব গ্রহণীয় নয়, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা ভুল কথা, শক্তিশালী শ্রেণী শক্তির জোরে অন্য শ্রেণীর মত পদদলিত করে। অবশ্য গণসার্বভৌমিকতার তত্ত্বের এসব ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, গণতন্ত্রের গণসমর্থন ও জনকল্যাণের আদর্শ ঘোষণা করে গণসার্বভৌমিকতার তত্ত্ব অনেকাংশ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করেছে।

চার ঃ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের তত্ত্ব (Austin's Theory of Sovereignty)

ইংরাজ আইনজ্ঞ জন অস্টিন (John Austin) ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তার 'আইন শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা' (*Lectures on Jurisprudence*) গ্রন্থে বলেন, আইন হল সার্বভৌমের আদেশ (command)। অর্থাৎ ঐ আদেশ হল অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী বলে সার্বভৌমের আদেশই একমাত্র আইন (Law is the command of the Sovereign)। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি ছাড়া আইনের অন্য কোনো উৎস নেই।

আইন হল সার্বভৌমের নির্দেশ

আইনের ঐ সংজ্ঞা হতেই সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি বোঝা যায়। যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ভোগ করে সে-ই সার্বভৌম, আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা যাঁর ওপর ন্যস্ত সেই ব্যক্তি বা সংসদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত। অস্টিনের সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা অনুযায়ী **"যদি কোনো সমাজে কোনো নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি (বা ব্যক্তি-সংসদ) অপর কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য প্রকাশ না করে অথচ সমাজের অধিকাংশের কাছ থেকে স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তবে সেই সমাজে ঐ ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি (বা ব্যক্তি-সংসদ) সার্বভৌম এবং ঐ সমাজ একটি রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।"**

অস্টিনের সংজ্ঞা

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে **অস্টিনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে যে সকল সিদ্ধান্তে** উপনীত হওয়া যায় তা হ'ল ঃ

১. প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রে কোন-না-কোন ব্যক্তি (বা সংসদ)কে দেখতে পাওয়া যায় যিনি (বা যাঁরা) সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেন।

২. ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ 'নির্দিষ্ট', অর্থাৎ তাঁকে (বা তাঁদের) স্পষ্টভাবে জানতে, দেখতে ও বুঝতে পারা যায়। সার্বভৌম শক্তি 'জনসাধারণ'-এর মতো অনির্দিষ্ট, রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছার' মত অস্পষ্ট, অথবা 'ভোটদাতাদের' মতো অনির্ণেয় হলে চলবে না।

৩. সার্বভৌমত্বের অধিকারী ঊর্ধ্বতন হবেন, অন্যের কাছে তিনি বা তাঁরা কখনই আনুগত্য জানাবেন না।

৪. সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছা কোনো সময়েই কোনো কিছুর দ্বারা খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ নয়। এ ক্ষমতা চরম ও অসীম। সার্বভৌমত্বের সামনে আইনগত কোনো বাধা থাকবে না। চরম ও অসীম বলে তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের মধ্যে সকল ব্যক্তি ও ভূখণ্ড তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর এই কর্তৃত্বকে ভাগ করা যায় না। কারণ বিভক্ত হলে সার্বভৌমত্ব সব জায়গায় পরিব্যাপ্ত হতে পারে না।

৫. জনসাধারণ স্বভাবতই নিরন্তর আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে, ঐ আনুগত্য কখনও সাময়িক নয়।

ইংরাজ বহুত্ববাদী (Pluralist) দার্শনিক হ্যারল্ড লাস্কি দেখিয়েছেন যে, **অস্টিনের মতবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত,** অস্টিনের মতে রাষ্ট্র হল আইনসংগতভাবে সংগঠিত প্রতিষ্ঠান—যেখানে একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব সকল ক্ষমতার কেন্দ্র ও উৎস হিসাবে কাজ করে। **দ্বিতীয়ত,** সার্বভৌমত্ব হল অপ্রতিহত ক্ষমতা, এর সীমা কেউ বেধে দিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্র—অর্থাৎ সার্বভৌম অন্যায়ভাবে, অযৌক্তিকভাবে ও অনৈতিকভাবে যে-কোনো কাজ করতে পারে। **তৃতীয়ত,** সার্বভৌমের আদেশই হল আইন। ঐ আদেশ বা আইন না মানলে আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি পেতে হয়।

সমালোচনা

অস্টিনের তত্ত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। **প্রথমত,** অস্টিন যেমন ভাবে বলেছেন তেমনভাবে **সার্বভৌমকে সুনির্দিষ্ট করা যায় না।** হেনরি মেইন বলেছেন যে, ইতিহাসে বহুবার এমন দেখা গিয়েছে যে, কোথায় এবং ঠিক কার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। অস্টিনের মতে ইংলণ্ডে 'রাজাসহ পার্লামেণ্ট' (King-in Parliament) এর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত। কিন্তু অধ্যাপক লাস্কি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, রাজা সহ পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বহুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ। পুরোনো প্রথা, নজির এবং ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের সর্বজনগ্রাহ্য রীতিনীতি লঙ্ঘন করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই। এই অনির্দিষ্টতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে আরও বেশি প্রকট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার বা অঙ্গরাজ্যের সরকার কেউই সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারেন না, উভয়েই ক্ষমতা পায় সংবিধান থেকে। সংবিধান সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষও সার্বভৌম নয়, সুতরাং সার্বভৌমকে কোন মতেই সুনির্দিষ্ট বলা যায় না। লাস্কি তাই বলেন, *The discovery of sovereignty in a federal state is practically an impossible adventure.*

দ্বিতীয়ত, অস্টিনের ধারণা "আইন সার্বভৌমের আদেশ"—অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নয়। প্রথা, রীতিনীতি, বিচারকের ব্যাখ্যা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ আইনকানুন যে গড়ে ওঠে, তা অস্টিন লক্ষ্য করেননি। ঐ আইনগুলো রাষ্ট্র তৈরী করে না, বিলোপ করতেও পারে না। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের মত শক্তিমান রাজা একটিও নতুন নির্দেশ (command) দেননি, চলিত প্রথা মেনে দেশ শাসন করেছেন মাত্র। অবশ্য অস্টিনপন্থীরা ঐ সমালোচনার জবাবে বলেন যে সরাসরি নির্দেশ না দিলেও সার্বভৌমশক্তি বিনা বাধায় যা চলতে দেয় তাই আইন (what the sovereign permits he commands)। প্রশ্ন হল, সার্বভৌম শক্তি বড় ধরনের কোন সামাজিক

রীতিনীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন কি? স্বভাবতই প্রতিকূল জনমতের ভয়ে তিনি তা পারেন না।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদী নামে পরিচিত একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমিকতাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে আইনের উৎস সার্বভৌম শক্তি নয়, অন্য কোন স্থান থেকে আইন তার কর্তৃত্ব পেয়ে থাকে। দুগুয়েত (Duguit)-এর মতে লোকে আইন মানে কারণ তা সার্বভৌমের নির্দেশ এজন্য নয়, বস্তুত আইনের ভিত্তি হল সামাজিক প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্যতা। ক্র্যাব (Krabbe) বলেন যে শাস্তির ভয়ে আমরা আইন মানি তা নয়, আমাদের কাছে ইহা ন্যায্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়—এটাই আইনের ভিত্তি।

চতুর্থত, বহুত্ববাদীরা মানতে প্রস্তুত নন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই থাকে এবং তাকে ভাগ করা যায় না। তাঁরা বলেন অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্র একটি মাত্র। সমাজে ব্যক্তির নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, রাষ্ট্র এদের সৃষ্টি করে না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোরও সার্বভৌমত্ব আছে। রাষ্ট্র একা নয়, তাকে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ভাগ করে নিতে হয়।

পঞ্চমত, অস্টিনের মতে সার্বভৌমত্ব যে চরম ও সীমাহীন তা অনেকে মানতে চান না। লেস্লি স্টিফেন বলেছেন যে, এ ক্ষমতা ঘরে বাইরে সীমাবদ্ধ, *limited both within and without*। দেশের মধ্যে নীতিবোধ, ধর্মীয় শিক্ষা, ন্যায়বিচার বোধ, দীর্ঘস্থায়ী প্রথা ও চিরায়ত ঐতিহ্য সার্বভৌমত্বকে সীমাবদ্ধ রাখে। দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমিত।

সর্বশেষে, অস্টিনের বক্তব্য গণতন্ত্রবিরোধী। বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক বার্নার্ড বোসাঙ্কেত বলেন যে অস্টিনের মতবাদ শক্তিতত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে জনসমর্থনের উপর। তাঁর মতে, *Austinian sovereignty is based on the idea of force, sovereignty in our sense is based on the will of the people.* অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে অস্টিন ও তাঁর অনুগামীরা সার্বভৌমত্বকে দেখেন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। সুতরাং ইহা বড়জোর দাসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, স্বাধীন নাগরিকদের ক্ষেত্রে নয়। তিনি বলেছেন, *They interpret sovereignty as an extreme master-servant relationship, but their account is far more applicable to a slave plantation or to menagerie than to the actuality of political life.*

পাঁচ. বহুত্ববাদী মতবাদ (Pluralistic Theory)

আমরা জানি অস্টিন সার্বভৌমিকতাকে চরম, অসীম ও অবিভাজ্য মনে করেন। সার্বভৌমিকতা চরম ও অবিভাজ্য হবার জন্য একে বিভক্ত করা যায় না, রাষ্ট্র এককভাবে এই চরম ক্ষমতা ভোগ করে। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে এরূপ ধারণাকে একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ (Monism) বলে। একত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ এবং সর্বজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে এবং একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত—এ অভিমত দৃঢ়ভাবে পোষণ করে। রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের এরূপ অবাধ, অসীম ও একক ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে বহুত্ববাদ (Pluralism) আত্মপ্রকাশ করে। ফিগিস্ (Figgis), দুগুয়েত (Duguit), লাস্কি (Laski), বার্কার (Barker), ফলেট (Miss Follet) প্রমুখ বহুত্ববাদীরা বিভিন্ন লেখায় এ মতবাদ পুষ্ট করেছেন।

বহুত্ববাদীদের মতে সমাজে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে—রাষ্ট্র তাদের মধ্যে একটি। ব্যক্তির মধ্যে নানা সৃজনীশক্তি নিহিত, নানা চিন্তা তার মনে উদয় হয়, *Man is a bundle of Interests.* খেলার প্রবণতা বাড়াবার জন্য একজন ব্যক্তি ফুটবল ক্লাবে যোগ দেয়, নাট্যপ্রতিভার প্রেরণায় সে নাট্যসংঘের সভ্য হয়। মালিকেরা নিজের স্বার্থে মালিক সংঘ গড়ে, শ্রমিকেরা নিজের স্বার্থে

শ্রমিক সংঘ গড়ে। ধর্মের প্রেরণায় কেউ ধর্ম-সমিতি গঠন করে, শিক্ষকেরা নিজ বৃত্তি উন্নয়নে শিক্ষক সমিতি গড়ে তোলে। শান্তিশৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে ব্যক্তি রাষ্ট্র নামেক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সৃজনীশক্তি বিকশিত হয়, তাই **প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তির কাছে আনুগত্য সমানভাবে দাবি করে।** বর্তমান কালে সমাজ তাই আর অনেক ব্যক্তির সমষ্টি নহে, সমাজ অনেক সংঘের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সমাজ ক্রমশ ঐ সব সংঘের যুক্ত মোর্চার আকার নিয়ে গড়ে উঠেছে, *Society is becoming more and more federal in nature.* এখন ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষের তুলনায় সংঘের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ অধিকতর বাস্তব হয়ে উঠেছে, *No longer do we say Man versus the State, but the Group versus the State.*

সমাজের এ সব গোষ্ঠী, সংঘ বা দলগুলোর প্রত্যেকেরই আলাদা সত্তা ও ব্যক্তিত্ব আছে। প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়নায়, মানুষের জৈবিক-মানসিক প্রবৃত্তির টানে আপনা-আপনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এরা গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র এদের সৃষ্টি করে না, রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর এদের অস্তিত্ব নির্ভরও করে না। সুতরাং ঐ সকল স্বাধীন স্বয়ম্ভু প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রাষ্ট্র নিজে অধিকতর সার্বভৌমত্বের দাবি করতে পারে না। অন্যান্য সংঘের মত রাষ্ট্রও একটি সংঘ, এর কোনো উচ্চতর মূল্য বা স্থান নেই। একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হয়েই ব্যক্তির সব প্রেরণা বা সৃজন ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়ে যায় না, আরও অনেক সংঘের সভ্য হওয়া ব্যক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্র *does not exhaust the associative impulses of man.* রাষ্ট্র তাই ব্যক্তির আনুগত্যের ষোল আনা একা দাবি করতে পারে না। তাকে সেজন্য ব্যক্তির আনুগত্যের দাবি নিয়ে অন্যান্য সংঘের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, নিজেকে যোগ্যতর প্রমাণ করতে হয়। **বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রে একক কোনো সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ নেই, কর্তৃত্বকে (সার্বভৌমিকতাকে) বিভক্ত করা যায় এবং করা উচিত।** অধ্যাপক লাস্কির মতে মানুষের যদি বহু ধরনের প্রেরণা থাকে, কেবলমাত্র একটি প্রেরণায় যদি সে নিঃশেষিত না হয়, তবে সমাজের কাঠামোও সেরূপই হবে। তাই তিনি সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা ধূলিসাৎ করার প্রয়োজন অনুভব করেন, *It would be of lasting benefit to political science if the whole concept of sovereignty was surrendered.*

বহুত্ববাদীরা আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলে মানতে প্রস্তুত নহেন। তাঁদের মতে আইন কতকগুলো নিয়ম মাত্র, সামাজিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে চালাবার প্রয়োজনে উদ্ভূত। সামাজিক সংহতি বাড়ানোই ঐ নিয়মগুলির লক্ষ্য। এই আদর্শ পিছনে থাকে বলেই লোকে আইন মানে। আইন ভাঙতে চেষ্টা করলে তা হয় বে-আইনী কাজ। রাষ্ট্র ঐ নিয়মগুলো কার্যকর করে মাত্র, তৈরী করে না।

বহুত্ববাদী তত্ত্বেরও তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত, একমাত্র রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নেই এবং থাকতে দেওয়া উচিত নয়—এ বক্তব্য মেনে নেয়া শক্ত। বহুত্ববাদীদের মতে সমাজে স্বতঃস্ফূর্ততা, স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্য থাকবেই, এগুলো থাকলে তবেই সংঘগুলোর কাজ অবাধে চলতে পারে। বৈচিত্র্যের ফল ঐক্যের বিনাশ, লিপসনের ভাষায় *the price of diversity is the impairment of unity.* সমাজ একটি জটিল সমষ্টি, তাই ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। আর এই ঐক্য থাকতে পারে যদি কোন বন্ধন থাকে। স্বার্থের বিরোধ থাকলে আনুগত্যের টানাটানি চলে, এই স্বার্থের বিভিন্নতা কমানো কোনো না-কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। সে প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্র, এবং তাই রাষ্ট্রের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে চলে না। বিভিন্ন প্রতিযোগী স্বার্থের সমন্বয়ের জন্য একজন রেফারি বা আমপায়ার থাকা একান্ত প্রয়োজন,—যে দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করে।

সমালোচনা

তাই বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের একক সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী না হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **যথার্থই মন্তব্য** করেছেন যে, বহুত্ববাদীরা সামনের দরজা দিয়ে সার্বভৌমিকতাকে বিদায় দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন।

দ্বিতীয়ত, অন্যতম বহুত্ববাদী হিসাবে স্বয়ং লাস্কি বহুত্ববাদকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বহুত্ববাদে রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থের বাহক মনে করা হয় না। তাই, রাষ্ট্র যে শক্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থেই অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ করতে চায় তা বহুত্ববাদীরা বোঝেন না।

বহুত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হলেও বহুত্ববাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা চরম এ বক্তব্যের বিরোধিতা করে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য রক্ষায় এই তত্ত্বের দান অপরিসীম।

নমুনা প্রশ্ন

1. সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দাও। এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? (এক দেখ) [H. S. C. '82]
2. সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '79, '80 ; T. S. B. '82]
3. পার্থক্য নির্দেশ কর :
   (ক) উপাধিসূচক ও প্রকৃত সার্বভৌম, (খ) আইনানুমোদিত ও কার্যকর সার্বভৌম, (গ) আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম। (তিন দেখ)
4. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা ব্যাখ্যা কর। (তিন দেখ) [T. S. B. '79]
5. অস্টিনের সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব আলোচনা কর। এর বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলো কি কি? (চার দেখ)
6. সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদী সমালোচনাগুলো পর্যালোচনা কর। (পাঁচ দেখ)
7. জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি আলোচনা কর। (তিন দেখ)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক দাও :

1. সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়,) [H. S. C. '79 '81]
2. রাষ্ট্রের (কেবল অভ্যন্তরীণ, কেবল বাহ্য, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় প্রকার) সার্বভৌমিকতা আছে।
3. সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদী তত্ত্বের প্রবক্তা একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম (অস্টিন, হেগেল, লাস্কি)
4. জনগণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের একজন প্রবক্তা হলেন (হবস্, অস্টিন, রুশো)
5. সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের প্রবক্তা (অস্টিন, লক, লাস্কি)
6. সার্বভৌমিকতাকে বিভক্ত করা (যায়, যায় না)
7. সার্বভৌমিকতা (স্থায়ী, অস্থায়ী) উপাদান।

> *"The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."*
> —Dr. Garner.

৪

রাষ্ট্রের উৎপত্তি
Origin of the State

পৃথিবীতে চিরদিন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজ বিবর্তনের একটা স্তরে রাষ্ট্র নামক সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যায়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা নেই। আমরা কেবল জানি যে, রাষ্ট্র হল সমাজের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সমাজের মধ্যে থেকে এর উদ্ভব। ইতিহাসের কোন না কোন স্তরে, সমাজের নিজের প্রয়োজনে ও বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল অঞ্চলে ঠিক একই সময়ে মনুষ্যসমাজ গঠিত হয়নি, এবং সকল মনুষ্যসমাজে ঠিক একই সময়ে এবং একই কারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। স্বভাবতই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত নন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সে বিষয়ে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে, প্রায় সকল মতবাদই অনুমান ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। বার্কের (Burke) ভাষায় বলা চলে যে, সরকারের আদি রূপের ওপর যেন একটা পর্দা টাঙানো আছে এবং সে পর্দা এখনও সরানো যায়নি। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না থাকায় নানারূপ কল্পনার সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

এক ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ বিভিন্ন মতবাদ (Theories of the Origin of the State)

পৃথিবীতে কি ভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকগুলো তত্ত্ব জড়ো হয়েছে।

আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো আলোচনা করবো এবং যুক্তিবোধের সাহায্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য পরে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করব।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে পাঁচটি মতবাদ আছে। এগুলি হ'ল ঃ

ক. **ঐশ্বরিক মতবাদ** (The Divine Origin Theory)

খ. **বলপ্রয়োগ মতবাদ** (The Theory of Force)

গ. **সামাজিক চুক্তি মতবাদ** (The Social Contract Theory)

ঘ. **ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ** (The Historical or Evolutionary Theory)

ঙ. পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal-Matriarchal Theory)

এবার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্বগুলোকে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল।

দুই ঃ ঐশ্বরিক মতবাদ (The Divine Origin Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে ঐশ্বরিক মতবাদই সবচেয়ে প্রাচীন। এই মতবাদে বলা হয়, ঈশ্বর স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করে মানুষকে সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপনের প্রেরণা দিয়েছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি মাত্র। রাজার মাধ্যমেই ভগবানের ইচ্ছা লোক-সমাজে প্রচারিত হয়েছে, সুতরাং রাজার আজ্ঞা পালন করার অর্থ ভগবানের আদেশ পালন করা। রাজার আদেশ অমান্য করলে পাপ হয়। ঈশ্বর যেমন নিজের সৃষ্ট কোন জীবের কাছে দায়িত্বশীল নন, তেমনই কোন রাজা বা রানী প্রজাদের কাছে দায়িত্বশীল নন। তাঁরা আইনের উর্ধ্বে, তাঁরা নিজেদের কাজের জবাবদিহি করবেন ঈশ্বরের কাছে, প্রজাদের কাছে নয়।

রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি

বিভিন্ন ধর্মের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।[১] হিন্দুরাষ্ট্রে রাজাকে ভগবানের অংশরূপে প্রচার করার অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। রামচন্দ্র ছিলেন স্বয়ং ভগবান। যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র। কোন রাজবংশের উৎপত্তি সূর্য থেকে, আবার কোন রাজবংশের উৎপত্তি চন্দ্র থেকে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখতে পাওয়া যায় যে, মাৎস্যন্যায়ের ফলে জনসাধারণ ঈশ্বরের কাছে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তা পূর্ণ করার জন্য মনুকে শাসক হিসেবে পাঠান। এমন কি, মুসলমান রাজত্বেও 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো' বলে সম্রাটকে অভিবাদন করা হত। প্রাচীন মিশর দেশে, এমন কি আধুনিক যুগেও জাপানে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে ডঃ ফিগিস (Figgis) দেখিয়েছেন যে, চারটি মূলসূত্রের উপর ঐ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, বংশানুক্রমে রাজত্ব করা শাসকদের ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার। তৃতীয়ত, ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারও কাছে রাজা নিজের কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। চতুর্থত, রাজার আদেশ মান্য করা ও তাঁর প্রতি অনুগত থাকা প্রজাদের পবিত্র কর্তব্য এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা পাপ।

চারটি মূল সূত্র

১. "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God."

প্রাচীন মিশর, চীন, পারস্য, জাপান, ভারত ইত্যাদি দেশে এই মতবাদের সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে যখন পোপ ও রাজার ভেতর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিরোধ শুরু হয়, তখন রাজার পক্ষ থেকে এ বলে প্রচার করা হয়েছিল যে তিনি শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি। অপরপক্ষে পোপের সমর্থকগণ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পোপের দাবী শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ (James I) ১৬০৩ সালে পার্লামেণ্টে ভাষণ প্রদানকালে বলেছেন যে "তিনি স্বামী এবং সমগ্র দেশ তাঁর আইনসম্মত স্ত্রী"[২]; কারণ রাজারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের মানবীয় প্রতিবিম্ব (**Kings are the breathing images of God upon earth**)।

প্রথম জেমসের এ বক্তব্যকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আরও উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে রবার্ট ফিল্মারের (Robert Filmer) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে রাজার ক্ষমতা শুধু ঈশ্বরদত্তই নয়, ঐ ক্ষমতা সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতার মত ব্যাপক, স্বাভাবিক এবং ঐ ক্ষমতা রাজারা বংশানুক্রমে ভোগ করার অধিকারী। শুধুমাত্র প্রথম জেমস্ বা ফিল্মার নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনশক্তির অভ্যুত্থান রোধ করার জন্য প্রয়োজন মত রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার কথা প্রচার করে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অন্যদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মার্টিন লুথার, ক্যালভিন প্রমুখ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মবিপ্লবের রথিগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করে জনগণকে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

প্রথম জেমস্ নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে, তাঁর পুত্র ইংলণ্ডের পরবর্তী রাজা প্রথম চার্লসকে (Charles I) প্রজাদের হাত থেকে রক্ষা করে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু রোধ করার জন্য ইংলণ্ডে কোন ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটল না। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রসার, ইউরোপের নবজাগরণ, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিস্তার ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত হানে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণের ব্যাখ্যা হিসেবে সতেরো শতক থেকেই ঐশ্বরিক মতবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে—বর্তমানে এ মতবাদটিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে আর গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না।

সমালোচনা

ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির উত্থাপন করে এর সমালোচনা করা হয়েছে। নীচে আমরা সেগুলি আলোচনা করছি :

১. ঐশ্বরিক মতবাদের প্রবক্তাগণ এ মতবাদের স্বপক্ষে কোন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বা ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থিত করতে পারেনি। সুতরাং এ তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক।

২. ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব রাজার সকল নীতি ও কাজকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা প্রজাদের কর্তব্য বলে দাবী করে। অর্থাৎ রাজা অন্যায় করলেও প্রজাকে সে অন্যায় সহ্য ও সমর্থন করতে হবে। এ বক্তব্য অযৌক্তিক এবং স্বভাবতই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন ও চরম রাজতন্ত্র প্রসারিত করার জন্যই স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এ তত্ত্বকে প্রচার করা হয়েছিল—এইরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

৪. রাজার ক্ষমতা অসীম, চূড়ান্ত এবং তিনি কোন মানবীয় কর্তৃত্বের কাছে তাঁর কাজের জন্য দায়িত্বশীল নন বলে ঐশ্বরিক মতবাদ যে বক্তব্য প্রচার করেছে তা প্রকারান্তরে স্বৈরাচারিতাকেই জন্ম দেয় বলে এ মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

৫. ঐশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্র নামক রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থাকে জটিল ধর্মীয় জটাজালে আবদ্ধ করেছে। কিন্তু রাষ্ট্র মূলত ধর্মনিরপেক্ষ স্বভাবজাত একটি সংস্থা। রাজা এবং পোপের (ধর্মের) পার্থক্য

২. "I am the Husband, and all the whole Isle is my lawful wife, I am the Head, and it is my Body ; I am the shepherd and it is my flock." —James I

নির্ণয় করে যীশুখৃষ্ট বলেছেন, "সীজারের যা প্রাপ্য সীজারকে দাও এবং ঈশ্বরের যা প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।"[১]

৬. ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্ব রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ছাড়া সরকারের অন্যপ্রকার শ্রেণীবিভাগের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

মূল্যায়ন

যদিও ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বটি শুধুমাত্র ভ্রান্তই নয়—অন্যকে বিভ্রান্ত করার পক্ষেও যথেষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, রাষ্ট্র-চিন্তার ক্ষেত্রে এ মতবাদের কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে। এ মতবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে প্রচার করে রাজার প্রতি জনগণের আনুগত্য দাবী করেছিল বলে সে যুগের মানুষকে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ করা সহজসাধ্য হয়েছিল। গেটেল (Gettell) যথার্থই বলেছেন যে, মানুষ যখন স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ছিল না তখন এ তত্ত্ব মানুষকে আনুগত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাষ্ট্র-বিবর্তনে সাহায্য করেছিল। রাষ্ট্র প্রবর্তনের প্রাথমিক স্তরে রাজশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে এ মতবাদ সহায়তা করেছিল। সর্বোপরি, ঐশ্বরিক মতবাদ ভুল প্রমাণিত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব এখনো পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি, বরং বর্তমান যুগেও এর ভিত্তিতে ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপনের প্রচেষ্টা ও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

তিন ঃ বলপ্রয়োগ মতবাদ (The Theory of Force)

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে লীকক (Leacock), হিউম (Hume), ওপেনহাইমার (Oppenheimer), জেঙ্কস্ (Jenks) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলপ্রয়োগ মতবাদের কথা বলেছেন। বলপ্রয়োগ মতবাদ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তিই ব্যাখ্যা করেনি—এ মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতির ওপরও আলোকপাতের চেষ্টা করেছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ মনে করে, ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, স্বার্থান্ধ শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভুত্ব-লিপ্সা ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে দাসত্বশৃঙ্খল ও অধীনতায় আবদ্ধ করার প্রয়াসের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির বীজ নিহিত। অর্থাৎ এ মতবাদ অনুযায়ী শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি কর্তৃক দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে দৈহিক শক্তির দ্বারা পরাভূত করে নিজ কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসে। শক্তি প্রয়োগের এরূপ ঘটনাই রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা মানুষের চিরন্তন প্রবণতা। ক্ষমতা লাভের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুর্বলের ওপর সবল মানুষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রাচীন মানবসমাজের এক গোষ্ঠী বা উপজাতির নেতা নিজের অনুচরদের সহযোগিতায় অন্য দলকে পরাস্ত করে বিজিত দলের ওপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করত। এরূপে এক-এক-জন দলপতি এক-একটি অঞ্চলে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করে শাসনকার্য আরম্ভ করে এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাহুবল প্রয়োগেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ জন্য আমরা বলি—'জোর যার মুল্লুক তার।' রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় বলপ্রয়োগে, রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখা হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা। রাষ্ট্র বিপুল শক্তির অধিকারী বলেই লোকে ভয় ও ভক্তিতে রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলে। শাসনের নির্যাস হ'ল শক্তি। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে এবং বাইরের আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হলে পশুবলের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং বলপ্রয়োগ মতবাদ মনে করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, ভিত্তি ও অস্তিত্ব পশুবলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি—শক্তির ওপর রাষ্ট্র নির্ভরশীল

---

১. "Render unto Caesar the things that are Caesar's, and render unto God the things that are God's,"

প্রাক্ রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অরাজকতার কথা এবং বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে বক্তব্য উপস্থিত করেন দার্শনিক হব্‌স্ সহ অনেকে। রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে মানুষে মানুষে হানাহানি ছিল স্বাভাবিক ; ওটাই ছিল নিয়ম। প্রতিটি মানুষ ছিল স্বার্থপর, নিজের ভাল ছাড়া সে আর কিছু বোঝে না, এবং ঐ স্বার্থপরতার জন্য সমাজে শৃংখলা ও নিরাপত্তা ছিল না। শক্তির দম্ভ বা বলপ্রয়োগের দ্বারা শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জনগণের আনুগত্য আদায় করে। জনগণের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করে তারাই হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রীয় শক্তির আধার। ঐ শক্তিই রাষ্ট্রকে রক্ষা ও পরিচালনা করে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রবক্তারা বলেছেন, মানুষের দ্বারা মানুষকে আক্রমণ ও তাকে দাসত্বের শৃংখলে বন্ধন করা এবং স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্ব-লিপ্সার মধ্যেই ঐতিহাসিক দিক থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হারবার্ট স্পেনসার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে সমাজে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তির বেঁচে থাকার (**survival of the fittest**) অধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য প্রচার করেছেন। তাঁর ঐ বক্তব্যে বলপ্রয়োগ মতবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। জার্মান দার্শনিক ট্রিটসকে (**Treitsehke**) রাষ্ট্রশক্তির উপাসনা ও যুদ্ধের গৌরব গাথায় মুখর হয়ে মূলত বলপ্রয়োগ মতবাদকেই স্বীকার করেছেন।

দার্শনিকদের লেখায় এ মতের অভিব্যক্তি

অনেকে মনে করেন যে, আধুনিক যুগে বলপ্রয়োগ মতের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন মার্কস্ ও তাঁর অনুগামীরা। মার্কসবাদীরা মনে করেন, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামেরও সূত্রপাত ঘটে। আর্থনীতিক দিক থেকে শক্তিশালী ও সম্পদশালী শ্রেণী সম্পদহীন ও দুর্বল উৎপাদক শ্রেণীকে শোষণ ও দমন করতে চায়। এদের মধ্যকার বিরোধ যাতে গোটা সমাজকে একেবারে গ্রাস করে না ফেলে সেজন্য এক শক্তির আধার বা রাষ্ট্র দেখা দেয়।[১] অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ, শোষণ ও পীড়ন অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কর্তৃক শক্তি প্রয়োগের কথা মার্কসবাদীরা বলেন। সুতরাং মার্কসবাদ বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থক এ কথা বলা ঠিক নয়। বলা যায়, মার্কসবাদীরা যুদ্ধ ও রাষ্ট্রশক্তির সমর্থক নন, কিন্তু সমাজবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে তুলে ধরেছেন যে শক্তি রাষ্ট্রের একটি প্রধান উপাদান।

মার্কসীয় বক্তব্য

বলপ্রয়োগ মতবাদকে বিভিন্ন সময়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগে ধর্মীয় সংগঠন (**Church**) ও ধর্মযাজকদের ক্ষমতা রাষ্ট্রের ওপরে স্থাপনের জন্য বলা হত যে, রাষ্ট্রের শক্তি বাহুবল থেকে, কিন্তু চার্চের শক্তি ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোকার (**Cocker**) দেখিয়েছেন যে, বিশের শতকের ফ্যাসিস্ট চিন্তাধারা বলপ্রয়োগ মতবাদ থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। ব্লুনৎস্লী মনে করেন, শক্তি বা সার্বভৌমই যে রাষ্ট্রের প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান তা বলপ্রয়োগ মতবাদের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন উদ্দেশে এ তত্ত্বের প্রয়োগ

যদিও রাষ্ট্রগঠনে পশুবলের দরকার, কিন্তু একমাত্র শারীরিক শক্তির দ্বারাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, একথা বলা যায় না। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো বলেছেন, যে অধিকার পশুবলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না, বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও অবসান ঘটে। বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র জয় করে তা দীর্ঘদিন রক্ষা করা সম্ভব নয় ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পশুবলের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। আধুনিককালের কল্যাণ রাষ্ট্র জনমত ও

বলপ্রয়োগ রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করেছে, কিন্তু এটি একমাত্র উপাদান নয়।

---

১. ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস্ লিখিয়াছেন, "...in order that these antagonisms, classes with conflicting economic interests might not consume themselves and society in sterile struggle ; a power apparently standing above society became necessary for the purpose of moderating the conflict and keeping it within the bounds of 'order' ; and this power, arising out of society, but placing it about it and increasingly and itself alienating from it, is the state."

সহযোগিতার নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। কিন্তু পশুবল ঐ আদর্শের বিপক্ষে। এ জন্যই অধ্যাপক গ্রীন বলেছেন, রাষ্ট্রের ভিত্তি গণ-ইচ্ছার ওপর স্থাপিত, বল-প্রয়োগের ওপর নয়।

সমালোচনা : বল প্রয়োগ নয়, গণ-ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি

শক্তিকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, একমাত্র শক্তির ভিত্তিতে কি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে ? তা যদি হয়, তবে জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতির কি কোন মূল্যই নেই ? আধুনিক অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন, যদিও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করেছে তা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ কোনমতেই রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র উপাদান নয়। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো মনে করেন, যে অধিকার পশুবলের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তা চিরস্থায়ী হতে পারে না। পশুবলের অবসানের সংগে সংগে অধিকারেরও অবসান ঘটে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থিত করেছেন প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক টমাস হিল গ্রীন (T. H. Green)। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে জন-সাধারণের স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে গ্রীন বলেছেন যে, **শক্তি নয়, মানুষের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি (Will, and not force, is the basis of the state)।** অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভিত্তি হল জনসাধারণের সম্মতি, শক্তি নয়। অনুরূপভাবে ম্যাক্‌আইভারও মনে করেন যে, একমাত্র পাশবিক বল জনগণকে সংগঠিত করতে পারে না এবং জনসাধারণের সম্মতির অনুবর্তী না হলে পাশবিক শক্তি বিভেদেরই জন্ম দেয়।[১] এঁদের মতবাদ অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতি না থাকলে পাশবিক শক্তি বিশেষ কিছু করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, শক্তিশালী রুশ সম্রাট জারকে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভিযানের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব ও পৃথিবীর অন্যান্য ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, জনগণের সদিচ্ছা ও সমর্থনের দ্বারা পুষ্ট না হলে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র স্থায়ী হতে পারে না।

স্বেচ্ছাভিত্তিক সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, গ্রীনের বক্তব্য কিছুটা পরিমাণে যুক্তিপূর্ণ হলেও ঐ বক্তব্য একেবারে অভ্রান্ত নহে। এ প্রসঙ্গে লিণ্ডসেকে (Lindsay) অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য শক্তির যেরূপ প্রয়োজন, সম্মতিরও সেরূপ প্রয়োজন রয়েছে। সম্মতিই রাষ্ট্রকে বিধিসঙ্গত রূপ দান করে। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও তার আইনকে আলস্য, অজ্ঞতা, অভ্যাস, ভয় ও প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা ইত্যাদি বিবিধ কারণে মানুষ মানে। ঐ সকল কারণগুলো থেকে ‘ইচ্ছা ও ভয়’ বোধের জন্ম—যা ‘আইন’কে মান্য করতে সাহায্য করে।

গ্রীনের বক্তব্যের সমালোচনা

যা হোক দেখা যাচ্ছে যে, বলপ্রয়োগ মতবাদকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ হিসেবে বলা যায় :

১. গ্রীনের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের সদিচ্ছা ও সম্মতি রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে ;

২. বলপ্রয়োগ মতবাদ স্বাধীনতা, অধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বিরোধী। ইহা স্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করে ;

৩. এ মতবাদ মানুষের মহত্ত্ব ও উদারতা ইত্যাদি প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে তার নীচতা ও অন্যান্য অসৎ প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় ;

৪. বলপ্রয়োগ মতবাদ যুদ্ধবাদকে সমর্থন করে, তাই এ মতবাদ শান্তি ও মানবতাবিরোধী।

---

১. "Force always disrupts, unless it is made subservient to common will." —MacIver

শক্তি ও সম্মতির যৌথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়। লিণ্ডসে (Lindsay) যথার্থই বলেছেনঃ 'অধিকাংশ আইনই প্রয়োগ করা সম্ভব, কারণ অধিকাংশ লোকই তা চালু রাখতে ইচ্ছুক।' কিন্তু অধিকাংশ লোক কর্তৃক আইন মানা এবং সকল লোকের সকল সময় মানা এক নয়। এর মধ্যে একটু ফাঁক থেকে যায়। ঐ ফাঁকটুকু পূরণের জন্যই শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়।

শক্তি ও সম্মতি রাষ্ট্রের ভিত্তি

চারঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদগুলোর মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি, এটি মানুষের সৃষ্ট একটি সংস্থা—এ বক্তব্য সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদটি খুবই প্রাচীন। মহাভারত, বাইবেল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, রোমান আইন ও প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বক্তব্যে এ মতবাদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্ট (Sophists) পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রকে চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা বলে মনে করতেন। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল ও প্লেটো এ ধরনের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত রোমান আইনের (Roman Law) মধ্য দিয়ে চুক্তি মতবাদের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকে রিচার্ড হুকারের (Richard Hooker) লেখায়ও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রাচীন শাস্ত্রে এই মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও মূলত তিনজন দার্শনিকের লেখার মধ্য দিয়েই এ মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে প্রভুত আলোড়ন সৃষ্টি এবং প্রভাব বিস্তার করেছে। চুক্তিবাদী ঐ দার্শনিকত্রয়ী হলেনঃ ইংরেজ দার্শনিক **টমাস হবস্** (**Thomas Hobbes**) ১৫৮৮-১৬৭৯, **জন লক্** (John Locke) ১৬৩২-১৭০৪ এবং আঠার শতকের ফরাসী দার্শনিক **জাঁ জ্যাক রুশো** (Jean Jackques Rousseau) ১৭১২-১৭৭৮।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি কি করে হল তাই ব্যাখ্যা করেনি; প্রজার সঙ্গে রাজার পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রজার স্বাধীনতার স্বরূপ, শাসকের কর্তৃত্বের সীমা ইত্যাদি নির্দেশ করে এ মতবাদ **রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে**। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মতবাদের তিনজন প্রবক্তা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদকে উপস্থিত করেছেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র চুক্তির ফলে গঠিত হয়েছে। এ তত্ত্বের সারমর্ম হলঃ ক. এমন একদিন ছিল যখন সমাজ বা রাষ্ট্র বলে কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না, মানুষের দ্বারা রচিত কোন আইন ছিল না। মানুষ নিজের ইচ্ছেমত তার জীবনযাত্রা চালনা করত। আদিম মানুষের জীবনের ঐ অবস্থাকে বলা হয় **প্রাকৃতিক অবস্থা** (state of nature)। প্রাকৃতিক অবস্থার **প্রাকৃতিক আইন** (natural law) এবং **প্রাকৃতিক অধিকার** (natural rights) ছাড়া মানুষের তৈরী কোন আইন বা অধিকার ছিল না। খ. প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ সুখী ছিল না। সর্বজন-স্বীকৃত কোন আইন-কানুন না থাকায় নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। ফলে মানুষ 'প্রকৃতির রাজত্ব' বা প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে নিজেদের সৃষ্ট আইন-কানুনের সাহায্যে সমাজ গঠনে আগ্রহী হয়। গ. এই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ, সংঘবদ্ধ ও সুসংযত জীবন যাপনের জন্য তারা চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক অবস্থা, চুক্তি ও রাষ্ট্রগঠন

কিন্তু প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অবস্থা কেমন ছিল, কেন তারা প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে চেয়েছিল এবং কার সঙ্গে কি ধরনের চুক্তি হয়েছিল সে বিষয়ে হবস্, লক ও রুশো ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এঁদের বক্তব্য আলাদা ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

হবসের অভিমত

১৬৫১ সালে প্রকাশিত হবসের **লেভিয়াথান** (*Leviathan*) বই-এ তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, হবসের সময়ে ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল এবং হবস্ ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক।

হবস্ মনে করেন যে, প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় যুগে অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠনের আগে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ খুব দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতো। মানুষের এ দুঃখের কারণ মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ ছিল একা, নিঃসঙ্গ, কুৎসিত, দীন, পাশবিক ও স্বল্পায়ু। হবসের ভাষায় বলা যায়ঃ *The conditions in the state of nature made man's life solitary, poor, nasty, brutish and short*। প্রতিটি মানুষ নিঃসঙ্গ ছিল বলে নিজের স্বার্থ সম্পর্কে প্রত্যেকে খুব সচেতন ছিল। ফলে প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় আমলে স্বার্থ, হিংসা, লোভ ইত্যাদি পাশব প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ পরিচালিত হত। মানুষের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না—মারামারি, কাটাকাটি, জোর-জুলুমের অন্ত ছিল না।

প্রাকৃতিক অবস্থা

এই অবাধ স্বাধীনতায় জীবন অসহ্য হওয়ায় মানুষ প্রকৃতির রাজত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। তখন তারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করে। এই চুক্তিকে অনেকটা এভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ "নিজ নিজ ইচ্ছা মত না চলে আমরা আমাদের অধিকার ও ক্ষমতা বিনা শর্তে একজনের হাতে সমর্পণ করলাম।" প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক অর্পিত এই ক্ষমতাসমষ্টি যাঁর হাতে পেঁছিল তিনিই হলেন সার্বভৌম শক্তি বা রাজা (**He that carrieth this person is called Sovereign and hath sovereign powers**)। এইভাবে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। রাজা কিন্তু চুক্তির অংশীদার নন—তিনি চুক্তির উর্ধ্বে। সুতরাং তাঁর কাজের জন্য প্রজাদের নিকট তিনি কোন কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন। তিনি নিজের ইচ্ছামত প্রজাদের শাসন ও পরিচালনা করবেন। প্রজারা তাঁর শাসন ও দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিতে বাধ্য। রাজার ইচ্ছাই আইন এবং তা সকল সময়ই ন্যায়সংগত। এভাবে হবস্ রাজশক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে অবাধ রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করেন।

লকের অভিমত

রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে যখন ক্রমশ দুর্বল, অসম্মানিত এবং ভেঙ্গে পড়ার মুখে সেই সময়ে রাজতন্ত্রের সমর্থনে হবসের অনমনীয় যুক্তিজালকে মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারল না। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৬৮৮ সালের বিপ্লবকে সমর্থন এবং এর ন্যায্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে লক্ তাঁর **টু ট্রিটিজেস অন্ সিভিল গভর্নমেণ্ট** (*Two Treatises on Civil Government*) নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদকে উপস্থিত করেন।

১৬৮৮ সালের রক্তহীন বিপ্লবের লক্ ছিলেন একজন সমর্থক। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্য দিয়ে লক্ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, শাসিতের সম্মতির ওপরই শাসন স্থিতিশীল। তাই হবসের চরম রাজতন্ত্রের পরিবর্তে লক্ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক ছিল না। তাঁর মতে প্রকৃতির রাজত্বটা খুব খারাপ ছিল না। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ স্বাধীন ছিল, প্রকৃতির নিজস্ব আইন দ্বারা মানুষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত। প্রকৃতিদত্ত কিছু অধিকারও মানুষ ভোগ করত। লকের ভাষায় বলতে গেলে, *The state of nature has a law of nature to govern it*. সুতরাং প্রাকৃতিক অবস্থায় মোটামুটিভাবে মানুষ সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবন যাপন করত।

প্রাকৃতিক অবস্থা

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনটি কারণে প্রকৃতির রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে বলে লক্ মনে করেন। কারণগুলো হলঃ ১. সমাজের ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যমূলক স্বীকৃত আইনের অভাব; ২. সর্ববাদীসম্মত বিচারকের অভাব এবং ৩. ঐ সকল

প্রাকৃতিক আইন সকলকে মানতে বাধ্য করার মত কোন কর্তৃত্ব বা কর্তৃত্বশালী শক্তিকেন্দ্রের অভাব।

সুতরাং লকের মতে জনগণ নিজেদের মধ্যে প্রথম **একটি চুক্তি সম্পাদন করে রাষ্ট্র গঠন করল, তারপরে দ্বিতীয় চুক্তি করে একজনকে রাজা করল।** প্রথম চুক্তির ভাষা এরূপ, "নিজেরা যথেচ্ছ ভাবে না চলে আমরা একটি সংঘবদ্ধ সমাজের ওপর আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কিছু অংশ ছেড়ে দিলাম।" এভাবে প্রকৃতির আইন নিজে ব্যাখ্যা করা এবং সে আইন নিজে প্রয়োগ করার অধিকার মানুষ প্রথম ছেড়ে দিল। অন্যান্য সকল কিছুর অধিকার সে নিজের হাতেই রেখে দিল। দ্বিতীয় চুক্তির ভাষা এভাবে বলা যায়, "আমাদের অধিকার রাজার হাতে সঁপে দিলাম এবং তাঁর অনুশাসন মেনে চলব। কিন্তু শর্ত এই যে, তিনি আইন প্রণয়ন করে আমাদের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা বজায় রাখবেন।" সুতরাং চুক্তির ফলে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হল। লকের মতে রাজা চুক্তির উর্ধ্বে নন—যতদিন তিনি চুক্তির শর্ত মেনে চলবেন, ততদিন তিনি জনগণের সমর্থন পাবেন—অন্যায়কারী রাজাকে প্রজারা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। দেশে রাজা থাকবেন ঠিকই, তবে রাজার শাসনের ক্ষমতার মূল উৎস হ'ল গণসম্মতি। জনসাধারণের সম্মতির ভিত্তিতেই সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের হাতেই থাকে। সুতরাং লক্ তাঁর মতবাদের সাহায্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করেন। হবস্ গণশক্তিকে উপেক্ষা করে রাজশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন—লক্ রাজশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে গণশক্তিকেই প্রাধান্য দিলেন। বস্তুত লক্ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন।

রুশোর অভিমত

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) ১৭৬২ সালে **সামাজিক চুক্তি** (*Contract Social*) নামক গ্রন্থে তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের অনিবার্যতা প্রকাশ করেন।

রুশো মনে করেন যে, প্রাক্‌রাষ্ট্রীয় অবস্থা বা প্রাকৃতিক রাজত্ব ছিল সুখ ও শান্তির, মানুষ ছিল সৎ, সরল ও স্বার্থহীন। আকাশের পাখীর মত মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত জীবন যাপন করত। সে জীবন ছিল আনন্দ ও গৌরবের জীবন। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ায় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে নানা সমস্যা দেখা দিল। মানুষের সরলতা ও সাম্যবোধ কমে গেল। ক্রমে ক্রমে সে আপন ও পর বিচার করতে শিখল—নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ বোধ দেখা দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা শুরু হ'ল—ফলে তারা স্বার্থপর হয়ে উঠল।

প্রাকৃতিক অবস্থা

রুশো মনে করেন, প্রাকৃতিক অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠায় তা থেকে মুক্তির জন্য জনগণ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। চুক্তিটি ছিল এরূপ—"আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে, আমাদের সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হব।" ঐ সমষ্টিগত ইচ্ছাকে রুশো বলেছেন **সাধারণ ইচ্ছা** বা *General Will.*

চুক্তির দ্বারা জনগণ নিজেদের সকল ক্ষমতা 'সাধারণ ইচ্ছা'-র হাতে সমর্পণ করায় তারা কেউই পরাধীন হল না। নিজেদের মিলিত ইচ্ছার কাছে তারা অধীনতা স্বীকার করল। সমষ্টিগত ইচ্ছার ওপরই রুশো সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করেছেন। রুশোর কথিত চুক্তিতে রাজার কোন স্থান নেই। রুশোর মতে জনগণ মিলিত হয়ে চুক্তি করে তাদের সকল অধিকার এক 'যৌথ ব্যক্তিত্বের' হাতে সমর্পণ করল। এভাবে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র। লক্ থেকে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে রুশো তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রের বনিয়াদকে শক্তিশালী করে তুললেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা

সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রথমদিকে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিকের যুক্তিবাদী চিন্তার আক্রমণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচনা করা হয় তা পরপৃষ্ঠায় আলোচনা করা হল :

১. ইতিহাসে চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রগঠনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চুক্তির সাহায্যে ব্যবসায় চালানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্র গঠন করা চলে না। কারণ, রাষ্ট্র অংশীদারী কারবার নয়। সুতরাং বলা যায়, এই মতবাদ অনৈতিহাসিক—এর সমর্থনে ইতিহাসে কোন নজীর নেই।

২. এ মতবাদ অযৌক্তিক। আদিম মানুষের পক্ষে চুক্তি করে রাষ্ট্রস্থাপন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ না ঘটলে রাষ্ট্র গঠন করার প্রশ্ন আসে না। সে চেতনা যখন এলো, তখনই রাষ্ট্র সৃষ্টি হল—বাইরের কোন চুক্তির অপেক্ষায় থাকলো না। তাই বলা যায়, চুক্তির আগেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল—পরে নয়।

৩. যে চুক্তির পিছনে তা রক্ষা করার মত আইন নেই, সে চুক্তির কোন মূল্য থাকতে পারে না।

৪. সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তারা মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছেন। আইন না থাকলে কোন স্বীকৃত স্বাভাবিক অধিকার থাকতে পারে না। সুতরাং যেখানে আইন কার্যকর নয়, সেখানে স্বাভাবিক অধিকারের কল্পনা অযৌক্তিক।

৫. সমাজবিজ্ঞানের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের বিকাশের ধারা গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তির দিকে। কিন্তু এই মতবাদ মনে করে 'প্রাকৃতিক অবস্থার' বিলোপ ঘটিয়ে রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে মানুষ গোষ্ঠী নয়, ব্যক্তি হিসেবে চুক্তি করেছিল। কিন্তু এরূপ অবস্থা কেবলমাত্র সমাজজীবনের কিছুটা অগ্রগতির পরেই সম্ভব।

৬. এ মতবাদে জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে বিপদ আছে। জনমত ভ্রান্ত হতে পারে, সাময়িক উত্তেজনায় পরিচালিত হতে পারে। তার ফলে কথায় কথায় বিপ্লব, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের আশংকা থাকে, যা বাঞ্ছনীয় নয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব জনমতের খামখেয়ালের ওপর নির্ভর করে না।

তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিসেবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। **সামাজিক চুক্তি মতবাদ যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করতে পারেনি—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।**

এর মূল্য

এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সামাজিক চুক্তি মতবাদের যথেষ্ট মূল্য আছে। জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতার ওপরেই রাষ্ট্র গঠিত—এ বাণী প্রচার করে চুক্তিবাদী দার্শনিকরা গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন করেন। এ মতবাদ থেকেই স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী ধ্বনিত হয়। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের দাবির সৃষ্টি রুশোর লেখনী থেকে শুরু হয়। বার্কারের মতে এ মতবাদ থেকে দুটি মূল্যবান নীতির[1] প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ঃ প্রথমত, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত, বলপ্রয়োগ নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি—এই সত্যটির প্রতিষ্ঠা।

পাঁচ ঃ সমষ্টিগত ইচ্ছা (General Will)

রুশোর 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র তত্ত্বটি একই সঙ্গে নিন্দা ও প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে রুশোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'ল 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' তত্ত্ব। রুশোর মতে 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র কাছে সকলে যেমন অধিকার সমর্পণ করল, তেমনি ইহা সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। জনগণের সকল অংশের ইচ্ছার মিলন ঘটেছে বলে ইহা 'সমষ্টিগত' নয়, সাধারণের কল্যাণকর বলেই ইহা 'সমষ্টিগত'। সমষ্টিগত ইচ্ছা জনগণের ইচ্ছার যোগফলও নহে, কারণ জনগণের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সঙ্গে সমষ্টিগত ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই—কেবলমাত্র জনগণের পক্ষে কল্যাণকর ব্যক্তি-ইচ্ছাগুলোর মিলনের যৌথ রূপের মধ্যেই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' নিহিত।[2]

---

১ "...a way of expressing to fundamental ideas or values to which human mind will always cling—the value of liberty or the ideas that will, not force, is the basis of government, and the value of justice, or the right, not might, is the basis of all political society and of every system of political order." —Barker

২ There is often a great deal of difference between the will of all and the General Will, the latter takes account only of the common interest, while the former takes private interest into account and no more than a sum of particular wills.

রুশো মনে করেন যে, 'সমষ্টিগত ইচ্ছা'র কাছে যেহেতু সকলে অধিকার সমর্পণ করল, সেজন্য রাষ্ট্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকার কারও নেই। রুশোর 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' সর্বব্যাপক, সর্বগ্রাসী, সর্বোচ্চ ও সর্বকল্যাণকর। এইভাবে রুশো তাঁর মতবাদে জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করলেন ; যেহেতু সমগ্র জনসাধারণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ এবং উদ্ভব ঘটেছে, সেজন্য সমষ্টিগত ইচ্ছার দায়িত্ব বা তা প্রয়োগের অধিকার জনসাধারণ ছাড়া অন্য কারও ওপর ন্যস্ত থাকতে পারে না। সুতরাং রাজতন্ত্র বা পরোক্ষ গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ আইন প্রণয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' যথাযথভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এবং সত্যকারের নৈতিক স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটতে পারে। **সুতরাং রুশোর মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ।** রুশো মনে করেন যে, আইন হল সমষ্টিগত ইচ্ছার মূর্ত রূপ, এর সঙ্গে স্বাধীনতার কোন বিরোধ থাকতে পারে না। এভাবে রুশো 'স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বে'র (**Liberty and Authority**) ভিতরকার চিরন্তন বিরোধের নিষ্পত্তি করলেন। রুশো ঘোষণা করলেন : 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ' (**Man is born free and everywhere he is in chains**)। মানুষের স্বাধীনতার অধিকার ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থনে রুশোর এই বক্তব্য বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ রণধ্বনি হয়ে পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

অর্থাৎ এক কথায় রুশোর মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই রাষ্ট্রের কাম্যরূপ ; আইনের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত ইচ্ছা মূর্ত হয়ে ওঠে ; আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটে এবং এরূপ অবস্থায় স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না।

সমষ্টিগত ইচ্ছা সম্পর্কীয় রুশোর বক্তব্য খুব বেশী স্পষ্ট ও পরিষ্কার নয়। তিনি সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন সত্য, কিন্তু কি করে এর সন্ধান পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। রুশো স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন। কিন্তু জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে অবাধ, চরম ও নিরংকুশ করার জন্য আইনের বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব ও অবৈধ হয়ে দেখা দিয়েছে। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন, রুশো গণতন্ত্রের পক্ষে সোচ্চার হলেও তাঁর 'সমষ্টিগত ইচ্ছার' মধ্য দিয়ে সামগ্রিকতাবাদী বা 'টোটালিটারিয়ান' (**Totalitarian**) চরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে।[১]

ছয় : হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Points of Agreement and Differences between Hobbes, Locke and Rousseau)

হবস্, লক্ ও রুশো প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ তিনজন দার্শনিকই সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই ঐ ত্রয়ীর মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এঁদের বক্তব্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের বক্তব্যে মৌলিক বৈসাদৃশ্য ও অসঙ্গতিও দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক অবস্থার ব্যাখ্যা ও চুক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হবস্ ও লক্ সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন। রুশো মোটামুটিভাবে উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। নীচে হবস্, লক্ ও রুশোর সামাজিক চুক্তি বিষয়ক মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করা হল।

হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উপলব্ধি করতে হলে তাঁদের সময়ের ঐতিহাসিক পটভূমি জানা প্রয়োজন। হবসের সময়ে ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল। হবস্ ছিলেন রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক। সুতরাং তাঁর *Leviathan* বই-এ চুক্তি মতবাদের ভিতর দিয়ে তিনি চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। লক্

১, "Rousseau's doctrine, though it pays lip-service to democracy tends to be the justifications of totalitarian states."
—Burtrand Russell

১৬৮৮ সালের রক্তহীন বিপ্লবের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। অত্যাচারী রাজার সিংহাসনচ্যুতির যৌক্তিকতা ও বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করে তা সমর্থনের জন্য তিনি তাঁর *Two Treatises on Civil Government* গ্রন্থে চুক্তি মতবাদকে উপস্থিত করেন। ফরাসী দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফরাসী চিন্তানায়ক রুশো তাঁর চিন্তাধারা *Contract Social* গ্রন্থে প্রকাশ করে ফরাসী বিপ্লবের অনিবার্যতা তুলে ধরেন।

প্রাক্-সামাজিক অবস্থা

প্রাক-সামাজিক প্রাকৃতিক অবস্থা, স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে হবস্, লক্ ও রুশোর মতবাদের মধ্যে গভীর বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা করা যায়। হবস্ মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন ছিল বীভৎস, পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী। তাই সে সময় মানুষ দীন, নীচ ও স্বার্থপর জীবন যাপন করত। বাহুবলের নীতির দ্বারাই সাধারণত প্রাক-সামাজিক যুগের মানুষ নিয়ন্ত্রিত হত। লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় শান্তি ও শুভেচ্ছা বিরাজ করত এবং ঐ অবস্থা ছিল কল্যাণকর। প্রাক্-সামাজিক অবস্থার মানুষকে লক্ আত্মসর্বস্ব ও অসামাজিক মনে করতেন না। বরং মানুষ স্বাধীন, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত। রুশো প্রাকৃতিক অবস্থাকে মর্ত্যের স্বর্গ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বজায় রেখে বসবাস করত।

চুক্তির সংখ্যা

চুক্তির প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে হবস্ বলেছেন চুক্তি হয়েছিল **একটি**। ঐ চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে তাদের সকল অধিকার বিনা শর্তে সমর্পণ করে, কিন্তু রাজা চুক্তির অংশীদার ছিলেন না। লকের মতে চুক্তি হয়েছিল **দুটি**—একটি সামাজিক এবং অপরটি রাজনৈতিক। প্রথমে সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং পরে রাজনৈতিক চুক্তির দ্বারা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। লকের মতে রাজা চুক্তির অংশীদার। রুশো মনে করতেন যে, চুক্তি হয়েছিল **একটি**। ঐ চুক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তি সমষ্টির হাতে সকল অধিকার সমর্পিত হয়। রুশো ঐ চুক্তিকে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হবসের অভিমত হল এই যে, সার্বভৌম শক্তি অবাধ, চূড়ান্ত, অপ্রতিহত, আদি এবং অপরিসীম। রাজাই একমাত্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী এবং সার্বভৌম শক্তির (রাজার) আজ্ঞাই আইন। লকের মতে সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য নয়। যদিও সরকার এর ব্যবহার করেন, কিন্তু মূলত তা জনগণের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। রুশো নিরঙ্কুশ সার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে রাজা বা সরকার সার্বভৌম শক্তির অধিকারী নন—এর অধিকারী সক্রিয় সমগ্র জনতা। রুশোর দৃষ্টিতে আইন হল সমষ্টিগত কল্যাণ-কর ইচ্ছার প্রকাশ।

শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হবস্ ছিলেন অবাধ রাজতন্ত্রের প্রবল সমর্থক—তাই স্টুয়ার্ট রাজবংশের স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি সমর্থন করেছেন। লক্ ছিলেন সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং তাঁর ঐ মতবাদের সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের নায্যতা প্রমাণ করেন। রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সমর্থন করেন। তিনি তাঁর এই মতবাদের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা জোগান।

অধিকার

মানুষের অধিকার সম্পর্কে হবসের ধারণা ছিল খুবই সীমিত। কোন অবস্থাতেই মানুষ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না। সুতরাং হবসের মতবাদ অনুযায়ী একমাত্র আইন প্রদত্ত অধিকার ও আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া জনগণের আর কোন অধিকার অবশিষ্ট ছিল না। লক্ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে রাজা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করার আইন-সঙ্গত অধিকার জনসাধারণের আছে। লকের মতে চুক্তি সত্বেও জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতার অধিকার জনগণের থেকে গেল। রুশোর মতবাদ অনুযায়ী স্বাধীনতা ও সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্র সৃষ্টি দ্বারা স্বাভাবিক অধিকারের কোন হানি ঘটেনি। রুশোর মতে 'সমষ্টিগত ইচ্ছা' সরকারকে পরিবর্তন করতে পারে।

হবস্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। কিন্তু লক্ ও রুশো রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। হবস্, লক্ ও রুশো এই তিনজন দার্শনিকই চুক্তি মতবাদের মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনজন দার্শনিকই সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রচার করে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টিকারী ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের মূলে চরম কুঠারাঘাত করেছেন।

রাষ্ট্র ও সরকার

সাত : রুশো হবস্ ও লকের মিলন ঘটিয়েছেন (Rousseau combines Hobbes and Locke)

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা রুশোর বক্তব্য বিশ্লেষণ করে অনেকে বলেন যে, তিনি হবস্ ও লকের চিন্তাধারা ও তত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছেন। আর একটু পরিষ্কার করে মত ব্যক্ত করে অনেকে বলেন যে, হবসের যুক্তি ও লকের সিদ্ধান্তকে যুক্ত করে রুশো তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থিত করেছেন (Rousseau combines the premises of Hobbes with the conclusions of Locke)। সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে হবস্, লক ও রুশোর ভাষ্য আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, হবস্ ও লকের বক্তব্যের ভিতর যতটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে, রুশোর ভাষ্য তার সঙ্গে ততটা বৈসাদৃশ্যমূলক নয়। বস্তুতপক্ষে হবস্ ও লকের ভাষ্য পরস্পর বিরোধী, কিন্তু রুশোর বক্তব্যের সঙ্গে কিছু পরিমাণে হবসের এবং কিছু পরিমাণে লকের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও, রুশো, হবস্ ও লকের বক্তব্যের মিলন ঘটিয়েছেন—এই বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে প্রতীয়মান হতে পারে। কারণ, যদিও লক ও রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে একটি মিলনসূত্র আবিষ্কার করা কষ্টকর নয়, কিন্তু অবাধ রাজতন্ত্রের ভাষ্যকার হবসের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের চারণকবি রুশোর ভিতর মিল খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। মনে রাখতে হবে, যে মিলনের কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক অবস্থা বা সামাজিক চুক্তির মিল নয়—তা আরও গূঢ় তত্ত্বগত মিল।

এই তত্ত্বগত মিল আলোচনা করার আগে দেখানো যেতে পারে যে, রুশো কিভাবে প্রাকৃতিক অবস্থা বা সামাজিক চুক্তি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হবস্ ও লকের চিন্তাধারার মধ্যে সেতু রচনা করলেন। প্রথমত, হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থাকে বীভৎস, পাশবিক ও স্বল্পস্থায়ী বলে বর্ণনা করেছেন। লক্ এর বিরোধিতা করে একে শান্ত ও কল্যাণকর বলেছেন। **রুশো যদিও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে লকের বক্তব্য সমর্থন করলেন, তবু তিনি স্বীকার করলেন যে, সম্পত্তির উদ্ভব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাকৃতিক অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে হবস্ বর্ণিত অবস্থার সম্মুখীন হয়।**

দ্বিতীয়ত, চুক্তির প্রকৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, **রুশো একদিকে যেমন হবসের মত একটি চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সমর্থন করেন, তেমনি লকের দ্বিতীয় চুক্তিকে** (যার দ্বারা জনগণ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল) **সরাসরি চুক্তি বলে অভিহিত না করে তাকে 'আইন প্রণয়ন' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন।**

তৃতীয়ত, 'স্বাধীনতা' ও 'অধিকার' সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, হবস্ মনে করেন শাসকের আইন দ্বারা স্বীকৃত স্বাধীনতাটুকুই জনগণ শুধু ভোগ করতে পারে। লকের মতে এটা যথেষ্ট নয়, এর দ্বারা স্বাধীনতা সীমিত হয়। রুশো যদিও স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, তথাপি তিনি মনে করতেন যে, আইনের মধ্য দিয়েই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রকাশ সম্ভব। **অর্থাৎ রুশোর মতে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই।** এভাবে হবস্ ও লকের চিন্তাধারার মধ্যে রুশো মিলন ঘটান।

কিন্তু তত্ত্বগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এই যে, রুশো হবসের কাছ থেকে সার্বভৌমত্বের ধারণা গ্রহণ করলেন। হবসের মতে এই সার্বভৌমত্বের প্রতিকূলে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই। সার্বভৌমের কাছে সকলকে বিনা দ্বিধায় আনুগত্য জানাতে হবে। সার্বভৌম শক্তি সকল চুক্তি ও সকল অধিকারের ঊর্ধ্বে। হবসের ঐ সার্বভৌমিকতার তত্ত্বকে রুশো সামগ্রিকভাবেই গ্রহণ

করেছেন। হবসের মত রুশোও বিশ্বাস করেন যে সার্বভৌমত্ব এক, অবিভাজ্য, চরম, সর্বশক্তিমান এবং চূড়ান্ত শক্তি। কিন্তু এদের ভিতর ঐ মিল থাকা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, এক জায়গায় এদের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। হবস্ সার্বভৌমত্বের অধিষ্ঠান দেখেছিলেন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে। রুশো এর পরিবর্তে সব নাগরিকের সমষ্টিগত ইচ্ছাকে সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে রুশো হবস্‌কে বর্জন করে গ্রহণ করেন লক্‌কে। লক্ মনে করতেন যে, চুক্তি ভঙ্গকারী শাসককে অপসারণের অধিকার জনগণের আছে। এভাবে **হবস্ ও লকের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মিলন ঘটিয়ে রুশো জনসাধারণের সার্বভৌমিকতার তত্ত্বের কথা বললেন।** রুশোর হাতে জনসাধারণের সার্বভৌমিকতা সমষ্টিগত ইচ্ছার রূপ গ্রহণ করল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, রুশো হবসের কাছ থেকে সার্বভৌমত্বের তত্ত্বটি গ্রহণ করে লকের জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে তাকে সমষ্টিগত ইচ্ছায় পরিণত করেন।

সুতরাং হবস্, লক্ ও রুশোর চিন্তার ভিতর পারস্পরিক অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য থাকলেও রুশোর মতবাদে হবসের তত্ত্ব ও লকের সিদ্ধান্তের কিছুটা পরিমাণে মিলন ঘটেছে।

আট ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিষেধক (Social Contract is the chief antidote to Divine Origin Theory)

সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে একান্তভাবেই মানুষের তৈরী একটি সামাজিক সংস্থা হিসেবে মনে করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অতীতে মানুষের দ্বারা চুক্তির ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। নিজেদের প্রয়োজনেই মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য কোন অলৌকিক শক্তির অবদান স্বীকার করেন না। তাঁদের এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গূঢ় ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল থেকে মুক্ত করে নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে ঐশ্বরিক মতবাদ ঘোষণা করে যে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ব্যাখ্যা কর এই মতবাদ ঘোষণা করে যে, রাজার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকর হয়। কারণ রাজা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অভিন্ন। যেহেতু রাজার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় সেজন্য রাজার ইচ্ছাকে বিনা শর্তে মান্য করা উচিত। এভাবে এই মতবাদ সকল যুক্তি-তর্ক অস্বীকার করে কল্পনা ও সংস্কারের এক বিচিত্র জটাজালে চিন্তাকে আচ্ছন্ন করল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিল সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তারা ঐশ্বরিক মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিপ্রস্তরকে অপসারণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে **রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি—রাষ্ট্র মূলত মানুষের প্রয়াস থেকে উদ্ভূত একটি মানবিক সংগঠন।** এদের এ ঘোষণা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করল—ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর সম্পর্কিত কূট ব্যাখ্যার উপর রাষ্টের উৎপত্তি আর নির্ভরশীল থাকলো না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে আলাদা করে চুক্তিবাদী দার্শনিকেরা ঘোষণা করলেন যে, রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাজার কোন ভূমিকা বা অবদান নেই, রাজতন্ত্রই একমাত্র ঈশ্বর অনুমোদিত শাসন পদ্ধতি নয় এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে দাবী করতে পারে না। লক্ ও রুশো আর একটু অগ্রসর হয়ে এ মত ব্যক্ত করলেন যে, রাজা তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করলে প্রজাদের বিদ্রোহ ও প্রতিকার করার অধিকার থাকবে, কারণ রাজার ক্ষমতা প্রজাদের স্বাধীনতা ও সম্মতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁরা এ কারণেই মনে করেন যে, রাজা ঈশ্বরের কাছে তাঁর কাজের জন্য দায়ী নন—তিনি তাঁর কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের কাছে দায়ী।

সামাজিক চুক্তি মতবাদকে কেন্দ্র করে এ ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে উঠল যে, ঈশ্বর একের পর এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তাঁর এক-একজন প্রতিনিধির (রাজা) হাতে তা সমর্পণ করেননি। সুতরাং রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রজাপীড়ন চুক্তিবাদীদের যুক্তির আঘাতে দুর্বল হয়ে উঠল। এর ফলে এ মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে রাজার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার দাবীতে বিপ্লব আরম্ভ হল। এভাবে রাজার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার

নীতি ও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের তত্ত্ব ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। সুতরাং বলা যেতে পারে, **সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রচিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে ঐশ্বরিক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।**

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামাজিক চুক্তির অন্যতম প্রবক্তা হবস্ ঈশ্বরের ভূমিকা ও কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেননি, বরং তিনি অবাধ রাজতন্ত্রের সমর্থন করেছেন এবং ধর্ম ও রাজার কাজের মধ্যে একটি সীমারেখা নির্দেশ করে রাজাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, হবস্ অবাধ রাজতন্ত্রকে স্বীকার করলেও তিনি যখন বললেন যে প্রজাদের ইচ্ছার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং তাদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এ চুক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে অবাধ রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করলেন। ঐ আঘাতকে আরও প্রসারিত করে লক্ ও রুশো ঐশ্বরিক মতবাদকে ভিত্তিচ্যুত করেন। সুতরাং ঐশ্বরিক মতবাদকে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত করার ব্যাপারে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরাট অবদান রয়েছে। **'ঈশ্বরদত্ত অধিকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্বহীন ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের ধ্যান ধারণাকে পরিবর্তন করতে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রভূত সাহায্য করেছে'**— ম্যাকআইভারের এ বক্তব্যকে যথার্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

নয়ঃ সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব (Practical Importance of Social Contract Theory)

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যার ব্যাপারে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেও এ মতবাদের বাস্তব মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হবস্, লক্ ও রুশোর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এমন কতকগুলি তত্ত্ব, তথ্য ও আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অমূল্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধিশালী করেছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, এর দ্বারা এ মতবাদের বাস্তব গুরুত্ব ম্লান হয়নি। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এ মতবাদ যদিও মূল্যহীন, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যে সকল মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থিত করে এ মতবাদ বাস্তব গুরুত্ব লাভ করেছে তা এবার আলোচনা করা হল। প্রথমত, **বর্তমানে সার্বভৌমিকতার যে ধ্যান-ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়, তা মূলত সামাজিক চুক্তি মতবাদের অবদান।** হবস্ এ চুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে আইনসঙ্গত সার্বভৌমিকতার (Legal Sovereignty) তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ উপস্থিত করেন রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে (Political Sovereignty) এবং রুশোর লেখার মধ্য দিয়ে জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty) মূর্ত হয়ে উঠে। সার্বভৌমিকতার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব মূলত চুক্তি মতবাদকে আশ্রয় করে বিকাশলাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, চুক্তি মতবাদের মহত্তম কীর্তি হল এই যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ধর্মতত্ত্বের জটিল জটাজাল থেকে মুক্ত করে এ মতবাদ ঐশ্বরিক মতবাদের ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রকল্পনার অবসান ঘটায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঘোষণা করল, প্রজার ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি—ঐশ্বরিক উপাদান রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বাইবেলের কুট ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নতুন ধারায় প্রবাহিত করল।

তৃতীয়ত, **সামাজিক চুক্তি মতবাদ অবাধ রাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিপ্রস্তরকে অপসারিত করে গণতন্ত্রের কেতন ওড়ায়।** লক্ ও রুশো প্রত্যক্ষভাবেই রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, শাসনকর্তা যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে জনগণ তাকে পরিবর্তন করার অধিকারী। হবস্ যদিও অবাধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু 'প্রজার ইচ্ছার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি'—তাঁর এই

স্বীকৃতি রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। বস্তুত সামাজিক চুক্তি মতবাদের মাধ্যমেই স্বীকার করা হল যে, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল প্রজার সম্মতি। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হল গণতন্ত্রের আদর্শ এবং মানুষের অধিকারের বাণী।

চতুর্থত, **রাজার ঈশ্বরদত্ত অধিকারের তত্ত্বের প্রধান প্রতিষেধক (chief antidote)** হিসেবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করায় সংস্কারমুক্ত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হল।

পঞ্চমত, **সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে** এ মতবাদ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

ষষ্ঠত, বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, **গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে এ মতবাদের বিশেষ অবদান রয়েছে।** রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সহযোগিতা ও সম্মতির ওপর ইহা স্থাপিত—এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছে। শাসকের ক্ষমতা সীমিত ও নির্ধারিত করে এবং শাসিত জনগণের সম্মতিকে প্রাধান্য দিয়ে এ মতবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করেছে।[১] বস্তুত সামাজিক চুক্তি মতবাদকে গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার অগ্রদূত বলে অভিহিত করা যায়।

সপ্তমত, **এ মতবাদের মধ্য দিয়ে 'স্বাধীনতা' ও 'ন্যায়'-এর আদর্শ প্রকাশ লাভ করেছে।** বার্কারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, চুক্তিবাদের যুক্তির মধ্যে দুটি মৌলিক ধারণা প্রকাশ পেয়েছে যার প্রতি মানুষের চিন্তা সকল সময় দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকবে। এ ধারণা দুটি হচ্ছে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের আদর্শ।[২] বস্তুত ঐ আদর্শ থেকেই স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, মানুষের অধিকার, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি ধ্যান-ধারণার আত্মপ্রকাশ ও প্রসার ঘটে। এই মতবাদের প্রভাবে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী শাসনের অবসান এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রেরণা দিয়েছিল।

সুতরাং চুক্তি মতবাদ একদিকে তত্ত্ব ও আদর্শগত অবদান দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পুষ্ট করেছে এবং অন্যদিকে এই চুক্তি মতবাদের আদর্শ পৃথিবীর বুকে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে পুরাতন, জরা-জীর্ণ সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজকে নতুন বৈপ্লবিক খাতে প্রবাহিত করেছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের এই বাস্তব গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

দশ ঃ ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Historical or Evolutionary Theory)

ডঃ গার্নার (Dr. Garner) বলেছেন ঃ "রাষ্ট্র ঈশ্বরসৃষ্ট সংস্থা নয়, ইহা বলপ্রয়োগের ফল-শ্রুতিও নয়, সম্মেলন বা কোন গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতেও এর সৃষ্টি হয়নি, পরিবারের সম্প্রসারণের ভিতর দিয়েও এর জন্ম হয়নি।[৩] অর্থাৎ ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি মতবাদ কোনটাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও অনুশীলনের ভেতর দিয়ে এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে যে, রাষ্ট্রের জন্মের কোন সরল সূত্র নেই। নানাবিধ জটিল উপাদানের মিশ্রণে, ক্রম বিকাশের পথে বিবর্তনের ধাপে ধাপে তমসাচ্ছন্ন আদিম ব্যবস্থা থেকে আধুনিক রাষ্ট্র বর্তমান রূপ

---

১. "The Contract Theory, however,......served a useful purpose in its day by providing a weapon for combating irresponsible rules and justification for resistance to tyranny."
—Garner

২. "It was a way of expressing two fundamental ideas or values to which human mind will always cling—the value of liberty and the value of justice:"
—Barker

৩. "The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family."
—Garner

পরিগ্রহ করেছে। বার্জেস যথার্থই বলেছেন, রাষ্ট্র হল মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ফল।[১] রাষ্ট্র যে মানব সমাজের বিবর্তনের ফল এ কথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতির কোলে জন্মলাভ করে মানুষকে বেঁচে থেকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, জৈবিক প্রেরণায় বংশ বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এই নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সভ্য রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। এই নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ তথা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি গবেষণার ফলে **রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে এ মতবাদকে গ্রহণ করেছেন।**

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ রাষ্ট্রকে মানব সমাজের ক্রমপ্রগতির ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। আদিম যুগ থেকে শুরু করে এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বহুবিধ উপাদানের জটিল মিশ্রণে, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের আদিম অবস্থা থেকে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের সচেতন ইচ্ছা ও কার্যপ্রণালীর ভিতর দিয়ে এ বিবর্তন কার্যকর হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে তার অজ্ঞাতে সমাজজীবনে নানা রূপান্তর ঘটেছে এবং ঐ রূপান্তরের ভেতর দিয়েই আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব। সমাজজীবনের ঐ রূপান্তর ও বিবর্তনের ব্যাপারে যে উপাদানগুলির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা হল :

ক. রক্তের সম্পর্ক (**Kinship**)
খ. ধর্মের বন্ধন (**Religion**)
গ. আর্থনীতিক প্রয়োজন (**Economic need**)
ঘ. আত্মরক্ষার তাগিদ, শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার (**Force**)
ঙ. রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (**Political consciousness**)

এবার প্রতিটি উপাদান নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হল।

ক. রক্তের সম্পর্ক

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের প্রকৃতির মধ্যেই রাষ্ট্র গঠনের বীজ নিহিত ছিল বলে বিবর্তনমূলক মতবাদ বিশ্বাস করে। আর ঐ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের সবচেয়ে বড় যোগসূত্র ছিল রক্তের সম্পর্ক বা পারিবারিক সংগঠন। প্রকৃতি ও জৈবিক প্রেরণার দ্বারা পুরুষ ও নারী মিলিত হয়ে বংশ সৃষ্টি করে। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাঁচিয়ে বড় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দায়িত্ব প্রধানত এসে পড়ে নারীর ওপর। কিন্তু শুধুমাত্র এ দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট নয়, জীবন সংরক্ষণের জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তান লালন-পালনের ভেতর দিয়ে পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটা নৈকট্যবোধ জাগ্রত হয়। পরিবারস্থ সকলে একই পুরুষ থেকে উদ্ভূত—এ বোধ ঐ নৈকট্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। তবে প্রাচীন সমাজে দত্তক পুত্র গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত ছিল বলে কোথাও কোথাও রক্তের সম্পর্কের ধারণা ছিল একান্তই কৃত্রিম। যাহোক এভাবে রক্তের সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবার গঠন করে পারিবারিক জীবন যাপনে এবং নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করে সন্তান-সন্ততি প্রতিপালনে উৎসাহিত করেছিল।

বংশবৃদ্ধির ফলে পরিবার যখন সম্প্রসারিত হয় তখনই তা থেকে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠী (**Clan**), উপজাতি (**Tribe**) ও জাতি (**Nation**)। কারণ, পরিবারের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে বিরাট পরিবারের ওপর অখণ্ড কর্তৃত্ব বা শাসন বজায় রাখা সম্ভবপর হল না।

---

১. "The state is a continuous development of human society out of a grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind." —Burgess

স্বভাবতই পরিবার তাই গোষ্ঠী ও উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু ঐ বিভক্ত গোষ্ঠী এবং উপজাতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন থাকলো। এভাবে রক্তের সম্পর্ক মানুষের ভিতর ব্যাপক নৈকট্য স্থাপন করে রাষ্ট্র স্থাপনের একটি মূল্যবান উপাদান সৃষ্টি করল। রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে কিভাবে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে ম্যাকআইভার (Maciver) সুন্দরভাবে বলেছেন যে, পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ব্যাপক সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে রূপান্তরিত হল। পারিবারিক কর্তৃত্ব গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্বে পরিণত হল। এভাবে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র—প্রথমে গঠিত হল সমাজ এবং সমাজ গঠনের পরে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র।

খ. ধর্মের বন্ধন

রক্তের সম্পর্কের মত ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রের বিবর্তনের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করায় ধর্মের বন্ধন রাষ্ট্র সৃষ্টির আর একটি মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশেষ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রক্তের বন্ধন যখন শিথিল হল, ধর্মীয় বন্ধনই তখন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। উইলসনের (Wilson) ভাষায় বলা যায়—'ধর্ম ছিল রাষ্ট্রের বন্ধনের চিহ্ন ও প্রতীক। ইহা ঐক্য, পবিত্রতা ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।'[১] আদিম সমাজে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ায় ঐ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ধর্মই ঐক্য স্থাপনে সাহায্য করে। যারা নিজেদের একই পুরুষ থেকে উদ্ভূত মনে করত, তারা একত্র হয়ে সময় সময় পূর্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি প্রদান করত। এক একটি গোষ্ঠীভুত সকলের বংশধারা এক—এই বোধ গোষ্ঠীজীবনে ঐক্য সৃষ্টি করলো। এ ছাড়া ঝড়, জল, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপর্যয়কে প্রাচীনকালে লোকে খুব ভয় করত। এক শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক (Magician) অতি-প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে এদের শান্ত করতে পারে বলে দাবী করত। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ কিছুটা ভয়ে, কিছুটা শ্রদ্ধায় ওদের মান্য করতে শুরু করে। কোন কোন স্থানে এরা রাজশক্তি পর্যন্ত পরিচালনা করতে আরম্ভ করে। কোথাও বা ধর্মমন্দিরে একই উপাসনায় রত লোকদের ভিতর ঐক্য দেখা গেল। এভাবে ধর্মবোধ মানুষের সমষ্টিগত বন্ধন ও ঐক্য বাড়িয়ে তাদের আজ্ঞানুবর্তী হতে শেখাল।

গেটেল (Gettell) যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক ক্রম বিকাশের আদিমতম ও সবচেয়ে সংকটময় যুগে একমাত্র ধর্মই বর্বরতম অরাজকতাকে দমন করে মানুষকে শ্রদ্ধার মনোভাব ও আনুগত্য শিখিয়েছিল।[২] কিছুদিন আগেও মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল ব্যাপক। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না যে, রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক যুগে যখন যুক্তিবোধহীন মানুষের কাছে ধর্মীয় প্রভাব ছিল সর্বগ্রাসী, তখন ঐ ধর্ম মানুষের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কী বিরাট অবদান সৃষ্টি করেছিল।

গ. আর্থনীতিক প্রয়োজন

সকল রকম প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু বাঁচার জন্য খাদ্য থেকে শুরু করে নানারকম পার্থিব জিনিস মানুষের প্রয়োজন হয়। ঐ সকল জিনিস মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়, যূথবদ্ধভাবে কোন এক বা একাধিক নায়কের নেতৃত্বে তারা সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করত। এর জন্য প্রয়োজন হতো নায়কের প্রতি বশ্যতা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও তার নির্দেশ পালন করা। এইভাবে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের আর্থনীতিক ব্যবস্থার আরও উন্নত রূপের ভিতর দিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়। কারণ আর্থনীতিক প্রয়োজনের একটা বিশেষ স্তরে সম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে পণ্য বিনিময়, সম্পত্তির মালিকানা রক্ষা, ধনবৈষম্য ইত্যাদি জটিল পদ্ধতি ও সমস্যার সূত্রপাত ঘটল। একদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষার জন্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, অন্য দিকে বহিঃশত্রুর

---

১. "Religion was the seal and sign of common blood, the expression of oneness, its sanctity, its obligations." —Wilson

২. "In the earliest and most difficult periods of political development, religion alone could subordinate barbaric anarchy and teach reverence and obedience." —Gettell

আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য বলিষ্ঠ সংগঠন গঠন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল। শ্রমবিভাগ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক স্বার্থ সংঘাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন ও শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবে আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে ক্রমবিকাশের পথে রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করলো।

ঘ. আত্মরক্ষার তাগিদে শক্তির সংগঠন ও ব্যবহার

সমাজবিবর্তনের প্রথম থেকেই আত্মরক্ষার তাগিদে শক্তির সংগঠন ও তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আদিম যুগে মানুষকে শক্তির সাহায্যে শিকার করে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে, আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করতে দেখা গিয়েছে, গোষ্ঠীপতির নির্দেশকে কাজে পরিণত করার জন্যও তাকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য গোষ্ঠী বা অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে শক্তির আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। আত্মরক্ষার তাগিদে এবং বাঁচার সংগ্রামে ঐ শক্তি প্রয়োগ গোষ্ঠীপতি বা উপজাতির নেতার নির্দেশেই পরিচালিত হত বলে ঐ সকল গোষ্ঠীপতি বা নেতাদের ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাদের নেতৃত্বাধীনে সমাজের উদ্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত বক্তব্য "যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজার সৃষ্টি" (War begot the king) স্মরণ করা যেতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রগঠনের ব্যাপারে শক্তির ব্যবহারের বা বল প্রয়োগের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এবং তাই এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ঙ. রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বলতে এমন একটি ধারণা বোঝায় যার দ্বারা মানুষ নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক বোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়। প্রাক্ সামাজিক যুগের প্রাথমিক স্তরে মানুষের ভেতর ঐ চেতনা জাগ্রত হয়নি, কিন্তু জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি এবং সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ চেতনা ক্রমশ দেখা দিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্র ঐ উপলব্ধির পরিণতি। জীবন ধারণের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের মধ্যে প্রথমে যে চেতনা দেখা দেয়, রাষ্ট্রের ভেতর দিয়েই কালক্রমে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। তাই রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মূল্য অপরিসীম।

মূল্যায়ন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, **কোন একদিনে আকস্মিকভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি—এর পিছনে রয়েছে যুগ-যুগান্তরের বিবর্তন।** রক্তের বন্ধন, ধর্মের সম্পর্ক, আর্থনীতিক প্রয়োজন, আত্মরক্ষার তাগিদে শক্তির সংগঠন, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ইত্যাদি উপাদানের সমবায়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট আকার থেকে বিবর্তিত হয়ে ক্রমশ রাষ্ট্র বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদকে রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে স্বীকার করা যায়। এই মতবাদ কোন রকম কাল্পনিক ধ্যানধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বাস্তবকে ভিত্তি করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কেবলমাত্র এ মতবাদেই দেখতে পাওয়া যায়। সমাজবিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এর আগে রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদগুলো আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো শুধুমাত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির এক একটি উপাদানকে গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য উপাদানকে অস্বীকার করেছে। তাই ঐ মতবাদগুলো রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেনি। যেমন ধর্মকে একমাত্র উপাদান মনে করে 'ঐশ্বরিক মতবাদ'-এর সৃষ্টি হয়েছে বা শক্তির সংগঠন ও ব্যবহারকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়ে 'বলপ্রয়োগ মতবাদ'-এর আবির্ভাব ঘটেছে বা শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাকে গ্রহণ করে 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'-এর উদ্ভব হয়েছে বা একমাত্র রক্তের সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 'পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক' মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনবাদী মতবাদই একমাত্র তত্ত্ব যা রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে যে সকল উপাদান আছে তাদের ওপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্র সৃষ্টির বিজ্ঞান, যুক্তি ও

ইতিহাসসম্মত বক্তব্য উপস্থিত করেছে। তাই সকল দিক থেকে বিচার করে **ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে রাষ্ট্র সৃষ্টির অভ্রান্ত মতবাদ বলে গ্রহণ করা যায়।**

এগার ঃ অতিরিক্ত আলোচনা ঃ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ[১] (The Patriarchal and Matriarchal Theory)

পিতৃতান্ত্রিক-মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ মনে করে যে, পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। কতকগুলো পরিবারকে নিয়ে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে একটি উপজাতি বা সম্প্রদায় গড়ে উঠে, কয়েকটি উপজাতি বা সম্প্রদায় একত্র হয়ে জাতি গড়ে তোলে, কালক্রমে ঐ জাতি থেকেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

স্যার হেনরি মেইনের মতে আদিম মানব-পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত ছিল। পরিবারের কর্তা ছিলেন সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির ওপরে তার অবাধ কর্তৃত্ব ছিল। তার নির্দেশেই গোটা পরিবার পরিচালিত হত। ঐ পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে যখন গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল তখন গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন গোষ্ঠীপতি (Patriarch)। এইভাবে কতকগুলো গোষ্ঠী মিলিত হয়ে যখন রাষ্ট্র গঠিত হল, তখন পিতৃপুরুষদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ, তিনিই হলেন রাষ্ট্রনায়ক। আরিস্টটল তাঁর 'পলিটিকস্' বই-এ বলেছেন যে, পরিবার হতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে—বর্তমানে অনেকে এই বক্তব্য স্বীকার করেন না। ইতিহাসেও এর সমর্থনে কোন নিদর্শন নেই।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিম পরিবারগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ স্ত্রীলোককে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছিল। পুরুষের পরিবর্তে নারীই ছিল পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী। প্রাচীনকালে মানবসমাজে মা ছিল সন্তান-সন্ততিদের অভিভাবিকা। মায়ের পরিচয়ে সন্তান-সন্ততিদের পরিচয় দেয়া হত। এখনও অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠনের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐভাবে মাতৃসম্পর্ক ধরে জাতি নির্ণয় করার রীতি প্রচলিত ছিল। এ মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল।

নমুনা প্রশ্ন

1. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলি কি কি ? (এক দেখ)
2. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ আলোচনা কর। এর বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি কি ? (দুই দেখ) [T. S. B. '81]
3. "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি"—এই মতবাদটি কতদূর গ্রহণযোগ্য ? যুক্তিসহ আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. B. '84]
4. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদ আলোচনা কর। মতবাদটির মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি ? (তিন দেখ) [H. S. C. '80, '82]
5. "পশুশক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে"—এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য কিনা আলোচনা কর। (তিন দেখ)
6. "শক্তিপ্রয়োগ নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি"—আলোচনা কর। (তিন দেখ) [T. S. B. '82]
7. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর। (চার দেখ) [H. S. C. '78]
8. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলি আলোচনা কর। (চার দেখ) [H. S. C. '81 এবং '83 ; T. S. B.]
9. রুশোর সাধারণ ইচ্ছা সম্পর্কে টীকা লেখ। (পাঁচ দেখ) [T. S. B. '81]

---

১. এই মতবাদটি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল মতবাদের সঙ্গে যাতে পরিচিত হওয়া যায় তার জন্য সংক্ষেপে এই মতবাদটি তুলে ধরা হল।

10. হবস্, লক্ ও রুশোর বক্তব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। (ছয় দেখ)
11. সামাজিক চুক্তি মতবাদের স্থায়ী অবদানগুলি আলোচনা কর। (নয় দেখ)
12. "রুশো হবস্ ও লকের মিলন ঘটিয়েছেন" আলোচনা কর। (সাত দেখ)
13. প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে টীকা লিখ। (চার দেখ) [T. S. B '79]
14. "ঐশ্বরিক মতবাদের প্রতিষেধক হল সামাজিক চুক্তি মতবাদ"—আলোচনা কর। (আট দেখ)
15. সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে হবসের বক্তব্য আলোচনা কর। (চার দেখ)
16. হবস্, লক্ ও রুশো বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থা আলোচনা কর। (চার দেখ)
17. প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে হবসের বক্তব্য আলোচনা কর। (চার দেখ)
18. সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে লকের বক্তব্য কি ? (চার দেখ)
19. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। এই মতবাদ সম্পর্কে তোমার মতামত লিখ। (দশ দেখ) [H. S. C. '79, '81 এবং T. S. B. '79]
20. "রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হল ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ"—আলোচনা কর। (দশ দেখ)
21. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির কোন মূল্য আছে কি ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। (দশ দেখ) [H. S. C. '83]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. "রাষ্ট্রের ভিত্তি গণ-ইচ্ছার উপর স্থাপিত, বল-প্রয়োগে নয়"—এ উক্তি করেছেন (রুশো, হেগেল, গ্রীন)।
2. একজন চুক্তি মতবাদী দার্শনিকের নাম (হবস্, লক্, রুশো, মার্কস)
3. রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে লেখা বই-এর নাম (পলিটিকস্, লেভিয়াথান, সামাজিক চুক্তি) [H. S. C. '80]
4. (হেগেল, রুশো, হবস্) 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির প্রবক্তা [H. S. C. '84]
5. (রিপাবলিক, লেভিয়াথান, সামাজিক চুক্তি) পুস্তকটি হবস্ লিখেছেন।
6. (হবস্, লক, রুশো) লেভিয়াথান গ্রন্থের লেখক। [H. S. C. '79]
7. (হবস্, লক্, রুশো) 'সরকার সংক্রান্ত দুটি চুক্তি' গ্রন্থ লিখেছেন। [T. S. B. '79]
8. "সমষ্টিগত ইচ্ছা" তত্ত্বটির প্রবক্তা (হবস্, গ্রীন, রুশো)।
9. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশের সহায়তা করেছে (বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, বিবর্তনমূলক মতবাদ)।
10. লকের মতে চুক্তি হয়েছিল (একটি, দুটি, তিনটি)।
11. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ একটি (বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক) মতবাদ। [H. S. C. '81]
12. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র (ঈশ্বরের সৃষ্টি, চুক্তির দ্বারা সৃষ্টি, মানব সমাজের বিরতিহীন ক্রমবিকাশের ফল) [H. S. C. '82]
13. রাষ্ট্র (সামাজিক চুক্তির, বিবর্তনের) ফলশ্রুতি।
14. রুশো (রাজতন্ত্রের, গণতন্ত্রের) সমর্থক।
15. হবস্ (রাজতন্ত্রের, গণতন্ত্রের) সমর্থক।
16. হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় চুক্তি হয়েছিল (এক, দুই, তিন) [T. S. B. '79]
17. রুশো হলেন (চরম রাজতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র)-এর প্রবক্তা।

"Nationalism from instinct became idea, from idea abstract principle, then fervid prepossession, ending where it is to-day, in dogma, whether accepted or evaded.

—Morely

৫

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা
Nationalism and Internationalism

আধুনিক যুগে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ একটি প্রবল শক্তি। একটা জাতির স্বাজাত্যাবোধের মানসিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে। সুস্থ ও পরিমিত জাতীয়তাবাদ জাতীয় জীবনে একটা আশীর্বাদ। কিন্তু পরিমিতির গণ্ডী অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদ যখন উগ্র এবং বিকৃত হয়ে ওঠে তখন তা হিংসা, দ্বেষ, আত্মশ্লাঘা এবং অন্ধ আবেগে পরিণত হয়ে মানবসভ্যতার সামনে সংকট সৃষ্টি করে। এরূপ অবস্থায় জাতীয়বাদের আদর্শ জাতির এক গর্বময় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আবেগে পরিণত হয়। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিকল্প হল আন্তর্জাতিকতার মহান আদর্শ। জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বমানবের কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে আন্তর্জাতিকতা বলে। বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার ওপরে আবর্জনার যে স্তূপ জড়ো করে তা থেকে সভ্যতাকে মুক্ত করতে না পারলে মানুষের মুক্তি নেই। সে মুক্তি আনতে পারে আন্তর্জাতিকতাবোধ। সুস্থ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোন বিরোধ নেই। বস্তুত সুস্থ জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা লাভ ঘটে আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়ে।

এক : জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ (People, Nationality, Nation and Nationalism)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর শব্দ হল 'জনগণ', 'জাতীয়তা' ও "জাতি'। বিভিন্ন লেখা ও আলোচনায় ঐ শব্দগুলো এমন এলোমেলো ভাবে ব্যবহার করা হয় যে, ঐ শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় না। বাংলা ভাষায়ও 'জাতি' শব্দটিকে আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। যেমন, ইংরাজীতে যাকে *Caste* বলে আমরা তাকে 'জাতি' বলি। আবার ইংরাজী *Race* শব্দটিকে আমরা 'জাতি' নামে অভিহিত করি। গোষ্ঠীকেও (*Clan* বা *Tribe*) অনেক সময় আমরা 'জাতি' বলি। আবার ইংরাজীতে 'নেশন' বলতে যা বোঝায় তাকেও আমরা 'জাতি' বলি। যেমন বলি আমরা ভারতীয় জাতি। আবার পরমুহূর্তেই আমরা বলি বাঙালী জাতি বা অসমীয়া জাতি। আবার তেমনি, ধর্মের ভিত্তিতে আমরা বলে থাকি হিন্দুজাতি বা মুসলমান জাতি। আরো সীমাবদ্ধভাবে উঁচু জাতি, নীচু জাতিও বলে থাকি। ভারতীয় জাতি বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্রনৈতিক সমতা, বাঙালী জাতি বলতে বুঝি ভাষা ও সাংস্কৃতিক সমতা, হিন্দু বা মুসলমান জাতি বলতে বুঝি ধর্মীয় সমতা ও উঁচু জাতি বলতে বর্ণসমতা বুঝি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নানা অর্থ ও তাৎপর্য বোঝাবার জন্য 'জাতি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' অর্থে জাতি শব্দটি ব্যবহার না করে 'নেশন' শব্দটিই ব্যবহার করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

'জাতি' শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ 'নেশন'। 'নেশন' শব্দটির উৎস হল ল্যাটিন "নেটিও" মূল শব্দ থেকে—যার অর্থ জন্ম বা জনগোষ্ঠী। তাই শব্দটি ব্যবহারিক অর্থ উৎস থেকে অনেক সরে গিয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েছে। কেউ কেউ 'জাতি'-কে 'জাতীয়তা' অর্থে বা 'রাষ্ট্র' অর্থে ব্যবহার করেন। যাহোক, জাতিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে জনসমাজ (People), জাতীয় জনসমাজ (Nationality), জাতি (Nation) ও জাতীয়তাবাদ (Nationalism) শব্দগুলোকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঐ শব্দগুলো সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না—বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং প্রথমেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঐ শব্দগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনসমাজ

একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী কিছু সংখ্যক লোকের ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, আচার-**ব্যবহারে, অধিকারবোধে যদি একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাকে জনসমাজ (People) নামে অভিহিত করা যায়।** অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে জনসমাজের মধ্য দিয়ে। অনেকে মনে করেন যে, উপরোক্ত ঐক্যগুলিই যথেষ্ট নয়, জনসমাজ গঠনের জন্য উৎসগত ঐক্যও প্রয়োজন।

জাতীয় জনসমাজ কি ?

জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হলে জাতীয় জনসমাজ-এর উদ্ভব হয়। যখন কোন মানবগোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক বা কুলগত ঐক্যের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, যখন তাদের ধর্ম ও ভাষা এক হয়, যখন তারা একই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বাস করে এবং একই ধরনের আর্থিক স্বার্থবন্ধনে যুক্ত থাকে, তখন জাতীয় জনসমাজের জন্ম হয়েছে একথা বলা যেতে পারে। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায় : **"জাতীয় জনসমাজ হল ভাষা, সাহিত্য, ধ্যান ধারণা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির দ্বারা শত শত বছরের বন্ধনে আবদ্ধ এমন এক জনসমষ্টি যা অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ অন্যান্য জনসমষ্টি থেকে নিজেকে পৃথক্ বলে মনে করে।**[১] জনসমাজের এক উন্নততর স্তর হিসেবে

১. "A nationality is a population held together centuries, by as for example, language and literature, ideas, customs and traditions, in such way so to feel itself a coherent unity distinct from other populations similarly held together by like ties of their own. A nation is a nationality which has organized itself into a political body either independent or desiring to be independent."

—Lord Bryce.

জাতীয় জনসমাজকে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ একই অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, একই ধরনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, একই ধরনের চিন্তা করতে অভ্যস্ত, একই প্রকারের মানসিক গঠনে চিহ্নিত এক ঐক্যবদ্ধ ও গভীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজই হচ্ছে **জাতীয় জনসমাজ** বা *Nationality*। জন স্টুয়ার্ট মিলও (J. S. Mill) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে জাতীয় জনসমাজ নামে অভিহিত করেছেন।

অর্থাৎ, **জনসমাজ + রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা = জাতীয় জনসমাজ।**

জিমার্ণ (Zimmern) মনে করেন, কোন জনসমাজ যদি মনে করে যে সেই জনসমাজ জাতীয় জনসমাজ, তবে তা হ'ল জাতীয় জনসমাজ (If a people feels itself to be a nationality, it is a nationality)। অর্থাৎ জাতীয় জনসমাজের অনুভূতিই একটা জনসমাজকে জাতীয় জনসমাজে রূপান্তরিত করে।

জাতি কাকে বলে ?

জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ঐক্য ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা যখন আরও গভীরতর হয়, তখন জন্ম হয় জাতি বা নেশন-এর। জাতীয় জনসমাজের সঙ্গে জাতির পার্থক্য নির্দেশ করে ব্রাইস বলেছেন, ভাষা-সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে জনসমাজ বলে। **অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত যে জনসমাজ বহিঃশাসন থেকে মুক্ত বা মুক্ত হবার চেষ্টা করছে তাকে জাতি (Nation) বলে।**

মাৎসিনি (Mazzini) উৎসগত ঐক্য ও রক্তগত-চেতনাসম্পন্ন জনসমাজকে জাতি বলেছেন।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অনেকে 'জাতি' ও 'রাষ্ট্র'কে সমার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঐ শব্দ দুটি আলাদা অর্থ ও ব্যঞ্জনা বহন করে। গিলক্রাইস্ট মনে করেন, **জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ যখন নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করে তখনই সৃষ্টি হয় জাতি।** অর্থাৎ কোন জনসমাজের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবোধের অনুভূতি না থাকলে ঐ জনসমাজ জাতি হয় না। তেমনি, কোন জনসমষ্টি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তার নিজস্ব রাষ্ট্র না থাকলে তাকেও জাতি বলা যায় না।

অর্থাৎ, **জাতীয় জনসমাজ বা জাতীয়তা + রাষ্ট্র = জাতি** (The State *plus* Nationality)।

অধ্যাপক বার্জেস উৎসগত অর্থে 'জাতি' শব্দটিকে ব্যবহার করে যা বোঝাতে চান তা হল এই যে, জাতি হল একদল লোক যারা জন্মসূত্রে ঐক্যবদ্ধ এবং ভৌগোলিক দিক থেকে একটি ভূখণ্ডে যাদের ঐক্য পরিপুষ্ট।[২] যেমন ভারতীয় আর্যরা—ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমায় এরা বসবাস করেছে এবং জন্মসূত্রে এরা মোটামুটিভাবে একই গোষ্ঠীর লোক।

কিন্তু অনেকে বার্জেসের এই বক্তব্যকে সমালোচনা করে বলেন যে, এই সংজ্ঞাটি বৈজ্ঞানিক অর্থে সঠিক নয়, এমন কি সাধারণ ভাবেও এর সত্যতা নেই। সমালোচকদের মতে 'জাতি' একটি জনগোষ্ঠী নয়, এমনকি এর কোন ভৌগোলিক ঐক্যেরও প্রয়োজন নেই। বার্জেস 'জনগোষ্ঠীর ঐক্য' (ethnic unity) বলতে মনে করেন, একটি জনগোষ্ঠীর এক ভাষা ও সাহিত্য, একই আচার-ব্যবহার ও একই মানসিকতা থাকবে। জাতি গঠনের জন্য যে একই ভাষার প্রয়োজন বার্জেসের এ মত সকলে গ্রহণ করেন না। কারণ তাঁরা দেখান যে, যদিও জাতি গঠনের জন্য জনগোষ্ঠীর ঐক্য বা ভাষাগত ঐক্যের প্রয়োজন, তবু সুইস জাতির এক ভাষা বা এক জন্মসূত্র নেই। বেলজিয়ানরা এক ভাষাভাষী

বার্জেসের সংজ্ঞা এবং এর সমালোচনা

---

১. "A nation is a race, decended from common ancestors, and sharing some kinds of blood consciousness."—Mazzini.

২. "a population of an ethnic unity, inbabiting a territory of a geographic unity."
—Burgess.

নয়, তারা এক জনগোষ্ঠীও নয়। একই গোষ্ঠী বলতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বোঝায়, আর এক ভাষা বলতে ভাব আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম বোঝায়। ভাষা অবশ্যই ভাব আদান-প্রদানের পথ সুগম করে ও নৈকট্যের সচেতনতা আনে। তবু জাতি গঠনের জন্য অন্যান্য উপাদানেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আসলে জাতি একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। ফরাসী মনীষী রেণাঁকে (Renan) অনুসরণ করে বলা যায়, "অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্ত হৃদয়বান মনুষ্যের মহাসংঘ এমন একটি সচেতন চরিত্র সৃজন করে, যা নেশন বা জাতি।" অনেকে মনে করেন যে, জাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কতকগুলো উপাদান অপরিহার্য। কিন্তু রেণাঁ মনে করেন, মানুষ কুল, ধর্ম, ভাষা বা নদ-নদীর দাস নয়। তাই ঐ সকল পার্থিব বস্তুর নির্দেশিত পথে জাতি সৃষ্টি হয় না। তাঁর মতে জাতি গঠনের জন্য কোন বাস্তব উপাদানের প্রয়োজন নেই। অতীত স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আশা—এই মানসিক অনুভূতিই যথেষ্ট। আগেই বলা হয়েছে যে, জিমার্ণও মনে করেন যে, যে কোন জনসমাজের মধ্যে যদি জাতীয় জনসমাজের উপলব্ধি দেখা যায়, তবে তাই জাতীয় জনসমাজ।

রেণাঁর মত

স্তালিনের (Stalin) **মতে জাতি হল ইতিহাস বিবর্তিত এক স্থায়ী সমাজ যা ভাবগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, সম-আর্থনীতিক জীবনের মনস্তাত্ত্বিক গঠন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের দ্বারা সংগঠিত** (A nation is a historically evolved stable community of language, territory, economic life and phychological make-up manifested in a community of culture)।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, মানব ইতিহাসের সকল পর্যায়ে এবং বিশেষ করে প্রথম স্তরে জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আধুনিক জাতীয়তাবাদ একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্র, রোমান সাম্রাজ্য বা মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রথা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য-এর (Holy Roman Empire) সময় কোনো জনসমষ্টি 'জাতি' হিসেবে নিজেকে মনে করত না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইংলণ্ডে টিউডর রাজবংশের অধীনে, ফ্রান্সে বুর্বোঁ বংশের শাসনকালে এবং স্পেনে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার রাজত্বকালে জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। 'জাতি'-র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

এক জাতিক ও বহু জাতিক রাষ্ট্র

পৃথিবীর সব জায়গায় জাতীয় সীমারেখা রাষ্ট্রীয় সীমারেখার অনুগামী নয়। তাই কোথাও এক জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র, আবার কোথাও দুই বা বহুজাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র দেখা যায়। **একটি জাতিকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হলে তাকে একজাতিক রাষ্ট্র (Mono-National State) বলে এবং একাধিক জাতি নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হলে তাকে বহু-জাতিক রাষ্ট্র (Poly-National State) বলে।** যেমন, পাকিস্তান এক-জাতিক এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বহু-জাতিক রাষ্ট্র।

জাতীয়তাবাদ কাকে বলে?

প্রতিটি জাতির স্বাজাত্যবোধের অনুভূতির প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের ভিতর দিয়ে। **জাতীয়তাবাদ** হ'ল এক ধরনের মানসিক অনুভূতি যা রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ভেতর দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। লিপসন মনে করেন, যখন কোন জাতীয় প্রতীককে অবলম্বন করে কোন জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম বা অঞ্চলের ভিত্তিতে নিজেদের পরিচিতি না দিয়ে সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে নিজেদের মনে করে তখন তারা একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয় এবং তাদের স্বাজাত্যবোধের ঐ অনুভূতিকে জাতীয়তাবাদ বলে। **উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, আমরা যদি নিজেদের হিন্দু, মুসলমান বা বাঙালী, বিহারী, অসমীয়া হিসেবে না ভেবে ভারতীয় হিসেবে মনে করি তবে আমরা ভারতীয়রা একটি জাতিতে পরিণত হব এবং আমাদের এই মানসিক অনুভূতিকে জাতীয়তাবাদ বলা হবে।** সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে একটি বিশেষ ভৌগোলিক

সীমানার মধ্যে অবস্থিত মানবসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতিগত ঐক্য এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সামাজিক বিকাশের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে এবং তার ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবাদ আত্ম-প্রকাশ করেছে। জাতি ও জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি সম্পর্কীয় এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসবাদী চিন্তার মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে।

দুই ঃ জাতীয়তার উপাদানসমূহ (Elements of Nationality)

জাতীয় জনসমাজ বা জাতি গঠনের ব্যাপারে কয়েকটি উপাদান প্রয়োজনীয় বলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁদের মতে যে সকল উপাদান এরূপ ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে সেগুলো হল জনগোষ্ঠী ও তার কুলগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক নৈকট্য, ধর্মগত-ঐক্য, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ঐক্যবোধ, আর্থনীতিক সমস্বার্থ এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ইত্যাদি। জাতীয়তার উপরোক্ত উপাদানগুলোকে আলাদা করে আলোচনা করা হল ঃ

কুলগত ঐক্য

১. নিঃসন্দেহে বলা যায়, **জাতীয়তার প্রথম ও প্রধান উপাদান হল জনগোষ্ঠীর কুলগত ঐক্য।** কোন জনসমষ্টি যখন মনে করে তাদের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত এবং তাদের আকৃতিতে একই ধরনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন তারা স্বভাবতই ঐ জনগোষ্ঠীকে স্বজন বলে মনে করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 'নর্ডিক' (Nordic) জাতির লোকেরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাদের দেহেই একমাত্র আর্যরক্ত প্রবাহিত—এই দাবীর ভিত্তিতে হিটলার জার্মানীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই কুলগত উপাদানকে আর বিশেষ প্রাধান্য দিতে রাজী নন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, রক্তের পবিত্রতা পৃথিবীতে কোথাও আর রক্ষিত হচ্ছে না।

ভাষাগত ঐক্য

২. **কুলগত ঐক্যের পরেই আসে ভাষাগত ঐক্য।** একই ভাষা-ভাষী জনসমষ্টি পরস্পরের মনের ও চেতনার অনেক কাছাকাছি। একই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেও ঐক্য দেখা যায়। তাদের প্রকাশ-ভঙ্গি ও রঙ্গ-রসিকতার মধ্যেও ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে ভাষার প্রভাবে সমভাষাভাষী জনসমাজের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে।

ভৌগোলিক নৈকট্য

৩. **ভৌগোলিক ঐক্যকে জাতীয় জনসমাজ গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়।** কোন নির্দিষ্ট দেশে বসবাসের ফলে সে দেশের জনসমাজ তাদের দেশকে মাতৃভূমি বলে মনে করে এবং ঐ মাতৃভূমিকে ঘিরে তাদের স্বাদেশিকতা জাগ্রত হয়ে ওঠে। ঐ মাতৃভূমির জন্য তারা যুদ্ধ করে এবং জীবন পর্যন্ত দান করতে দ্বিধা বোধ করে না। তারা অনুভব করে যে, একই দেশের আলো, বাতাস, মাটি, জল তাদের শরীরে মিশে আছে, একই দেশের খাদ্যে তারা প্রাণ ধারণ করছে। **ভৌগোলিক সান্নিধ্য এভাবে একটি দেশের জনসমষ্টির ভেতর স্বভাব-জাত ঐক্য সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।**

ধর্মগত ঐক্য

৪. যদিও ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধর্ম বহু বিভেদ ও অশান্তির কারণ, **তবুও একথা মানতে হবে যে, ধর্ম মানসিক বন্ধনের একটি বিরাট গ্রন্থি।** ইদানীং কালে জনমনে ধর্মের প্রভাব কিছু পরিমাণে শিথিল হলেও একই ঈশ্বরের উপাসনা ও একই ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে এবং ইহকাল-পরকাল সম্পর্কে একই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ অনুভব করে। একথা মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তির সমাজজীবনে ধর্ম নিশ্চয় ন্যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধের উৎস, ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি জনগোষ্ঠীর ঐক্যের ধারক ও বাহক, কিন্তু জাতীয়তার সঙ্গে ধর্মের বিশেষ কোন যোগ নেই। যেমন বাঙালীর জাতীয়তায় সকল ধর্মেরই স্থান আছে।

৫. একটি জনসমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে। এর ফলে জীবনের বহু সমস্যা তাদের কাছে অভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়। একসঙ্গে বাঁচা-মরার প্রেরণায় জাতীয়তার পুষ্টি ঘটে। **একই রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করা এবং একই রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে পরিপুষ্ট হবার জন্য এদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক চেতনাগত ঐক্যের পরিমণ্ডলী সৃষ্টি হয়।**

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ঐক্য

এইজন্যই লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগের অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনৈতিক চেতনাবোধ আমাদের জাতীয়তা গঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে।

৬. **আর্থনীতিক সমস্বার্থ অর্থাৎ একই প্রকারের আর্থনীতিক চেতনা, সংগ্রাম, স্বার্থ ও অধিকারের ভিত্তিতে যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় জাতীয়তার উপাদান হিসেবে তার বিশেষ অবদান রয়েছে।** 'তৃতীয় দুনিয়া'-র অর্থাৎ সদ্যস্বাধীন প্রতিটি দেশ ধনী দেশগুলোর বহুজাতিক করপোরেশনের হাত থেকে নিজেদের শোষণমুক্ত করার জন্য যে আর্থনীতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা তাদের জাতীয়তার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

আর্থনীতিক সমস্বার্থে

৭. **মানুষের সৃষ্ট শিল্প, সাহিত্য, রুচি, ভাব ও ধ্যান-ধারণার ঐক্যের ভিত্তিতে একাত্ম-বোধ সৃষ্টি হয়।** ধর্মের যুক্তিতে যা সম্ভব হয় না, সাংস্কৃতিক ঐক্য তা সম্ভব করে। সংস্কৃতি থেকেই আসে সম-মানসিকতা। সাহিত্য ঐ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, সঙ্গীতে এ তান-লয়ের বিস্তার, স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে, নৃত্যে, পোশাকে, হাতের কাজে সর্বত্র ঐ মানসিকতার ছাপ। ঐ মানসিকতা ধর্মের বেড়া ভেঙ্গে দেয়। তাই বাঙলা দেশের হিন্দু মুসলমান পীরের দরগায় সিন্নি দেয়, চেরাগবাতি জ্বালে, আর মুসলমান ফকির বেহুলার ভাসান গান করে, রামায়ণ শোনায়। বাউল, ভাটিয়ালী বা কীর্তন সুরের এই ঢঙগুলো বাঙালীর নিজস্ব। তাই যে কোন বাঙালীর প্রাণ এই সুরের অজান্তেই সাড়া জাগায়।

সাংস্কৃতিক ও ভাবগত ঐক্য

জাতীয়তার উপাদানগুলো কি অপরিহার্য ?

এখন প্রশ্ন হল, জাতীয়তার অনুভূতি সৃষ্টির জন্য এই উপাদানগুলো কি অপরিহার্য ? প্রতিটি উপাদান কি সমপ্রয়োজনীয় ?

বিভিন্ন জাতির সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত উপাদানগুলো সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজনীয় নয় এবং যে স্থানে প্রয়োজনীয় সেখানেও অপরিহার্য কি না সে বিষয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। কুলগত ঐক্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বর্তমানযুগে পৃথিবীর কোন দেশের জনসমষ্টির রক্তের পবিত্রতা রক্ষিত হয়নি। ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় মিলে মিশে গিয়েছে। আবার কোথাও দেখা যায় কোন জনসমষ্টির ধর্মমত এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ নিয়ে ভারত, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে একটি জাতির উৎপত্তি হয়েছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ এক ভাষায় কথা বললেও দুটি জাতি গঠন করেছে। ভৌগোলিক সান্নিধ্য ও আর্থনীতিক সমস্বার্থকেও জাতিগঠনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে মনে করা যায় না। পাহাড়, মরু, নদ-নদী, সাগর-এর ভৌগোলিক অবস্থান সব জায়গায় জাতিগুলোকে বিভক্ত করেনি, আবার বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে একই জাতির অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়।

বাস্তব উপাদান ছাড়াও ভাবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ সৃষ্টি করতে পারে। ঐ ভাবগত ঐক্যবোধ যখন তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বিভিন্ন জাতীয় সমাজের মধ্যে প্রসারিত হয়, তখন বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের সমন্বয়ে জাতি আত্মপ্রকাশ করে। যেখানে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের ভেতর ঐরূপ ঐক্য আত্মপ্রকাশ করে—সেখানেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, জাতীয়তা গঠনের উপাদানগুলো বিভিন্ন জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয়তার অনুভূতি গঠনে সাহায্য করেছে, তাই ঐ উপাদানগুলো জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে জাতীয়তা সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় উপাদানগুলো **প্রয়োজনীয় হলেও সবসময় অপরিহার্য নয় এবং প্রতিটি উপাদান সমপ্রয়োজনীয় নয়।**

তিন : ভারত কি একটি জাতি ? (Is India a Nation ?)

ভারতবাসীকে একটি জাতি হিসেবে অভিহিত করা যায় কিনা, এ প্রশ্নটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে, যখন একটি জনসমাজ কুলগত ঐক্য, ভাষা ও সাহিত্যগত ঐক্য, ভৌগোলিক নৈকট্য, ঐতিহাসিক একাত্মবোধ, ধর্মগত ঐক্য, আর্থনীতিক সমস্বার্থ, সাংস্কৃতিক ও ভাবগত ঐক্য প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাকে জাতি বলে। ভারতে উপরোক্ত উপাদানগুলো কতটা আছে তা বিচার করা প্রয়োজন।

ভারতে জাতীয়তার বাস্তব উপাদানের অভাব

ভারতীয়রা বিভিন্ন কুলে বিভক্ত, কুলগত ঐক্য এখানে নেই। ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আছে, সুতরাং হরফ, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ একথা বলা যায় না। তামিল ভাষা, বাংলা ভাষা, উর্দু ভাষা, হিন্দী ভাষা ইত্যাদি ভাষার পরস্পরের সঙ্গে পার্থক্য এত গভীর যে ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে ভাষা একটি বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ধর্মগত ব্যাপারে দেখা যাবে যে বিরোধ আরও গভীরে। তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ এই ভারত। মূল দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমান ছাড়াও ভারতে আরও বহু ধর্মাবলম্বী আছে। বস্তুত ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সদ্ভাব বজায় রেখে এখানে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ভারতীয় জনগণ ভৌগোলিক নৈকট্যের বন্ধনে আবদ্ধ, একথাও বলা যায় না। সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গের জনগণের বা রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে চেরাপুঞ্জিতে বসবাসকারী জনগণের কোনরূপ ভৌগোলিক নৈকট্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা। পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ, রুচি, ভাব ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং কেতাবী যে সকল ঐক্যের উপাদানের সাহায্যে একটি জাতি আত্মপ্রকাশ করে, ভারতে সেরূপ উপাদানগত কোন ঐক্য নেই একথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন জাতি সৃষ্টির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর অনেক জাতির ক্ষেত্রেই উপরোক্ত উপাদানগুলো প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কুলগত ঐক্য বজায় আছে, বা সকলে একই ধর্মাবলম্বী বা সেই জাতির প্রতিটি ব্যক্তি একই ভাষায় কথা বলে এরূপ অবস্থা দেখা যায় না। অর্থাৎ দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন কুল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চেতনা বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এক-একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন, সুইস (Swiss) জনগণ বিভিন্ন কুল ও ভাষায় বিভক্ত, তা সত্ত্বেও সুইস জনগণ একটি জাতি।

জাতি গঠনের উপাদান অপরিহার্য নয়

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, উপরোক্ত উপাদানগুলো জাতি গঠনের জন্য একান্ত অপরিহার্য নয়। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মরুভূমি, সাগর ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদান এবং ধর্ম, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য সর্বত্র জাতিকে বিভক্ত করতে পারেনি। এই সকল উপাদানকে অস্বীকার করে একটি জনসমাজের মধ্যে এমন এক ভাবগত ঐক্য তৈরী হতে পারে যা বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও জাতীয় প্রেরণা সৃষ্টি করে একটি জনসমাজকে জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে। ভারতের ক্ষেত্রেও জাতি গঠন এরূপ ভাবেই ঘটেছে।

ভারতবাসীর মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক অবস্থানগত, কুলগত বিভিন্ন পার্থক্য এবং বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একটা মৌলিক ঐক্য রয়েছে। ভারতীয়রা একই শাসন এবং শোষণের অধীনে থাকায় স্বাধীনতার আগে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা সেই ঐক্যকে দৃঢ় করেছে। প্রতিটি ভারতবাসী—সে সুদূর পাঞ্জাব বা পশ্চিম বাংলা যেখানেই থাকুক না কেন ; ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্ম, কুলগত যত পার্থক্যই তাদের মধ্যে থাকুক না কেন ; তাদের ভাগ্য একই সঙ্গে জড়িত। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন—এই বোধ ভারতীয়দের এক-ই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসনকে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছে এবং ভারতীয়রা একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ঐক্য, যোগাযোগ, আদান-প্রদান অনেক বেড়েছে এবং 'আমরা ভারতীয়' এই বোধের প্লাবনে ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতা, ভাষাবোধ, ধর্মবোধ অনেকাংশে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবে ভারতে এক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির ব্যাপারে একদিকে সরকারী প্রচেষ্টা অন্যদিকে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। জাতীয়তাবাদ মূলত একটি ভাবগত ঐক্য এবং ভাবগত ঐক্যের দৃঢ় বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয়রা একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভাবগত ঐক্যে ভারত একটি জাতি

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঐ ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য জাতীয়তাবাদ বিরোধী শক্তিও ভারতে কম শক্তিশালী নয়। ধর্মীয় অনৈক্যের জন্য আজও ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা যায় এবং ভাষাগত বিরোধের জন্য ভাষা-দাঙ্গা হয় না এমন নয়। সমাজের অনুন্নত শ্রেণীকে এখনও অস্পৃশ্য মনে করে অত্যাচার করা হয়, বিত্তবানেরা এখনও বিত্তহীনদের শোষণ করে। আঞ্চলিকতাকে জিইয়ে রাখা, ভাষাগত বিরোধকে উস্কানি দেয়া, ধর্মগত পার্থক্যকে বিরোধের মূল কেন্দ্রে আনার প্রচেষ্টা চালানো ইত্যাদি কাজকর্ম চালাবার সংহতিবিরোধী শক্তি ভারতে বেশ সক্রিয়। অনৈক্যের বীজ এবং সংহতি-বিরোধী শক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করে তুলতে পারলে ভারতে জাতীয়তাবাদের শক্তি অনেক শক্তিশালী হবে এবং ভারতীয়রা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হতে পারবে।

ভারতে অনৈক্যের শক্তি সক্রিয়

চার ঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self Determination)

প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐ সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বৈশিষ্ট্যগুলো মূর্ত হয়ে উঠতে চায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভেতর দিয়ে। তাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে **জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী বা নিজস্ব রাষ্ট্রগঠনের দাবী দৃঢ় রূপ নেয়।** প্রতিটি জাতীয়-গোষ্ঠীই চায় তাদের নিজেদের রাষ্ট্র, যেখানে তারা নিজেদের সংস্কৃতি ও কল্পনাকে রূপ দিতে পারে। প্রেসিডেন্ট উইলসন আত্মনিয়ন্ত্রণের ঐ অধিকার সম্পর্কে বলেন যে "আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি শব্দমাত্র নয়, এটি প্রতিটি কাজের পেছনে নিহিত নীতি। রাষ্ট্রবিদ্‌গণ তা ভুললে বিপদ ঘটাবেন।" এই বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি **"একটি জাতি একটি রাষ্ট্র"** (One Nation, One State) নীতি ঘোষণা করেন।

উইলসন ঃ জাতির নিজস্বতা অনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণ

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ত্ব বলা হয়। **আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তত্ত্ব বা 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র', তত্ত্ব হল বহুজাতিক রাষ্ট্রের (Poly National State) বিরুদ্ধে এক জাতীয় রাষ্ট্রের (Mono National Sate) দাবী।** জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, "যেখানে জাতীয়তাবোধ কিছুটা পরিমাণে শক্তিশালী, সেখানেই জাতীয় জনসমাজের সকল মানুষকে একটি স্বতন্ত্র সরকারের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রাথমিক যুক্তি রয়েছে।"

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর সমর্থনে একদিকে যেমন অনেক দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ ও মনীষী সোচ্চার হয়েছেন, তেমনি অনেকে ঐ দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁদের মতে কোনমতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে সমর্থন করা যায় না এবং যদি বা যায়ও তবে কার্যত তা প্রয়োগ করা সর্বত্র সম্ভব নয়। যাহোক, 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' বা 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' তত্ত্বের স্বপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্বপক্ষে যুক্তি

১. জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, যেখানে জাতীয়তাবাদ কিছুটা পরিমাণে শক্তিশালী, সেখানে জাতীয় জনসমাজে সকল মানুষকে একটি স্বতন্ত্র সরকারের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রাথমিক যুক্তি রয়েছে।

মিল জনসাধারণের হাতেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণের ভার ছেড়ে দিতে চান। তিনি আরও মনে করেন যে, বহু জাতিতে বিভক্ত রাষ্ট্রে স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠতে পারে না (**Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities**)।

মিলের বক্তব্য

২. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে বলা যায়, স্বাধীনতার জন্য জাতীয় চেতনা এত বিরাট ও প্রবল যে তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ম্যাকআইভার বলেছেন, "যে চেতনা এত ব্যাপক, এত জটিল, এত সূক্ষ্ম, তথাপি এত প্রবল, তা যদি কোন সংগঠনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, সে-সংগঠন অনিবার্য ভাবেই রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে।"

৩. প্রতিটি জাতিরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। ঐ সকল বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র সত্তাকে সে জাতিই কেবল স্বকীয় পদ্ধতিতে বিকশিত করতে পারে। তাই জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন।

৪. অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হলেই যে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ ঘটবে এমন কথা নেই, বরং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হলে জাতিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরোধ ভুলে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বসবাস করতে পারবে।

৫. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হলে প্রতিটি জাতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করবে, ফলে বিভিন্ন জাতির নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বিকাশ মানবসভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

৬. জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সমর্থনে বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্যটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, "কোন জনসমাজকে তাদের নিজস্ব সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের শাসনাধীন থাকতে বাধ্য করা, আর একটি নারীকে, যে-পুরুষকে সে ঘৃণা করে, তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা, একই কথা।"

৭. একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতির মধ্যে শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সহনশীলতার অভাবের জন্য মাঝে মাঝে দুর্বল ও সংখ্যালঘু জাতি অত্যাচারিত হয়। তাই ঐ সকল সংখ্যালঘু জাতি কর্তৃক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে অত্যাচারমুক্ত হবার দাবি অগ্রাহ্য করা যায় না।

৮. ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকেও জাতীয় স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করতে হয়। কোন জনসমাজ যদি নিজের আত্মবিকাশের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হতে চায় তবে কোন্ যুক্তিতে এ দাবীকে উপেক্ষা করা সম্ভব?

বিপক্ষে যুক্তি

এবার জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকার করে নেয়া সহজ, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন একবার শুরু হলে কোথায় যে এর শেষ হবে তা বলা কঠিন। যে কোন জনসমষ্টি যে কোন বিষয়ের দ্বারা নিজেদের মধ্যে দলবদ্ধতার প্রেরণা পেলে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি বলে ঘোষণা করতে পারে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার দাবি উত্থাপন করতে পারে। এই নীতি মেনে নিলে গ্রেটব্রিটেন ও সুইজারল্যান্ড চারটি করে রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। ভারতে অনেকগুলো রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে। এইভাবে পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পাবে।

২. এইভাবে অসংখ্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, বিভিন্ন জাতির মানুষ আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে এমন ভাবে মিশে আছে যে, রাষ্ট্রসীমানার প্রাচীর তুলে এদের বিভক্ত করা যায় না।

৩. আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর সবচেয়ে বিরোধী হলেন লর্ড এক্টন। তাঁর মতে রাষ্ট্রগঠনে জাতীয়তার কোনই অবদান নেই। বরং জাতীয়তার নীতি রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বিরোধী এবং শত্রু। এক্টনের ভাষায় বলা যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব হল অবাস্তব। সাম্রাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থায়ী বিশ্বাসী লর্ড এক্টন স্বাভাবিকভাবেই মনে করেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সমাজতন্ত্র উভয়েই অকাম্য। তবে তাঁর মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী সমাজতন্ত্রের চেয়েও নিকৃষ্ট (*More absurd and more criminal than the theory of Socialism*)। তাঁর মতে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যেমন সমাজের ভিত্তি দৃঢ় করে, রাষ্ট্রের ভিত্তি তেমনই বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ শক্তিশালী করে।

৪. একটি জাতির বিভিন্ন মানুষ একাধিক দেশের মধ্যে এরূপভাবে ছড়িয়ে থাকতে পারে যে, অনেক সময়ে তাদের একত্র করে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তা ছাড়া এরূপ ব্যবস্থা যে আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে নিরাপদ নয় তা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগের ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করলেই বোঝা যায়। ভারতকে বিভক্ত করে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হল সেই পাকিস্তানে সকল মুসলমানকে এক করে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি।

৫. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, একাধিক জাতীয় জনসমাজ একই রাষ্ট্রে পরস্পরের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে উন্নত জাতির সংস্পর্শে এসে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলো উন্নত ও উপকৃত হয়েছে।

৬. জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপিত হলে রাষ্ট্রগুলোর আয়তন এত ছোট হবে যে, এরা কেউ আর্থিক দিক হতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না। আত্মরক্ষার জন্যও এরা যথেষ্ট শক্তিশালী হতে না পারার ফলে অন্যের সাহায্য নিয়ে এদের চলতে হয়, ফলে ঐ ছোট রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। তাই লর্ড এক্টন বলেছেন ঃ "জাতিতত্ত্ব হচ্ছে ইতিহাসের পশ্চাৎগামী পদক্ষেপ" (The theory of nationality is a retrograde step in history)।

৭. লর্ড কার্জনের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি দুমুখো তলোয়ার—একদিকে তা যেমন ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা জোগায়, তেমনি অন্যদিকে তা বিচ্ছিন্নতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রীয় সংহতি নষ্ট করতে সাহায্য করে।

এই সকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, **আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অবিমিশ্র আশীর্বাদ বা অবিমিশ্র অভিশাপ কোনটিই নয়। নীতিগতভাবে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এ তত্ত্বকে সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।** একটি জাতিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ করে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের এক বিরাট অবদান আছে—একথা ঠিক। কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করলে পৃথিবীতে অসংখ্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি হবে এবং তা গভীর সংকট সৃষ্টি করবে। তাই বিশাল আয়তনের বহু-জাতিক উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ক্ষেত্রে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন না করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় শাসন ক্ষমতা এবং স্বাধীকার প্রয়োগের অধিকার স্বীকার করে বিভিন্ন জাতীয়তার সত্তার উন্নতি এবং বিকাশ সুনিশ্চিত করে তোলা সম্ভব।

পাঁচ ঃ জাতীয়তাবাদের গুণ এবং সীমাবদ্ধতা (Value and Limitations of Nationalism)

ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রভুত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে এবং জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু বর্তমানকালে জাতীয়তাবাদ অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। নীচে জাতীয়তাবাদের দোষ ও গুণ আলোচনা করা হ'ল।

জাতীয়তাবাদের গুণ

১. জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে, সুস্থ জাতীয়তাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীর অনেক দুর্বল ও পরাধীন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং স্বাধীনতা লাভ করে নিজ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

জাতীয়তাবাদ প্রেরণা সৃষ্টি করে

২. ম্যাৎসিনি মনে করেন, প্রত্যেক জাতিরই কিছু কিছু নিজস্ব প্রতিভা আছে, যার সমন্বয়ে মানব সমাজের সম্পদ সৃষ্টি হয় (each nation possessed eertain talents which taken together, formed the wealth of the human race)। তাই ম্যাৎসিনির মতে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতি-প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তা সর্বমানবের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারে।

সর্বমানবের কল্যাণ

৩. ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদ যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে তার ফলে অনেক রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

৪. জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হলে এর অস্তিত্ব অনেক দৃঢ় হয় এবং স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। বার্জেস মনে করেন, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হলে সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের মধ্যকার বিরোধের সহজেই মীমাংসা হয়।

দৃঢ় অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব

জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা

১. মনে রাখা দরকার যে, জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদ সুস্থ চেতনাকে ছাড়িয়ে মানসিক সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরী করে। অন্য যে সকল জাতি উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে দমন করা হয়।

অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি

২. অন্ধ আবেগ দ্বারা পরিচালিত জাতিদম্ভী রাষ্ট্র সকল কিছুকে জাতীয় চরিত্রের অনুগামী করার জন্য হাস্যকর যান্ত্রিক 'ইউনিফর্মিটি' প্রয়োগ করে এবং এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ দমিত হয়ে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

যান্ত্রিক ইউনিফর্মিটির প্রাধান্য

৩. জাতীয়তাবাদ সকল যুক্তি ও পরমতসহিষ্ণুতাকে বিসর্জন দিয়ে অন্ধ আবেগ, উন্মত্ততা, অসহিষ্ণুতার দ্বারা সমগ্র দেশে এক অসুস্থ ও বিকৃত মানসিকতা তৈরী করে।

অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি

৪. উগ্র জাতীয়তার ফলে জনগণের মধ্যে ত্রাস, আতঙ্ক ও বিনা প্রতিবাদে বশ্যতা স্বীকারের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৫. জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্য বিকাশের যে সম্ভাবনা থাকে, তা বিকৃত জাতীয়তাবাদের নিদারুণ চাপে বিলীন হয়ে যায়।

৬. মানবতাকে অস্বীকার করে উগ্র জাতীয়তাবাদ যে বিদ্বেষ, হিংসা ও আক্রমণকারী ভূমিকা প্রচার করে তার অনিবার্য পরিণাম হল যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবিস্তার, গণতান্ত্রিক অধিকারের হত্যা ও ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা। এরূপ জাতীয়তাবাদ যুক্তি ও আলোচনাকে অস্বীকার করে নিজের

দেশের দাবীকেই সবচেয়ে আগে স্থান দেয় এবং সকল বিরোধের মীমাংসার জন্য যুদ্ধকে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ এভাবে পৃথিবীর বুকে এক সর্বনাশা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বার্তাবাহী জাতিগুলোকে নিষ্ঠুর শাসন এবং পীড়নে নিঃস্ব ও হতবল করে তুলেছিল। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের ঐ ভয়াবহ উত্থানের মূলে রয়েছে বিকৃত জাতীয়তাবাদ।

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য বিস্তার

৭. অধ্যাপক হেইজের (Hayes) মতে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ আংশিকভাবে দেশপ্রেমের আদর্শ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা হল জাতির গর্বময় এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ মানসিক স্বভাব। এই মানসিক স্বভাবের জন্যই এক জাতি অন্য জাতির প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করে, অন্যকে ঘৃণা করতে শেখে এবং নিজেদের সকল কাজকে সকল সময় ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক বাতিকগ্রস্ত রোগ বিশেষ, এক প্রকারের অতিরঞ্জিত অহমিকা।

উগ্র জাতীয়তাবাদ এক রোগ বিশেষ

৮. সর্বশেষে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদের এই বিকৃত, হিংস্র, বীভৎস ও উগ্ররূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে সভ্যতার সংকট সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করেছেন (menace to civilization)।

সভ্যতার সংকট সৃষ্টিকারী

ছয় ঃ জাতীয়তাবাদ ও সভ্যতা (Nationalism and Civilization)

জাতীয়তাবাদের দোষগুণ আলোচনা করে বোঝা যাচ্ছে, পরিমিত, স্বাভাবিক এবং সুস্থ জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বহু জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মধ্য দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়েছে ; আবার এই জাতীয়তাবাদের অপব্যবহারের ফলে অনেক জাতি পরিমিতিবোধের সীমা ছেড়ে হিংসা, দ্বেষ, অযৌক্তিক আত্মশ্লাঘা, আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং বিকৃত আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে পৃথিবীতে মানবসভ্যতার সংকট সৃষ্টি করেছে।

বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তার বিষময় ফল নিয়ে মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। পুরানো পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ রাজনৈতিক চেতনাতে সমৃদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জাতি স্বাধীনতা এবং স্বাধীকারের দাবী তোলে। এই দাবী থেকেই জন্ম নেয় "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" তত্ত্ব। জাতীয়তাবাদের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে বহুদিন ধরে দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বেঁধে রাখা হয়েছিল। পদদলিত ও নিপীড়িত মানুষের ব্যথায় তৎকালীন বহু মনীষীই ব্যথিত হয়েছিলেন। **রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে মানবসভ্যতার শত্রু বলে ঘোষণা করেন (Nationalism is a menace to civilization)।** মানুষের যা কিছু শ্রেয় ও প্রিয়, যা কিছু কল্যাণকর ও মহৎ উগ্র জাতীয়তাবাদের আক্রমণ তারই বিরুদ্ধে।

জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় ইউরোপে নতুন বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। ঐ নতুন অর্থনীতিই হল বুর্জোয়া অর্থনীতি। বিদেশ থেকে মুনাফলাভের লোভ, কাঁচামাল সংগ্রহের লালসা, সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্বারা শোষণের আশায়, বাজার সৃষ্টির তাগিদে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো দিকে দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। এই কারণে তারা নিজ নিজ দেশকে উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবোধের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন করে। অধ্যাপক লাস্কির মতে **ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয় (As power exceeds nationalism becomes transformed into imperialism)।**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একদিকে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপানের উগ্র জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকাকে হিংস্রতার নখদন্তে ছিন্নভিন্ন করে পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতার মুখে কালিমা লেপন করেছে, অন্যদিকে ঐ জাতীয়তাবাদ পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের জন্ম দিয়ে এক পাশবশক্তি সৃষ্টি করেছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ প্রচার

করেছিল যে, অসভ্য জাতিগুলোকে সভ্য করার জন্য তাদের প্রভাব বিস্তার প্রয়োজন। কিপলিং কথিত *whiteman's burden* এবং হিটলার কথিত *superiority of the Nordic race*-এর অজুহাতে জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠা করে। এরপরেই জার্মানী তার স্পর্ধিত বুটের তলায় নিষ্পেষিত করল চেকোশ্লোভাকিয়াকে ও আরও অনেক শান্তিপ্রিয় দেশকে। ইতালী আধিপত্য বিস্তার করল আবিসিনিয়ার ওপর। ব্যথিত কবিগুরু ঘোষণা করিলেন, *Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce self-idolatry of nation-worship is the goal of human history*. জাতীয়তাবাদের এই সভ্যতা বিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে।" অধ্যাপক হেইজ-এর মতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ আংশিকভাবে দেশপ্রেমের আদর্শ বলে মনে হলেও বাস্তবে এটি অহঙ্কারময়, ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অহেতুক অহমিকাজড়িত এক বাতিকগ্রস্ত রোগছাড়া আর কিছুই নয়। উগ্র, অনুদার ও বিকৃত মনোভাবের ঊর্ধ্বে যদি সুস্থ-স্বদেশপ্রেমের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয় একমাত্র তবে তা হবে মানবজাতির তথা পৃথিবীর পক্ষে আশীর্বাদ। হেইজের ভাষায়, *Nationalism when it becomes synonymous with the purest patriotism, will prove a unique blessing to humanity and to the world.*

সাত : আন্তর্জাতিকতা (Internationalism)

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে প্রধানত জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে। এই সকল জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের এক জাতির অধীন বলে মনে করে এবং অন্য রাষ্ট্রের জনগণকে বিজাতীয় বলে গণ্য করে। বর্তমান শতকে জাতীয়তাবাদ উগ্র হয়ে উঠছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ছাড়াও দুটি মহাযুদ্ধ মানবসভ্যতার গৌরব ক্ষুণ্ণ করেছে। জাতিকে রক্ষা করার নামে পৈশাচিক নরহত্যা এবং নির্বিচারে অপর জাতির স্ত্রীলোক ও শিশুহত্যা ঘটেছে। বিষ-বাষ্প ও জীবাণু বোমা প্রয়োগ ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের হাতিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা পরমাণু বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তি আস্বাদন করেছি। বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন। "ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে" (Thirty pieces of silver coin) কতিপয় বিবেকহীন ক্ষমতালোভীর হাতে গোটা মানবজাতির ভবিষ্যৎ তুলে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তার দোহাই দিয়ে সাহিত্যিকেরা জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। সাধারণ মানুষও জাতীয়তার নামে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অনেক অন্যায় কাজ সমর্থন করেছে। জাতীয় উন্মাদনার দ্বারা পরিচালিত তথা-কথিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীতে এরূপ মানবতাবিরোধী কাজকর্ম করে চলেছে। প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্রই নিজের জনগণের ওপর এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করছে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের বৃদ্ধি করছে।

জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাই বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ

উগ্র জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব আজ মানবজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। অধ্যাপক লাস্কি তাই বলেছেন, "অবিলম্বে জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর হাত থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা সরিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ সার্বভৌমত্বের একমাত্র প্রকাশ হয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে।" রবীন্দ্রনাথও এই জাতীয়তাবাদকে তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে ঐ উগ্র জাতীয়তাবাদই সভ্যতার সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী।

কেবল বর্তমান যুগে নয়, বহুকাল আগে থেকেই মনীষীরা বলে আসছেন যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও মানুষের একটিই জাত, প্রতিটি মানুষ সমগ্র মানবজাতির অংশ, সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করে অবিলম্বে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন প্রয়োজন। আজ আমরা

ক্রমশই উপলব্ধি করছি "পৃথিবীর মাঝে আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি; একই পৃথিবীর অন্নে পালিত, একই রবি-শশী মোদের সাথী।" পৃথিবীকে বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রে আর ভাগ করা উচিত নয়; মহা-মানবজাতির ভিত্তিতে পৃথিবীময় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইংলণ্ডের কবি টেনিসনের ভাষায় বলা চলে—এমন একদিন কবে আসবে, যেদিন মানুষের আইনসভা ও পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র (Parliament of Men and Federation of the World) স্থাপিত হবে?

কবির কল্পনা—মানুষের আইনসভা এবং পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র

এরূপ মহান্ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ এখন আর কবির কল্পনাতে সীমাবদ্ধ নয়, অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে ঐ স্বপ্ন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মানবসমাজ ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে—পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে জাতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিবর্তনের ধারা কখনও এই স্তরেই শেষ হতে পারে না। জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র কখনই বিবর্তনের শেষ ধাপ নয়। বৃহত্তর মানবসমাজ নিশ্চয় এক আন্তর্জাতিক মহারাষ্ট্রের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হবে।

জাতীয় রাষ্ট্র হল বিবর্তনের একটি ধাপ—আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গঠনের পদক্ষেপ

ভৌগোলিক ভাবে পৃথিবীর আয়তন এখন ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র ডিঙিয়ে একদেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করছে ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করছে, সৌভ্রাতৃত্বের মানসিকতা গড়ে তুলছে। এক জাতির সাহিত্য অন্য দেশের ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে; সমগ্র মানবজাতির মনের ভাবজগতে ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য এক একটি আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এমন প্রসার হয়েছে যে, সব দেশই পরনির্ভরশীল হয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। কেউ কারও সহযোগিতা ছাড়া বাঁচতে পারছে না। পৃথিবীর যে কোন ঘটনা আজ অন্য অঞ্চলকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করছে। আজকাল নিউইয়র্কের কোন ব্যাঙ্কে গোলমাল বাধলে থাইল্যাণ্ডে বিপ্লব বাধতে পারে, আমেরিকায় বেশি গম উৎপন্ন হলে ভারতের গমচাষীর আর্থিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে বলে মনে করাই উচিত।

কোন্ কোন্ শক্তি আন্তর্জাতিকতার স্বপক্ষে

উপরন্তু, জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সভা ও সমিতিতে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিগণ এক সঙ্গে মিলে আলাপ-আলোচনা করছে, পারস্পরিক সমস্যাকে বোঝা এবং তা সমাধানের চেষ্টা করছেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক বোঝাবুঝির মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকারের প্রসার এবং আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর, খাদ্যদফতর, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদির কাজকর্মে সকল দেশের মানুষের মনে আন্তর্জাতিকতার মূল সুরটি বেজে উঠছে।

আন্তর্জাতিকতার প্রসার

আন্তর্জাতিক আইনকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে পৃথিবীর জনমত আজকাল অনেক বেশী সচেতন। পৃথিবীর জনমত উপেক্ষা করে কোন জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিষবাষ্পের ব্যবহার, আণবিক বোমার ব্যবহার বা পরীক্ষা ইত্যাদি কাজ ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানুষেরা আজ বিনা দ্বিধায় জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তবুও অনেকে এখনও উটপাখির মত বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণতা পুরানো ব্যাধির মত বহুমানুষের মন জরাজীর্ণ করে রাখছে। আর্থনীতিক স্বার্থ, ধর্মান্ধতা, সামরিক শক্তির উগ্রতা, অপর জাতির প্রতি অবিশ্বাস, ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি আন্তর্জাতিকতার ঘোর বিরোধী। জাতীয় রাষ্ট্রকে সবথেকে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে নির্বিচারে পূজা করাই ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য, তাতেই ব্যক্তির মোক্ষ—এরূপ মত প্রচার করা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের উদার আহ্বান "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও", "শ্রমিকের কোন পিতৃভূমি নেই" আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধকে বৃদ্ধি করে তুলছে। **সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার**

(Proletarian Internationalism) সাম্যবাদী দর্শন আন্তর্জাতিকতার মহান্ আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরেছে। বিশ্বের সকল শোষিত এবং নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য এবং বিশ্বের যে কোন প্রান্তের শোষিত মানুষের সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থন এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের সংগ্রামে এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা কোনক্রমেই সুস্থ জাতীয়তাবাদের বিরোধী নয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে যে সুস্থ ও সৃজনশীল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ তার প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার অন্যতম ভিত্তি।

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা

আমরা বিশ্বাস করি, নদীর গতিধারার মত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বিবর্তন এক আন্তর্জাতিক-রাষ্ট্রের মহা-মোহনায় নিশ্চয় পেঁছবে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ আজ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনায়কদের আণবিক অস্ত্রের আস্ফালনের সামনে কম্পমান; বিজ্ঞানের দম্ভে উন্মত্ত মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব লোপে আজ উদ্যত। আমরা আশা করতে পারি যে, মানুষের অন্তরের শুভবোধ ও মানবতাবোধের উদয় নিশ্চয়ই হবে। জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়ে "মানুষের আইনসভা ও পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র" একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের এ আশা বাস্তবায়িত হতে পারে একমাত্র আন্তর্জাতিকতার মহান্ আদর্শের দ্বারা।

আট : জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism)

জাতীয়তাবাদের বিকৃত পরিণতির ফলে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানব-সমাজের সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে বিশ্ব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে আন্তর্জাতিকতার মহান্ আদর্শ। বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার ওপরে যে আবর্জনার স্তূপ জড়ো করে তুলেছে তা হতে সভ্যতাকে মুক্ত করতে না পারলে মানুষেরও মুক্তি নেই। সে মুক্তি আনতে পারে আন্তর্জাতিকতাবোধ। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, নৈকট্যবোধ ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাবকে জাতীয় গণ্ডী অতিক্রম করে গোটা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত করাকে আমরা 'আন্তর্জাতিকতা' নামে অভিহিত করতে পারি। অর্থাৎ জাতিগত সত্তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বমানবের কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে আন্তর্জাতিকতা বলা হয়। জাতীয়তাবাদের বিকৃতরূপ জন্ম দেয় সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদ। ঐ বিকৃত জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদের বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। "নিজে বাঁচো ও অপরকে বাঁচতে দাও"—এটাই আন্তর্জাতিকতার মূল সুর। অন্য জাতির ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র নিজের জাতির সব কিছুকে চরম ও চূড়ান্ত বলে মনে করার অহমিকা আন্তর্জাতিকতা বিরোধী।

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান যুগে আরিস্টটলের ধারণামত কোন রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বাঁচতে পারে না। তাই প্রতিযোগিতার বদলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। শ্রীনেহরুর ভাষায় বলা যায়, **"শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিকল্প হ'ল সম্মিলিত ধ্বংস"** (**The alternative to peaceful co-existence is co-destruction**)। তাই মানুষের ভালবাসা ও আনুগত্য নিছক রাষ্ট্র ও জাতিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ক্রমশ পরিব্যাপ্তি লাভ করছে। এ জন্যই আন্তর্জাতিক আইনের অনুশাসনে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করছে। আন্তর্জাতিকতার প্রথম সংগঠনগত প্রকাশ ঘটেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘের (League of Nations) মধ্য দিয়ে। আরও সুগঠিত ও সুসংহত আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations)। জাতিগত সার্বভৌমিকতার কিছু অংশ ত্যাগের মধ্য দিয়েই এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে। লাস্কি মনে করেন যে, জাতিগত রাষ্ট্রগুলো সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ পরাধীনতার মধ্যবর্তী একটি অবস্থা গ্রহণ করতে পারলে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হতে পারে এবং তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আন্তর্জাতিকতা একটি মহান্ ও উচ্চস্তরের আদর্শ। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমসাময়িক সমস্যাবলী সমাধানে আন্তর্জাতিকতার আদর্শই একমাত্র কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিকতা আজও সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। তাই অনেকে আন্তর্জাতিকতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারছেন না। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, উগ্র জাতীয়তাবাদের প্লাবনে নিমজ্জিত রাষ্ট্রনায়কগণ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। বিশেষ করে তাঁরা আন্তর্জাতিকতাকে জাতীয়তাবাদের বিরোধী আদর্শ বলে মনে করেন।

এখন প্রশ্ন হল, **জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা কি পরস্পরের বিরোধী আদর্শ—না এরা পরস্পরের পরিপূরক?** আমরা তো মনে করি, জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতা ঘটে আন্তর্জাতিকতার মধ্য দিয়ে। জিমার্ন (Zimmern) যথার্থই বলেছেন যে, **জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিকতায় পেঁছানো সম্ভব** (The road to internationalism lies through nationalism)।

অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, জাতীয়তাবাদের সংগে আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্যের দিক থেকে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। উনিশের শতকে ইতালীর দেশপ্রেমিক মাৎসিনি (Mazzini) মানবসমাজকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন জাতির সমবায় বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ বা সংঘাতের কোন সম্ভাবনা নেই; বরং প্রতিটি জাতিই স্বকীয় প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাৎসিনির জাতীয়তাবাদ মূলত আন্তর্জাতিকতারই পরিপূরক। অন্যদিক থেকে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদের ভিত্তি না থাকলে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিকাশ লাভ করতে পারে না। কারণ নিজে বাঁচা ও নিজের শ্রীবৃদ্ধির মধ্য দিয়েই অপরকে বাঁচানো ও অপরের শ্রীবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করা সম্ভবপর। বিভিন্ন জাতির জাতিগত সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিকতায় পেঁছাবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্বার্থ এবং অশুভ প্রবণতার সংমিশ্রণে জাতীয়তাবাদ আমাদের সমসাময়িক যুগে সুস্থ ও উদারতার পথ পরিত্যাগ করে বিকৃত ও অনুদার হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সংকীর্ণ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতা ও আন্তর্জাতিকতাকে লুপ্ত করে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একটি জাতির মহত্ত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে থাকে। সুতরাং এই বিকৃতি সাময়িক। আমরা বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে সুস্থ জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটবে এবং জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করবে আন্তর্জাতিকতার পাথেয় রূপে।

নমুনা প্রশ্ন

1. জাতি কাকে বলে? কি ভাবে একটি জাতির উৎপত্তি হয়? (এক দেখ)
2. জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দাও। জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। (এক দেখ)
3. জাতীয় জনসমাজের সংজ্ঞা দাও। জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলি কি, কি?
(এক এবং দুই দেখ) [T. S. B. '82]
4. ভারতবাসীকে কি একটি জাতি বলা যায়? (তিন দেখ)
5. জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলি কি কি? ভারতকে কি একটি জাতি বলা যায়?
(দুই এবং তিন দেখ) [H. S. C. '81]
6. জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? এর দোষগুণ আলোচনা কর। (এক এবং পাঁচ দেখ) [H. S. C. '81]

7. শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা কাকে বলে ? (সাত দেখ)
8. জাতীয়তার উপাদানগুলো আলোচনা কর। (দুই দেখ)
9. জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর। এদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলোর উল্লেখ কর। (এক এবং দুই দেখ) [H. S. C. '78, '79]
10. জাতীয় জনসমাজ বলিতে কি বোঝায় ? জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানগুলো আলোচনা কর। (এক এবং দুই দেখ) [H. S. C. '85]
11. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? (চার দেখ) [H. S. C. '78]
12. "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতিটি আলোচনা কর। (চার দেখ)
13. রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উচিত ? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। (চার দেখ) [H. S. C. '83]
14. 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' তত্ত্বটি আলোচনা কর। এই নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করা হয় ? (চার দেখ) [H. S. C. '80, '82]
15. একজাতিক রাষ্ট্র কাকে বলে ? একজাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে এবং বিপক্ষে, যুক্তিগুলো আলোচনা কর। (চার দেখ)
16. জাতীয়তাবাদ কাকে বলে ? জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? (এক এবং আট দেখ) [H. S. C. '78]
17. জাতীয়তাবাদের দোষ-গুণ আলোচনা কর। (পাঁচ দেখ)
18. "জাতীয়তাবাদ সভ্যতার শত্রু"—আলোচনা কর। (ছয় দেখ)
19. জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা কর। (আট দেখ) [H. S. C. '81]
20. জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার বিরোধী ? যুক্তিসহ আলোচনা কর। (আট দেখ) [H. S. C. '82]
21. জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝায় ? ইহা কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? (এক এবং আট দেখ) [H. S. C. '84]
22. "জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিকতায় পেঁছানো যায়"—আলোচনা কর। (আট দেখ)
23. 'আন্তর্জাতিকতা'র ওপর টীকা লিখ। (সাত দেখ) [T. S. B. '82]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. (ক) জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি উপাদানের নাম লিখ।
   (খ) "জাতীয়তাবাদ সভ্যতার শত্রু"—একথা কে বলেছেন ?
   (গ) আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্বটিকে অন্য কি নামে অভিহিত করা হয় ?
   (ঘ) একটি করে একজাতি-ভিত্তিক ও বহুজাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রের নাম কর।
2. যথাস্থানে টিক্ দাও :
   (ক) জাতীয়তা একটি (সামাজিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক) অনুভূতি।
   (খ) (সুস্থ, বিকৃত) জাতীয়তাবাদ সভ্যতার শত্রু।
   (গ) জাতীয়তাবোধ + (সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র) = জাতি।
   (ঘ) জনসমাজ + রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা = (রাষ্ট্র, জাতীয় জনসমাজ, জাতি)
   (ঙ) জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এমন একটি অধিকার যার দুদিকে ধার—এ কথা বলেছেন (মিল, রবীন্দ্রনাথ, লর্ড কার্জন)

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

... ...

—**Preamble of the UN Charter**

৬

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

The United Nations

প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎসতা, ব্যাপক নরহত্যা ও সর্বগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বশান্তি স্থাপন ও রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯১৯ সালে জাতিসংঘ বা *League of Nations*-এর সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'আন্তর্জাতিকতা'র আলোচনায় "মানুষের আইনসভা ও পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের" যে আশা ও প্রয়োজন ব্যক্ত হয়েছে বস্তুত তার প্রথম বাস্তব অভিব্যক্তি ঘটে জাতিসংঘের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে মহান্ উদ্দেশ্যে পালনের জন্য জাতিসংঘের জন্ম হয়, জাতিসংঘ সেই উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এর আর কোন কার্যকর ভূমিকা থাকে না। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের অবলুপ্তি ঘটে এবং তার পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতির অগ্রগতি এবং মানব সভ্যতা বিকাশে সাহায্য করবে—এই প্রত্যাশা নিয়ে বিশ্বের মানুষ জাতিপুঞ্জের দিকে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

এক ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তির পটভূমিকা (Background of the Origin of United Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি দেখে পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাতের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে প্যারিস সম্মেলনে ১৯১৯ সালে জাতিসংঘ গঠন করা হয়। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো জাতিসংঘকে কুক্ষিগত রেখে নিজেদের ক্ষমতালাভের অস্ত্র হিসেবে তাকে ব্যবহারের চেষ্টা করায় জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়। তাই জাতিসংঘের অস্তিত্বকালেই পৃথিবীতে বীভৎস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয়। জাতিসংঘের ব্যর্থতা দেখে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই। ১৯৪৫ সালে গঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। **এক কথায় জাতিসংঘের ধ্বংসাবশেষের ওপরে গড়ে ওঠে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।**

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম ১৯৪৫ সালে হলেও মনে রাখতে হবে যে, এরূপ একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ১৯৪১ সাল থেকে। প্রচেষ্টাও তখন থেকেই শুরু। ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'আতলান্তিক সনদ' নামে এক আটদফা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকটি দেশ যাতে স্বাধীনতাসহ শান্তিতে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। পরে পৃথিবীর ২২টি রাষ্ট্র ঐ আতলান্তিক সনদের মূল নীতির প্রতি সমর্থন জানায় এবং ঐ ঘোষণা পত্র "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা" (United Nations Declaration) নামে পরিচিতি লাভ করে।

উৎপত্তি

এর পর ১৯৪৩ সালে সোবিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা মস্কোতে মিলিত হয়ে পৃথিবীর শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম-সমতার নীতির (principles of the sovereign equality of states) ওপর ভিত্তি করে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐক্যমত হন। ১৯৪৪ সালে ডামবার্টন ওকসে (Dumbarton Oaks) সোবিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও চিয়াং-কাই-শেকের চীনের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্য সনদের একটি খসড়া রচনা করেন। ঐ খসড়া সনদটি ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে পেশ করা হয়। সম্মেলনে ঐ খসড়াটি পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে তা জাতিপুঞ্জের সনদ (Charter of the U. N.) হিসেবে ঘোষিত হয়। ঐ সম্মেলনই ভবিষ্যৎ জাতিপুঞ্জের রূপরেখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতিসংঘ ভেঙ্গে দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠনের সিদ্ধান্তও ঐ সম্মেলনে গৃহীত হয়। বলা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর জাতিপুঞ্জের আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হল। এই প্রসঙ্গে নিকোলাসের একটি চমকপ্রদ উক্তি স্মরণীয়, 'নবজাত সংস্থাকে (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ) নিয়ে উত্তেজনার আতিশয্যে অবলুপ্ত সংস্থাটির (জাতিসংঘ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা পর্যন্ত সকলে বিস্মৃত হয়েছিল।'

দুই ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি (Aims and Principles of United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি খুব স্পষ্ট, সুন্দর ও কাব্যিক ভাষায় সনদের মুখবন্ধ ও প্রথম অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য

মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, বিগত দুটি বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলে মানব সম্প্রদায়কে অপরিসীম

লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধের বিপদ হতে আগামী দিনের মানব সমাজকে রক্ষা করতে এবং মূল মানবাধিকারগুলো রক্ষা করতে কৃতসংকল্প। সনদের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে :

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এই উদ্দেশ্যে যে কোন শান্তি-ভঙ্গের আশংকা ও আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য জাতিপুঞ্জ যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণে বদ্ধপরিকর থাকবে।

২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও জাতিপুঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩. কেবলমাত্র বিশ্বশান্তি রক্ষা নয়, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক অধিকারসহ মৌলিক অধিকারগুলোকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্য সনদে ব্যক্ত হয়েছে।

৪. সকল জাতির সমান অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে স্বীকৃতিদান করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সহাবস্থান ও সহযোগিতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য সকল জাতিগুলোর কার্যক্রমের মিলনক্ষেত্র হিসেবে জাতিপুঞ্জ আত্মপ্রকাশ করবে বলে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের নীতি

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো যাতে কার্যকর হতে পারে সেজন্য জাতিপুঞ্জের সনদের **দ্বিতীয় ধারায় কয়েকটি স্বীকৃত নীতির কথা বলা হয়েছে।** একদিকে জাতিপুঞ্জের সনদে সকল জাতির সার্বভৌমগত সাম্য স্বীকার করা হয়েছে ; অন্যদিকে, জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলো সনদ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়দায়িত্ব হিসেবে কতকগুলো নীতির কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত, যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো সচেষ্ট থাকবে।

দ্বিতীয়ত, কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা সনদবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকা থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিরত থাকবে।

তৃতীয়ত, সদস্য রাষ্ট্রগুলো জাতিপুঞ্জ কর্তৃক যে-কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যক্রমের (action) সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং ঐ রাষ্ট্রকে কোনও প্রকার সাহায্যে দান করতে পারবে না।

এ ছাড়াও নীতি হিসেবে বলা হয়েছে, যে সকল রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় তারাও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী চলে জাতিপুঞ্জ তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে। **নীতি হিসেবে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে,** কোনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

জাতিপুঞ্জের সনদ কর্তৃক ঘোষিত **উদ্দেশ্য ও নীতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে** তা জানতে হলে জাতিপুঞ্জের বিগত ৩৮ বছরের কাজকর্ম বিশ্লেষণ করা দরকার। সে আলোচনা পরে করা হবে।

তিন : জাতিসংঘের সংগে জাতিপুঞ্জের তুলনা (Comparison between League of Nations and United Nations)

অনেক লেখক জাতিপুঞ্জকে জাতিসংঘেরই একটি নবতর রূপ বলে অভিহিত করেছেন। এ দুটি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি স্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বৈসাদৃশ্যগুলোও উপেক্ষণীয় নয়। অত্যন্ত সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হ'ল।

উভয় সংস্থাই বিশ্বাস করে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল সুসংবদ্ধ যৌথ উদ্যমের দ্বারাই অর্জন করা যেতে পারে। উভয় সংস্থাই কতকগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ, যদিও

জাতিসংঘের ক্ষমতা ছিল সীমিত। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রায় অবিকৃত প্রতিরূপ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আকৃতি ও প্রকৃতিতে উভয় সংগঠনেই একই রূপ। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ বস্তুত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আদর্শেই গঠিত হয়েছে। এ সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, শুধুমাত্র নিরস্ত্রীকরণ ও সংখ্যালঘু নিরাপত্তার বিষয়গুলো বাদে জাতিসংঘের প্রতিটি কর্তব্যকর্মই কোন-না-কোন আকারে জাতিপুঞ্জের মধ্যে পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে।

উপরোক্ত মিল থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যেরও অভাব নেই। জাতিসংঘ অপেক্ষা জাতিপুঞ্জ অধিকতর উজ্জ্বল এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন না হলে এর প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হত না। জাতিসংঘে তৎকালীন পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রগুলো কখনই একসঙ্গে সদস্যপদভুক্ত হয়নি। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বর্তমান পৃথিবীর সকল বৃহৎ শক্তিই উপস্থিত। অধ্যাপক ইগ্লটন বলেন যে, যদিও দুটি সংগঠনের মধ্যে আকৃতিগত ও গঠন-সংক্রান্ত সাদৃশ্য দেখা যায়, তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতা এবং অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘের চেয়ে জাতিপুঞ্জ ভিন্ন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তিগুলোর অবস্থা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। বৃহৎ যুদ্ধ সাধারণত বৃহৎ শক্তিগুলোর সংঘাতের ফলেই ঘটে থাকে। অতএব ঐ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে মতৈক্য ঘটলে তবেই নিরাপত্তা পরিষদের অধিকংশ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাবে এবং তার ফলে সম্ভবত যুদ্ধ পরিহার করা যাবে—এটাই জাতিপুঞ্জের সনদের মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট উপসংস্থাগুলোর কার্যপ্রণালী জাতিসংঘের অধীনস্থ সংস্থা অপেক্ষা ব্যাপকতর ও বেশী স্পষ্ট। জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন জাতিসংঘের দুই পরিষদের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের চেয়ে অনেক বেশি যথাযথ। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (covenant) 'শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য' আগ্রহী ছিল, তবে 'শান্তি' বলতে সেখানে যুদ্ধ পরিহার করাকেই বোঝান হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ্য কূটনীতি, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সনদে ঐ বিষয়গুলো ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। উপরন্তু মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথাও সনদে ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক ও সামাজিক সংস্থাটিকে একটি মুখ্য সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জাতিপুঞ্জের উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নতুনতর সংস্থা গঠনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই সকল দিক থেকে বিচার করলে জাতিপুঞ্জকে জাতিসংঘের নিছক নব সংস্করণ বলা হয়তো ঠিক নয়।

চার : জাতিপুঞ্জের গঠন ও কাঠামো (Composition and Structure of the United Nations)

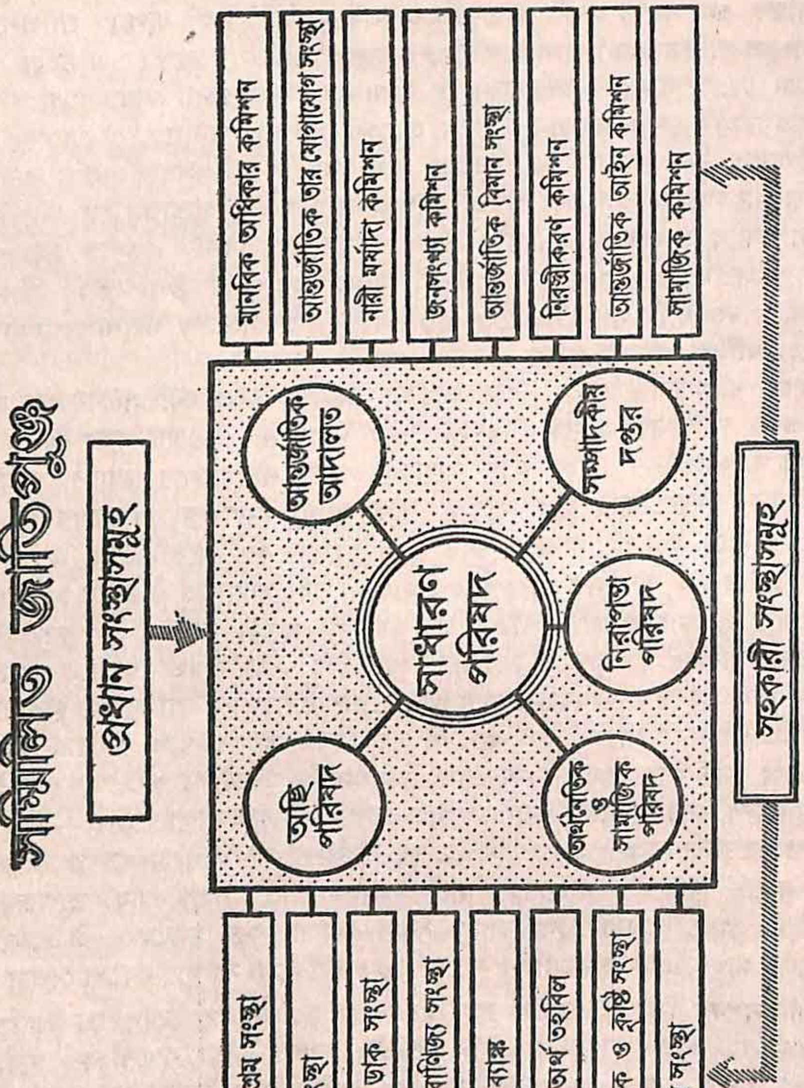
জাতিপুঞ্জের গঠন ও কাঠামো জাতিপুঞ্জের সংবিধান বা সনদের মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সংবিধানকে বলে সনদ (Charter of the U. N.)। মুখবন্ধ সহ ১১১টি ধারা নিয়ে জাতিপুঞ্জের সনদ রচিত হয়েছে।

৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যে জাতিপুঞ্জের যাত্রা ১৯৪৫ সালে শুরু হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৫৬টি; সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নিয়েই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

নতুন সদস্য গ্রহণ

জাতিপুঞ্জের সনদের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সনদে বর্ণিত সদস্যরাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করে যে কোন শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রই জাতিপুঞ্জের সদস্য হবার অধিকারী। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে জাতিপুঞ্জকে দেখতে

[জাতিপুঞ্জের ছ'টি প্রধান এবং কয়েকটি সহযোগী সংস্থার ছক]



হবে যে, জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে ঐ রাষ্ট্র সক্ষম ও ইচ্ছুক কিনা। কোন রাষ্ট্রকে সদস্য করতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

জাতিপুঞ্জ কোন্ কোন্ প্রধান সংস্থা এবং কোন্ কোন্ সহকারী সংস্থা নিয়ে গঠিত হবে তা জাতিপুঞ্জের সনদের সাত এবং দুই নম্বর ধারায় বলা হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের সনদের ৭নং ধারা অনুযায়ী **ছটি প্রধান সংস্থা নিয়ে জাতিপুঞ্জ গঠিত।** ঐ সংস্থাগুলো হ'ল ঃ

ক. **সাধারণ পরিষদ** (General Assembly)
খ. **নিরাপত্তা পরিষদ** (Security Council)
গ. **আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ** (Economic and Social Council)
ঘ. **অছি পরিষদ** (Trusteeship Council)
ঙ. **আন্তর্জাতিক বিচারালয়** (International Court of Justice)
চ. **মহাকরণ বা সম্পাদকীয় দপ্তর** (Secretariat)

উপরোক্ত প্রধান সংস্থাগুলি ছাড়াও জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য সনদের ২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী **প্রয়োজনীয় সহকারী সংস্থা** (Subsidiary Organs) গঠনের কথা বলা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)
২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
৩. আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (IBRD)
৪. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)
৫. শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO)
৬. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)
৭. শিশু সাহায্য ভাণ্ডার (UNICEF)
৮. আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)
৯. আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)
১০. আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন (UPU)

জাতিপুঞ্জের প্রতিটি প্রধান সংস্থা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাঁচ ঃ সাধারণ সভা (General Assembly)

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য নিয়ে সাধারণ সভা গঠিত। অর্থাৎ জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য রাষ্ট্রই সাধারণ সভার সদস্যভুক্ত। প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অনধিক পাঁচজন করে প্রতিনিধি সাধারণ সভায় পাঠাতে পারে। তবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের ভোট-সংখ্যা একটি। সাধারণ সভা প্রতি বছর একজন সভাপতি নির্বাচিত করে। এ ছাড়াও সতের জন সহ-সভাপতি এবং স্থায়ী কমিটিগুলোর জন্য (Standing Committees) সাতজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ সভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাতটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে।

গঠন

কার্যাবলী

সাধারণ সভার কার্যাবলী জাতিপুঞ্জের সনদের ১০ থেকে ১৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ সভার কাজকে পাঁচটি ভাগে করা যায় ঃ ১. নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ, ২. আইন প্রণয়ন জাতীয় কাজ, ৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনে সাহায্য করার জন্য রাজনৈতিক কাজ, ৪. পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজ, ৫. জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য নির্বাচন। নিরাপত্তা পরিষদে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়ে গিয়েছে বা আলোচিত হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে অনুমোদন করার অধিকার সাধারণ পরিষদের নেই। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভাকে অনুরোধ করলে আলাদা কথা। জাতিপুঞ্জের সনদে সাধারণ সভাকে ব্যাপক অনুসন্ধান ও আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ সভা যে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কেবলমাত্র 'সুপারিশ' করতে পারে—সিদ্ধান্ত বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ভোগ করে না। সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়সূচী সেক্রেটারী-জেনারেল স্থির করেন।

সভাপতি নির্বাচন

সাধারণ সভার প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে এর সভাপতি নির্বাচন করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিনিধিরা সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচিত হতে পারেন না। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বাইরে থেকে একজনকে সাধারণ সভার সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে হয়।

সাধারণ বিতর্ক

সাধারণ সভার প্রত্যেক বাৎসরিক অধিবেশনের সূত্রপাত হয় একটি 'সাধারণ বিতর্ক'-এর দ্বারা। শান্তিরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় ঐ বিতর্কে স্থান পায়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সহযোগিতার সাধারণ নীতি নিয়ে সাধারণ সভা আলোচনা করে। নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র সীমিত করার নীতি নিয়েও সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারে।

এবার সাধারণ সভার কার্যাবলী আলোচনা করা যেতে পারে।

১. নীতি নির্ধারণ

সাধারণ সভার প্রথম কাজ হ'ল নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ। সনদের ১১(১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারবে।

২. আইনমূলক

সাধারণ সভার আবশ্যিক কাজ হল আন্তর্জাতিক আইন ও এর সংকলনের উন্নতি ও প্রসারে উৎসাহ দেওয়া। এ ব্যাপারে সাধারণ সভার অনুমোদন যদিও আইনের মর্যাদা লাভ করে না, তথাপি এর কার্যধারা জাতীয় আইনসভার কার্যপ্রণালীরই মত। এই কারণে সাধারণ সভাকে *Quasi-Legislature* বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসার এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আবশ্যিক কর্তব্য সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৩. রাজনৈতিক কাজ

সাধারণ সভার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব হল বিশ্বে নূতন ও উন্নত আইনগত শৃংখলা ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে সহায়তা করা। এই কর্মাধিকারের দ্বারাই সাধারণ সভা প্যালেস্টাইন বিভাজনের পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করেছিল, যার ফলে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল।

৪. পর্যবেক্ষণ

সাধারণ সভা সচিবালয়সহ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে বিভিন্ন অঙ্গসহ সমগ্র সংগঠনের প্রশাসনিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গ বা সংস্থাকে সাধারণ সভার কাছে কাজকর্মের প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।

৫. নির্বাচন করা

জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী সাধারণ সভার আর একটি কাজ হল নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের, আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং অছি পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন করা। ঐ সব সদস্যদের সাধারণ সভার দু-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের মহাসচিবকে (Secretary General) সাধারণ সভা নির্বাচন করে। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণও নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কোন রাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ প্রদান করতে পারে এবং জাতিপুঞ্জের সনদবিরোধী কার্যে লিপ্ত থাকার জন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাতিল করতে পারে।

সাধারণ সভার রাজনৈতিক কার্যাবলীই বেশি গুরুত্ব অর্জন করেছে এবং এ ব্যাপারে এই সংস্থা বিশেষ সাফল্যেরও পরিচয় দিয়েছে। একথা সত্য যে, সনদ রচয়িতাগণ এ বিষয়ে নিরাপত্তা

পরিষদ অপেক্ষা সাধারণ সভাকে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় পরিণত করতে নিশ্চয়ই আগ্রহী ছিলেন না। সাধারণ সভার ক্ষমতার এই সম্প্রসারণের প্রধান কারণ হল বৃহৎ শক্তিগুলোর মতানৈক্যের ফলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রায়শই একটি অক্ষম সংস্থায় পরিণত হয়ে থাকে। তার ওপরে 'ভিটো' প্রয়োগের ফলে মাঝে মাঝে অবস্থা আরও জটিল হয়ে থাকে।

১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে **'শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি' (Uniting for Peace)** প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সভার কার্যধারা একটি নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং সাধারণ সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দিলে, বা শান্তিভঙ্গ ও আক্রমণাত্মক কাজকর্ম সংগঠিত হলে নিরাপত্তা পরিষদই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—এটাই ছিল সনদ রচয়িতাদের অভিপ্রায়। কিন্তু সাধারণ সভা ঐ ক্ষমতাটিকে আত্মসাৎ করায় এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদের অকর্মণ্যতা যেন আরও বৃদ্ধি পায়।

ভোটদান পদ্ধতি

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র পাঁচজন করে প্রতিনিধি সাধারণ সভায় পাঠাতে পারলেও প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সাধারণ সভায় একটি করে ভোট থাকে। সব 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের **দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন।** গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোন সুপারিশ করা এবং পূর্বে উল্লেখিত সদস্যদের নির্বাচন করা। অন্যান্য সকল প্রশ্নে সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জাতিসংঘের **(League of Nations)** সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদের মতৈক্যের প্রয়োজন হত। সুতরাং বলা যায়, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও উন্নত।

সাধারণ সভার ভারসাম্যে পরিবর্তন

এতদিন সাধারণ সভা গুরুত্বহীন একটি আলোচনা সভা হিসাবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু ইদানীংকালে সাধারণ সভার ভারসাম্যে একটা ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেওয়ায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদিন আফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন না হবার জন্য এরা জাতিপুঞ্জের সদস্য ছিল না। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমর্থক সদস্যদের সংখ্যা সাধারণ সভায় বেশি ছিল। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ সভাকে নিজের ইচ্ছেমত কাজে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে এসেছে। কিন্তু সম্প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার অনেকগুলো রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করায় সাধারণ সভায় পৃথিবীর জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে। **সাধারণ সভার পুরোনো ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে এক নূতন ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে।** ঐ সকল সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলোর বেশির ভাগ যদিও সাম্যবাদী রাষ্ট্র নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরা সাধারণ সভায় মার্কিন বিরোধী শিবিরের ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে। জাতিপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিনিধি মিঃ ময়নিহান তাই এই নতুন ভারসাম্যকে "সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা" **(Tyranny of Majority)** বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মূল্যায়ন

জাতিপুঞ্জের সনদের রূপকারগণ সাধারণ সভাকে শক্তিশালী ও কার্যকর সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা একে নিছক একটি প্রচারধর্মী ও আড়ম্বরপূর্ণ বিতর্ক সভায় আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। সাধারণ সভার আলোচনায় বিষয়বস্তুর ওপর বাধা আরোপ করা হয়েছিল এবং একে সুপারিশের উর্ধ্বে কোন কার্যকর ভূমিকা পালনের অধিকার হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। অথচ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে এই সভারই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা সজ্জিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ এটি পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিমূলক সংস্থা। এ সংস্থার মধ্য দিয়েই বিশ্ববিবেক তথা বিশ্বজনমত প্রতিফলিত হয়। সুতরাং সাধারণ সভার

প্রতিনিধিমূলক চরিত্র এবং এখানে বিশ্বজনমতের প্রতিফলন ঘটে বলে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

আগের আলোচনা-ধারা থেকে এটা পরিষ্কার যে জাতিপুঞ্জের সনদ রচয়িতাদের ইচ্ছাকে সম্মান প্রদর্শন না করে সাধারণ সভার উত্থান ঘটেছে এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ট্রেকের (Strake) মতে এটা স্মরণীয় যে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। সাধারণ সভার ক্ষমতারই শুধু সম্প্রসারণ ঘটেনি, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর মর্যাদা ও ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ সভার চলার পথে আইনগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এর বহু ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সাধারণ সভার ওপরে আস্থাশীল। যে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধের পেছনে কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তির অদৃশ্য হাত থাকে, ঐ বৃহৎ শক্তিগুলোর ঐক্যমতের ওপর বিশ্বশান্তি নির্ভরশীল হলে শান্তি স্থাপন ও বিরোধের মীমাংসার আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। তাই নিরাপত্তা পরিষদ নয়, সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ সভাই আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু।

ছয় ঃ নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)

পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতিপুঞ্জের সনদের ২৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ ৫ জন স্থায়ী সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। ১৯৬৫ সালে সনদের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করা হয়। **বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদ ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত, এদের মধ্যে ৫ জন স্থায়ী সদস্য এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য।** স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে আছে ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, জনগণতান্ত্রিক চীন[১] ও ব্রিটেন। ঐ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য ছাড়া আছেন ১০ জন অস্থায়ী সদস্য—যারা সাধারণ সভার দ্বারা দু বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই দশটি অস্থায়ী আসনের মধ্যে ৫টি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলোর জন্য, ২টি পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর জন্য, ২টি ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর জন্য এবং ১টি পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে।

গঠন

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা সীমিত বলে ঐ সংস্থা আকারে ক্ষুদ্র। একে এরূপ ভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে এই সংস্থা বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে দ্রুত মিলিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে প্রতি মাসে ইংরাজী ভাষার নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী ১৫ জন সদস্যের মধ্য হতে এক-একজন সভাপতিত্ব করেন। নিরাপত্তা পরিষদের কমিটির সংখ্যা কম। এদের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন (Disarmament Commission) এবং সামরিক কমিটির (Military Committee) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভোট পদ্ধতি এবং ভিটো ব্যবস্থা

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন প্রণালী ও ভোটদানের পদ্ধতি এরূপ যে, কোন বৃহৎশক্তি বা তার সমর্থনকারী কোন রাষ্ট্রকে দোষী বলে ঘোষণা করা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। সনদ অনুযায়ী স্থায়ী পাঁচজন সদস্য কোনও বিষয়ে ঐক্যমত না হলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তা কার্যকর হতে পারবে না। **অর্থাৎ পাঁচজন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে কোন একটি সদস্য-রাষ্ট্র যদি কোন নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন (একে বলা হয় ভিটো) তবে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাবে।** স্থায়ী সদস্যরা কোন প্রস্তাবে দুবার ভোটদানের অধিকারী—একবার নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে এবং দ্বিতীয়বার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে। **একে দ্বৈত ভিটো বলে।**

১. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনগণতান্ত্রিক চীনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করে 'ভিটো'-এর জোরে কুয়োমিংটাং চীনকে জাতিপুঞ্জ এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রেখেছিল।

নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলী

সনদ প্রণেতাগণ নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্যকর সংস্থার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এ জন্যই সনদের ২৪ নম্বর ধারায় জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে। সনদে আরও বলা হয়েছে যে, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পরিষদ যে সব কাজ সম্পন্ন করবে তা সদস্যদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে ধরা হবে। তবে নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতির সংগে সঙ্গতি রেখে কর্তব্য পালনে অগ্রসর হতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য সম্বন্ধে উপরোক্ত নির্দেশ ধারার (**guide line**) পটভূমিকায় এবার পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা যেতে পারে।

১. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা

নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অভিভাবক। কারণ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কোন বিবাদ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দেয়, তবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ঐ বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য পরিষদ বিবদমান রাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানাতে পারবে। ঐ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে ক. আলাপ-আলোচনা, খ. অনুসন্ধান, গ. মধ্যস্থতা, ঘ. সমন্বয় সাধন (conciliation), ঙ. সালিশী, চ. বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকরণ, ছ. আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাপনার মাধ্যম গ্রহণ বা অন্য যে কোন উপায় গ্রহণ (৩৩ নম্বর ধারা)। পরিষদের প্রাথমিক চেষ্টা হবে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য যে কোন পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করানো। সনদে ঐ পদ্ধতিগুলোকে, আন্তর্জাতিক বিবাদের 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসা' পদ্ধতি (**Pacific Settlement of Disputes**) বলে।

ঐ উপায়গুলো ব্যর্থ হলে নিরাপত্তা পরিষদ দোষী সদস্যদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দ্বারা বিবাদ মীমাংসা করতে পারে।

২. নিয়োগ

জাতিপুঞ্জের নতুন সদস্য রাষ্ট্র গ্রহণ, মহাসচিব নির্বাচন, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ সভার কাছে সুপারিশ করে। উপরোক্ত সুপারিশগুলোর জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য সহ নয়টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন।

৩. নিরস্ত্রীকরণ

পৃথিবীর মানবিক ও আর্থিক সম্পদ যাতে মারণাস্ত্রের জন্য বেশী ব্যবহৃত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব। সম্প্রতি নিরস্ত্রীকরণ এবং অস্ত্র সীমিতকরণ নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সনদ সংশোধন

জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধনের প্রস্তাব সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হতে হয়। কিন্তু ঐ প্রস্তাব কার্যকর ও বলবৎ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।

৫. অছি

অছি ব্যবস্থাধীন এলাকাগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, ঐ সকল এলাকার রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদ পালন করে।

মূল্যায়ন

স্থায়ী পাঁচটি রাষ্ট্রের ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকর ভূমিকাকে বহুলাংশে হ্রাস করেছে। বস্তুত, দু শিবিরে বিভক্ত বিশ্বে কোন সমস্যার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা গণচীনের ঐক্যমত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। নীতি, আদর্শ ও

মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য এদের মধ্যে খুবই বেশি বলে ভিটোর প্রয়োগও খুব বেশি। ভিটো প্রয়োগের ফলে নিরাপত্তা পরিষদে প্রায়ই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অথচ সনদের রচয়িতাদের নিরাপত্তা পরিষদ সম্পর্কে উচ্চাশার সীমা ছিল না। এ কারণেই অধ্যাপক নিকোলাস বলেছেন যে, **জাতিপুঞ্জের অন্য সকল সংস্থা থেকে নিরাপত্তা পরিষদই প্রতিশ্রুতি ও কৃতকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।**

নিরাপত্তা পরিষদের ঐ অক্ষমতাকে ঢাকার জন্য জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে কতকগুলো আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর বিহিত করার দায়িত্ব এদের উপর ন্যস্ত, তবে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্যই নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের দিক থেকে বলতে গেলে আশ্বাসের কথা এই যে, বর্তমান শতকের ষাটের দশক থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব ও মর্যাদা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কঙ্গো ও সাইপ্রাসের মাধ্যমেই নিরাপত্তা পরিষদের জাতিপুঞ্জের কার্য সম্পাদিত হয়েছে। একথা বললে নিশ্চয় অন্যায় হবে না যে, ভিটো সংক্রান্ত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তা পরিষদের ছোট আকার এবং গঠনগত সংঘবদ্ধতা একে সাধারণ পরিষদের চেয়ে বেশি সক্রিয় হবার সুযোগ দিয়েছে।

সাত : আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)

উদ্দেশ্য ও গঠন

জাতিপুঞ্জের সনদ রচয়িতারা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক ও আর্থনীতিক প্রগতির ওপর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক, আর্থনীতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন ধারণের মান ইত্যাদির উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান সংস্থা হিসেবে গঠন করা হয়েছে। আগে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৭ জন। **বর্তমানে ৫৪ জন সদস্য নিয়ে** এই পরিষদ গঠিত এবং প্রতি বছর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

কার্যাবলী

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ যে কোন আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বা ঐ সকল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রকে সাধারণ পরিষদের কাছে বা জাতিপুঞ্জের যে কোন বিশেষজ্ঞ সংস্থার (Specialised Agency) কাছে বক্তব্য বা সুপারিশ পেশ করতে পারে। এই পরিষদ নিজের কার্যধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারে। সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থনীতিক কাজের দায়িত্ব এই পরিষদ গ্রহণ করতে পারে।

আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের কার্যধারা খুবই জটিল। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদকে কাজ করতে হয়। কিন্তু এ পরিষদের প্রধান কাজ মূলত বিভিন্ন কমিশন, বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলো আছে যাদের কাজের সঙ্গে সাধারণ পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আবার কতকগুলো সংস্থা আছে যাদের কাজের অংশবিশেষের সঙ্গে সাধারণ পরিষদ জড়িত।

সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিষদের প্রধান দায়িত্ব পালন করে সাতটি কমিশন। ঐগুলো হল : পরিসংখ্যান কমিশন, জনসংখ্যা কমিশন, সামাজিক কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সংখ্যালঘু রক্ষা কমিশন, নারীর মর্যাদা রক্ষা কমিশন, উত্তেজক মাদকদ্রব্য কমিশন। এ ছাড়াও ইউরোপীয় আর্থিক কমিশন (ECE), এশিয়া ও দূর প্রাচ্য আর্থিক কমিশন (ECAFE), লাতিন আমেরিকা

আর্থিক কমিশন (ECLA) এবং আফ্রিকা আর্থিক কমিশন (ECA) প্রভৃতি আঞ্চলিক কমিশনগুলো নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের অনেক বিশেষজ্ঞ সংস্থার কার্যাবলী আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), শিশু সাহায্য ভাণ্ডার (UNICEF), আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IME) ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ সংস্থার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মানব অধিকার সংক্রান্ত কমিশন (Commission on Human Rights) একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা।

আট ঃ অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

জাতিপুঞ্জের অধীনস্থ ও ম্যাণ্ডেট রাজ্যগুলোর জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য অছি পরিষদকে গঠন করা হয়েছে। অছি পরিষদের প্রধান দায়িত্ব হল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, অছি পরিষদের অধীনস্থ শাসনাধীন রাজ্যগুলোকে উন্নত করা এবং তাদের স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত করে তোলা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ৮০০ মিলিয়ন মানুষ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে বাস করত। যুদ্ধের পরে ৬০০ মিলিয়ন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হলেও এখনও ব্যাপক জনগণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঐ সব জনগণকে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই অছি পরিষদের সৃষ্টি।

জাতিসংঘের অধীনে যে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা ছিল জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদ তারই উত্তরাধিকারী। তবে ম্যাণ্ডেট ব্যবস্থা থেকে অছি পরিষদ বিস্তৃত ক্ষমতার অধিকারী, বেশি শক্তিশালী এবং অনেক উদার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিপুঞ্জের সনদে অছি পরিষদের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে ঃ

উদ্দেশ্য

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান ; ২. অছি ব্যবস্থার অধীনস্থ অঞ্চলকে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার উন্নয়নের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের উপযোগী করা ; ৩. জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যকে ঐ সকল অঞ্চলে (অছি এলাকায়) সামাজিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমান সুযোগ দান।

জাতিপুঞ্জের সনদের ৮৭ এবং ৮৮ নম্বর ধারায় অছি পরিষদের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত, এটা অছি এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জন্য কতকগুলো প্রশ্ন পেশ করে এবং তাদের উত্তর গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, শাসিত অঞ্চল থেকে আবেদনপত্র অছি পরিষদ গ্রহণ করে। তৃতীয়ত, প্রয়োজনবোধে অছি পরিষদ শাসিত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে।

ক্ষমতা

ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত এলাকাগুলো যাতে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, এটাই অছি পরিষদের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছে একথা বলা যায়। ১৯৬০ সালের আগে টোগোল্যাণ্ড, ফরাসী ক্যামেরুণ ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬১ সালে টাংগানিকা ও পশ্চিম সামোয়া এবং পরবর্তীকালে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডী ও দক্ষিণ ক্যামেরুণ স্বাধীনতা লাভ করে।

নয় ঃ আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কিত বিষয়াদি, বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিচার ও আন্তর্জাতিক অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় বিচারের জন্য জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রসংঘের সময়কার স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়েরই এটা নবরূপ।

মোট ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত। বিচারপতিরা নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা কর্তৃক ন' বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগের জন্য প্রার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ, স্বদেশের সর্বোচ্চ আদালতে নিয়োগের যোগ্যতা, অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইনজ্ঞ হিসেবে সুনাম থাকা প্রয়োজন। একই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্য থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে একাধিক বিচারক নিয়োগ করা যাবে না। বিচারকগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নিয়োগ করেন।

গঠন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থিত হতে পারে। ঐ সব বিরোধের ক্ষেত্রে বিবদমান উভয় রাষ্ট্রই যদি আন্তর্জাতিক আদালতের এক্তিয়ার গ্রহণ করে, তা হলেই সেই বিরোধ এই আদালতে উপস্থিত করা যাবে। অনেক রাষ্ট্রই কয়েক শ্রেণীর বিরোধ ঐ আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করবে বলে 'স্বীকৃতি-মূলক শর্তে'' স্বাক্ষর করেছে। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য এই আদালতকে চরম বা চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক আদালত বলা যায় না। মরগেনথু যথার্থই বলেছেন, *The International Court of Justice is in no sense a Supreme Court of the world which may decide, with final authority, appeals from the decisions of other internattional tribunals.*

এক্তিয়ার

আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদালত বহু বিরোধের মীমাংসা করেছে। এদের মধ্যে ইংরাজ সরকারের আংলো-ইরাণীয় তৈল কোম্পানী জাতীয়করণ সংক্রান্ত বিরোধ, মরোক্কায় মার্কিন নাগরিকদের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিরোধ, ভারত ও পর্তুগালের মধ্যে দাদরা ও নগর হাভেলী নামক দুটি স্থানে যাতায়াতের অধিকার সম্পর্কে বিরোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ গঙ্গার জল বণ্টন সংক্রান্ত বিরোধ আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থিত করবে বলে হুমকী দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিছুদিন আগে এ আদালতের রায়ে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার ওপর দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করায় ঐ আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নিকোলসন মন্তব্য করেছেন যে, ঐ আদালত যদি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজনৈতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, তবে আদালত হিসেবে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে (Indeed if it gets too much involved in what are essentially political quarrels the Court might run the risk of appearing merely the judicial instrument of the General Assembly)

দশ ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর (Secretariat)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৭ নম্বর ধরায় বলা হয়েছে যে, **একজন মহাসচিব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মী নিয়ে সম্পাদকীয় দপ্তর গঠিত হবে।** সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করা হবে, কিন্তু সংগঠন-বহির্ভূত কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তারা নির্দেশ গ্রহণ করবেন না। সনদে জাতিপুঞ্জের কর্মীদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের নিয়োগ করেন মহাসচিব।

সম্পাদকীয় দপ্তরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। জাতিপুঞ্জ ও এর প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য তথ্য পরিবেশনা, জাতিপুঞ্জের আলোচনা ও প্রস্তাবগুলো জাতিপুঞ্জের পত্রিকায় প্রকাশনা, জনতথ্য দপ্তরের মারফত পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ বিতরণ, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গবেষণা পরিচালনা করা সম্পাদকীয় দপ্তরের কার্যাবলীর অন্তর্গত। জাতিপুঞ্জের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসেবে মহাসচিবের মাধ্যমে সাধারণ সভায় উপস্থিত করার দায়িত্ব সম্পাদকীয় দপ্তরের ওপর ন্যস্ত। দপ্তরের কাজকর্মের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য

দপ্তরের কার্যাবলী

কয়েকটি বিভাগ আছে। প্রধান প্রধান বিভাগগুলো হল: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিষদ সংক্রান্ত বিভাগ, আর্থনীতিক বিভাগ, সামাজিক বিভাগ, অছি পরিষদ সংক্রান্ত বিভাগ, শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ, আইন বিভাগ ও প্রচার বিভাগ। সম্পাদকীয় দপ্তরের কাজকর্ম, কর্মীসংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দপ্তর পরিচালনার ব্যয়ও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৬ সালে দপ্তর পরিচালনার ব্যয় ছিল ১৯.৩ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪০.৪ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে ঐ ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহাসচিব (Secretary General)

সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান হলেন মহাসচিব বা সেক্রেটারী জেনারেল। জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ সভা মহাসচিবকে নিয়োগ করবে এবং মহাসচিব হলেন সংগঠনের প্রধান শাসনতান্ত্রিক কর্মকর্তা। মহাসচিব নিয়োগের ব্যাপারে এমন একটি নাম খুঁজে বের করতে হয় যাঁকে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্য সমর্থন করতে প্রস্তুত। নরওয়ের ট্রিগভি লি (Trygve Lie) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম মহাসচিব ছিলেন। এর পরে মহাসচিব হন দাগ হ্যামারশিল্ড (Dag Hammerskjoeld)। পরবর্তী মহাসচিব হলেন য়ু থান্ট (U That)। তাঁর পরে মহাসচিব হন কুর্ট ওয়াল্ড-হাইম (Kurt Waldheim)। বর্তমানে মহাসচিব হলেন পেরেজ ডি কুলার (Perez de Cuellar)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রশাসনে মহাসচিবের পদ এবং তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতিপুঞ্জের সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব মহাসচিবের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান হিসেবে ঐ দপ্তর পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আর্থিক প্রয়োজন, আর্থিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি ব্যাপারে অর্থাৎ এক কথায় অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্ম তাঁকেই সম্পন্ন করতে হয়। জাতিপুঞ্জের মুখপাত্র হিসেবে তিনি কাজ করেন এবং এ সংস্থার প্রতিনিধিত্বমূলক যাবতীয় কার্য (Representational functions) তাঁর ওপর ন্যস্ত। সাধারণ সভার কার্যসূচী প্রস্তুত করা, এর জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা, ঐ সভায় কার্যবিবরণী পেশ করা, সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা, সভার খসড়া প্রস্তুত করা ইত্যাদি মহাসচিবকে করতে হয়।

মহাসচিবের কার্যাবলী

মহাসচিবের প্রধান কাজ হল রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব পালন করা। হিংসা ও উত্তেজনা পরিহার করে যাতে জাতিপুঞ্জের সনদের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি পৃথিবীতে নিশ্চিত করা যায় তার জন্য মহাসচিবকে নিরলসভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়। বস্তুত তিনি কতটা সার্থকভাবে রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার ওপর মহাসচিবের পদের ন্যায্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। জাতিপুঞ্জের সনদের ৯৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরূপ যে কোন বিষয়ে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার বিবাদ দূরীকরণের ব্যাপারে মহাসচিবের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গিয়েছে কোরিয়া যুদ্ধে, কঙ্গো সংকটে, মিশর ও ইস্রায়েল বিবাদে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে অনেক সময় তৎকালীন মহাসচিবেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করে সর্বনাশা অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন। কোথাও তাঁরা সার্থক হয়েছেন, আবার কোথাও সফল হতে পারেননি। আবার অনেকে মনে করেন যে, কোথাও কোথাও মহাসচিবেরা ঐ দায়িত্ব যথার্থ ভাবে পালন করেননি। যেমন কঙ্গো সংকটে, বিশেষ করে লুমুম্বার মৃত্যুর ব্যাপারে অনেকের নিকট মহাসচিব দাগ হ্যামারশিল্ডের ভূমিকা নিন্দনীয় বলে মনে হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মহাসচিবের পদটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে এ পদের কার্যকারিতা, গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভর করে পদাধিকারী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, দূরদৃষ্টি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার ওপর।

এগার ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন (An Evaluation of Achievements and Failures of U. N.)

যে মহান্ আদর্শ ও নীতিকে কার্যকর করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে তা বাস্তবায়িত করতে হলে জাতিপুঞ্জকে কয়েকটি কর্তব্য ও কার্য সম্পাদন করতে হবে। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের মীমাংসা করা এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মনোভাবকে প্রসারিত করাই জাতিপুঞ্জের প্রধান কাজ ও কর্তব্য।

ঐ সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব এবং পক্ষপাতহীন মনোভাব একান্ত প্রয়োজন। দুঃখের কথা, জাতিপুঞ্জ এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। জাতিপুঞ্জে প্রধানত তিনটি গোষ্ঠী আছে ঃ ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ; ২. রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এবং ৩. ভারত, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতির নেতৃত্বে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো।[১] এ ছাড়াও ইদানীং কালে কমিউনিস্ট চীন ও তার কয়েকটি সহযোগী রাষ্ট্র কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে না থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

এতদিন পর্যন্ত জাতিপুঞ্জ ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী শিবিরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। ফলে অনেক আন্তর্জাতিক বিবাদের ন্যায্য ও সন্তোষজনক মীমাংসা করতে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পশ্চিমী শিবিরের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়ায় তারা আর আগের মত সংহত নয়। বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির সমর্থনে আগের মত সকল ব্যাপারে এগিয়ে আসতে আর উৎসাহী নয়। তা ছাড়া ইদানীংকালে জাতিপুঞ্জে অনেক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত এবং কোন গোষ্ঠীভুক্ত নয় এমন নিরপেক্ষ দেশগুলো (যারা **'তৃতীয় বিশ্ব'** নামে পরিচিত,) জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করায় জাতিপুঞ্জের ভারসাম্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে একদা জাতিপুঞ্জের যাত্রা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৫৬। সুতরাং জাতিপুঞ্জ সর্বজনীনতা লাভ করেছে বলা যায়। এ সকল কারণে আজকের দিনে জাতিপুঞ্জের পক্ষে আর কোন বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠীর কথামত চলা সম্ভব নয়।

এবার কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমস্যার ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের কাজ ও ভূমিকা পর্যালোচনা করা হ'ল ঃ

কার্যক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা

ইরানের অভিযোগ

১৯৪৬ সালে ইরান জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এনেছিল। একটি চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইরানে সোবিয়েত, ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য মোতায়েন ছিল। ইরান সোবিয়েত সৈন্য অপসারণ দাবী করে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোবিয়েতের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। সোবিয়েত রাশিয়া ঐ অভিযোগ অস্বীকার করে। ইতিমধ্যে ইরান থেকে রুশ বাহিনী অপসারিত হয়।

ইউক্রেনের অভিযোগ

ঐ বছর ইউক্রেন জাতিপুঞ্জে অভিযোগ করে যে, ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ ও জাপ সৈন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না করে জাতিপুঞ্জে প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দেয়া হয়েছিল।

সিরিয়া ও লেবাননের অভিযোগ

ঐ বছরই সিরিয়া ও লেবাননে ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যের উপস্থিতির প্রতি ঐ দুটি দেশ জাতিপুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য অপসারণের ইচ্ছে আছে—এটুকু জানিয়েই কোনরূপ সক্রিয় কার্যকর পন্থা গ্রহণ না করে জাতিপুঞ্জ তার দায়িত্ব শেষ করে।

---

১. নিরপেক্ষ গোষ্ঠী গঠনের পেছনে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মিশরের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে অনেকে একে নিরপেক্ষ গোষ্ঠী থেকে বহিষ্কারের দাবী জানায়। নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর দেশগুলো তৃতীয় বিশ্ব (Third world) নামে পরিচিত।

ঐ সময়ে ভারত অভিযোগ করে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার স্থানীয় ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করছে। বিষয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এই অজুহাতে জাতিপুঞ্জ ঐ ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্য নীতির প্রচলন এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বহু অভিযোগ জাতিপুঞ্জে তোলা হয়। ঐ জাতিপুঞ্জ বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে দিয়ে তা কার্যকর করাতে পারেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদারি ও বলপূর্বক কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত রাখার বিষয়টি বারবার জাতিপুঞ্জের কাছে উপস্থাপিত করা সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ আজ পর্যন্ত দখলীকৃত এলাকা থেকে পাকসৈন্য অপসারিত করাতে পারেনি। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনা ও সহযোগিতায় জাতিপুঞ্জ ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করার জন্য সচেষ্ট ছিল। সৌভাগ্যের কথা যে, সোবিয়েত ইউনিয়ন বারবার "ভিটো" প্রয়োগ করে ঐ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয়।

কাশ্মীর সমস্যা

উত্তর কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া আক্রান্ত হয়েছে এ অজুহাতে জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়াতে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করে এবং জাতিপুঞ্জের ব-কলমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়াতে একটি সর্বগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, জাতিপুঞ্জ কোরিয়ার ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধের চেষ্টা না করে কোরিয়াতে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ সমর্থন করে। জাতিপুঞ্জের ঐ কাজ পৃথিবীতে একটি রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধ সংগঠনে সাহায্য করেছিল।

কোরিয়া সমস্যা

১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হয়। কিন্তু বেলজিয়াম সরকার কঙ্গোতে সৈন্য পাঠালে কঙ্গো সরকার জাতিপুঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করে। কঙ্গোতে এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিক লুমুম্বাকে হত্যা করা হয়। এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ মার্কিন গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হিসেবে চলেছে বলে সোবিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে।

কঙ্গো সমস্যা

এ ছাড়াও, একটি জাতিকে নির্মূল করার জন্য যে সর্বধ্বংসী দীর্ঘ যুদ্ধ ভিয়েতনামে চলেছিল তার প্রতিকারে জাতিপুঞ্জ বিশেষ ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে জাতিপুঞ্জের নির্বাক দর্শকের ভূমিকা ইদানীংকালের সর্বাপেক্ষা হতাশাজনক ঘটনা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ

জাতিপুঞ্জের ইতিহাস অমিশ্রিত সাফল্য বা ব্যর্থতার ইতিহাস নয়। তাই জাতিপুঞ্জকে পুরোপুরি সফল বা পুরোপুরি ব্যর্থ বলে অভিহিত করা যায় না। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার কাজে জাতিপুঞ্জ কোথাও কোথাও সফল হয়েছে এবং কোথাও কোথাও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সৃষ্টির ব্যাপারে এর ভূমিকা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে বিবদমান শক্তিগুলোর মধ্যে আলোচনার পরিবেশ ও আলোচনার মঞ্চ হিসেবে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা তর্কাতীত। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার চেয়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের সাফল্য অনেক বেশি। এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অন্যান্য আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক অপ্রধান সংস্থাগুলোর নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টা ও ভূমিকা জাতিপুঞ্জের সাফল্যের পরিচয়।

বার : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ (Future of the United Nations)

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাস পুরোপুরি সাফল্যের ইতিহাস নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময় এর সপক্ষে মানুষের

সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। ঐ সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করার জন্য উদ্যোক্তাগণ এর ভবিষ্যৎ সাফল্যের যে ইংগিত দিয়েছিলেন তা অতিরঞ্জিত। ফলে, পদে পদে আশাভঙ্গ ঘটেছে। অবশ্য সমকালীন পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শক্তিবিন্যাসের কথা মনে রেখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাজকর্মের মূল্যায়ন করলে এ সংস্থা যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না।

তা ছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৪৫ সাল এবং ১৯৮৫ সাল এক নয়। একদিকে আজ জাতিপুঞ্জে সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলোর সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির অনেক বেশি শক্তিশালী। অন্যদিকে পৃথিবীর শান্তির শক্তিগুলো অনেক বেশি সুসংগঠিত। সেজন্য অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এটা আশা করা অন্যায় হবে না যে জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের মত ব্যর্থ হবে না।

জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন কল্যাণধর্মী ও প্রগতিমূলক কাজকর্ম এই সংস্থার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতিপুঞ্জের অর্থের শতকরা ৮৫ ভাগ সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়, এবং এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ বিশ্বব্যাপী সমাজ উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা প্রভূতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত **EPTA (Expanded Programme of Technical Assistance)** একটি অত্যন্ত কার্যকর সংস্থা। এ ছাড়া **FAO (Food and Agricultural Organization), UNICEF (United Nations Children's Emergency Fund), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)** ইত্যাদি সংস্থার কাজকর্ম জাতিপুঞ্জের সার্থকতার প্রমাণ। প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল উ থাণ্ট বলেছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সদস্যতার দিক দিয়ে সর্বজনীন এবং জাতিসংঘ অপেক্ষা কার্যকর ও শক্তিশালী। গণসাধারণতন্ত্রী চীন (কমিউনিষ্ট চীন) জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে জাতিপুঞ্জের সর্বজনীনতা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একমাত্র সংগঠন হিসেবে জাতিপুঞ্জ শুধু যে টিকে আছে তা নয়, ওয়াল্টার লিপম্যান **(W. Lipmann)** যথার্থই বলেছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ "একটি অপরিহার্য সংস্থা।" অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝেছি, যে ধরনের আদর্শস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপিত হলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে অথবা শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকা ঘটবে না, সেরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার মত রাজনৈতিক পরিবেশ ও মানসিক উৎকর্ষ পৃথিবীতে এখনো দেখা দেয়নি। তাই জাতিপুঞ্জের অধিকাংশ ব্যর্থতার জন্য দায়ী বর্তমান পৃথিবীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। 'ভেটো' সমস্যাটিকে প্রায়শই জাতিপুঞ্জের একটি ত্রুটি বলে মনে করা হয়; কিন্তু আমরা জানি যে, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিগুলো অন্য দেশগুলোর প্রবল বিরোধিতার মধ্যে জাতিপুঞ্জে তাদের যোগদানের প্রায় একটি শর্ত হিসেবেই 'ভিটো' দানের অধিকারটি দাবি করেছিল। অর্থাৎ, ঐ 'ভিটো' মেনে না নিলে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে অপরিহার্য তার আর একটি প্রমাণ এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন রাষ্ট্রগুলোর এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। কালভোকোরেসি (Calvocoressi) ঐ সব দেশগুলোর জাতিপুঞ্জের প্রতি সমর্থনকে জাতিপুঞ্জের মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক নিরপেক্ষ সম্মেলনে ঐ দেশগুলো ঐ সব অঞ্চলের মানুষের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়েছে। একথা সর্বৈব স্বীকৃত যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশগুলো যেভাবে মারাত্মক পারমাণবিক ও আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী হয়ে উঠেছে তাতে যে কোন আঞ্চলিক যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে! এ অবস্থায় জাতিপুঞ্জের অবলুপ্তি মানবসমাজের আত্মহত্যার সমান।[১]

১. "It is the survival or suicide of man...the choice is either extinction or human brotherhood."
—Dr. Radhakrishnan.

এ সব বিবেচনা করলে জাতিপুঞ্জের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। জাতিপুঞ্জকে ব্যর্থ হতে দিতে পারা যায় না, **কারণ জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হবার অর্থ মানুষের সব আশা ও পরিকল্পনার অপমৃত্যু।**

নমুনা প্রশ্ন

1. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করার কারণ আলোচনা কর। (এক দেখ)
2. জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '79 T. S. B. '82]
3. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। এই উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়েছে? (দুই, এগার এবং বার দেখ) [H. S. C. '81]
4. জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলো আলোচনা কর। ইহার প্রধান অঙ্গগুলো কি কি? (দুই এবং চার দেখ) [H. S. C. '85]
5. জাতিসংঘের সঙ্গে জাতিপুঞ্জের তুলনামূলক আলোচনা কর। (তিন দেখ)
6. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামো আলোচনা কর। এর প্রধান সংস্থাগুলি কি কি? এদের যে কোন একটির গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (চার দেখ) [H. S. C. '78]
7. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী আলোচনা কর। (দুই দেখ)
8. নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। ভিটো কাকে বলে? নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (ছয় দেখ) [H. S. C. '82. T. S. B. '82]
9. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর। (পাঁচ দেখ) [H. S. C. '80 and 83, T. S. B. '79, 81]
10. আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (সাত দেখ)
11. অছি পরিষদ সম্পর্কে টীকা লিখ। (আট দেখ) [H. S. C. '80]
12. আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। [নয় দেখ] [T. S. B. '79 '82]
13. সম্পাদকীয় দপ্তরের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধান কে? (দশ দেখ)
14. 'মহাসচিব' সম্পর্কে টীকা লিখ। (দশ দেখ)
15. 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে টীকা লিখ। (বার দেখ)
16. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ কর। এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মত কি? (এগার এবং বার দেখ) [T. S. B. '79]
17. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর। (এগার এবং বার দেখ) [H. S. C. '79 and '84]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক উত্তরে টিক্ দাও ঃ

(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম হয় (1919, 1941, **1945**) সালে।

(খ) প্রতিটি রাষ্ট্র অনধিক (2, **5**, 7 জন) প্রতিনিধি সাধারণ সভায় প্রেরণ করে।

(গ) সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাধারণ সভার (এক-তৃতীয়াংশ, দুই-তৃতীয়াংশ তিন-চতুর্থাংশ) ভোটে গৃহীত হয়।

(ঘ) নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা (5, 11, **15**) জন। [H. S. C. '78]

(ঙ) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসংখ্যা (1, **5**, 7) জন।

(চ) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য (5, **10**, 12) জন।

(ছ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান সংস্থা (2, 4, **6**) টি।
(জ) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের সংখ্যা (9, 11, **15**) জন।
(ঝ) জাতিপুঞ্জের (এক-তৃতীয়াংশ, দু-তৃতীয়াংশ, **সকল**) সদস্য সাধারণ সভার সভ্য।
(ঞ) নিরাপত্তা পরিষদের (সকল সদস্যের, কেবল অস্থায়ী সদস্যের, **কেবল স্থায়ী সদস্যদের**) ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। [H. S. C. '80]
(ট) জাতিপুঞ্জের আর্থনীতিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা (18, 27. **54**) [H. S. C. '81]
(ঠ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি (**অঙ্গ**/অঙ্গ নহে)। [H. S C. '84]
(ড) অছি পরিষদ জাতিপুঞ্জের একটি (**অংগ**, অংগ নয়) [H. S. C. '83]
(ঢ) জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে (সকল সদস্য রাষ্ট্র, কেবলমাত্র অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো, **কেবলমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো**) ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে। [H. S. C. '85]

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
(ক) নিরাপত্তা পরিষদে কারা 'ভিটো' প্রয়োগ করতে পারে ? (স্থায়ী সদস্যগণ)
(খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধানকে কি বলা হয় ? (চার্টার)
(গ) নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত ? (15) [T. S. B. '79]
(ঘ) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকগণ কার দ্বারা এবং ক বছরের জন্য নিযুক্ত হন ?
(সাধারণ সভা কর্তৃক ন বছরের জন্য)
(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্পাদকীয় দপ্তরের প্রধানকে কি বলা হয় ? (মহাসচিব)

"Rights, in fact, are those conditions of social life, without which no man can seek, in general, to be himself at his best." —H. Laski

৭

নাগরিকত্ব, অধিকার ও কর্তব্য
Citizenship, Rights and Duties

প্রতিটি সভ্যসমাজে ব্যক্তিমানসের উন্নতি ও বিকাশের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র-স্বীকৃত অধিকারের অস্তিত্ব অপরিহার্য মনে করা হয়। এই অধিকারগুলো হ'ল সমাজ জীবনের কতকগুলো প্রয়োজনীয় শর্ত যার অভাবে নাগরিক জীবনের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। বস্তুত একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জন্য যে সকল অধিকার স্বীকার করে তার দ্বারা রাষ্ট্রের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের জন্য অধিকার সুনিশ্চিত করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনি নাগরিকদেরও সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য রয়েছে। অধিকারের ধারণার সঙ্গে কর্তব্যের ধারণা জড়িত।

এক : নাগরিক কে ? (Who is a Citizen ?)

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যারা নগরে বাস করে তাদের নাগরিক বলে। প্রাচীন গ্রীসদেশে নগর-রাষ্ট্র ছিল। অর্থাৎ এক একটি নগর নিয়ে এক একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠিত হত। এই 'নগর' শব্দ থেকেই নাগরিক কথাটি এসেছে। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে **যারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রশাসনে অথবা বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র তাদের নাগরিক বলে গণ্য করা**

উচিত (He who has the power to take part in the deliberative or judicial administration is said by us to be a citizen of that State)।

ইতিহাসের বিবর্তনের পথে এই নগর-রাষ্ট্রগুলো বর্তমান যুগের বৃহদায়তন জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আধুনিক কালের রাষ্ট্রগুলো আয়তনে যেমন বিরাট তেমনি এদের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। তাই আজকাল পৌরনীতিতে 'নাগরিক' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের যে কোন সদস্যকেই নাগরিক বলা হয়। যারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের সকল অধিকার ভোগ করে, তাদের রাষ্ট্রের সদস্য বলে মনে করা হয়। আরিস্টটলের যুগে ক্রীতদাস, মজুর শ্রেণী ও স্ত্রীলোকদিগকে নাগরিক আখ্যা দেয়া হত না। কারণ তারা ছিল পর-নির্ভরশীল। তাই সে যুগে রাষ্ট্রের কাজে তাদের অংশ গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রের যে কোন অধিবাসী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেই তাকে নাগরিক বলে গণ্য করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, আনুগত্য কাকে বলে ? যখন কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং বিপদের সময়ে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে, তখন বলা যায় যে, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। নাগরিক রাষ্ট্র থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কতকগুলো অধিকার লাভ করে, আবার রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলো কর্তব্যও পালন করে। ঐ সকল কাজ ভালভাবে করতে হলে নাগরিকের মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় নাগরিকত্ব হল সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির সচেতন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ (The contribution of one's instructed judgment to the cause of public good)। তাই ব্যাপক অর্থে, **যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে, ঐ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকে, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ অধিকারী হয় এবং সমাজের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সচেতন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করে থাকে তাকেই নাগরিক বলে।**

সুতরাং বলা যায় একজন নাগরিক ঃ ১. রাষ্ট্রের সদস্য ; ২. রাজনৈতিক অধিকার সহ সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করে ; ৩. রাষ্ট্রের প্রতি (সরকার আর রাষ্ট্র সমার্থক নয়) তার আনুগত্য অবশ্যই থাকবে ; ৪. সমাজের স্বার্থে সচেতন বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করে ; ৫. রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে।

নাগরিক ও বিদেশী

নাগরিক ও বিদেশী

সাধারণত, একটি দেশের অধিবাসীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা, নাগরিক ও বিদেশী (citizens and aliens)। বিদেশীরা ভিন্ন দেশের স্থায়ী অধিবাসী এবং তারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ভারতে বহু ইংরেজ, জার্মান, জাপানী ইত্যাদি বিদেশী বাস করে, যদিও ভারতে বসবাসকালে তারা ভারতীয় আইন মেনে চলে ও ভারত সরকারকে কর দেয় এবং কিছু কিছু সামাজিক অধিকার ভোগ করে, তা সত্ত্বেও এদের ভারতীয় নাগরিক বলা চলে না। দ্বিতীয়ত, **বিদেশীরা** ভারতে কিছু কিছু পৌর অধিকার ভোগ করলেও এদেশের **কোন রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না**। তারা ভোট দিতে পারে না, সরকারী চাকুরি দাবি করতে পারে না এবং এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করার অধিকার পায় না।

নাগরিক ও দেশবাসী

নাগরিক ও দেশবাসী

নাগরিক ও দেশবাসীর (citizens and nationals) মধ্যে পার্থক্য আছে, তাও জানা দরকার। যেমন, ভারতীয় নাগরিক ও ভারতবাসী। যে ভারতীয়ের ভোটাধিকার আছে, সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে সে ভারতের নাগরিক। কিন্তু ভারতে বহুসংখ্যক শিশু, কিশোর আছে যারা দেশে বসবাস করে, পৌর অধিকারগুলো ভোগ করে, **কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না।** এদের দেশবাসী বলে, এরা নাগরিক নয়।

নাগরিক ও প্রজা

নাগরিক ও প্রজার (citizens and subjects) মধ্যেও পার্থক্য আছে। ব্রিটেনের যে সকল উপনিবেশ আছে সে সকল স্থানের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক একজন ব্রিটিশ প্রজা। কিন্তু যারা ব্রিটেনের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে ভোগ করে থাকে তারা ব্রিটেনের নাগরিক।

নাগরিক ও প্রজা

দুই : নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Modes of Acquiring Citizenship)

প্রতিটি ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। সুতরাং এটি একটি স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা যে কি করে এরা প্রত্যেকে নাগরিক হলেন বা নাগরিকতা অর্জন বা লাভ করলেন। দুটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায় :

ক. জন্মসূত্রে (by birth) নাগরিকতা অর্জন।
খ. অনুমোদনসিদ্ধ বা স্বেচ্ছাকৃত (by naturalisation) পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন।

উপরোক্ত পদ্ধতি দুটির মাধ্যমে কিভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের আবার দুটি পদ্ধতি আছে :

১. **রক্তের সম্পর্কের নীতি** (Jus Sanguinis or by virtue of blood)
২. **জন্মস্থান নীতি** (Jus soli or by virtue of birthplace)

রক্তের সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তার মাতা-পিতা যে-দেশের নাগরিক ছিল নবজাতকও ঐ দেশের নাগরিক হবে। এ নীতি অনুযায়ী নাগরিকতা লাভের জন্য ব্যক্তির জন্মস্থান বিচার করা হয় না। যেমন, ভারতীয় নাগরিকদের সন্তান পৃথিবীর যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, রক্তের সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী নবজাতক ভারতীয় নাগরিক বলেই গণ্য হবে।

রক্তের সম্পর্ক নীতি

অন্যদিকে জন্মস্থান নীতি অনুসারে যে রাষ্ট্রে শিশুর জন্ম সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জিত হয়। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ করে, তবে ঐ সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার পাবে।

জন্মস্থান নীতি

কোন রাষ্টে প্রথম নিয়মটি, কোন রাষ্ট্রে দ্বিতীয় নিয়মটি, আবার কোন রাষ্ট্রে উভয় নিয়মই গ্রহণ করা হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় দুটি নীতিই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি ভারতের মাটিতে কোন বিদেশীর সন্তানের জন্ম হয়, তবে সেই সন্তান ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে। আবার কোন ভারতীয় নাগরিকের সন্তান বিদেশে জন্মলাভ করলে ঐ নবজাতক ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হয়।

এই দুইটি নীতির মধ্যে রক্তের সম্পর্কের নীতিকে অধিকতর যুক্তিসম্মত বলে মনে করা হয়। কারণ, কোন্ স্থানে জন্ম ঘটবে তা অনেকাংশে অনিশ্চিত এবং আকস্মিক বিষয়। ব্রিটেনে ভ্রমণ কালে কোন ভারতীয় নারীর শিশু জন্ম গ্রহণ করলে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী সে ব্রিটেনের নাগরিক, যদিও ভারতের অধিকারই তার ওপর বেশি হওয়া উচিত। নাগরিকতা সম্পর্কে জন্মস্থান বা জন্মভূমিগত আইন-কানুন আছে বলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। ভারতীয় নাগরিকের সন্তান মার্কিন দেশের মাটিতে জন্মলাভ করলে ঐ নবজাতক ভারতীয় আইন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক, আবার মার্কিন আইন অনুযায়ী সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। একে বলে **দ্বিনাগরিকত্বের (double nationality)** সমস্যা। কিন্তু এক ব্যক্তি তো একই সময়ে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হল যে, ঐ

কোন্‌টি শ্রেয়

নবজাতক সাবালক হয়ে ঐ দুটি দেশের মধ্যে যে কোন একটি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের অধিকার ভোগ করে। অন্য দেশের নাগরিক হলেও বিয়ের পরে স্ত্রীলোকেরা সাধারণত তাদের স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে।

খ. অনুমোদনসিদ্ধ বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নাগরিকতা অর্জন

স্বেচ্ছাকৃত নাগরিক হতে হলে, কতগুলো শর্ত পূরণ করে তা অর্জন করতে হয়। একে অর্জিত নাগরিকত্ব বলে। সব রাষ্ট্রেই বিদেশীয়দের নাগরিকত্ব অর্জন করার ব্যবস্থা আছে। স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের জন্য নীচে উল্লেখিত শর্তগুলো বিভিন্ন দেশে আরোপিত হয়ে থাকে ঃ

১. স্বদেশ ত্যাগ করে দীর্ঘকাল কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাস করা,
২. কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকরি গ্রহণ করা,
৩. কোন বিদেশী রাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকারী হওয়া,
৪. কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা,
৫. কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা,
৬. কোন মহিলা কর্তৃক বিদেশী রাষ্ট্রের পুরুষকে বিয়ে করা (এ ক্ষেত্রে ঐ মহিলা স্বামী যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতার জন্য আবেদন করতে পারেন)।

সকল দেশে স্বেচ্ছাকৃত নাগরিকতা অর্জনের শর্ত এক নয়। কোন কোন রাষ্ট্রে উপরোক্ত শর্তগুলোর মধ্যে একটি বা দুটি শর্ত মানলেই হয়, আবার, কোন দেশে কতকগুলো শর্ত একসঙ্গে মানতে হয়। ঐ শর্তগুলো পূরণ হলে রাষ্ট্র তার ইচ্ছেমত কোন বিদেশীকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে। ঐরূপ স্বেচ্ছাকৃত নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে বিদেশীকে সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে এবং অনুসন্ধান করে সন্তুষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে নাগরিকত্ব দান করবে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবার একটি ছকের সাহায্যে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো তুলে ধরা হল ঃ

নাগরিকতা অর্জন

- জন্মসূত্র
  - রক্তের সম্পর্ক নীতি
  - জন্মস্থান নীতি
- অনুমোদনসিদ্ধ
  - অন্য রাষ্ট্রে বসবাস
  - অন্য রাষ্ট্রে চাকরি গ্রহণ
  - অন্য রাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকারী
  - বিদেশী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান
  - বিদেশী ভাষায় জ্ঞান অর্জন
  - বিদেশী পুরুষকে বিয়ে

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকত্ব অর্জন

অনুমোদনসিদ্ধ বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নাগরিকত্ব অর্জন পূর্ণ বা আংশিক (complete or partial) হতে পারে। কোন বিদেশী যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা অনুমোদনসিদ্ধভাবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের মাধ্যমে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকের জন্য প্রদত্ত সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার পুরো অংশীদার হয়, তখন তাকে পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন বলে। **ব্রিটেনে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকদের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়।**

কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অর্জিত নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিকের তুলনায় কিছু কিছু কম সুযোগ-সুবিধে পায়। যেমন, **অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারেন না।** রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট হতে হলে যতটা দেশপ্রেম এবং একাগ্রচিত্ত হতে হয়, তা একমাত্র রক্তের সম্পর্কের নীতি বা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মার্কিন নাগরিকের ক্ষেত্রেই সম্ভব এরূপ মনে করা হয়। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদনসিদ্ধ পদ্ধতিতে আংশিক নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়, কিন্তু নাগরিকের পূর্ণ অধিকার পাওয়া যায় না।

তিন ঃ নাগরিকতা বিলোপের কারণ (Causes of the Loss of Citizenship)

সকল রাষ্ট্রে নাগরিকতা বিলোপের কারণ এক নয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। তবে **সাধারণভাবে** নিম্নলিখিত কারণে কোন ব্যক্তি তার নাগরিক অধিকার হারাতে পারে ঃ

১. কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তার নিজের রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লোপ পাবে। কারণ এক ব্যক্তি একই সংগে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক থাকতে পারে না।

২. কোন বিদেশী পুরুষের সংগে বিয়ে হলে মহিলারা তাঁদের স্বামীর নাগরিকত্ব লাভ করে ও নিজের দেশের নাগরিকত্ব হারায়।

৩. অন্য কোন রাষ্ট্রের অধীনে সরকারী কাজ গ্রহণ করলে কোন কোন রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে স্বদেশের নাগরিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়।

৪. কোন কোন রাষ্ট্রে এমন নিয়মও আছে যে, সরকারের অনুমতি না নিয়ে কোন নাগরিক বিদেশী কোন রাষ্ট্র থেকে উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করলে তাকে স্বদেশের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বর্তমানে কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য কোন উপাধি বা সম্মান গ্রহণ করতে পারেন না। এজন্য ভারতের এভারেস্ট বিজয়ী বীর তেনজিঙকে ব্রিটেনের রানীর ইচ্ছা থাকলেও কোন উপাধি দিতে পারেননি।

৫. যুদ্ধের সময় কোন সৈনিক নিজের সৈন্যদল ছেড়ে বিপক্ষ দলে পলায়ন করলে তার নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়।

৬. কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে, বিচারালয়ে গুরুতর অপরাধে কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার নাগরিক অধিকার লোপ পায়।

৭. নিজের দেশ বা রাষ্ট্র থেকে একটানা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলে নাগরিক তার নাগরিকত্ব হারাতে পারে।

৮. বিদেশী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলে নিজের দেশের নাগরিকতার বিলোপ হতে পারে।

নাগরিকতা বিলোপের যে সব কারণ আলোচনা করা হল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বেচ্ছাকৃতভাবে নাগরিকতা পরিত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা। এ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা রকম বিধি দেখা যায়। কতকগুলো রাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে এই অধিকার দেয়। অতীতে বেশির ভাগ রাষ্ট্রই নাগরিকতা ত্যাগের অধিকার দিত না। এখন অবশ্য গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগের ওপর বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথিল হয়েছে।

চার ঃ সু-নাগরিকের গুণাবলী (Qualities of a Good Citizen)

ভলটেয়ার (Voltaire) বলেছেন, প্রতিটি জাতি তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সরকার পায় (A people will get the kind of government it deserves)। অর্থাৎ নাগরিকের দোষ, গুণ, যোগ্যতা, অযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের দোষ, গুণ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা।

সু-নাগরিক ও সু-রাষ্ট্র একই ধারণার দুটি দিক। সু-নাগরিকের ভাল গুণগুলোই রাষ্ট্রকে উন্নত করে তোলে। আবার রাষ্ট্রের ভাল নিয়ম-কানুন ও পরিচালনার ফলেই সু-নাগরিক গড়ে ওঠে। বর্তমান যুগে আমরা গণতন্ত্রকে আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে মনে করি। তাই বলা যায়, সু-নাগরিক হল সেই ব্যক্তি যিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্যগুলো করতে প্রস্তুত। গণতন্ত্রে সাধারণ নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন এবং কতকগুলো দায়িত্ব পালন করেন।

ভাল নাগরিক ঃ ভাল রাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য থেকেই নাগরিকদের গুণাবলী গড়ে ওঠে। আবার ঐ গুণগুলোই গণতন্ত্রকে রক্ষা করে তাতে প্রাণসঞ্চার করে। বার্ণসের ভাষায় বলতে গেলে—গণতন্ত্রের সাফল্যের মূল কথা হলঃ প্রতিটি নাগরিকের মনে একদিকে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ ও তীব্র আত্মসম্মানবোধ; অন্য দিকে দায়িত্ব বহন, আলাপ-আলোচনা ও সহনশীলতার ইচ্ছে।[১] সু-নাগরিকত্বের মূল কথা হল, নিজের শিক্ষা, বিচার-বিবেচনা ও শক্তি জনকল্যাণে নিয়োগ করা (The contribution of one's instructed judgment to the public good)। নাগরিকের মনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জেগে উঠলে ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখা দিলে তবেই সে সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে।

বার্ণসের মত

বিখ্যাত রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ **লর্ড ব্রাইস** সুনাগরিকের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন; যথা, **বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক** (Each member of a free community must be capable of citizenship. Capacity involves three qualities—intelligence, self-control and conscience)। সুতরাং লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করে বলা যায়, যে নাগরিকের বুদ্ধি, আত্মসংযম এবং বিবেক আছে তিনিই সুনাগরিক।

সুনাগরিকের বিচারবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। কিভাবে দেশ শাসিত হলে জনসাধারণের মঙ্গল হবে সুনাগরিকের সে বিচারবুদ্ধি থাকা দরকার। তার ভাল-মন্দ বিচার করার মত বোধশক্তি থাকা প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য প্রত্যেক নাগরিকের সু-শিক্ষার দরকার। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সমগ্রতার আলোকে অংশকে বোঝা, স্থায়িত্বের আলোকে সমসাময়িক বিষয়কে বোঝা সু-নাগরিকের প্রকৃত শিক্ষা।

বিচারবুদ্ধি

সুনাগরিকের আত্মসংযম থাকা দরকার। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সুনাগরিকের ব্যক্তিগত ত্যাগ করার মত মনোভাব থাকা দরকার। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বর্জন করেও দেশের মঙ্গলের জন্য দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিজের মতামতের সঙ্গে দেশের অধিকাংশের মতামত আলাদা হলেও আত্মসংযমের মাধ্যমে সকলের মত মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। সরকারী কোন আইন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও তা মেনে চলতে হবে। উত্তেজনা, আবেগ ও স্বার্থের প্রাবল্য সংযত না করলে সে সু-নাগরিক হতে পারে না।

সংযম

পরিশেষে **সু-নাগরিকের বিবেকসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।** সু-নাগরিক প্রত্যেকটি কাজ কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাধুতার সঙ্গে সম্পন্ন করবে। সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করা, সরকারকে কর দেওয়া, আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে সাহায্য করাও সু-নাগরিকের কর্তব্য। সু-নাগরিক নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকবে। নিজের স্বার্থ ভুলে দেশের ও দশের সেবাই সু-নাগরিকের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু অর্থলোভ অথবা ক্ষমতা-লোভে যারা ঐ নীতি মানে না, অন্য অনেক গুণ থাকলেও তারা কখনও সু-নাগরিক হতে পারে না। বিবেকের প্রেরণা অনুযায়ী কর্তব্য করা সু-নাগরিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ।

বিবেক

---

১. "Two characteristics in the conduct and outlook of all men : first, a sturdy independence and secondly, an imaginative sympathy." —Burns

বার্ণস মনে করেন, উপরোক্ত গুণাবলীর সঙ্গে **স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীন মনোবৃত্তি** যুক্ত হলে প্রকৃত সুনাগরিক হওয়া সম্ভব।

সুতরাং ওপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, **যে নাগরিকের বুদ্ধি, আত্মসংযম, বিবেক, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, আত্মসম্মানবোধে, দায়িত্ববোধ এবং সহনশীলতা আছে এবং যার সমষ্টিগত কল্যাণ, গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মূল্যবোধের ওপর অবিচল নিষ্ঠা আছে—তিনিই সুনাগরিক।**

সংজ্ঞা

পাঁচ : সু-নাগরিকতার অন্তরায় (Hindrances to Good Citizenship)

নাগরিকদের উৎকর্ষ যেমন রাষ্ট্রের মান উন্নত করে, সেরূপ নাগরিকদের অপকর্ষ বা গুণাবলীর স্বল্পতা রাষ্ট্রের মানের অবনয়ন ঘটায়। বাস্তব জগতে সু-নাগরিকত্বের আদর্শের প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নানা অবস্থার চাপে নাগরিক তার কর্তব্যগুলো করে উঠতে পারে না। তাছাড়া, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদির জন্যও সু-নাগরিক গড়ে উঠতে পারে না।

ঐ সকল বাধা ছাড়া সু-নাগরিকত্বের অন্তরায় হিসেবে কতকগুলো দোষের কথা উল্লেখ করা যায়। নাগরিকের তিনটি দোষ থাকলে সে সু-নাগরিক হতে পারে না। **লর্ড ব্রাইসের মতে ঐ তিনটি দোষ হল :** ১. **উদ্যমহীনতা (Indolence)**, 2. **স্বার্থপরতা (Self-Interest)** এবং ৩. **দলীয় মনোভাব (Party-Spirit)**। লর্ড ব্রাইস-নির্দেশিত উপরোক্ত তিনটি প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও **অজ্ঞতা (Ignorance)** সু-নাগরিকতার অন্তরায়। যে ব্যক্তি অলস, স্বার্থপর, দলীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং অজ্ঞ সে কখনও সু-নাগরিক হতে পারে না।

১. উদ্যমহীনতা

সমাজ বা সমষ্টিগত বিষয়ে যে নির্লিপ্ত সে কখনও ভাল নাগরিক হতে পারে না। সকলের সমবেত চেষ্টাতেই সমষ্টিগত কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে। সাধারণত দেখা যায় যে, সর্বসাধারণের কাজ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ যেখানে নেই সেখানে কাজে অগ্রণী হওয়ার দরকার নেই—এ মনোবৃত্তিই সু-নাগরিক হওয়ার অন্তরায়। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু দেখা যায় যে, কার্যক্ষেত্রে অনেকেই সামাজিক কাজকর্ম এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। প্রত্যেকে ভাবে যে, অন্যে ঐ কাজ করবে। এভাবে সর্বজনীন কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না। ভোট দেওয়ার সময়ে নাগরিক হয়তো ভাবে, কত ভোটদাতাই তো আছে আমার একটা ভোট দেওয়া বা না-দেওয়ায় এমন কি এসে যায়? এভাবে ক্রমে ক্রমে কাজে এবং চিন্তায় তাদের অলসতা আসে।

সব লোকই যদি এরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে উদাসীন হয়ে পড়ে, তবে শাসনে শৈথিল্য আসে। সরকারী কর্মচারীরাও কাজে শিথিল হয় এবং শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার শর্ত হল সদা সতর্কতা (Enternal vigilance is the price of liberty)। দেশের রাজনৈতিক বা পৌরস্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সবসময় শাসন বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, না হলে স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। নির্লিপ্ত ও উদাসীন নাগরিকই একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেয়। এজন্য রাষ্ট্রনীতিক বিষয়ে যারা অবহেলা করে তারা সু-নাগরিক হবার অনুপযুক্ত। সুতরাং উদ্যমহীনতা সু-নাগরিকতার একটা বড় অন্তরায়।

২. স্বার্থপরতা

ব্যক্তিগত স্বার্থ নাগরিকত্বের অন্তরায়। সমাজজীবনের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে হবে। অর্থের লোভে অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচন, ভোট ক্রয়-বিক্রয়, নির্বাচনের পরে টাকা বা মন্ত্রিত্বের লোভে আইনসভার সদস্যদের সম্পূর্ণ নীতিহীন দলবদল, স্বার্থের জন্য আইনভঙ্গকারীকে বাঁচিয়ে চলা, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মীয়তার খাতিরে সরকারী চাকরিতে বহাল করার জন্য তদ্বির করা ইত্যাদি স্বার্থপরতার লক্ষণ এবং এগুলো সমাজবিরুদ্ধ কাজ।

অর্থের লোভে, সম্মানের লোভে বা সুলভে সমাজে জনপ্রিয় হবার জন্য এরূপ অন্যায় কাজ করা নাগরিকের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। দেশে নাগরিকদের স্বার্থপরতার প্রাবল্য দেখা দিলে শিল্পপতিরা কেবলমাত্র অর্থলোভে চালিত হবে, সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও উৎকোচপ্রবণ হবে, সরকারের ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্রশক্তিকে দলীয় স্বার্থে নিয়োগ করবে। এ অবস্থায় গণতন্ত্র বেশিদিন বাঁচতে পারে না। স্বার্থপর লোক সু-নাগরিক হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

৩. **উগ্র দলীয় মনোভাব**

উগ্র দলীয় মনোভাব, সু-নাগরিকত্বের আর একটি প্রতিবন্ধক। বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে রাজনৈতিক দল প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আছে। মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত রাষ্ট্রে এরূপ রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই আদর্শ হওয়া উচিত দেশের সেবা। কিন্তু ঐ আদর্শ ভুলে যদি প্রত্যেক দল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, তবে তা হবে রাষ্ট্রের পক্ষে অমঙ্গলজনক। যদি কোন নাগরিক নিজের দলের স্বার্থকেই বড় করে দেখে, সমাজের ও রাষ্ট্রের স্বার্থহানি করে তবে সে সু-নাগরিক হবার অনুপযুক্ত। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের মনকে সংকীর্ণ ও যুক্তিহীন করে। বিভিন্ন দলভুক্ত লোকেরা একে অন্যের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে অনেক সময় দেশের অনিষ্ট ডেকে আনে। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে মিথ্যাচরণ, নীতিহীনতা ও স্বার্থলোলুপতা দেখা দেয়। নিজেদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক, প্রত্যেক দলের সভ্যদের একমাত্র আদর্শ হবে উগ্র দলীয় মনোভাব ত্যাগ করে সব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দেশের সেবা করা।

৪. **অজ্ঞতা**

সু-নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হলে নাগরিকের কিছু পরিমাণে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার অভাবের জন্য অজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার দেখা দেয় যা সুনাগরিক হবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। নাগরিকেরা অজ্ঞ হলে অতি সহজেই তাদের বিপথে চালনা করা করা যায়। এজন্য স্টুয়ার্ট মিল অজ্ঞ নাগরিকদের ভোটাধিকার দিবার বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাঁর মতে অজ্ঞ নাগরিকগণ ভোটের গুরুত্ব বুঝতে না পারার জন্য এর মর্যাদা রাখতে পারে না। তাই বলা হয় যে, অজ্ঞতা সুনাগরিকতার একটি বড় অন্তরায়।

সু-নাগরিকত্বের আরও অনেক অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন, ক. জনসাধারণের দারিদ্র্য, খ. নির্বাচনী প্রথার ত্রুটি-বিচ্যুতি, গ জনমত প্রকাশের বাহনগুলোর দুর্নীতিপরায়ণতা, এবং ঘ. সংবাদপত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সুনাগরিক হবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাছাড়া, দেশের বিপুল জনসংখ্যা ও আয়তন সুনাগরিক গড়ে তোলার পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায়। সর্বোপরি বর্তমানের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি অপরিকল্পিত হবার ফলে সেখানে কখনো কখনো বিপুল বেকারী দেখা দেয়। উৎপাদনের বিশৃংখলা, আর্থনীতিক অসাম্য—ইত্যাদি ব্যবস্থার সামনে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষমতাহীন ও একান্ত অসহায় বলে মনে করে। এর ফলে **ব্যক্তি ক্রমশ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা (Alienation) অনুভব করে,** ফলে সমাজের সঙ্গে নাগরিক একাত্মবোধ অনুভব করে না এবং নাগরিক ক্রমশ হতাশাগ্রস্ত ও নিরাশাবাদী হয়ে ওঠে।

অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা

ছয়ঃ অন্তরায়গুলো দূর করার উপায় (Measures for the Removal of the Hindrances to Good Citizenship)

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকদের সচেতনতা, চরিত্র এবং সৎগুণাবলীর ওপর। তাই সুনাগরিকত্বের অন্তরায়গুলোকে কি উপায়ে দূর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, সুনাগরিকতার অন্তরায়ের মূল কারণ হল জনসাধারণের নির্লিপ্ততা (public apathy)। সুতরাং সব প্রতিকারের লক্ষ্যই হল জনকল্যাণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও সুখী সমাজ গড়ে তোলা।

নাগরিকের দোষগুলো দূর করতে হলে লর্ড ব্রাইসের মত অনুযায়ী দু ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন : ক. শাসনতান্ত্রিক (Administrative remedies) এবং খ. নৈতিক (Moral remedies)। সরকারের কাঠামো, নীতি ও কার্যপদ্ধতি উন্নত করাকে বলে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার ব্যবস্থা। আর যা জনসাধারণের চরিত্র ও মনোবল উন্নত করে তোলে তা হল নৈতিক প্রতিকার ব্যবস্থা।

ক. শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার

সুচিন্তিতভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে সুনাগরিকত্বের অন্তরায়গুলো দূর করা সম্ভব। ১. ব্রাইসের মতে দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসন সুনিশ্চিত থাকা প্রয়োজন (system of proportional representation)। এর ফলে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব লাভ করে এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ২. ভোটদানের কাজ বাধ্যতামূলক করার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে ভোটদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের কাজে জনগণ উদাসীন হয়ে না পড়ে। ৩. জনমত সংগ্রহ (Referendum), গণ উদ্যোগ (Initiative), প্রতিনিধি প্রত্যাহার প্রথা (Recall) ইত্যাদি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে। ঐ সকল পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক থাকে এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। ৪. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন পঞ্চায়েত, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করে এদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। ঐ সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানই নাগরিককে গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ দেয়, এ বিষয়ে নাগরিককে সুশিক্ষিত করে তোলে। তা ছাড়া, ৫. দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি অসামাজিক কাজকর্ম রোধের জন্য উপযুক্ত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

খ. নৈতিক প্রতিকার

নির্বাচনী আইনের কড়াকড়ি, দুর্নীতির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের দোষত্রুটি দূর করা যায়। কিন্তু আইনের মাধ্যমে বাধ্যতা আরোপ করে ভোটদাতার উদাসীনতা দূর করা যায় না। নাগরিকের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে উন্নত স্তরের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। মনকে রঙিন না করে গৈরিক রঙের বস্ত্র পরিধান করে যেমন প্রকৃত যোগী হওয়া যায় না, এটাও সেরূপ। অন্তরের উন্নতি বা মানসিক উৎকর্ষ অর্জনই বড় কথা। মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধিই ব্যক্তিকে সুনাগরিক করে তোলে। নাগরিকের মনে অদম্য উৎসাহ থাকা, সমাজবোধ থাকা এবং সুস্থ ও সুসংস্কৃত অনুভূতি থাকা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, কোন জনসমষ্টি অন্যান্য ধরনের সরকার অপেক্ষা গণতান্ত্রিক সরকার অধিকতর পছন্দ করতে পারে; কিন্তু জনগণ যদি উৎসাহহীনতা, অসাবধানতা, কাপুরুষতা বা জনকল্যাণমূলক প্রেরণার অভাবের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারকে রক্ষা করার মত পরিশ্রম করতে প্রস্তুত না থাকে, যদি ঐ সরকার আক্রান্ত হলে তারা তাকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না থাকে, যদি নানা প্রলোভনের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে; যদি নিজেদের প্রিয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনষ্ট করতে উদ্বুদ্ধ হয়—তবে এরূপ অবস্থায় ঐ জনসমষ্টি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে অনুপযুক্ত। জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করেন, ঐরূপ জনগণকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করতে দেওয়া হলেও বেশিদিন তারা তা আস্বাদন করতে পারবে না।

সুনাগরিকতার অন্তরায় প্রতিকারের প্রকৃত উপায় হল শিক্ষার প্রসার। এমনভাবে শিক্ষাদান-পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার যাতে সাহস, সততা, সহনশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকার ও অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এজন্যেই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্রে' ব্যাপকভাবে

শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। সুশিক্ষা ব্যক্তির মনে উদারতা জাগায়, দেশপ্রেম জাগায়, গভীর সমাজ-বোধ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শিক্ষার প্রভাবেই হিংসা, দ্বেষ এবং আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত বা দলগত সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়ে দেশ-মাতৃকাকে সেবা করার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। প্রকৃত শিক্ষা প্রতিটি নাগরিককে কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ দেশসেবকে পরিণত করে। এরূপ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন্ উৎস থেকে ও কি কৌশলে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি জাগ্রত হচ্ছে সে সম্পর্কে সদা সর্বদা তাদের সচেতন থাকতে হবে।

প্রতিকারের **ঐ সকল ব্যবস্থা ছাড়াও দারিদ্র্য, অনাহার, আয়-বৈষম্য, ধন-সম্পদের কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি দূর করার উদ্দেশ্য আর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।** এতে জনসমষ্টির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও ন্যায়বোধ জেগে ওঠে। যদি দেশের প্রতিটি ক্ষেতখামার ও কলকারখানা থেকে আলাপ-আলোচনা ও হিসেবে-নিকেশের মাধ্যমে তলার দিক থেকে শুরু করে ক্রমশ ওপরের দিকে জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনা রচিত হয় তবে তা জনচিত্তে সাড়া জাগায়, দেশ সম্পর্কে লোককে আগ্রহী করে তোলে। এভাবে ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে যে অভিন্নতাবোধ দেখা দেয়—তাই সুনাগরিক সৃষ্টির পরিবেশ রচনা করে সুনাগরিক গঠনে সাহায্য করে।

সাত : ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন (Indian Citizenship Act)

পৃথিবীর বৃহৎ দুটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েত ইউনিয়ন) প্রত্যেকটিতে ব্যক্তির দু শ্রেণীর নাগরিকত্ব আছে। ব্যক্তি যে প্রদেশ বা অঙ্গ রাজ্যে বাস করে সে তার নাগরিক এবং গোটা দেশের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নাগরিকত্ব বলতে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বোঝায়; কোন অঞ্চল বা রাজ্যের নাগরিকত্ব বোঝায় না। **সর্বভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়া কোন দ্বৈত-নাগরিকত্ব (dual citizenship) ভারতের শাসনতন্ত্রে নেই।** আমরা ভারতের নাগরিক, বাংলা, বিহারের বা মহারাষ্ট্রের নাগরিক নই। ভারতের নাগরিকেরা বিভিন্ন রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হতে পারেন, কিন্তু তাদের সে রাজ্যের নাগরিক বলা যায় না।

১৯৫০ সালে গৃহীত **ভারতের সংবিধানের** ৫ নম্বর ধারা থেকে ১০ নম্বর ধারায় **বলা হয়েছে যে, যারা নিম্নলিখিত যোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি যোগ্যতার অধিকারী হবে তাদের ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য করা হবে :** ১. যিনি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন; বা ২. যার মাতাপিতা ভারত ইউনিয়নের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন; বা ৩. ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবার আগে পাঁচ বছর বা তার অধিককাল ধরে ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করেছেন; বা ৪. যিনি বা যার মাতাপিতা বা পিতামহ-পিতামহী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্গত ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন; বা ৫. ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের আগে ভারতীয় ইউনিয়নে এসে বসবাস করছেন; অথবা ৬. ঐ উক্ত তারিখে বা তার পরে ভারতীয় ইউনিয়নে এসে বসবাস করার পর নাগরিকরূপে নাম রেজেস্ট্রী করে ভারতে বাস করছেন। যিনি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর পাকিস্তানে গিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করছেন তিনি ভারত ইউনিয়নের নাগরিকত্ব হতে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু তিনি যদি আবার পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্থায়িভাবে ভারতে বাস করার সনদ বা আইনানুসারে অধিকার পেয়ে থাকেন তা হলে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পুনরায় লাভ করবেন।

আমাদের শাসনতন্ত্রে নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বা নাগরিকত্ব লোপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এ সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছিল যে, সংসদ এই বিষয়ে আইন করে নিয়মাবলী স্থির করবে। **১৯৫৫ সালে সংসদে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইনানুসারে পাঁচটি পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করা যায় :** ১. জন্ম সূত্রে (by birth) : ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারীর পরে যারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন (বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত বা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের

সন্তান ছাড়া) ; ২. বংশ (descent) ঃ উত্তরাধিকার সূত্র অনুযায়ী ভারতে জন্মেছেন এমন ব্যক্তির সন্তান ঐ তারিখ বা তার পরে বিদেশে জন্মগ্রহণ করলেও ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন ; ৩. রেজেস্ট্রী (registration) ঃ যারা সাধারণত ভারতে বসবাস করেন তাঁরা যদি রেজেস্ট্রারীভুক্ত হবার জন্য দরখাস্ত করার ছয় মাস আগে থেকে এখানে বাস করেন ; ৪. অর্জন (naturalization) ঃ ক. ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এমন বিদেশীয় নারীরাও দরখাস্ত করে নাম রেজেস্ট্রী করিয়ে ভারতীয় নাগরিক হতে পারেন, (খ) বিদেশী ব্যক্তি দরখাস্ত করলে এবং ভারত সরকার তা উপযুক্ত বিবেচনা করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারেন ; ৫. নতুন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি (incorporation of territory) ঃ যদি নতুন কোন অঞ্চল ভারতের অধিকারভুক্ত হয় তা হলে ঐ অঞ্চলের কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বলে গণ্য হবেন তা ভারত সরকার স্থির করবেন। পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ, সিকিম ইত্যাদি রাজ্যের অধিবাসীরা এভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।

১৯৫৫ সালের আইন অনুসারে কারা ভারতের নাগরিক

কোন বিদেশীকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেবার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় ঃ ক. তিনি যে দেশের নাগরিক ভারতীয়রা সেই দেশের নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ পান কিনা ; খ. তিনি আগের বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কি না ; গ. দরখাস্ত করার বারো মাস আগে থেকে তিনি ভারতে একটানা বসবাস করছেন কি না বা ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন কি না ; ঘ. ঐ বারো মাসের আগে সাত বছরের মধ্যে অন্তত চার বছর তিনি এদেশে বাস করছেন বা ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করছেন কি না ; ঙ. তিনি সচ্চরিত্র এবং ভারতের ১৪টি প্রধান ভাষার একটিও জানেন কি না ; চ. ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করার কোন অভিপ্রায় তাঁর আছে কি না।

বিদেশী ব্যক্তির নাগরিকত্ব লাভ

১৯৫৫ সালের আইনে নাগরিকত্ব বিলোপ সাধনের বিধানও রাখা হয়েছে। ঐ আইন অনুযায়ী তিন ভাবে নাগরিকত্ব লোপ পেতে পারে ঃ ১. ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগের দ্বারা। যদি কখনও দেখা যায় কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ভারতের এবং অন্য কোন দেশের নাগরিক তবে তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হবে। নতুবা তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পাবে। ২. স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের দ্বারা। কোন ভারতীয় নাগরিক নিজ ইচ্ছায় অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে স্বভাবতই তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ পাবে। ৩. সরকারী নির্দেশ দ্বারা। যদি কখনও ভারত সরকার মনে করেন যে, কেউ জাল বা মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা ভারতের নাগরিক হয়েছেন বা তিনি সংবিধানের প্রতি অনুরক্ত নন, তবে তাঁর নাগরিকতার বিলোপ ঘটবে।

নাগরিকত্বের বিলোপ

আট ঃ অধিকার ঃ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Rights : Definition and Nature)

সাধারণ অর্থে লোকের ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ অর্থে 'অধিকার' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় না। অধিকার শব্দটির রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনের ভেতর দিয়েই ব্যক্তি তার সত্তার প্রকাশ ও বিকাশ সাধন করতে পারে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে আমরা বুঝি প্রত্যেকের নিজস্ব প্রবণতা, অন্তর্নিহিত প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতা অবাধে প্রকাশ করা। কারও প্রবণতা খেলাধুলায়, কারও ছবি আঁকায়, কারও লেখা-পড়ায়, কারও বা গান-বাজনা ও নাটক অভিনয়ে। নিজ নিজ প্রবণতা ও দক্ষতার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হলে আমরা বলি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হল। নিজ নিজ প্রবণতা ও দক্ষতার বিকাশ সম্ভব হয় সুযোগ ও সুবিধে ভোগের উপযুক্ত পরিবেশে। ন্যূনতম কতকগুলো প্রয়োজন না মিটলে ঐ পরিবেশ সৃষ্টি হয় না। যেমন, কোন বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে

অধিকার ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনে সাহায্য করে

তবেই নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে পারে। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য যে **সকল সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার তাদের যোগফল হল অধিকার।** অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় বলা যায় যে, অধিকার বলতে আমরা সামাজিক জীবনের সে সকল শর্তকে বুঝি যার অভাবে সাধারণ ভাবে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয় (**Rights, in fact, are those conditions of social life, without which no man can seek, in general, to be himself at his best**)।

কিন্তু অধিকারগুলো তখনই প্রকৃত অধিকার হতে পারে যখন রাষ্ট্র সেগুলোকে 'অধিকার' বলে স্বীকার করে এবং তাদের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। রাষ্ট্র না মেনে নিলে ঐগুলো অধিকার বলে গণ্য হতে পারে না।[১] অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলে অধিকার থাকতে পারে না।

রাষ্ট্র অধিকার স্বীকার ও রক্ষা করে

সমাজ এবং রাষ্ট্র মানুষের কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধেকে স্বীকৃতি দেয় এবং তখন ঐগুলো 'অধিকার' নামে পরিচিত হয়। অধিকারগুলোর সীমা, ব্যতিক্রম এবং ভোগের শর্ত স্থির করে সমাজ এবং রাষ্ট্র এবং এরাই অধিকারগুলো রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সমাজ বা রাষ্ট্র-স্বীকৃত অধিকারগুলো যাতে আমরা ভোগ করতে পারি এবং কোন রকম বাধা-নিষেধ আরোপ করে কেউ যাতে ঐ ভোগে কোনরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করতে না পারে তা দেখার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। **এক কথায় রাষ্ট্র ও সমাজ অধিকারের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা।**

অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য অংগাংগীভাবে জড়িত। আমাদের চিন্তা ও ভাব প্রকাশের অধিকার আছে। এর অর্থ, অন্যের কর্তব্য হল আমার চিন্তা ও ভাব প্রকাশে বাধা না দেওয়া।

অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য জড়িত

অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের কিছু কিছু অধিকার দেয়। ঐ অধিকারগুলো ভোগ করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাকেও কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়।

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বা সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়োজনের মধ্য থেকেই সকল অধিকারের উৎস। যেমন, কোন মানুষের অধিকার নেই অন্যকে হত্যা করার ; ঐ অধিকার মেনে নিলে সমাজ ভেঙে যাবে ; চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সামাজিক বিশৃঙ্খলার পরিবেশে সুন্দর ও উন্নত জীবন যাপনের আদর্শ বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। সামাজিক কল্যাণের মৌলিক নিয়মগুলো না মেনে চললে অধিকারগুলো ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকটি নাগরিকেরই কতকগুলো নৈতিক দায়িত্ব আছে। প্রত্যেকে নিজে যেমন অধিকার ভোগ করবে, ঠিক তেমনি প্রতিটি নাগরিকের অন্যদের অধিকারের কথাও স্মরণ রাখা উচিত। অন্যদের অধিকার মেনে চলা সবারই দায়িত্ব। প্রত্যেকের উচিত এমন ভাবে ঐ অধিকারগুলো প্রয়োগ করা যাতে সমাজের জ্ঞান ও সম্পদ্-ভান্ডার ভরে ওঠে। হবহাউসের (Hobhouse) ভাষায় বলা চলে যে, **প্রতিটি অধিকারই সামাজিক কল্যাণের শর্ত।**

সামাজিক কল্যাণ বলতে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট কোন ধারণাকে বোঝায় না। **যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের সম্পর্কে ধারণাও পরিবর্তিত হয়।** পৃথিবীতে যখন শিল্পপ্রসার শুরু হয়, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করে নিয়েছিল। লোকে যতখুশি সম্পত্তি অর্জন করতে পারত এবং যে-কোন ভাবে অর্জিত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগ করতে পারত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক কাঠামোতে এত ত্রুটি দেখা গিয়েছে যে, আজকাল সামাজিক কল্যাণের দিকে তাকিয়ে এরূপ অবাধ অধিকারকে যুগোপযোগী নয় বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের জনমতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার সঙ্কোচনের পক্ষে। অনেক

অধিকার সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন

১. অধ্যাপক Barker আরও সুন্দর ভাবে বলেছেন : "The sum of rights is my whole capacity, my whole status and whole power of action—within state and whole its law ; it is my general and total personal or legal personality ; it is my general position in the system of right (in so far as that system is recognised by the state) and the whole of my share in the system."

—Barker, *Principles of Sociol and Political theory*

রাষ্ট্রও তাই জনমতের চাপে ঐ অধিকারগুলো সংকোচন করছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজ-জীবনেরও দ্রুত পরিবর্তনের জন্য এমন কোন অধিকারের তালিকা তৈরি করা যায় না যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়।

একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ও সাম্য দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা না থাকলে কোন নাগরিক নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য দাবি করতে পারে না। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত অনুযায়ী সরকার গঠিত হয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই নাগরিককে অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেয়। বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সহায়ক। উপরন্তু, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক সাম্য না থাকলে রাষ্ট্র বিত্তবান্ ও বলবান্ শ্রেণীকে অধিকতর সুযোগ দেয়। ফলে, সকলের অধিকার সমভাবে রক্ষিত হয় না। এর জন্য এরূপ সমাজে কাগজ-পত্রে অধিকার থাকলেও তা বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যে রাষ্ট্রের নাগরিকরা যত বেশি পরিমাণ অধিকার ভোগ করতে পারে, সে রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও গণতান্ত্রিক।

একমাত্র গণতন্ত্রেই অধিকার থাকে

নয় ঃ অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights)

অধিকারের চরিত্র অনুযায়ী তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এ ধরনের শ্রেণী বিভাগ করার আগে বলা প্রয়োজন যে, অধিকারগুলোকে **নৈতিক ও আইনসংগত** এ দুটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে।

নৈতিক অধিকার ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকের ওপর নির্ভর করে। এতে রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যেমন সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কয়েকটি নৈতিক অধিকার আছে। শিক্ষকেরও ছাত্রের প্রতি কয়েকটি নৈতিক অধিকার আছে। কিন্তু ঐ অধিকার ক্ষুন্ন হলে রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে কোন প্রতিকার করতে পারে না। সন্তান যদি বৃদ্ধ বয়সে মাতাপিতার ভরণপোষণ না করে, অথবা ছাত্র যদি শিক্ষককে ভক্তিশ্রদ্ধা না করে, তবে রাষ্ট্র তাকে সেজন্য কোন শাস্তি দিতে পারে না। কেউ যদি নৈতিক অধিকার ভাঙে তবে সমাজের কাছে সে নিন্দনীয় হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র এ বিষয়ে কিছু করতে পারে না।

নৈতিক ও আইনসংগত অধিকার

আমাদের আলোচনা মূলত নাগরিকদের আইনসংগত অধিকার নিয়ে। **যে সকল অধিকার রাষ্ট্র আইনের দ্বারা রক্ষা করে তা আইনসংগত বা আইনগত অধিকার।** এই অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করে নেয় এবং ঐ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দেয়। **আইনগত অধিকারকে দুটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ**

ক. পৌর অধিকার (Civil Rights)

খ. রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

এ দুটি অধিকার বাদে আরও দু রকমের অধিকার আছে—সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার। এদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

ক. পৌর অধিকার

যে সকল সুযোগ-সুবিধে বা অধিকার না থাকলে মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করতে পারে না এবং যে সকল অধিকার নাগরিক জীবন-যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক **তাদের পৌর অধিকার বলে।** মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলোর পূর্ণ বিকাশের জন্য পৌর অধিকারের প্রয়োজন। অনেক রকম পৌর অধিকার আছে। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত পৌর অধিকারগুলোই প্রধান ঃ

পৌর অধিকার

১. বাঁচা বা জীবন রক্ষার অধিকার

বাঁচা এবং জীবন রক্ষার অধিকার (right to life) নাগরিকদের একটি প্রধান ও অপরিহার্য অধিকার। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য নাগরিকদের জীবন রক্ষা করা। দেশের

ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং শত্রুর আক্রমণ হতে দেশ রক্ষা করে জনগণের জীবন রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য। এজন্য আত্মহত্যা করাও আইনের চোখে অপরাধ।

২. **স্বাধীনতার অধিকার**

নাগরিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পৌর অধিকার হল স্বাধীনতার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকারটি খুবই ব্যাপক। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীন গতিবিধির অধিকার, সংঘবন্ধ হবার এবং সংঘ ও সমিতি গঠন করার অধিকার, সভা ও জমায়েতে যোগদানের অধিকার, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পেশা গ্রহণ করার অধিকার, স্থায়িভাবে দেশে বসবাস করার অধিকার ইত্যাদি স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্গত। কয়েকটি স্বাধীনতার অধিকার আলোচনা করা হল ঃ

ক. **স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার**

নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা থাকবে এবং সকল নাগরিকই সকল সময়ে নির্ভিক ভাবে তার মত প্রকাশ করতে পারবে। সরকারী নীতি সমালোচনা করার অধিকারও তাদের আছে। সরকারের সমালোচনার জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। মতামত মূলত দুভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—বক্তৃতার মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে। তাই মুদ্রণযন্ত্র, পুস্তক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকের মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করার অধিকার আছে।

খ. **স্বাধীন গতিবিধির অধিকার**

রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে-কোন নাগরিক অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। সরকার কর্তৃক প্রবেশাধিকার নিষিন্ধ করা হয়েছে এমন স্থান ছাড়া অন্যত্র অবাধ চলাফেরায় সরকার কোন বাধা দিতে পারবে না। যেমন, প্রতিটি ভারতবাসীর ভারতের অন্তর্গত যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা ও যাতায়াতের অধিকার আছে।

গ. **বিনাবিচারে আটক না হবার অধিকার**

বিনা-বিচারে সরকার কখনো কাকেও আটক রাখতে পারবে না। কাকেও অন্যায় ভাবে আটক করলে সে এই মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য উচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারে এবং বিচারপতি ঐ আটককে অবৈধ বলে মনে করলে তৎক্ষণাৎ বন্দীকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

ঘ. **সংঘবন্ধ হবার অধিকার**

মানুষ নানা প্রয়োজনে সংঘবন্ধ হয়ে বাস করতে চায়। নানা রকম উদ্দেশ্যে লোকে সংঘ গঠন করে। এ সংঘ যদি বে-আইনী অথবা রাষ্ট্রবিরোধী না হয় তবে প্রত্যেক নাগরিক যে-কোন সংঘ বা সমিতি গঠন করার এবং সংগঠনের সভ্য হবার অধিকারী।

ঙ. **সভা-জমায়েতে যোগ দেবার অধিকার**

সভা আহ্বান করে যে-কোন বিষয়ে সমালোচনা করার অধিকার নাগরিকের আছে। সভা ও সমিতিতে যোগদান করে যে কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বা অন্যের মতামত জানার অধিকার সবার আছে।

চ. **পেশা ও বৃত্তির অধিকার**

আইনসংগত যে কোন পেশা গ্রহণ করা বা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা প্রতিটি নাগরিকের আছে।

ছ. **বসবাস করার অধিকার**

প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের যে-কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ভংগ না করলে সকল নাগরিক রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করার অধিকারী।

৩. **সম্পত্তির অধিকার**

প্রত্যেক নাগরিকই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবাধে ক্রয়, বিক্রয় ও ভোগ করতে পারবে। সম্পত্তি-

অর্জন ও ভোগের অধিকার না থাকলে সমাজবন্ধনই শিথিল হয়ে পড়ে—এটাই আরিস্টটলের মত। সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকার করা হয় না। সমাজের মঙ্গলের জন্য ও ব্যক্তির বিকাশের জন্য নিজের অর্জিত সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই স্বীকার করা হয়।

৪. চুক্তির অধিকার

আইনের সীমানার মধ্যে থেকে যে-কোন নাগরিক অন্য নাগরিকের সাথে চুক্তিবন্ধ হতে পারবে। ঐ চুক্তি দু পক্ষেরই পালনীয়। অবশ্য যদি ঐ চুক্তি আইন-বিরুদ্ধ অথবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরুদ্ধ হয় তবে তা বাতিল হবে।

৫. আইনের চোখে সমান বলে গণ্য হবার অধিকার

ধনী-দরিদ্র সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান। আইন কাকেও খাতির করে না। যে যত বড়ই হোক না কেন, অপরাধ করলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আইনের চোখে সমতা এবং আইন কর্তৃক সবাইকে সমভাবে রক্ষা করা সাম্য নীতির উৎস।

৬. পরিবার গঠনের অধিকার

পরিবার গঠনের অধিকার একটি মৌল পৌর অধিকার। বিয়ে করা এবং পারিবারিক জীবন-যাপন করার অধিকারকে পরিবার গঠনের অধিকার বলে।

৭. ধর্মের অধিকার

প্রতিটি নাগরিক নিজ ইচ্ছে ও বিশ্বাস মত ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে, ধর্মীয় আচার-আচরণে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, নিজ ধর্মমত ব্যক্ত ও প্রচার করতে পারবে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ (secular) রাষ্ট্র। তাই ভারত রাষ্ট্র কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে না, কিন্তু এখানে নাগরিকদের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মাচরণের অধিকার ও সুযোগ দেয়া হয়।

খ. রাজনৈতিক অধিকার

যে সকল অধিকার থাকলে রাষ্ট্রের কাজকর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা যায় সে সকল অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। কেবলমাত্র নাগরিকেরাই রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে। নিম্নলিখিত অধিকারগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে গণ্য করা যায়ঃ

১. ভোটাধিকার

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। ভোটাধিকার বর্তমান যুগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সাধারণভাবে একুশ বছর বয়সের নর-নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেন। কোথাও কোথাও আঠার বছর বয়সকেই ভোটাধিকারের যোগ্য মনে করা হয়। তবে যারা দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত বা পাগল, তারা ভোট দেবার অধিকার লাভ করে না। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে।

২. নির্বাচিত হবার অধিকার

ভোটাধিকারের সঙ্গে নির্বাচিত হবার অধিকার অংগাংগীভাবে জড়িত। যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটাধিকার লাভ করেন তাঁরা নির্বাচিত হবার অধিকারও লাভ করেন। তবে কোন-কোন পদে (যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত হবার জন্য শুধুমাত্র ভোটাধিকার থাকলেই চলবে না, ন্যূনতম বয়স এবং অন্যান্য যোগ্যতাগত শর্ত পালিত হতে হবে।

৩. সরকারী চাকরি পাবার অধিকার

যোগ্যতা অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক সরকারী চাকরি পাবার অধিকার লাভ করেন। তবে কোন বিশেষ ধরনের কাজ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। কিছু কিছু কাজ কেবলমাত্র নারী বা পুরুষের জন্য সংরক্ষিত থাকতে

পারে। যেমন, নার্সদের চাকরি নারী ছাড়া কোন পুরুষ লাভ করবে না। আবার ভারতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আইন করে কিছু কিছু সরকারী চাকরি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে চাকরির অধিকার নাগরিকদের মৌল অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

৪. আবেদন করার অধিকার

সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে শাসন কর্তৃপক্ষ বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিক ভোগ করে।

৫. সরকারের সমালোচনা করার অধিকার

স্বৈরাচারী শাসকেরা এবং একনায়কেরা সরকারের কোন সমালোচনা বরদাস্ত করেন না। সরকারের সমালোচনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। তাই গণতন্ত্রে নাগরিকেরা সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করার অধিকার ভোগ করে। অনেকে মনে করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য এ অধিকারটি খুবই প্রয়োজনীয়।

৬. রাষ্ট্রকে অমান্য করার অধিকার

সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হলেও রাষ্ট্রশক্তিকে অমান্য (disobedience) বা বিরোধিতা (resistance) করা যায় কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ ছিল। আগে মনে করা হত, রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা করা যায় না, রাষ্ট্রীয় আইনকে অমান্য করা যায় না। কিন্তু বর্তমানে মনে করা হয়, সামাজিক কাঠামোর ইচ্ছে পূরণে আইন কতটা সাহায্য করতে পারে তার ওপর রাষ্ট্রীয় আইন ও নিয়ম-কানুন আনুগত্য আদায় করতে পারে কিনা তা নির্ভরশীল। তাই লাস্কি মনে করেন, রাষ্ট্র কী পরিমাণে তার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম তার ওপর রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য নির্ভর করে। রাষ্ট্রকে অমান্য করার অন্তত শর্তসাপেক্ষ অধিকার বর্তমানে মোটামুটি স্বীকৃত। শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তনের জন্য নাগরিকদের বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের অধিকার উপরোক্ত চিন্তার সম্প্রসারিত রূপ। **মার্কসবাদীরা ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের অধিকারকে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার বলে মনে করেন।** গান্ধীজী মার্কসবাদের অনুগামী না হয়েও শান্তিপূর্ণভাবে **রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করার অধিকার সমর্থন করেছেন।** বস্তুত, ব্রিটিশের মত শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেও গান্ধীজী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন নজীর স্থাপন করেছেন।

৭. বিদেশে থাকাকালীন নিরাপত্তার অধিকার

যখন কোন নাগরিক বিদেশে থাকে, তখন ঐ বিদেশী সরকারের কোন অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য ঐ দেশে নিযুক্ত স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে তার সাহায্য পাওয়ার অধিকার থাকে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের সময়ে অথবা জরুরী অবস্থায় দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করলে কোন কোন দেশের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ব্যবহার সরকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে।

দশ : নাগরিকদের কর্তব্য (Duties of the Citizens)

বাধ্যতামূলকভাবে কোন কিছু করা বা না-করার দায়িত্বকে কর্তব্য বলে। আইন মান্য করা নাগরিকদের একটি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব, সুতরাং আইন অমান্য না-করা নাগরিকদের একটি কর্তব্য। আবার, জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা নাগরিকদের দায়িত্ব, তাই জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি না-করা নাগরিকদের কর্তব্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, **যে সকল কাজ অবশ্যই করা উচিত এবং যে সকল কাজ করা উচিত নয়, তা করা বা না-করাকে কর্তব্য বলে।** নাগরিকদের কর্তব্যগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করলে কেউ সুনাগরিক হতে পারে না।

কর্তব্য কাকে বলে

অধিকার বললেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কথা ওঠে। **অধিকারের ধারণার মধ্যে কর্তব্যের ধারণা নিহিত।** এক ব্যক্তির অধিকার অন্য ব্যক্তির কর্তব্যের ওপর নির্ভর করে। রাস্তায় আমার চলাফেরা করার অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের কর্তব্য হল রাস্তায় আমার চলাফেরায় কোন বাধা সৃষ্টি না করা। সুতরাং আমার অধিকার ভোগ করা অন্যের কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভরশীল।[১]

অধিকার ও কর্তব্য

যে সকল কর্তব্য পালনের পেছনে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে তাকে **আইনগত কর্তব্য** বলে। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের আনুগত্য প্রকাশ করা একটি আইনগত কর্তব্য। যে সকল কর্তব্যের পিছনে আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব আছে তাকে **নৈতিক কর্তব্য** বলে। যেমন, সন্তানসন্ততিদের পালন করা পিতামাতার নৈতিক কর্তব্য।

কর্তব্যের চরিত্র অনুযায়ী একে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

ক. রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য
খ. পরিবারের প্রতি কর্তব্য
গ. সমাজের প্রতি কর্তব্য
ঘ. মানব জাতির প্রতি কর্তব্য

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের মূল কর্তব্যগুলো নীচে আলোচনা করা হল ঃ

ক. রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য

১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঃ এই কর্তব্যই বিদেশী ও নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা এবং রাষ্ট্রের নির্দেশ মান্য করা। দেশ আক্রান্ত হলে দেশ রক্ষা করা নাগরিকদের অন্যতম রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও রাষ্ট্রের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। বিপদে আপদে রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা, সরকারী কর্মচারীরা যাতে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে তাতে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

২. আইন মান্য করা ঃ প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলবে। সমাজের মঙ্গলের জন্যই আইন করা হয়। সুতরাং যারা সমাজের মঙ্গল চায় তারা নিশ্চয়ই আইনের বিরোধিতা করবে না। শুধু নিজে আইন মানলেই চলবে না, অন্যে আইন ভঙ্গ করলে তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। তবে আইন যদি ন্যায় ও কল্যাণের বিরুদ্ধে হয়, তখন তা সংশোধনের জন্য আইনসঙ্গত ভাবে চেষ্টা করতে হবে। এটাও প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকের কর্তব্য।

৩. কর প্রদান করা ঃ মানুষের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ সম্পন্ন করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন ; নাগরিকেরা কর দিয়ে ঐ অর্থের সংস্থান করে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল নিয়মিতভাবে সরকার কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা করা।

৪. ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা ঃ আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হ'ল নির্বাচনের সময়ে বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী বিচার করে ভোট প্রয়োগ করা। সাধুভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা নাগরিকের কর্তব্য।

৫. নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারী কাজ করা ঃ কোন নাগরিক সরকারী কাজে নিযুক্ত হলে, যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেও সরকারের সব কাজ সুসম্পন্ন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অনেক সময় দেখা যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনবিদ্ বিপুল অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে লোভ ত্যাগ করে সরকারী আদেশে অনেক কম বেতনে আদালতের বিচারকের কাজ গ্রহণ করেছেন।

---

১. অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের আলোচনা বিশদভাবে পরে করা হয়েছে।

খ. পরিবার প্রতি কর্তব্য

পরিবারের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যগুলো আলোচনা করা হল ঃ

প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন নাগরিকের নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্য আছে। যতদিন পিতামাতা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাঁদের সেবা করা ও সাধ্যমত সুখ-শান্তি দেওয়া প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য।

পারিবারিক দায়িত্ব পালন

নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও নিকট-আত্মীয়কে ভরণপোষণ করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নানাপ্রকার আর্থিক ও দৈহিক সাহায্যে সকলকে সুখী করার চেষ্টা করা নাগরিকের কর্তব্য।

ইংরাজিতে একটি কথা আছে যে, দয়া-দাক্ষিণ্যের অভ্যাসের সূত্রপাত ঘটে গৃহে (Charity begins at home)। তেমনি, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যের সূত্রপাত ঘটে নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্য সাধনের মধ্য দিয়ে। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, সে কখনই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। পারিবারিক কল্যাণের ওপরেই রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে। পরিবারের মধ্যে যদি অশান্তি থাকে, তবে রাষ্ট্রে শান্তি আসতে পারে না। স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা. সহানুভূতি ইত্যাদি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ ও প্রয়োগ পরিবারকে কেন্দ্র করেই ঘটে। পরিবারের সঙ্গে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তিই রাষ্ট্রের ঐক্য ও সহযোগিতার মূল ভিত্তি। এজন্য পারিবারিক কর্তব্যকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারিবারিক কর্তব্যবোধ যার নেই সে নাগরিক হবার অনুপযুক্ত। পারিবারিক কর্তব্য নাগরিক কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গ. সমাজের প্রতি কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে দলবদ্ধ হয়ে বাস করাই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। কিন্তু সমাজে বাস করতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের সমাজের প্রতি কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হয়।

সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন

সমাজের উন্নতি দ্বারাই নাগরিকের উন্নতি সম্ভব। সমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক নাগরিক তার সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করবে—অর্থের দ্বারা, শ্রমের দ্বারা, বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা সমাজের সেবা করা প্রত্যেক নাগরিকের সুমহান্ কর্তব্য। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেও সমাজের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। আজকাল আমাদের দেশে সরকার নানা 'উন্নয়ন পরিকল্পনা' গ্রহণ করছে। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও মেরামত, কুটির-শিল্পের উন্নয়ন, গৃহপালিত পশুর সেবাকেন্দ্র, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বন-জঙ্গল পরিষ্কার ও জলনিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্যে জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক। ঐ সকল সমাজোন্নয়নের কাজে সরকারকে সাহায্য করাও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সকলের মধ্যে নৈতিক ও আর্থনীতিক উন্নতি সাধনও নাগরিকের কর্তব্য। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সমাজের কুসংস্কার ও কু-রীতি-নীতি দূর করে নানাপ্রকার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও ঋণভারে জর্জরিত লোকদের মধ্যে আশার বাণী বহন করে প্রত্যেককে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করা এবং উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম জাগিয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

ঘ. বিশ্বমানবের প্রতি কর্তব্য

বর্তমান যুগে মানুষ শুধু নিজের পরিবার, নিজের সমাজ অথবা নিজের রাষ্ট্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। বিশ্বমানবের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সকল জাতিই একসূত্রে গ্রথিত। বিজ্ঞানের নানা প্রকার আবিষ্কার আজকাল সময় ও দূরত্ব অত্যন্ত

বিশ্বমানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও উদ্বুদ্ধ করা

সংক্ষেপ করে দিয়েছে। এখনকার এরোপ্লেন শব্দগতি অপেক্ষাও দ্রুত চলতে পারে। তিনদিনে আজকাল গোটা বিশ্ব একবার পরিক্রমা করা চলে। এমন দিন হয়তো আসবে যখন একদিনে এরোপ্লেনের সাহায্যে গোটা বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হবে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল

আজকাল আর তা নেই। সুদূরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ব্রিটেনকে এখন ভারতের নিকট প্রতিবেশী বলা চলে। জলপথে দ্রুতগামী জাহাজ মহাসাগরের দুর্গম ব্যবধান দূর করেছে। স্থলপথে দ্রুতগামী ট্রেন ও মোটর গাড়ি সব জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন, বেতারবার্তা ইত্যাদি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অতি সহজে ও অল্প সময়ে ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির সুখ-দুঃখ, গৌরব-গ্লানি, সমৃদ্ধি-দুর্গতি ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া অন্যান্য জাতিতেও অনুভূত হবে। কোন জাতিই আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দৃঢ় হচ্ছে। আজ সুদূর ভিয়েৎনাম অথবা প্যালেস্টাইন-এ কোন অশান্তির সৃষ্টি হলে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশের দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়।

এই বিশ্বমানবতার আদর্শের বাস্তব প্রতীক জাতিপুঞ্জ। জাতিপুঞ্জই সকল জাতির মিলনক্ষেত্র। এখানেই সকলের অভাব-অভিযোগ সমবেত চেষ্টায় দূরীকরণের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং বর্তমানে প্রত্যেক জাতির অপর জাতি সম্পর্কে কতকগুলো কর্তব্য আছে। বড় রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে, অনুন্নত রাষ্ট্রকে উন্নয়নের জন্য উন্নত রাষ্ট্র সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করবে। এক রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, শিল্পকলা অন্য রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধিশালী করবে। প্রত্যেক জাতির জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বহুমুখী দানে বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হবে ও অপরাপর জাতি তাতে অংশগ্রহণ করবে।

সুতরাং প্রত্যেক নাগরিক নিজের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রেখেও ক্ষমতানুযায়ী বিশ্বমানবের প্রতি তার কর্তব্য সম্পন্ন করবে। সকল জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করার জন্য প্রত্যেক নাগরিক সচেষ্ট থাকবে। সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করার জন্য সকলেরই কর্তব্য হবে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করা। ঘৃণা, দ্বেষ, বর্ণবৈষম্য, জাতিবৈষম্য, কৃষ্টিবৈষম্য ইত্যাদি বিভেদ ভুলে বিশ্বপ্রেমের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। নিজের শিক্ষাদীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী করতে প্রত্যেকেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

এগার. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (The Relation between Rights and Duties of Citizens)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে "Rights imply duties." অর্থাৎ **অধিকারের ধারণার মধ্যে কর্তব্যের ধারণা নিহিত।** অধিকার বললেই সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যের কথা ওঠে। কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করতে হলে মানুষ একে অন্যের ওপর কতকগুলো দাবি করবে। ঐ দাবির একদিক হল অধিকার, অন্যদিক হ'ল কর্তব্য। এক ব্যক্তির অধিকার অন্য ব্যক্তির কর্তব্যবোধের ওপর নির্ভর করে। নিজের উপার্জিত সম্পত্তির ওপরে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে। কিন্তু ঐ অধিকার নির্ভর করে অন্যান্য নাগরিকের ওপর। তারা কখনও অন্যের সম্পত্তি জোর করে দখল করবে না বা সেরূপ কোন চেষ্টা করবে না—এটা তাদের কর্তব্য। কিন্তু অন্যের যদি ঐ কর্তব্যবোধ না থাকে, অর্থাৎ সে যদি সর্বদাই পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে, তা হলে সম্পত্তির ওপরে মালিকের অধিকার বজায় থাকতে পারে না। অধ্যাপক হব্‌হাউস (Hobhouse) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে যেয়ে বলেছেন: *If, I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give me reasonable room.*

অধিকার ও কর্তব্য ঃ উভয়ের সম্পর্ক

শুধুমাত্র আইন-সম্মত অধিকারের ক্ষেত্রেই নয়, নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। পিতার যেরূপ নৈতিক অধিকার আছে যে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান তাঁকে ভরণপোষণ করবে; পিতারও সেরূপ যথাযথ পালন, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দ্বারা সন্তানকে মানুষ করে তোলার চেষ্টা করা নৈতিক কর্তব্য।

নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্য

রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে। নাগরিকের ওপর রাষ্ট্রের কতকগুলো অধিকার আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রকেও কতকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। নাগরিকের আনুগত্য ও সহযোগিতা রাষ্ট্র দাবি করতে পারে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রও নাগরিকের নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈষয়িক উন্নতি প্রভৃতির জন্য কর্তব্য পালন করবে। নাগরিকের অনেক অধিকার আছে ঃ সম্পত্তি ভোগ, স্বাধীন গতিবিধি, স্বাধীন মতপ্রকাশ, চুক্তি করা, সংঘবদ্ধ হওয়া, পরিবার গঠন, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি। তেমনি নাগরিকদেরও কতকগুলো কর্তব্য রয়েছে। সময়মত ধার্য কর দেওয়া, আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারী কাজ সম্পন্ন করা ইত্যাদি। নাগরিক যদি আইন মেনে না চলে রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার না করে, সরকারী খরচ চালাবার জন্য কর না দেয় তবে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকতে পারে না।

রাজনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক কর্তব্য

সুতরাং নাগরিকের সামাজিক কল্যাণ বিষয়ক চেতনা ও রাজনৈতিক-বোধের ওপরেই অধিকার নির্ভর করে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য নাগরিক তার অধিকার ব্যবহার করবে না। তার অধিকার যাতে সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে না যায়, তাও তার লক্ষ্য হবে। আমার অধিকার আছে, আমার বাড়ির সামনে আমার জায়গায় নানা প্রকার আবর্জনা নিক্ষেপ করার। কিন্তু ঐ অধিকার প্রয়োগ করার ফলে যদি আমার প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্যের হানি হয়, তবে তা সমাজকল্যাণ-বিরোধী। এরূপ অধিকার ব্যবহার করার ফলে সমাজের ওপর আমার যে একটা কর্তব্য আছে তা লঙ্ঘন করা হল। সুতরাং প্রত্যেকটি অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি করার দায়িত্ব ও কর্তব্য যুক্ত থাকে।

বার. ভারতের জনগণের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of the Citizens)

প্রতিটি সভ্য সমাজেই ব্যক্তি মানসের উন্নতি ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত কিছু কিছু অধিকারকে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের জন্য ঐ অধিকারগুলো অপরিহার্য এবং সেইজন্যই ঐগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। সুতরাং মৌলিক অধিকার বলতে সাধারণভাবে এমন অধিকার বোঝায় যা প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাবার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে।

মৌলিক অধিকার কাকে বলে ?

মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিক জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয় বলে ঐগুলোকে সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়। সংবিধানে ঐগুলো বিধিবদ্ধ করে ঐগুলোকে সুস্পষ্ট, মূর্ত, বাস্তব ও সর্বজনবিদিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকার জন্য ঐ অধিকারগুলোর ভোগ সুনিশ্চিত হয়। তৃতীয়ত, সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকার জন্য ঐ অধিকারগুলো আদালতগ্রাহ্য (justiciable and enforceable) হয়। অধিকারগুলোকে অমান্য বা ভংগ করলে আদালতে প্রতিবিধান পাওয়া যায়। চতুর্থত, অধিকারগুলো সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকলে ঐগুলোর ওপর রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না— কারণ হস্তক্ষেপ যাতে না ঘটে সেজন্য আইনগত বাধানিষেধও সংবিধানে লিখিত থাকে। পঞ্চমত, মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিখিত থাকলে ঐগুলো মৌল আইন বলে বিবেচনা করা হয় এবং আইনসভা বা সংসদ সহজে ঐগুলোর ওপরে হস্তক্ষেপ বা ঐগুলোকে পরিবর্তন করতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, সংবিধানে বিধিবদ্ধ না থাকলে মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং আইনের চোখে ঐগুলোর সাংবিধানিক মর্যাদা থাকে না।

সংবিধানে বিধিবদ্ধ করার কারণ

ভারতের সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভারতের নাগরিকদের জন্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার ঘোষণার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশে যে সকল সংবিধান গৃহীত হয়েছে তাতে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানেও জনগণের জন্য সাতটি অধিকারকে

ভারতে মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এইজন্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৬টি ধারা সংযোজিত হয়। কিন্তু বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ছ'টি।

এই অধিকারগুলো কী অর্থে মৌলিক ?

এখন প্রশ্ন হল, এ অধিকারগুলোকে 'মৌলিক অধিকার' কেন বলা হয় ? সাধারণভাবে মৌলিক অধিকার বলতে এমন অধিকার বোঝায় যা ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি-প্রতিভা ও ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের অঙ্গ হিসেবে এই সকল অধিকারগুলোকে নিশ্চয়তা দান করা একটি অত্যাবশক শর্ত বলে মনে করা হয়। অনেকের মতে মৌলিক অধিকারের মধ্য দিয়ে **সংবিধানের বিবেক** মূর্ত হয়ে ওঠে। বলা যায়, **ভারতের সংবিধানের প্রদত্ত অধিকারগুলো ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তি-সত্তার উন্মেষ ও বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আবশ্যক, তাই ঐ অধিকারগুলো মৌলিক।**

অধিকারগুলো কেন মৌলিক

দ্বিতীয়ত, বিখ্যাত সাংবিধানিক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস বসু মনে করেন যে, এই অধিকারগুলো মৌলিক, কারণ অন্যান্য সাধারণ অধিকারগুলো সাধারণ আইন সংশোধন পদ্ধতির মত পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলো পরিবর্তন করার জন্য বিশেষ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

তৃতীয়ত, মনে করা হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলো দেশের সাংবিধানিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকার জন্য অন্যান্য অধিকার থেকে এই অধিকারগুলোর চরিত্রে মৌল পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধান কর্তৃক লিখিতভাবে বিধিবদ্ধ হবার জন্য সাংবিধানিক পদ্ধতি বাদে এগুলোর ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যায় না।

মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নীচে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হ'ল ঃ

প্রথমত, **কোনও আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারকে আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।** সোবিয়েত ইউনিয়নে কাজের অধিকার এবং কাজ করে জীবন-যাপনের মত পারিশ্রমিক পাবার অধিকার সংবিধান স্বীকার করেছে। কিন্তু এরূপ কোন আর্থনীতিক অধিকার আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে স্থান পায়নি, যদিও কিছু কিছু আর্থিক ও সামাজিক অধিকার নির্দেশাত্মক নীতিতে স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অধিকারগুলোকে ভারতীয় সংবিধানে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কতকগুলো অধিকারকে 'মৌলিক অধিকার' এবং অন্য কয়েকটিকে 'নির্দেশমূলক নীতি' নামে অভিহিত করে আলাদাভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলো যে আইনগত মর্যাদা ভোগ করে এবং ঐগুলো মান্য করার যে বাধ্যবাধকতা থাকে নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর তা নেই। সেজন্য **মৌলিক অধিকারগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য—কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলো নয়।**

তৃতীয়ত, কতকগুলো 'মৌলিক অধিকার' শুধুমাত্র নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। এ ছাড়া কতকগুলো অধিকার আছে যা নাগরিক ও অ-নাগরিক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনবোধে ভারতে ঐ সকল মৌলিক অধিকারের কিছু কিছু মুলতুবী রাখা যেতে পারে। তাছাড়া জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের প্রতিবিধানের ক্ষমতা রহিত করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, মৌলিক অধিকারগুলো দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কয়েকটি অধিকার নেতিবাচক (negative), যেখানে রাষ্ট্রের ওপর কতকগুলো বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বাকী অধিকারগুলো অস্তিবাচক (positive), যেখানে নাগরিকদের অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে।

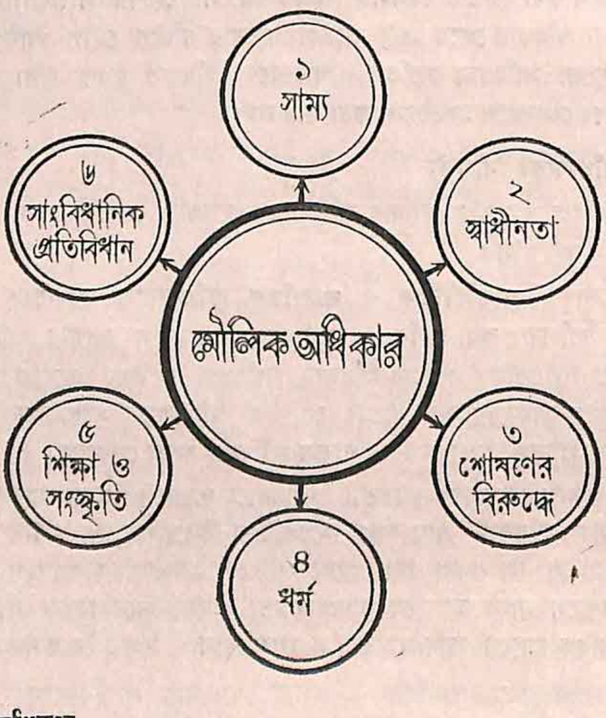
ষষ্ঠত, মৌলিক অধিকারগুলো চরম (absolute) নয়। বিভিন্ন কারণে আইনসভা এদের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ (reasonable restrictions) আরোপ করতে পারে। তবে ঐ বাধা-নিষেধ যুক্তিসঙ্গত কিনা আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে।

মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত অধিকারগুলো

ভারতের সংবিধানে **সাতটি মৌলিক অধিকারকে** বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, **৪৪তম সংশোধনী অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকার** এখন আর **মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়।** রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী ১৯. ৬. ৭৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। তাই বর্তমানে আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা **হ'ল ছ'টি** ঃ

১. **সাম্যের অধিকার** (Right to Equality)
২. **স্বাধীনতার অধিকার** (Right to Freedom)
৩. **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার** (**Right against Exploitation**)
৪. **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার** (**Right to Freedom of Religion**)
৫. **সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার** (**Cultural and Educational Rights**)
৬. **সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার** (**Right to Constitutional Remedies**)।

নীচে একটি চিত্রের সাহায্যে মৌলিক অধিকারগুলোকে দেখান হল ঃ



১. সাম্যের অধিকার

ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা থেকে ১৮ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার আলোচনা করা হয়েছে।

ক. সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, 'আইনের চোখে সমতা' (**Equality before the Law**) এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ' (**Equal protection of the Laws**)—এ দুটি অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হল। 'আইনের চোখে সমতা' ব্রিটেনের সাধারণ আইন (**common law**) এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে গৃহীত।

এই দুটি অধিকারের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। তবে মনে করা হয়, 'আইনের চোখে সমতা' অপেক্ষা 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষণ' অনেক বেশি অস্তিবাচক (positive)।

খ. সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জন্মস্থান বা এর কোন একটির জন্যে বিভিন্ন নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য এবং নর ও নারীর মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করতে পারবে না। এই সকল কারণে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হোটেল, রেস্তোরাঁ, সাধারণের আমোদ-প্রমোদের স্থান, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট বা রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নাগরিককে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না।

সাম্যের অধিকারে কি কি আছে

গ. রাষ্ট্রের অধীনে চাকরিতে বা কোন পদে নিয়োগের সমান সুযোগ সকল নাগরিকই পাবে (১৬ নম্বর ধারা)।

ঘ. অস্পৃশ্যতাজনিত কোনপ্রকার অযোগ্যতা কারো উপর আরোপ করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে (১৭ নম্বর ধারা)।

ঙ. সামরিক উৎকর্ষ বা বিদ্যাবত্তা ছাড়া অন্য কোন কারণে রাষ্ট্র কোন উপাধি বা খেতাব দান করবে না এবং কোন নাগরিক বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না (১৮ নম্বর ধারা)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাম্য বলতে পৌর সাম্য, সামাজিক সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, আইনগত সাম্য ও আর্থনীতিক সাম্য বোঝায়। প্রথম চারিটি সাম্যের অধিকার ভারতীয় নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর্থনীতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয়নি।

যদিও রাষ্ট্র নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করবে না, কিন্তু সংবিধানে বলা হয়েছে যে, শিশু ও নারীর কল্যাণের জন্য এবং অনুন্নত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য চাকরি সংরক্ষণের সুযোগ রাখার ব্যবস্থাও সংবিধানে রাখা হয়েছে। এ সব ব্যতিক্রমকে সাম্যের অধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করা চলবে না।

ব্যতিক্রম

ভারতের সংবিধানে জনগণের জন্য সাম্যের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু এই অধিকার বিধিবদ্ধ করে, মর্যাদা ও সযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে চরম সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। যেটা করা হয়েছে তা হ'ল সম-অবস্থায় সমানদের মধ্যে সাম্য (equality among the equals under equal circumstances)। এম. সি. শিতলবাদ (M. C. Setalvad) বলেছেন যে, আদর্শ সাম্য প্রতিষ্ঠা স্বপ্নের ব্যাপার, বাস্তবে যেটুকু সাম্য সুনিশ্চিত করা সম্ভব তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংবিধান প্রণেতারা প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সংবিধানে সাম্যের অধিকারের মধ্যে আর্থনীতিক সাম্য স্থান না পাওয়ায় সাম্যের অধিকার অস্তিবাচক হয়ে উঠতে পারেনি। আইনের চোখে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও পৌর-অধিকারের সাম্য সুনিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়, আর্থনীতিক ও সামাজিক সাম্যকে সুনিশ্চিত করেই সাম্যের অধিকারকে অস্তিবাচক ও অর্থবহ করা সম্ভব।

মূল্যায়ন

২. স্বাধীনতার অধিকার

আমাদের সংবিধানে সাত প্রকার স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ৪২তম সংবিধানে সম্পত্তি ভোগ, অর্জন, রক্ষা ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার থেকে বিলোপ হওয়ায় **বর্তমানে ১৯ নম্বর ধারায় ছ' রকমের স্বাধীনতা স্বীকৃত আছে।** ঐগুলো হল ঃ

১। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।

২। শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমাবেশের স্বাধীনতা।

৩। সমিতি ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা।

৪। ভারত রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা।

৫। ভারত রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বসবাস ও অবস্থানের স্বাধীনতা।

৬। যে কোন পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন বা ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার স্বাধীনতা।

নীচে একটি ছকের মাধ্যমে ছ'টি স্বাধীনতা দেখান হল ঃ

স্বাধীনতার অধিকার

বাক্	সমাবেশ	সংগঠন	গতিবিধি	বসবাস	বৃত্তি ও ব্যবসায়

গণতন্ত্রে জনগণের স্বাধীনতার অধিকার খুবই মূল্যবান এবং ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সংবিধানে জনগণকে উপরোক্ত ছ'টি স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বস্তুত উপরোক্ত স্বাধীনতা-গুলির সম্যক্ ও পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের আদর্শ পরিবেশ রচিত হতে পারে।

অন্যান্য স্বাধীনতা

সংবিধানের ২০ নম্বর ধারায় নাগরিকদের কয়েকটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের (personal freedoms) কথা বলা হয়েছে। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করলে যে সময়ে অপরাধ সংঘটিত হবে সে সময়কার সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও বলা হয়েছে, একই অপরাধের জন্য কাউকে দুবার শাস্তি দেয়া যাবে না। ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আইনের অনুশাসন বাদে কাউকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২২ নম্বর ধারায় খামখেয়ালী (arbitrary) ও বে-আইনী আটক যাতে না হয় সে সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধ

কোন স্বাধীনতাই চরম নয়—এই যুক্তিতে স্বাধীনতার ওপরে কতকগুলো "যুক্তিসংগত বাধানিষেধ" আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সংহতি, শৃংখলা, সদাচার, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব, বিচারালয়ের অবমাননা, ইত্যাদি কারণে স্বাধীনতার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে। প্রয়োজনবোধে ঐ স্বাধীনতাগুলো থেকে নাগরিকগণকে আংশিক বা পুরোপুরি বঞ্চিত করা যেতে পারে। জরুরী অবস্থার সময়ে স্বাধীনতাগুলোর ওপর বাধানিষেধ আরোপ করার ব্যাপারে প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। তা ছাড়া কোন নাগরিককে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য নিবর্তনমূলক আইন (Preventive Detention Act) বা মিসা আইন (MISA) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী।

মূল্যায়ন

স্বাধীনতার অধিকার ভারতের সংবিধানে যে ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা অনেককেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমরা তাকেই স্বাধীনতার অধিকারের আদর্শ সংরক্ষণ বলবো যেখানে একদিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধের স্বাধীনতার অবসান ঘটে এবং অন্যদিকে জনগণের জন্য সামাজিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত থাকে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে জনগণের জন্য সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে সাধারণভাবে সামাজিক স্বাধীনতা এবং বিশেষ করে কোন আর্থিক স্বাধীনতা স্থান পায়নি—তাই আমাদের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকার অস্তিবাচক হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া সংবিধানে যে ছয় দফা স্বাধীনতার অধিকার স্থান পেয়েছে তা এত সাংবিধানিক বাধা নিষেধের (restrictions) দ্বারা এমনভাবে সীমিত যে ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার শাসনবিভাগ ও সংসদ একজোট হলে ঐ সাম্যের অধিকারকে অর্থহীন করে তুলতে পারে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই অধিকার অনুযায়ী মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বিনা পারিশ্রমিকে (বেগার) খাটানো এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রমদান নিষিদ্ধ

করা হয়েছে। নারী ও শিশুকে অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত করা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের ব্যাপার সংবিধানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সকল কাজ বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয়। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের কারখানা, খনি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা চলবে না।

সমালোচকেরা বলেন, ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ওপরে বিভিন্ন রকমের, বিশেষ করে আর্থনীতিক শোষণ অব্যাহত রয়েছে। অথচ আমাদের সংবিধানে সামাজিক ও আর্থনীতিক শোষণকে বন্ধ করার জন্য আদালতগ্রাহ্য (Justiciable) কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

৪. ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার

ভারতের সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারায় ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় যে, রাষ্ট্রের কোন ধর্ম (যেমন, হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম) থাকবে না, রাষ্ট্র কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না, রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে।

সংবিধানে সকল নাগরিকের বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় প্রচারের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় সমাজকল্যাণ বা সংস্কারমূলক সংস্থাগুলি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সামনে উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চালনার স্বাধীনতা থাকবে। কোন বিশেষ ধর্ম প্রচারের জন্য কাউকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না। সরকারী সাহায্য লাভ করলে কোন শিক্ষালয়ে কোন বিশেষ ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে না বা কোন বিশেষ একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য তা উন্মুক্ত রাখা চলবে না। জনগণের ধর্মাচরণের অধিকারের নামে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাধারণ নৈতিক মানের বিরোধী কাজ করা চলবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সক্রান্ত অধিকার

কোন অঞ্চলের নাগরিকদের স্বতন্ত্র কোন ভাষা, হরফ বা সংস্কৃতি থাকলে তা সংরক্ষণের অধিকার তাদের থাকবে। ধর্ম, বর্ণ বা ভাষার জন্য কাউকে সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকবে।

৬. সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলো যাতে বলবৎ করা যায় সে উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের কয়েকটি অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত অধিকারগুলোর মধ্যে একটি বা একাধিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সুনির্দিষ্ট অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সকল সংবিধানগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য অপরাধীকে বিচারকের কাছে হাজির করার আদেশ দিয়ে পরোয়ানা জারি করতে পারে। একে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ **(Hebeus Corpus)** বলে। আবার হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরমাদেশ **(Mandamus)** জারী করে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। এ ছাড়াও আদালত প্রতিষেধ **(Prohibition)**, অধিকার পৃচ্ছা **(Quo-Warranto)** এবং উৎপ্রেষণ **(Certiorari)** ধরনের লেখ **(Writs)** ও আদেশ জারী করতে পারে। ৪২তম সংশোধনীতে হাইকোর্টগুলোর লেখ জারি করার ক্ষমতা সীমিত করা হয়। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীতে ঐ ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটি বিধিবদ্ধ অধিকার : সম্পত্তির অধিকার

সম্পত্তির অধিকারটি একটি বিতর্কমূলক বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা সমীচীন কিনা এবং একে মৌলিক অধিকারের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা

উচিত কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। **সম্প্রতি** সংবিধান সংশোধন করে (৪৪ নম্বর সংশোধনী) **সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।** সুতরাং বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার নয়—এটি সাধারণ বিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

ভারতের সংবিধানের 'স্বাধীনতার অধিকার' সংক্রান্ত ১৯ (১) (f) ধারায় জনগণকে সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় ও ভোগের অধিকার (to acquire, hold and dispose of property) দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধানের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত ৩১ (১) ধারাতে বলা হয়েছে যে, আইনের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না (No person shall be deprived of his property save by authority of law)। জাতীয় স্বার্থে সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে—তবে সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কোন নাগরিককে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য করতে পারবে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করার নীতি আইন স্থির করবে, এর জন্য আদালতে বিচার প্রার্থনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আগে ক্ষতিপূরণ আদায় এবং তার জন্য আইনের সাহায্য লওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে 'ক্ষতিপূরণের' বদলে 'অর্থপ্রদান' করা হয় এবং অর্থপ্রদানের পরিমাণ স্থির করার জন্য আদালতে যাওয়া যাবে না বলা হয়।

১৯৫১ সালে ভূমি-সংস্কার এবং জমিদারী প্রথা বিলোপ করার সময়ে সম্পত্তির অধিকারের কয়েকটি ধারা সংশোধন করে সংবিধান সংশোধন করা হয়। ১৯৫৭ সালে চতুর্থ সংশোধন দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে আরও হ্রাস করা হয়। ১৯৭১ সালে ২৯তম এবং ১৯৭৪ সালে ৩৪তম সংশোধন আইন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে আরও খর্ব করা হয়। ফলে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এ যুক্তিতে জমির মালিকেরা আর সংবিধান অনুযায়ী আদালতের সাহায্য গ্রহণ করতে সমর্থ নয়।

১৯৭৬ সালে গৃহীত ৪২তম সংশোধনীতে বলা হয় যে নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles) কোন একটি ধারা কার্যকর করার জন্য কোন আইন গৃহীত হলে ঐ আইন সম্পত্তির অধিকারকে ভঙ্গ করলেও তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

উপরোক্ত সংশোধনীগুলোর দ্বারা ব্যাপক অধিকার রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এর ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

তের ঃ ভারতে নাগরিকদের মৌল কর্তব্য (Fundamental Duties of the Indian Citizens)

সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি তাদের কর্তব্যও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে এতদিন পর্যন্ত নাগরিকদের জন্য কোন কর্তব্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা ছিল না। ১৯৭৬ সালে ভারতের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে নিম্নলিখিত **দশটি কর্তব্যকে** নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

১. সংবিধানকে মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ, সাংবিধানিক সংস্থাসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান ;

২. স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টিকারী মহান্ আদর্শগুলোকে পোষণ ও অনুসরণ করা ;

৩. দেশের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও রক্ষা করা ;

৪. দেশকে রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে জাতির সেবায় অংশ গ্রহণ করা ;

৫. ধর্মগত, ভাষাগত এবং অঞ্চল ও সম্প্রদায়গত বিভেদের উর্ধ্বে উঠে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করা। নারীর পক্ষে মর্যাদাহানিকর প্রথা পরিহার করা ;

৬. আমাদের মিশ্র-কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মূল্য দেওয়া ও তাকে রক্ষা করা ;

৭. বন, হ্রদ, নদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ ও উন্নত করা এবং প্রাণীর প্রতি মমত্ব প্রদর্শন করা ;
৮. বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের মনোভাব সৃষ্টি করা ;
৯. জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসা পরিহার করা ;
১০. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সঠিক কার্যকলাপের উৎকর্ষের প্রচেষ্টা চালানো যাতে জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও সাফল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

চৌদ্দ : সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার (Social and Economic Rights)

আমরা আগে জনগণের অধিকারের আলোচনা করার সময়ে কেবলমাত্র পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে অলোচনা করেছি। এবার সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সামাজিক অধিকার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনের পূর্ণতা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কতকগুলো অধিকারের প্রয়োজন দেখা যায়। এ অধিকারগুলো না থাকলে জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং যে সব অধিকারের সাহায্যে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত এবং সমাজজীবনকে পরিপূর্ণ ও কল্যাণকর করে তোলে তাকেই সামাজিক অধিকার বলে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আইনের দ্বারা সমর্থিত হয়েই সামাজিক অধিকারগুলো স্বীকৃতি লাভ করতে পারে।

সামাজিক অধিকার বলতে মূলত নিম্নলিখিত অধিকারগুলোকে বোঝায় :

১. সামাজিক সাম্যের অধিকার ;
২. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার ;
৩. আইনের চোখে সমান হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার ;
৪. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ;
৫. ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ;
৬. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।

আর্থনীতিক অধিকার

নিছক সামাজিক, রাজনৈতিক বা পৌর অধিকার জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে পারে না—এর জন্য আর্থনীতিক অধিকার প্রয়োজন। অধ্যাপক লাস্কি দৈনন্দিন অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত অর্থ খুঁজে পাবার সুযোগকে আর্থনীতিক অধিকার বলে অভিহিত করেছেন।

একসময়ে শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে রুজি-রোজগারের অধিকারকেই আর্থনীতিক অধিকার বলা হত। কিন্তু বর্তমানে নিম্নলিখিত অধিকারগুলো আর্থনীতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত :

১. জীবনধারণের অধিকার ;
২. চাকরির অধিকার ;
৩. জীবনধারণের মত পর্যাপ্ত মজুরি পাবার অধিকার ;
৪. বেকার ভাতা পাবার অধিকার ;
৫. বার্ধক্যকালীন ভাতা পাবার অধিকার ;
৬. অবসরের অধিকার।

আর্থনীতিক অধিকার সামাজিক অধিকারের অংশ। **বস্তুত আর্থনীতিক অধিকার না থাকলে অন্যান্য অধিকার অর্থহীন এবং শূন্যগর্ভ কল্পনায় পর্যবসিত হয়।** সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আর্থনীতিক অধিকারকে সংবিধানগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পনের ঃ রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy)

ভারতের জনগণের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের মধ্য দিয়ে রূপদান করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, মৌলিক অধিকার ভারতের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। অন্যদিকে **ভারতে জনগণের সামাজিক ও আর্থনীতিক অধিকার এবং এ সংক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটেছে রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতির মধ্য দিয়ে।** সুতরাং ভারতের সামাজিক ও আর্থনীতিক বনিয়াদ হল এই নির্দেশক নীতিগুলো। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (৩৬ হইতে ৫১ ধারায়) নির্দেশক নীতিগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

নির্দেশাত্মক নীতি কি এবং কেন ?

নির্দেশাত্মক নীতিগুলোকে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য সংবিধানের কয়েকটি নির্দেশ বলা যেতে পারে। আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানে এরূপ নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। নির্দেশাত্মক নীতিতে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলা হয়েছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলোকে সংবিধানে সংযোজিত করা হয়েছে। কোন্ আদর্শ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে শাসকেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তার চিত্রই নির্দেশাত্মক নীতিতে ফুটে উঠেছে। প্রতিটি নাগরিক যাতে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই নীতিগুলো রচিত হয়েছে।

মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নির্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য

মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের কাজকর্মের সীমা নির্দেশ করে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পরিধি সংকুচিত করে। অন্যদিকে নির্দেশক নীতিগুলো লক্ষ্য বা আদর্শে পেঁছবার উপযোগী নির্দেশনামা। প্রথমটি হ'ল নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, দ্বিতীয়টি হ'ল রাষ্ট্রের কতকগুলো করণীয় বিষয়ে নির্দেশের সমষ্টি।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করলে মৌলিক অধিকারগুলো বিচারযোগ্য, কিন্তু নির্দেশক নীতিগুলো বিচারযোগ্য নয়। এর দুটি তাৎপর্য আছে। কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আদালতের সাহায্য লওয়া যায়, কোন নির্দেশক নীতি প্রতিপালিত না হলে আদালতে যাওয়া যায় না। অর্থাৎ নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আদালতগ্রাহ্য নয়। এই নীতিগুলো কাজে পরিণত করতে হলে আলাদা করে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোকে কার্যকর করার জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন নির্দেশক নীতির বিরোধী হলে ঐ আইনকে সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল করা যায় না।

তৃতীয়ত, নির্দেশক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে যদি কোন বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকার বহাল থাকবে, নির্দেশক নীতি অগ্রাহ্য হবে।

চতুর্থত, আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে নির্দেশক নীতিগুলো সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলো গণতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ, গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানগত বাস্তব (constitutional reality)। সংবিধানের দিক থেকে বিচার করলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র উভয়েরই সংমিশ্রণ আমাদের সংবিধানে আছে এবং ৪২তম সংশোধনীতে সমাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলোতে কি আছে ?

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নীতিগুলোকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

ক. আর্থনীতিক আদর্শসমূহ ; খ. সামাজিক আদর্শসমূহ, গ. আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কার, ঘ. বৈদেশিক নীতির আদর্শ।

নির্দেশাত্মক নীতিতে বলা হয়েছে যে, সরকার এমন নীতি অবলম্বন করবে,

১. যাতে নাগরিকেরা সমানভাবে জীবিকার্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ লাভের অধিকারী হয় ;

২. জাতীয় সম্পদের মালিকানা এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে তা একস্থানে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে ;
৩. যাতে কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ ও নৈতিক আত্মবিসর্জন থেকে রক্ষা করতে পারে ;
৪. শিশু ও নারী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির যাতে অপচয় না হয় ;
৫. প্রত্যেক রাজ্যে সরকার কর্তৃক গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠনের ব্যবস্থা করা ;
৬. প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ সাধ্যমত প্রত্যেক অধিবাসীকে কাজ ও শিক্ষালাভ-এর সমান অধিকার দেবে এবং বেকারী, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ্য এবং দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সুনিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে ;
৭. নারীরা যাতে প্রসূতি-সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা করা ;
৮. কৃষি, শিল্প অথবা অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত শ্রমিক যাতে পরিপূর্ণ কাজ, জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, ভদ্রোচিত জীবনযাপন ও বিশ্রাম লাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ পায়, ব্যক্তিগত বা সমবায়ের ভিত্তিতে কুটির-শিল্পের যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় তার চেষ্টা করা হবে ;
৯. সকল জায়গায় একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনবিধি প্রবর্তনের চেষ্টা করা ;
১০. কিশোর-কিশোরীদের চৌদ্দ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিকভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা ;
১১. অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও তফশিলভুক্ত শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সামাজিক অত্যাচার ও সকল রকম শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করা ;
১২. জনগণের পুষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, জন-স্বার্থের উন্নতিসাধন ইত্যাদি রাজ্য সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য হবে এবং চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে মাদক জাতীয় পানীয় ও ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ;
১৩. আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পশুপালন ও পশুপ্রজননের ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশু হনন নিষিদ্ধ করা ;
১৪. উচ্চাঙ্গ শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ আবাসস্থল, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান ও বস্তুকে সরকার কর্তৃক ক্ষতি, ধ্বংস, অপসারণ, বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি করা থেকে রক্ষা করা ;
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচারবিভাগ আলাদা করা ;
১৬. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধিবিষয়ক শর্তগুলো প্রতিপালন, সালিশীর সাহায্যে আন্তর্জাতিক কলহ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরোক্ত নীতিগুলোর মধ্যে কয়েকটি, যেমন গ্রামপঞ্চায়েত সংগঠন, মাদক দ্রব্য বর্জন, কুটির শিল্পের প্রসার, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুপালন ইত্যাদির উৎস হল গান্ধীজীর আদর্শ ও দর্শন।

রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতির এই আদর্শগুলোর সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি আমাদের সমাজ-বিবর্তনের কোন্ চিত্র আমরা সামনে রাখব। রাষ্ট্র পরিচালনার এই নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ অনেকাংশে সমাজতান্ত্রিক। আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, বেকার ভাতা প্রদান, শিশু ও যুবক-যুবতীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রকাশ।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

নির্দেশাত্মক নীতিগুলোকে আমাদের সংবিধানে সংযোজনের সমালোচনা করে অনেকে বলেন যে, যেহেতু এই নীতিগুলো আদালতগ্রাহ্য নয় এবং এদের মান্য করবার কোন আইনসঙ্গত বাধ্য-বাধকতা নেই, সেজন্য কার্যত এগুলোর কোন সার্থকতা নেই। এ নীতিগুলো যত মহৎ আদর্শ ও অধিকারের কথা ঘোষণা করুক না কেন, এদের বাস্তবায়িত করার নিশ্চয়তা না থাকলে এদের মূল্য কি? সুতরাং বলা হয় যে, সংবিধানের শোভা বর্ধন করা ছাড়া নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর কোন মূল্য নেই।

স্যার জেনিংসও (Sir Ivor Jennings) মনে করেন যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলো সাধু আকাঙ্ক্ষার (pious aspiration) অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়। তিনি মনে করেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে ঊনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলো ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্রের বৃটিশ দর্শন (Fabian Socialism without Socialism) নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। অধ্যাপক হুইয়ার আরও কঠিন ভাষায় এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কতকগুলো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে। আর নির্দেশাত্মক নীতিগুলো যদি শুধু 'কথার কথা' হয় তবে এ ধরনের জিনিস সংবিধানে স্থান দেওয়ার ফলে সংবিধানের মর্যাদার হানি ঘটে।[১]

কিন্তু অন্যদিকে অনেকে মনে করেন যে, উপরোক্ত ধারণা সঠিক নয়। তাঁরা বলেন সংবিধানের ৩৭ নম্বর ধারায় এই নীতিগুলো দেশের শাসন পরিচালনার অঙ্গ (fundamentals in the governance of the country) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁরা মনে করেন, আইনের বাধ্য-বাধকতাই কোন নীতি কার্যকারিতার একমাত্র গ্যারাণ্টি নয়। সচেতন জনমতের দ্বারাই এগুলো সাফল্যের সংগে রূপায়িত হতে পারে। এই নির্দেশক নীতিগুলোর গুরুত্ব রাজনৈতিক। সরকার যদি এই নীতিগুলো অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তবে জনমত বা নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ নীতিগুলো অবহেলা করলে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হতে পারে। আদালত বিচার করবে না ঠিকই, কিন্তু এগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা সে মানদণ্ডেই নির্বাচকমণ্ডলী সরকারকে বিচার করবে। ডঃ আম্বেদকারের ভাষায় বলা যায়, কোন সরকার যদি নির্দেশাত্মক নীতিগুলো উপেক্ষা করে তবে তাকে নির্বাচনের সময়ে এর জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে (If any government ignores them, they will certainly have to answer for them before the electorate at the election time.)।

তাঁরা আরও মনে করেন, সরকারের প্রতিটি আইন, শাসকদের প্রতিটি কাজ, বিচারকদের প্রতিটি বিচার—এ সকলের পথপ্রদর্শক হিসেবে নীতিগুলো কাজ করে। তাই এদের শিক্ষণমূল্যও অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিগুলোর সংগে সঙ্গতি রাখার জন্য মৌলিক অধিকারের সংশোধন করা হয়েছে। সর্বোপরি এই নীতিগুলো উল্লেখের ফলে আমাদের সংবিধানের আদর্শগত মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ ও আহ্বান এ নীতিগুলোর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। এতে আমাদের সংবিধানের প্রগতিশীল চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ করার জন্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে অপরিহার্য এ কথাই নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

সংবিধান পারদর্শী অস্টিনও (Granville Austin) মনে করেন যে, সামাজিক বিপ্লবের লক্ষ্যগুলোতে উপনীত হওয়া বা এই বিপ্লবসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোতে উপনীত হতে উৎসাহিত করাই নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের উদ্দেশ্য (aimed at furthering the goals of social revolution......to foster this revolution by establishing the conditions necessary for its achievement)।

কিন্তু কথা হল, আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যেও আর্থনীতিক অধিকার স্থান পায়নি। নির্দেশাত্মক নীতিতে এর উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। সংবিধানে আর্থনীতিক সাম্য মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ থেকে আয় ও সম্পদের বৈষম্য

---

১ If the Constitution is to be taken seriously, the interpretation and fulfilment of these general objects of policy will raise great difficulties for legislatures and these difficulties will bring the constitution, the courts and the legislature into conflict and dispute. If these declarations, are, however, to be treated as 'words' they will bring discredit upon the constitution also.

দূর করতে হবে। নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু তা করতে রাষ্ট্র সংবিধানগতভাবে বা আইনগতভাবে বাধ্য নয়। ভারতে কঠিন বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও কাকেও বেকারভাতা প্রদান করা হয়নি। এই নির্দেশক নীতিগুলো তাই রাষ্ট্র সর্বদা পালন করে না ; পালন করতে আইনত বাধ্যও নয়। এই নীতিগুলোকে যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা হত তবে দেশে পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী সংবিধান রচিত হত। সোবিয়েত ইউনিয়নে নাগরিকদের কাজের অধিকার, আর্থনীতিক সাম্যের অধিকার এবং শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। এটাই হ'ল সমাজতান্ত্রিক সংবিধান রচনার নীতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর মূল্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কারও কারও মতে নির্দেশাত্মক নীতিগুলো লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার নিছক অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয় (a little more than a manifesto of aims and aspirations)। আবার অনেকে মনে করেন, আর্থনীতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতিগুলো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। উভয় বক্তব্যের মধ্যেই হয়তো কিছু সত্য নিহিত আছে। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হবার জন্য যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে তার কোন গুরুত্ব নেই এ কথা বলা যায় না। এই জন্যই সংসদে বিরোধীপক্ষ বহুদিন ধরে নির্দেশাত্মক নীতিগুলোকে আদালতগ্রাহ্য করা এবং মৌলিক অধিকারের ওপরে স্থান দানের দাবী জানিয়ে আসছে।

৪২তম সংশোধন আইনে ঐ দাবীর কিছুটা স্বীকার করে নির্দেশাত্মক নীতির শ্রেষ্ঠত্ব (Primacy) মেনে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যদিও নির্দেশাত্মক নীতিগুলো প্রত্যক্ষভাবে আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু ঐ সকল নীতির কোন একটিকে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তা অসাংবিধানিক বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ সংবিধানের ১৪ ধারা (সাম্যের অধিকার), ১৯ ধারা (স্বাধীনতার অধিকার) এবং সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে এ যুক্তিতে নির্দেশাত্মক নীতি রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। সুতরাং ১৪ ও ১৯ ধারার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের ঊর্ধ্বে নির্দেশাত্মক নীতিকে স্থান দেয়া হয়েছে।

এ কারণে অনেকে ৪২তম সংশোধনীর এই অংশকে যুগান্তকারী (epoch making) বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ সংশোধনী গ্রহণ করার ফলে নির্দেশাত্মক নীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

নমুনা প্রশ্ন

1. নাগরিক কাকে বলে ? নাগরিক ও বিদেশী, নাগরিক ও দেশবাসী এবং নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। (এক দেখ)
2. নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর। (দুই দেখ)
[H. S. C. '78, '80 and '83 T. S. B. '82]
3. কি কি কারণে নাগরিকতার বিলোপ ঘটে ? (তিন দেখ) [H. S. C. '78, '81, T. S. B. '82]
4. নাগরিকত্ব বলতে কি বোঝায় ? যে সকল উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় সেগুলো বর্ণনা কর।
(এক এবং দুই দেখ) [H. S. C. '85]
5. ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের পদ্ধতিগুলো এবং নাগরিকতা বিলোপের কারণগুলো আলোচনা কর। (দুই এবং তিন দেখ)
6. সুনাগরিকের গুণগুলো আলোচনা কর। (চার দেখ)
7. সুনাগরিকতা কাকে বলে ? সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো কি কি ? ইহা কিভাবে দূর করা যায় ? (চার, পাঁচ এবং ছয় দেখ) [T. S. B. '79]

8. অধিকার কাকে বলে ? আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারগুলো আলোচনা কর। (আট এবং নয় দেখ) [H. S. C. '85]
9. রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অধিকার বলতে কি বোঝায় ? ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত কয়েকটি রাজনৈতিক অধিকারের উল্লেখ কর। (পাঁচ এবং নয় দেখ) [H. S. C. '81]
10. আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার বলতে কি বোঝায় ? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর। (নয় দেখ) [H. S. C. '83]
11. নাগরিকদের কি কি কর্তব্য করা উচিত ? (দশ দেখ)
12. অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। (এগার দেখ) [H. S. C. '80 and '83]
13. "অধিকারের ধারণার মধ্যে কর্তব্যের ধারণা নিহিত"—আলোচনা কর। (এগার দেখ)
14. 'অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত'— ব্যাখ্যা কর। (এগার দেখ) [H. S. C, '85]
15. ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের যে সব মৌলিক অধিকার আছে সেগুলো আলোচনা কর। (বার দেখ) [T. S. B. '78]
16. সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি ? ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (বার দেখ) [H. S. C. '84]
17. ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সাম্যের অধিকার আলোচনা কর। (বার দেখ) [T. S B. '79]
18. ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার কটি ? স্বাধীনতার অধিকারগুলো আলোচনা কর। (বার দেখ)
19. ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার আলোচনা কর। (বার দেখ) [H. S. C. '79]
20. ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সম্পর্কে টীকা লিখ। (বার দেখ)
21. ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (বার দেখ)
22. সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি ? ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (বার দেখ) [H. S. C. '79]
23. ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত যে কোন তিনটি মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (বার দেখ) [H. S. C. '82]
24. ভারতের সংবিধানের চারটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ কর। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো কিভাবে সংরক্ষিত হয় ? (বার দেখ) [H. S. C. '85]
25. নাগরিক কাকে বলে ? ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার আলোচনা কর। (এক এবং বার দেখ) [T. S. B. '81]
26. ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের যে সকল কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে তা আলোচনা কর। (তের দেখ) [T. S. B. '81]
27. ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আলোচনা কর। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে পার্থক্য কি ? (চৌদ্দ দেখ) [H. S. C. '81 and '83, T. S. B. '82]
28. নির্দেশাত্মক নীতিগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (চৌদ্দ দেখ)
29. ভারতের সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (চৌদ্দ দেখ) [H. S. C. '82, '84]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. (ক) একটি দেশে বসবাসকারীদের কোন্ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ?
   (খ) নাগরিকতা লাভের প্রধান পদ্ধতি দুটির নাম লিখ।
   (গ) লর্ড ব্রাইসের মত অনুযায়ী সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলো কি কি ?
   (ঘ) ভারতের সংবিধানের কোন্ ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
   (ঙ) ভারতের সংবিধানের কোন্ অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার আলোচিত হয়েছে ?

2. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্ দাও :

1. রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে (নাগরিক, বিদেশী)।
2. ভোটাধিকার একটি (সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, পৌর অধিকার)। [H. S. C. '78, '81, '85]
3. কর্মের অধিকার একটি (রাজনৈতিক, আর্থনীতিক অধিকার)। [H. S. C '78, '80, '84]
4. ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত (করে, করে না)। [H. S. C. '84]
5. ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি)। [H. S. C. '84]
6. সংবিধানে ভারতের জনগণকে বর্তমানে (5, 6. 7)-টি মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে।
7. মৌলিক অধিকার আদালত কর্তৃক (বলবৎযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয়)।
8. ভারতের সংবিধানে (5, 6, 7)-টি স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত।
9. চাকরির অধিকার একটি (সামাজিক, আর্থনীতিক, নৈতিক) অধিকার।
10. নির্দেশক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক (বলবৎযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয়)। [H. S. C. '85]
11. ভারতের সংবিধানে ধর্মের অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি)।
12. ভারতের সংবিধানে কর্মের অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি)।
13. পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংগঠন করা ভারতের সংবিধানের (মৌলিক অধিকারে, নির্দেশমূলক নীতিতে) স্থান পেয়েছে।
14. বর্তমানে ভারতে সম্পত্তির অধিকার (মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়)। [H. S. C. '80, '82, '85]
15. মৌলিক অধিকারগুলো (অবাধ, অবাধ নয়)। [T. S. B. '79]
16. রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য হ'ল (একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠন, জনগণের মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিতকরণ)। [T, S. B. '79]
17. বিদেশীরা (সামাজিক, রাজনৈতিক) অধিকার ভোগ করতে পারে না।
18. নাগরিক নয় এমন দেশবাসী (পৌর, রাজনৈতিক) অধিকার ভোগ করে।
19. ভারতের সংবিধানে (দ্বৈত নাগরিকতা আছে, দ্বৈত নাগরিকতা নেই)।
20. অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হবার (যোগ্য, অযোগ্য)।
21. সম্পত্তির অধিকার একটি (রাজনীতিক, আর্থনীতিক) অধিকার। [H. S. C. 83]
22. কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত একটি (মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়)। [H. S. C. '83]

"*It is the function of the political theorist to see, sooner than others, and to analyse, more profoundly than others, the immediate and the potential problems of the political life of the society; to supply the practical politician, well in advance, with alternative courses of action, the foreseeable consequences of which have been fully thought through; and to supply him not only with brilliant asides, but with a solid block of knowledge on which to build*".

—**Arnold Brecht**

৮

কয়েকটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব
Some Major Political Theories

যে-কোন শাস্ত্র পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তত্ত্বের বা মতবাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের বিশেষ অবদান রয়েছে। বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব। কোন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় যখন নিছক বর্ণনা, তুলনা ও বিচারের গণ্ডী অতিক্রম করে মানুষের নিরন্তর প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের মূল্যায়নের তথ্য হিসেবে উপস্থিত হয় তখন তাকে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব বলে। আবার অনেকে বলেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যে অনুমান ও সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে তাকে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব বলে। এক সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে দর্শন এবং মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলকে সুনিশ্চিত করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য—তাই

দর্শন ও মূল্যবোধহীন কোন রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবে এ কথা ঠিক যে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের প্রবক্তারা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ এবং ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে তত্ত্ব গড়ে তোলেন এবং সামাজিক কল্যাণ-সম্পর্কে এঁদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এক এবং অভিন্ন নয়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের পদচারণা দেখতে পাওয়া যায়—প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বপক্ষে এবং সমাজ-ব্যবস্থাকে পাল্টে দেবার অঙ্গীকার নিয়ে। স্বাভাবিক কারণেই তাই রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বগুলোতে একই মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে না।

এক : উদারনীতি বা উদারনৈতিক মতবাদ (Liberalism)

রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন এবং চিন্তাধারার ইতিহাসে উদারনীতি বা উদারনৈতিক মতবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। উদারনৈতিক মতবাদ একটা চিন্তাধারাকে প্রকাশ করে—যার আবির্ভাব কোন একজন চিন্তাবিদ্ বা তাত্ত্বিক দ্বারা ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে ঘটেনি। অনেকে মনে করেন যে, সনাতন উদারনৈতিক চিন্তাধারার (Classical liberalism) প্রথম আবির্ভাব ঘটে প্রাচীন গ্রীক দেশে চিন্তার স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্টদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম উদারনৈতিক চিন্তাধারাকে শক্তিশালী করে। যাজক সম্প্রদায় ও সামন্ত প্রভুদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য এবং মনুষ্যত্বকে (essence of man) তুলে ধরার প্রয়াসের দ্বারা উদারনৈতিক চিন্তাধারার সম্প্রসারণ ঘটে। ইংলণ্ডের অধিকারের সনদ্-এর **(Bill of Rights)** এবং আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রকাশ উদারনীতিরই অভিব্যক্তি। তবে বর্তমান যুগে উদারনৈতিক মতবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার আবির্ভাব ঘটে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময় উদারনীতি ইংলণ্ডের জাতীয় দর্শন এবং জাতীয় নীতিতে পরিণত হয় এবং এই আধুনিক উদারনৈতিক মতবাদের প্রধান তিনজন প্রবক্তা হলেন ইংলণ্ডের হিতবাদী দার্শনিক বেন্থাম (**Bentham**), জেমস মিল (**James Mill**) এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল (**J. S. Mill**)। এই তিনজন মুখ্য প্রবক্তা ছাড়াও লক, ভলতেয়ার, রুশো, হিউম, মঁন্তেস্কু, অ্যাডাম স্মিথ, জেফারসন, গ্রীণ, কোল, লাস্কি প্রমুখ চিন্তাবিদরাও নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উদারনীতিকে সমর্থন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

উৎপত্তি ও বিকাশ

উদারনীতি বলতে কি বোঝায় ?

উদারনৈতিক মতবাদকে নিছক একটি তত্ত্ব বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। **উদারনৈতিক চিন্তা হ'ল একটা আন্দোলন, একটা আদর্শ, একটা দর্শন, একটা জীবনবোধ।** উদারনীতি বলতে আমরা একটা ব্যাপক জীবনাদর্শকে বুঝি। উদারনীতির সঙ্গে একটা ব্যাপক প্রেক্ষাপট জড়িত থাকার জন্য উদারনৈতিক মতবাদ বা *Liberalism* বলতে ঠিক কি বোঝায় তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা কষ্টকর। এইজন্যই উদারনৈতিক মতবাদের কোন সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে বলা যায়, উদারনীতি হ'ল স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ সরকারী নীতি ও কার্য পদ্ধতি, সমাজের সাংগঠনিক নীতি এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনপদ্ধতি (an idea committed to freedom as a method and policy in government, as an organising principle in society, and a way of life for the individual and community)।[১] Webster's *Unified Dictionary and Encyclopaedia*-তে উদারনীতির সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে Liberalism is *a term indicating the tendency towards extendiug individual rights and liberties as against rigid political, economic or bureaucratic authority. Politically, the term was formerly used to denote a movement of progressive reform in government and has been applied*

১. Epcyclopaedia Britannica, Vol 13,, P, 1017 (1967 Ed,)

at various times to parties agitating for the particular kind of liberty. অর্থাৎ, অনমনীয় রাজনৈতিক, আর্থনীতিক বা আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার সম্প্রসারণের প্রবণতাকে উদারনীতি বলে। উদারনীতির সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উদারনীতি হল একটা আদর্শ, যা ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রিয়া কর্মের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির অধিকারের মূর্ত প্রকাশ। সুতরাং সমাজে সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে এর তাৎপর্যকে অনুধাবন করাকেই উদারনীতি বলে।

হবহাউস (*Hobhouse*) তাঁর *Liberalism* গ্রন্থে একটি গতিশীল ধারণা হিসেবে উদারনীতি বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের আত্ম-পরিচালনার ক্ষমতার ওপরে ভিত্তি করে সমাজগঠনের বিশ্বাসকে উদারনীতি বলে। ঐভাবে গঠিত সমাজই একটি সত্যিকারের জনসমষ্টি গড়তে পারে। স্বাধীনতা ব্যক্তির অধিকার হিসেবে যতটা স্বীকৃত, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হ'ল সমাজ সংগঠনের জন্য। উদারনীতি হ'ল স্বাধীনতার অনুশাসন এবং এর অর্থ হ'ল যুক্তিসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ। উদারনীতি প্রয়োগের দ্বারাই সামাজিক প্রগতিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব। তাই বলা হয়, নতুন জগতের প্রয়োজনকে মেটাবার নতুন আদর্শ হ'ল উদারনীতি (**Liberalism came as a new ideology to fit the needs of a new world**)।[১]

উদারনীতি বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবন করার সুবিধের জন্য **বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারনীতির তাৎপর্য** কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উদারনীতির তাৎপর্য বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করা যেতে পারে।

সামাজিক ক্ষেত্রে উদারনীতি বলতে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বোঝায়। সুতরাং উদারনীতি ধর্মীয় এবং নৈতিকতার ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের বাধাহীন বিকাশ হ'ল উদারনীতির নির্যাস।

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উদারনীতি হ'ল ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন অধিকার, উৎপাদন ও বণ্টনের স্বাধীনতা, পূর্ণ প্রতিযোগিতা, উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফা অর্জনের অবাধ অধিকার।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতির প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণকে সীমিত রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, অবাধ গতিবিধির স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসনবিভাগের ওপরে আইন সভার নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্বীকৃতি অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিকে উদারনীতির পরিপূরক বলে মনে করা হয়।

আধুনিক উদারনীতি

বর্তমান শতকের বিশের এবং ত্রিশের দশকে সনাতন উদারনীতির (**Classical liberalism**) সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের প্রবণতা যুক্ত হয়ে একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করে এবং এই ধারাকে আধুনিক উদারনীতি নামে অভিহিত করা হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শ থেকে ব্যাপ্ত হয়ে বিশের শতকে উদারনীতি ব্যাপক জনগণের আদর্শে পরিণত হয়। আধুনিক উদারনীতি হ'ল দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মসূচীর সমন্বয়। উদারনীতি বলতে কোন একটা নির্দিষ্ট তত্ত্বকে

১. Laski, *the Rise of European Liberalism*, P. 16.

বোঝায় না—এটা হ'ল একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি। এর নির্যাস হ'ল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থা এবং শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি।

উদারনীতির বৈশিষ্ট্য

উদারনীতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উদারনীতি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে একটি চরম লক্ষ্য বলে মনে করে। ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য যে-কোন নিয়ন্ত্রণকে উদারনীতির প্রবক্তারা ক্ষতিকর বলে মনে করেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা এবং মর্যাদার বিকাশের জন্য নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তি স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই উদারনীতি মনে করে যে, সামাজিক সংস্থা হ'ল উপায় মাত্র (means), যার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক কারণেই উদারনীতি সকল প্রকার কর্তৃত্বের বিরোধী। বস্তুত বলা যায় যে সনাতন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিক্রিয়া থেকেই উদারনীতির উৎপত্তি। উদারনীতি মনে করে, যে-কোন প্রকার কর্তৃত্বই ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগের পরিধিকে সীমিত করে তোলে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিধিকে প্রসারিত করে উদারনীতি ব্যক্তির গতিবিধি ও পছন্দের পরিমণ্ডলীকে সম্প্রসারিত করতে চায়। এর ফলে ব্যক্তির বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, উদারনীতি মূলত মানবতাবাদের পৃষ্ঠপোষক। জনগণ যাতে কর্তৃত্বের অধিকারী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বশংবদে পরিণত না হয়ে স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারে উদারনীতি সেই ধরনের সামাজিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে চায়। এরূপ পরিবেশ সুনিশ্চিত হলে দুর্বল ও অবহেলিত জনসমাজ নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা খুঁজে পায়।

পঞ্চমত, উদারনীতি একটা গতিশীল ধারণা। এই নীতি সমাজকে এবং সামাজিক সমস্যাকে মুক্তমন, যুক্তি ও মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কথা বলে। কোন কিছুকে চরম বলে ধরে না নিয়ে যুক্তি ও মানবতার আলোতে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেয় উদারনীতি। তাই উদারনীতি কোন অনড় ধারণা নয়—এটি একটি গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করার ব্যাপারে উদারনীতির ধারণা অনড়, কিন্তু পদ্ধতি সম্পর্কে উদারনীতি গতিশীল।

অ্যালান গ্রিমস্ (Alan P. Grimes) উদারনীতির উপাদানগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে উদারনীতি এমন একটা ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে থাকবে বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থা (Pluralistic Society), রাজনীতিতে বিভিন্ন মত ও দলের অস্তিত্ব, অর্থনীতি-ধর্ম-সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন ধারার অস্তিত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিমন্ডলী; ব্যক্তির পছন্দের ব্যাপক সুযোগ এবং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদিকে, সেই সমাজে থাকবে না বাধ্যতামূলক অনুরূপতা (uniformity and conformity), একচেটিয়া ব্যবস্থা এবং কর্তৃত্ববাদ। এইভাবে যে সমাজ গড়ে উঠবে সেখানে জনগণই হবে সার্বভৌম—সরকার বা কর্তৃত্ব হবে জনগণের প্রতিনিধি মাত্র (The people were sovereign—the government was their deligate)।

হলওয়েল (Hallowell) তাঁর *Main Currents in Modern Political Thought* গ্রন্থে উদারনীতির নির্যাসগুলোকে তুলে ধরেছেন: ১. ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের চরম মূল্য এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সাম্যে বিশ্বাস; ২. ব্যক্তি-ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস; ৩. মানুষের সহজাত মহত্ত্বে (goodness of man) বিশ্বাস; ৪. জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি ইত্যাদির অবিচ্ছেদ্য অধিকারে বিশ্বাস; ৫. ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে ঐক্যমত; ৬. ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিমূলক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র চুক্তির শর্ত অমান্য করলে ব্যক্তি কর্তৃক সরকারকে বিরোধিতা করার এবং নতুন সরকার গঠনের ক্ষমতা; ৭. আইন হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার—এই বিশ্বাস; ৮. রাষ্ট্রের সীমিত ও নেতিবাচক ক্ষমতায় বিশ্বাস;

৯. ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং বৌদ্ধিক—ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস ; এবং ব্যক্তির যুক্তিগ্রাহ্য বিবেকের প্রতি বিশ্বাস।

উদারনীতির মৌল সূত্র

হবহাউস তাঁর *Liberalism* গ্রন্থে আরও সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদারনীতির ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি উদারনীতির নয়টি মৌল সূত্রকে তুলে ধরেছেন। উদারনীতির ঐ মৌল সূত্রগুলো হ'ল ঃ

১. পৌর-স্বাধীনতা (Civil Liberty) ঃ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় (Feudal Society) রাজা, সামন্ত প্রভু এবং যাজকেরা আইন রচনা এবং তা প্রয়োগের অধিকার ভোগ করে। সেখানে আইনের প্রয়োগ নিরপেক্ষভাবে এবং সমতার নীতি অনুযায়ী হয় না—কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ ঘটে। ফলে ঐ ব্যবস্থায় ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত থাকে না। উদারনীতি ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আইন-প্রণয়ন এবং সমাজে সমতার নীতি অনুযায়ী আইন প্রয়োগের নীতির কথা বলে।

২. অর্থনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা (Fiscal Liberty) ঃ এই নীতির নির্যাস হ'ল সরকার পরিচালনায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাদের ওপরে কর আরোপ করা চলবে না (No taxation without representation)। অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধিরা (মধ্যবিত্তরা) সরকার পরিচালনা করবে এবং তাদের স্বার্থ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় করনীতি এবং অর্থনীতি নির্ধারিত হবে।

৩. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Personal Liberty) ঃ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নিশ্চিন্ত করা প্রয়োজন বলে উদারনীতি মনে করে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, পূজা-অর্চনার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি হ'ল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকাশ।

৪. সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty) ঃ সামাজিক স্বাধীনতা বলতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ এবং আর্থনীতিক অবস্থা নির্বিশেষে সমাজে সমতার নীতিকে বোঝায়। সামাজিক স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সামাজিক স্বাধীনতার মূল কথা হ'ল প্রত্যেকটি মানুষই সমাজের চোখে সমান এবং প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী।

৫. আর্থিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) ঃ রাষ্ট্র কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের স্বাধীনতা, দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা, ঋণদান ও ঋণ গ্রহণের স্বাধীনতা, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও মুনাফা অর্জনের স্বাধীনতা হ'ল উদারনৈতিক ব্যবস্থার আর্থিক স্বাধীনতা।

৬. পারিবারিক স্বাধীনতা (Domestic Liberty) ঃ সম্পত্তি, বিবাহ এবং সন্তানের ওপর অধিকারের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রবক্তা হ'ল উদারনীতি। শিশুদের শিক্ষালাভের অধিকার এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার ও শোষণ থেকে রক্ষা করার অধিকার থাকবে।

৭. আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা (International Liberty) ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা উদারনীতির লক্ষ্য। জাতীয় নীতির ক্ষেত্রের শক্তি প্রয়োগের নীতি গ্রহণ বা সামরিকবাদ প্রতিষ্ঠা উদারনীতি বিরোধী।

৮. রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) ঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার নির্যাস হ'ল প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা। হবহাউস রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে উদারনীতির মধ্যমণি বলে মনে করেন।

৯. জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty) ঃ উদারনীতি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার কর্ম পরিচালনায় জনগণের সর্বাত্মক ভূমিকার স্বীকৃতি দান উদারনীতির উদ্দেশ্য।

সমালোচনা

উদারনৈতিক মতবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, স্যাবাইন (Sabine) মনে করেন যে, সামাজিক দর্শন হিসেবে উদারনীতি সামাজিক কল্যাণের কোন ইতিবাচক ধারণা এবং কর্মসূচীকে তুলে ধরতে পারেনি। বরং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের ওপরে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেবার ফলে সমাজকল্যাণ সম্পর্কে এই মতবাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দর্শন হিসেবেও এই মতবাদ সরকারের ইতিবাচক কাজকর্মকে তুলে ধরতে পারেনি—কিন্তু জনকল্যাণের দিক থেকে সরকারের ইতিবাচক কর্মসূচির রূপায়ণ অপরিহার্য। সুতরাং এই তত্ত্ব জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ার দর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

তৃতীয়ত, উদারনীতি মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং লেসেফেয়ার (Laissez-faire) অর্থনীতির প্রবক্তা। তাই এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রধান সমালোচনা হল এই যে, উদারনীতি বাস্তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং ঐ ব্যবস্থায় শোষণ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখতে চায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটা আমেজ ও পরিমণ্ডলী সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কায়েম রাখাই এই মতবাদের উদ্দেশ্য। উদারনীতির প্রবক্তারা ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, অসম সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসক ও শোষকের স্বাধীনতাতে পরিণত হয়। এই মতবাদে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যে নগ্ন প্রকাশ দেখা দিয়েছে তার দ্বারা এমনকি গণতান্ত্রিক সমাজবাদও কায়েম করা যায় না (**A philosophy of crude and uncritical individualism is, in fact, inconsistent with social democracy**)।

চতুর্থত, উদারনীতি একটা সুসংবদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি—এটি একটি নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল নীতি। এই মতবাদকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এমন অনেক চিন্তাবিদ্‌কে এই নীতির প্রবক্তা এবং সমর্থক বলে চিহ্নিত করা সম্ভব—যাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দ্বিমত পোষণ করেন।

পঞ্চমত, সমালোচকেরা বলেন যে, উদারনীতির প্রবক্তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সমাজের উঁচুতলায় বাস। এরা মূলত পুঁজিবাদের সমর্থক এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী। তাই এঁদের উদারনৈতিক দর্শনে সমাজতন্ত্রকে বিরোধিতা করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তাকে স্থিতিশীল রাখার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

দুই : মার্কসবাদ (Marxism)

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে কার্ল মার্কস (**Karl Marx**) এক অবিস্মরণীয় নাম। মার্কসের চিন্তা, মতামত ও শিক্ষাকে সাধারণভাবে মার্কসবাদ বলা হয়। মার্কসবাদের আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে মার্কসের বন্ধু ও সহযোগী ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (**Frederick Engels**) প্রভূত অবদান রয়েছে। বস্তুত মার্কস ও এঙ্গেলসের দর্শনকেই মার্কসবাদ বলে। মার্কসবাদের বিকাশে এবং সৃজনশীল প্রয়োগে লেনিনের (**V. I. Lenin**) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। **বস্তুবাদী দর্শনের জনক** কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেছিলেন চিরায়ত ভাববাদী দর্শনের পীঠস্থান জার্মানীতে এবং জার্মানীর ভাববাদী দার্শনিক কাণ্ট, ফিকটে ও হেগেলের ভাববাদী দর্শন থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি তাঁর সহযোগী ও বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের সহযোগিতায় বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি রচনা করে তাকে বিকশিত করে তুললেন—গড়ে উঠলো মার্কসবাদ।

মার্কসবাদ কি ?

মার্কসের জীবনীকার হেনরিচ গ্রেমকভ (**Heinrich Gremkov**) বলেছেন যে, মার্কসের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তিনি হেগেলীয় ভাববাদের সীমাবদ্ধতা এবং ফয়েরবাখের (**Feuerbach**) চিন্তার অধিবিদ্যাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিশানা খুঁজে পেলেন। আলথুসার (**Althusser**) যথার্থই বলেছেন, মার্কস এবং এঙ্গেলস্ এমন

এক জগতের, এমন এক মৌলিকভাবে ভিন্ন বাস্তবতার সন্ধান পেলেন জার্মান ভাববাদী দর্শনের কোথাও যার কোন প্রতিধ্বনি নেই।

মার্কস দেখিয়েছেন যে, কোন দর্শন দার্শনিকের বিশুদ্ধ চিন্তার ফসল নয়—সকল দর্শনের শেকড় রয়েছে জীবনের মধ্যে। জীবনবোধ থেকেই মার্কসবাদের উদ্ভব—মার্কসবাদ মহাপুরুষের ধ্যানলব্ধ আবিষ্কার নয়। মার্কসবাদ হ'ল সৃজনশীল দর্শন, মার্কসবাদ হ'ল বিজ্ঞান। মার্কসবাদ হ'ল আমাদের এই জগৎ এবং তার অংশ মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব। এঙ্গেলস বলেছেন, "ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তনের নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কস তেমনি মানব ইতিহাসের বিবর্তন সূত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি যা আবিষ্কার করেছেন তা চিরন্তন সত্য।"

মার্কসবাদের উৎস

মার্কসবাদের উদ্ভব ঘটে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে মানুষের চিন্তার জগতের এক যুগ সন্ধিক্ষণে। মার্কসবাদ হ'ল মানুষের বস্তুজগৎ এবং ভাব জগতের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি—যা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা *Dialectical Materialism* নামে চিন্তার ইতিহাসে পরিচিত। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উৎস কি তা আমাদের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। মার্কসবাদের উৎস হিসেবে প্রধানত তিনটি ধারাকে চিহ্নিত করা হয়, যদিও ঐ তিনটি ধারার বাইরেও আরও কয়েকটি চিন্তাধারা এবং ঐতিহাসিক কারণ মার্কসবাদের উদ্ভবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মার্কসীয় তত্ত্ব ও চিন্তাধারাকে প্রধানত কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তাত্ত্বিক চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সুতরাং মার্কসবাদের উৎসকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ; ২. তাত্ত্বিক চিন্তা।

১. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

ফরাসী বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে এবং এদের যৌথ প্রভাবে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে এবং পরিণতিতে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এই ঘটনাবলী মার্কসবাদের উদ্ভবের অন্যতম উৎস।

২. তাত্ত্বিক চিন্তা

মার্কসবাদের উৎস হিসেবে যে সকল তাত্ত্বিক চিন্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক. ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, খ. কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের ধ্যান ধারণা এবং গ. জার্মান ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা।

ক. ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর্থনীতিক ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন। লকের বুর্জোয়া আর্থনীতিক চিন্তার সূত্র ধরে অ্যাডাম স্মিথ মূল্যের শ্রমতত্ত্বের (labour theory of value) সূত্রপাত করেন এবং রিকার্ডো ঐ তত্ত্বকে পুরোপুরি রূপদান করেন। অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর তত্ত্বের সূত্র ধরে মার্কস তাঁর *Das Capital* গ্রন্থে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে সামাজিক শ্রমের ভূমিকাকে তুলে ধরেন এবং তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব (Theory of surplus value) ব্যাখ্যা করেন।

খ. কাল্পনিক সমাজতন্ত্র

ফরাসী দেশের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী (Utopian socialists) সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা করে সমাজতন্ত্রের রূপরেখা উপস্থিত করেন।

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা থাকলেও মার্কসবাদের উদ্ভবের পেছনে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ. **জার্মান ভাববাদ**

মার্কসীয় চিন্তাধারার উৎপত্তির পেছনে জার্মান ভাববাদের বিশেষ অবদান রয়েছে। জার্মানীর বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক কাণ্ট, ফিকটে এবং বিশেষ করে হেগেলের নাম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। হেগেল দ্বন্দ্বতত্ত্বের (Dialectics) প্রথম রূপকার। হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

মার্কসবাদের প্রধান প্রধান সূত্র বা তত্ত্ব

মার্কসবাদের চিন্তাধারা ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে মার্কসবাদের প্রধান প্রধান সূত্রগুলো আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। মার্কসবাদের প্রধান সূত্র বা তত্ত্বগুলো হ'ল ঃ

১ **মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি ঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ**
২. **মার্কসবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**
৩. **মার্কসবাদের আর্থনৈতিক ভিত্তি ঃ উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব**
৪. **মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব**
৫. **মার্কসের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব**
৬. **মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্ব**

মার্কসবাদের উপরোক্ত মূল সূত্র বা তত্ত্বগুলো মার্কসবাদ জানা ও বোঝার জন্য অপরিহার্য। এইজন্য মার্কসবাদের উপরোক্ত তত্ত্বগুলোকে সংক্ষেপে আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল।

তিন ঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হ'ল মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি। মার্কস এবং এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের জনক।

জার্মানীর ভাববাদী দার্শনিকেরাই প্রথমে মানুষের ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে দ্বান্দ্বিক সংঘাতের প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন। মার্কসের আগেই ভাববাদী দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি সুস্পষ্ট রূপ দেন। হেগেল দেখান যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই পরিবর্তনশীল। বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সকল কিছুই হ'ল এক অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ হেগেলের গতিশীলতাময় এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াই দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা *Dialectics*। সমাজের গতিশীলতাকে বা পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা করার জন্য দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ অপরিহার্য। জার্মান ভাববাদী দার্শনিকেরা দ্বন্দ্বতত্ত্বকে ভাবজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন—তাকে বস্তুজগতকে বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেনি। কারণ, ভাববাদীরা বস্তুজগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা মনে করতেন ভাববাদীজগৎ থেকেই বস্তুবাদী জগতের সৃষ্টি।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কি ?

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিকরা সমাজ পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে দেখান যে বস্তুজগতের অস্তিত্ব ভাবজগতের ওপরে নির্ভরশীল নয় এবং কোন অলৌকিক শক্তির ইচ্ছায় বস্তুজগৎ সৃষ্ট হয় না। এঁরা দেখান যে, বস্তুজগতের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলে বস্তুজগতের তথা সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে জন্ম নেয় গতি, আর ঐ গতি থেকেই সকল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করেন যে, বস্তুবাদ হ'ল বস্তুজগতের পরিবর্তনকে অনুধাবন করার অপরিহার্য পদ্ধতি।

এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি মূল সূত্রকে তুলে ধরেন ঃ

প্রথমত, বস্তুর মধ্যে নিহিত গতিশীলতা সব সময়ই বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটায় (**Transformation of Quantity into Quality**)। যেমন কোন পদার্থের প্রোটনের (**Proton**) পরিমাণ পরিবর্তন করে গুণগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তৈরী করা যায়। পরমাণুর পরিমাণগত পরিবর্তন সাধন করে পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টি করা যায়। ঠিক তেমনি, সমাজে অন্যায় এবং অবিচারের ফলে সমাজব্যবস্থার গতিশীলতা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সমাজ-ব্যবস্থায় পরিমাণগত পরিবর্তন আনে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তিনটি সূত্র

দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্র হ'ল, বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রাম (**Unity and Struggle of Opposits**)। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মনে করে যে, বস্তুর পরিবর্তনশীলতার উৎস বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে। বস্তুর মধ্যেই তার বৈপরীত্য থাকে। বিপরীত উপাদানগুলোর দ্বন্দ্ব থেকেই পরিবর্তন সূচিত হয়। দ্বান্দ্বিক তত্ত্বে বলা হয় যে, একটি বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকে। বস্তুর মধ্যেকার বৈপরীত্যের ফলে নেতিকরণ ঘটে এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় তা নতুন সত্তা লাভ করে। এইভাবে বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতে পরিবর্তন ঘটে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বের তৃতীয় সূত্র হ'ল নেতির নেতিকরণ (**Negation of Negation**)। হেগেল তাঁর দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি স্তর চিহ্নিত করেছেন। ঐগুলো হ'ল বাদ (**Thesis**), প্রতিবাদ (**Antithesis**) এবং সম্বাদ (**Synthesis**)। কোন ঘটনার স্তরটি হ'ল বাদ। যা তার নেতিকরণ ঘটায় সেটি হ'ল প্রতিবাদ। উভয়ের সমন্বয়ে যে নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয় সেটি হ'ল সম্বাদ। সম্বাদ হ'ল পুরাতন অবস্থার শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোর সংরক্ষণ করে পুরাতন অবস্থার রূপান্তর। মার্কস হেগেলের কাছ থেকে দ্বান্দ্বিকের এই সূত্রটি গ্রহণ করেন এবং বস্তুজগতের পরিবর্তন বিশ্লেষণে তা প্রয়োগ করেন। মার্কসবাদ দেখায় যে, নেতিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরানো রূপ পরিবর্তিত হয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হ'ল পুঁজিবাদকে নেতিকরণের একটি রূপ। সমাজতন্ত্র একদিকে পুঁজিবাদের মহৎ অবদানগুলোকে সংরক্ষণ করে, অন্যদিকে পুঁজিবাদকে বাতিল করে গুণগত দিক থেকে উন্নত ব্যবস্থাকে সৃষ্টি করে।

মার্কসীয় বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক মার্কসবাদের মূল ভিত্তি। মানব সমাজকে বিশ্লেষণ এবং এর পরিবর্তনকে একমাত্র এই দ্বান্দ্বিকের দ্বারাই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

চার ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

সমাজবিকাশের এবং সমাজের রূপান্তরের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলোর প্রয়োগকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানব ইতিহাসের সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব, বিকাশ এবং পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মকে সূত্রায়িত করে। স্তালিন (**Stalin**) বলেছেন, "সমাজ জীবনের অনুশীলনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলোর প্রয়োগকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সামাজিক জীবনধারা এবং সমাজ ইতিহাসের ইতিবৃত্ত বিচারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলোর ব্যবহারকেও বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।"[১] ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আর ইতিহাস এক নয়। ইতিহাসের কাজ হ'ল ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করা—আর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কাজ হ'ল মানবজীবনের যথার্থ বিকাশের সাধারণ নীতিকে আবিষ্কার করা। ইতিহাস হ'ল বিষয়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হ'ল ঐ বিষয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান। সমাজে অবিচার, অন্যায়, অসাম্য ও শোষণের কারণগুলো নিহিত রয়েছে মানুষের ইতিহাসের মধ্যে—বস্তুত এই বোধ ও সচেতনতা থেকে উদ্ভব

সংজ্ঞা

১. দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ,—জে. ভি. স্তালিন।

ঘটে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের। সমাজ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যারই নাম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ইতিহাস ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলো প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজ পরিবর্তনের বিশ্লেষণকে বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তোলে।

এক সময়ে মনে করা হত, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর। ভাববাদীরা মনে করতেন, ইতিহাস হ'ল নৈর্ব্যক্তিক আত্মার (spirit) সৃষ্টিশীল ক্ষমতার প্রকাশ। মার্কসবাদী চিন্তাধারার আবির্ভাবের আগে কোন চিন্তাবিদ্ ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি কি, সামাজিক ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ কি—এই সকল প্রশ্নের কোন বিজ্ঞানসম্মত উত্তর উপস্থিত করতে পারেননি। মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, সমাজ বিকাশ কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির ইচ্ছায় বা কোন ব্যক্তির একক চেষ্টায় ঘটে না। সমাজ বিকাশের ইতিহাস হ'ল উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও তার বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিকাশের ফলশ্রুতি। মার্কসের এই বক্তব্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নির্যাস এবং একে কয়েকটি মূল সূত্রে তুলে ধরা যেতে পারে।

ব্যাখ্যা

প্রথমত, মার্কস দেখান যে, **ব্যক্তি তাঁর শ্রমের মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একটি সামাজিক পরিমণ্ডলী গড়ে তোলে এবং শ্রমের প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশকে পরিবর্তন করে।** অন্যান্য প্রাণীর শ্রমের ক্ষমতা থাকলেও তারা শ্রমের প্রয়োগ করে বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে না।

তিনটি সূত্র

দ্বিতীয়ত, মানুষ তাঁর সৃজনশীল শ্রমকে ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ঐ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বলা যায়, সভ্যতার অগ্রগতি, চিন্তাজগতের পরিবর্তন, সংস্কৃতির বিকাশ ইত্যাদি উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, উৎপাদিকা শক্তি (forces of produetion) এবং উৎপাদন সম্পর্কের (relation of production) পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধিত হয়। উৎপাদিকা শক্তি বলতে শ্রম শক্তির অধিকারী মানুষ, শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনের হাতিয়ার এবং প্রকৃতিদত্ত সম্পদের যোগফলকে বোঝায়। অর্থাৎ মানুষের শ্রমশক্তি + উৎপাদনের হাতিয়ার + প্রাকৃতিক সম্পদ = উৎপাদনের উপাদান। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমশক্তির প্রয়োগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে উৎপাদন সম্পর্ক বলে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, উৎপাদনের উপকরণের মালিকদের সঙ্গে উৎপাদনে নিযুক্ত অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক হল উৎপাদন সম্পর্ক। মার্কস ও এংগেলস উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে সমাজের বিকাশকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা দেখান যে, উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের ভিত্তিতে সমাজে পরিবর্তন আসে এবং ইতিহাস এগিয়ে চলে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের সামঞ্জস্য সাধনের মাধ্যমে। উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কে সম্পর্ক বৈরীমূলক হলে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব ঘটে।

উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক

মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ইতিহাসের কোন অমোঘ গতি নেই, শ্রমজীবী মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে—ইতিহাস হ'ল মানুষের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ সমাজপরিবর্তন কোন নির্দিষ্ট গতিপথে অলৌকিক শক্তির নির্দেশে ঘটে না। সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজের বিকাশ ঘটে উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে।

পাঁচ : উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব (Theory of Surplus Value)

মার্কসবাদের অন্যতম উৎস হ'ল ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labour theory of value) ব্যাখ্যা করেন। ঐ

আলোচনার সূত্র ধরে মার্কস তাঁর বিখ্যাত উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। মার্কস এই তত্ত্বে সামাজিক শ্রমের ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করেন। মার্কস দেখান যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রমকে আত্মসাৎ করে মালিকেরা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝান যেতে পারে। ধরা যাক, কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে কাঁচা মাল, শ্রমিকের মজুরী ও অন্যান্য খরচ বাবদ ব্যয় হয় এক'শ টাকা। অর্থাৎ ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় (M) হ'ল এক'শ টাকা। দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করা হয় তিন'শ টাকায়। অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য (M') তিন'শ টাকা। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্য হল ৩০০−১০০ (M'−M)=২০০। দু'শ টাকার উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে শ্রমিকের শ্রম। মালিক শ্রমিককে শ্রমের পুরো মূল্য না দিয়ে একাংশ আত্মসাৎ করে। সুতরাং শ্রমিকদের শ্রমের পুরো মূল্য না দিয়ে মালিক শ্রমিকের যে শ্রমকে আত্মসাৎ করে তাই হল উদ্বৃত্ত মূল্য বা মালিকের অতিরিক্ত মুনাফা।

ছয় : মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব (Marxian Theory of the State)

উৎপত্তি

রাষ্ট্র সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা থেকে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি হ'ল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানত মার্কস ও এঙ্গেলস-এর রচিত *The Communist Manifesto* (১৮৪৮) গ্রন্থে, এঙ্গেলসের *The Origin of the Family, Private Property and the State* (১৮৮৪) গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে লেনিনের লেখা *The State and Revolution* (১৯১৭) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, মার্কসের *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (১৮৫২) প্রবন্ধেও মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তার মৌলিক বিশ্লেষণ রয়েছে। যাহোক, বলা যায় যে, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর দর্শন থেকে মার্কসবাদ রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে বিশেষ করে লেনিন ও স্তালিনের দ্বারা মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা আরও বিকশিত হয়।

বস্তু থেকে চৈতন্য বিবর্তিত হয়

আগেই বলা হয়েছে, মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি হ'ল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সুতরাং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রেক্ষাপটে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। ভাববাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, ভাব (idea), আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের জন্যই ইতিহাসের ধারা বদলায় এবং সমাজ পরিবর্তিত হয়। ভাববাদী দার্শনিক হেগেল মানুষের জীবনে ঈশ্বরের চৈতন্যের লীলার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন এবং ঐ লীলার সূত্রেই তিনি সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু থেকে চৈতন্য বিবর্তিত হয়। তাই মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ পরিবর্তিত হয় এবং ঐ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে ভাব, আদর্শ ও ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন ঘটে। ভাব, আদর্শ, নীতি, ধর্ম ইত্যাদিকে মার্কস অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনি মনে করেন যে, ঐগুলো হ'ল সমসাময়িক বস্তু জগতের প্রতিফলন। ঐ প্রতিফলন থেকেই মানুষের মনে ভাব, ধ্যান-ধারণা এবং তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। মার্কসের ভাষায় বলা যায়, *With me......the ideal is nothing else than the material world refleced by the human mind, translated into forms of thought*. মার্কস তাঁর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখান, যে কোন সমাজের প্রতিষ্ঠান, আইনী-ব্যবস্থা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সেই সমাজ ও যুগের আর্থিক কাঠামোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়। এঙ্গেলস্ বলেছেন যে,

ভিত্ এবং উপরিসৌধ

কোনও সমাজের প্রতিষ্ঠান, আইন-ব্যবস্থা, কলা, ধর্ম ও ধ্যান-ধারণাগুলো হল উপরিসৌধ বা *Superstructure*। ঐ উপরিসৌধ সমাজের সেই সময়কার প্রচলিত আর্থনীতিক কাঠামো বা ভিত্ বা *Base*-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার, উপরিসৌধে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাও অনেক সময় আর্থিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে।

উপরোক্ত বাস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে মার্কস মানব সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখান যে একমাত্র প্রাক্‌ঐতিহাসিক সমাজ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রচলিত সমাজের ইতিহাস হ'ল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস (The history of all hitherto existing sociey is the history of class struggle)। পশুপালনের যুগে যে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয় সামন্তযুগে তা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শিল্প বিপ্লবের পরে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে ঐ শ্রেণীসংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

মার্কস দেখিয়েছেন যে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির (mode of production) ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সমাজে নির্দিষ্ট ধরনের শ্রেণী সম্পর্ক। উৎপাদন-পদ্ধতির আবার দুটি দিক আছে। প্রথমত, উৎপাদন-শক্তি (forces for production)। উৎপাদন শক্তি বলতে, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, শ্রমিক ও তার দক্ষতাকে বোঝায়। দ্বিতীয়টি হ'ল উৎপাদন সম্পর্ক (relation of production)। উৎপাদন-সম্পর্ক বলতে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সম্পর্ক তাকে বোঝায়। উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে শ্রেণী উৎপাদন-শক্তির মালিক তারাই সমাজে প্রতিপত্তিশালী। তারা শোষিত শ্রেণীর ওপর তাদের শোষণকে অব্যাহত রেখে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। আধুনিক যুগে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলত দুটি শ্রেণী জন্মলাভ করে। প্রথমটি ধনিক শ্রেণী এবং দ্বিতীয়টি শ্রমিক শ্রেণী। সমাজের উৎপাদিত সম্পদের এক বিরাট অংশ এই ধনিক বা মালিক শ্রেণী আত্মসাৎ করে শ্রমিককে তার উৎপাদনের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করে। শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, অথচ মালিক ন্যায্য অংশ থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করে তা নিজে আত্মসাৎ করে। মার্কস একে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) আখ্যা দিয়েছেন।

উৎপাদক সম্পর্ক

শোষিত শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সকল যুগেই মালিক শ্রেণী পুলিশ, সৈন্য ও অন্যান্য শক্তি একত্র করে শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করার চেষ্টা করে। মার্কসের মতে কেন্দ্রীভূত পশুশক্তির সাহায্যে গঠিত এই যে সংগঠন যা শোষকের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করে তাই রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্ট্র হল শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক এবং কেন্দ্রীভূত পশুশক্তির (coercive power) প্রকাশ। মার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এইভাবে পশুপালনের যুগ থেকে শুরু করে সামন্ত যুগ বা আধুনিক শিল্পযুগেও ঘটনা একই ধারার প্রবাহিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণী প্রতি যুগেই পশুশক্তির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নামক সংগঠনের দ্বারা নিজ শ্রেণীস্বার্থ তথা শোষণ বজায় রাখে 'রাষ্ট্র' নামক যন্ত্রের সাহায্যে। তাই রাষ্ট্র উৎপাদনের উপাদানের মালিকদের দ্বারা শ্রমজীবী জনসাধারণকে শোষণের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, রাষ্ট্র হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীর কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি মাত্র (an executive committee for administering the affairs of the whole bourgeois class)। শোষকশ্রেণী নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা ও অন্যান্য বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীকে দমন করার জন্য রাষ্ট্র নামক সংগঠনের দ্বারা কতকগুলো রীতিনীতি কার্যকর করে—যাকে আইন নামে অভিহিত করা হয়। লেনিন বলেছেন, যাদের মিলনের সম্ভাবনা নেই এরূপ পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র হ'ল শ্রেণীশাসনের একটি সংস্থা, একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে শোষণ করা যন্ত্র বিশেষ (The State is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonism. It is an organ of class rule ; on organ for the oppression of one class by another)।

রাষ্ট্র শোষণের যন্ত্র

মার্কস মনে করেন যে, ক্রমবর্ধমান ও বিরামহীন শোষণে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীকে বলিষ্ঠ সংগঠন সৃষ্টি করে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সম্পদশালী শ্রেণী কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় যন্ত্র নিজেদের হাতছাড়া করবে না ; তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য যথাসর্বস্ব পণ করে শোষণ যন্ত্র বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজ অধিকারে রাখার চেষ্টা করবে।

তাই মার্কস মনে করেন যে, বিপ্লবের মধ্যেমেই একমাত্র শোষক সম্পদশালী শ্রেণীকে পরাজিত করা সম্ভব। এই ভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে শোষক ও শাসক শ্রেণীকে পরাজিত করে শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার লাভ করে শ্রমিক শ্রেণী সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র (dictatorship of the proletariat) প্রতিষ্ঠা করবে। শাসকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রথমত, ধনিক শ্রেণী ও ধনতন্ত্রকে বিনষ্ট করবে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (state socialism) প্রতিষ্ঠা করবে ; এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রের ধীরে ধীরে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটবে। সাম্যবাদী সমাজে প্রতি ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন মত ভোগ করবে এবং নিজ সাধ্যমত উৎপাদন করবে (from each according to his capacity, to each according to his need)।

শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কারণ সাম্যবাদী সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণী থাকবে না—সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণীহীন সমাজ। যখন সমাজে একাধিক শ্রেণী থাকে তখন ক্ষমতাবান শ্রেণী রাষ্ট্র নামক পশুশক্তিসম্পন্ন সংগঠন দ্বারা নিজের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করে এবং অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকে দমন করে। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, কারণ এখানে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করা এবং শোষিত শ্রেণীকে দমন করা, কোনটিরই প্রয়োজন নেই। তাই, মার্কসের মতে সাম্যবাদী সমাজের বিশেষ এক পর্যায়ে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে (the state will wither away)।

রাষ্ট্রের অবলুপ্তি

সমালোচনা

মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শন পৃথিবীতে বিপুলভাবে অভিনন্দিত এবং ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। বস্তুত পৃথিবীতে যুগপৎ এত প্রশংসা ও নিন্দা অন্য কোন তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঘটেনি। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে যে সকল কারণে সমালোচনা করা হয়েছে তা আলোচনা করা হল :

প্রথমত, সমালোচকদের মতে মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দ্বারা আর্থনীতিক ঘটনার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং মানুষের জীবনে ভাব, আদর্শ, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে বহুলাংশে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা হ'ল এই যে, মার্কস ধর্ম, নীতি, আদর্শ, ভাব ইত্যাদিকে অস্বীকার করেননি, তিনি এদের আর্থনীতিক পারিপার্শ্বিক থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেছেন মাত্র।

দ্বিতীয়ত, মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরুদ্ধে আর একটি সমালোচনা হল, মার্কসীয় মতবাদ রাজনীতি, আইন ইত্যাদিকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি। মার্কসের মতে আর্থিক কাঠামোই হ'ল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি—রাজনীতি বা আইন হল উপরিসৌধ (super-structure) মাত্র। কার্ল পপারের (Karl Popper) যুক্তিতে মার্কস এইভাবে রাজনীতিকে 'বন্ধ্যা' করে ফেলেছেন। এই সমালোচনা অযৌক্তিক। মার্কস রাজনীতি বা রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব কোথাও অস্বীকার করেননি। এরা আর্থনীতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে—এই কথা বলেছেন মাত্র। সুতরাং বলা যায়, কার্ল পপার মার্কসের প্রতি সুবিচার করেননি।

তৃতীয়ত, বলা হয়, মার্কস সমাজে স্বার্থের বিভিন্নতার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণী সংঘর্ষকে অত্যাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। সমালোচকদের অভিযোগ, মার্কস ইতিহাসে শুধু শ্রেণী সংঘর্ষই দেখেছেন—কিন্তু এর পাশাপাশি শ্রেণী সহযোগিতার ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা সঠিক নয়। শ্রেণীস্বার্থের বিভিন্নতা এবং শ্রেণীসংঘর্ষের ঘটনা অতীতে ছিল এবং বর্তমানেও আছে। মার্কস দেখিয়েছেন যে, সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ যুগে শ্রেণীর এবং শ্রেণীসংগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে এবং একটি বিশেষ যুগে ঐ শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটবে। সুতরাং মার্কসীয় তত্ত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে এবং সমাজতন্ত্র গঠনের দ্বারা শ্রেণীসংগ্রামের অবসানের কথা লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

চতুর্থত, সমালোচকেরা মনে করেন যে, মার্কস ধর্ম ও নীতির আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী। তাই নীতিশাস্ত্রের চিরন্তনতা মার্কস উপলব্ধি করতে পারেননি। উত্তরে বলা হয়, নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পরস্পরবিরোধনীতি বিভিন্ন দেশে আইনসিদ্ধভাবে প্রচলিত আছে। এর দ্বারা ধর্ম, নীতি প্রভৃতির আপেক্ষিকতাই প্রমাণিত হয়, অব্যয়বাদ নয়।

পঞ্চমত, সমালোচকেরা বলেন, সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (withering away of the state) সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল দেশে রাষ্ট্রের অবসান ঘটেনি, বরং সেখানে রাষ্ট্র অধিকতর শক্তিশালী ও কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠছে। এর উত্তরে লেনিনকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অবসান ঘটতে পারে না।

সর্বোপরি সমালোচকের আশঙ্কা, মার্কস নির্দেশিত সংঘর্ষ, হিংসা ও বিপ্লবের ভেতর দিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে তা সুস্থ, শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে না। এর উত্তরে বলা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হবার কোন কারণ ঘটেনি।

মার্কসের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও মার্কসীয় দর্শনের গুরুত্ব ও প্রভাব কমেনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক লাস্কি যথার্থই বলেছেন; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা চলছে সেখানেই কার্ল মার্কসের বাণী মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে এবং মানুষ তাঁকে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে বন্দনা করছে (In every country of the world where men have set themselves to the task of social improvement, Marx has been always the source of inspiration and prophecy)।

সাত : শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব (Theory of Class Struggle)

মার্কস সমাজে শ্রেণীর উৎপত্তি, শ্রেণীর চরিত্র এবং শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করে মার্কস দেখান যে, সমাজ ব্যবস্থার আদি স্তরে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না—উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি বিশেষ স্তরে ঐতিহাসিক কারণে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যাদের ভিন্ন অবস্থান, উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে যাদের ভিন্ন সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠনে যাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং সামাজিক সম্পদে যাদের ভিন্ন অধিকার এরূপ গোষ্ঠীগুলোকে শ্রেণী বলে। যখন আর্থিক ব্যবস্থায় একটি গোষ্ঠী শ্রম দান করে এবং অন্য গোষ্ঠী সেই শ্রমের অংশ আত্মসাৎ করে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং ঐ গোষ্ঠীগুলোকে শ্রেণী বলে।

শ্রেণী কি ?

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকার অর্থ হ'ল একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শ্রমকে আত্মসাৎ করা এবং এর ফলে এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মনে করা যাক্ একজন ব্যক্তির শ্রমে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা বাজারে বিক্রি করে দু'শ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু যিনি শ্রমদান করলেন তাকে শ্রমের মূল্য (মাইনে) বাবদ পঁচিশ টাকা দেওয়া হ'ল। বাকী এক'শ পঁচাত্তর টাকা উৎপাদনের উপকরণের যিনি মালিক তিনি আত্মসাৎ করেন মুনাফা হিসেবে। অর্থাৎ ঐ শ্রমিকের এক'শ পঁচাত্তর টাকার শ্রম অন্য একজন আত্মসাৎ করলেন। ঐ দুজন ব্যক্তির দুটি শ্রেণীতে অবস্থান এবং এদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, তাই এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধ্য।

মার্কস দেখিয়েছেন যে প্রাক্‌সামাজিক যুগে অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করার ব্যাপার ছিল না, তাই সে যুগে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বিশেষ স্তরে শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের অর্থ হ'ল শ্রেণীগুলোর মধ্যে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি। মার্কস দেখান যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণীগুলোর সম্পর্ক যদি পরস্পরবিরোধী

হয়, তবে অনিবার্যভাবেই তাদের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটবে। এবং শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে উঠবে—তা কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে নির্ভর করবে না। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের লেখা *Communist Manifesto* গ্রন্থে বলেছেন, *The history of all hitherto existing society is the history of class struggle.* অর্থাৎ, আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গিয়েছে, তাদের সকলেরই ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। এখানে প্রাচীন সাম্যবাদী ব্যবস্থা ছাড়া পরবর্তী ব্যবস্থাগুলোকে সমাজ হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলস্-এর এই উক্তি দাস-সমাজ এবং তার পরবর্তী সমাজগুলো সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের একটা চালিকাশক্তি হিসেবে মার্কসবাদ শ্রেণীসংগ্রামের একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছে।

শ্রেণী দ্বন্দ্বের অনিবার্যতা

দাস সমাজে একদিকে ক্রীতদাস, অন্যদিকে ক্রীতদাসের মালিক—দুটো শ্রেণী ছিল। দাসেরা উৎপাদন কাজে শ্রমদান করত এবং দাসের মালিকেরা ঐ শ্রম শোষণ করে উৎপাদনের উপকরণের মালিক হয়। দাস সমাজে এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের ফলে শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকে। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে একদিকে ছিল ভূমিদাস শ্রেণী, অন্যদিকে সামন্তশ্রেণী। ভূমিদাসদের শ্রম আত্মসাৎ করে সামন্তপ্রভুরা নিজেদের সম্পদকে বৃদ্ধি করে। এই দুই পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর অবস্থানের জন্যে ঐ সমাজেও শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত ছিল। বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের বিলোপ ঘটেনি, বরং তা আরও তীব্র হয়েছে। একদিকে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্যদিকে উৎপাদনের উপকরণের মালিক বা বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমকে আত্মসাৎ করেই বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চলে।

বিভিন্ন সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব

উপরোক্ত শ্রেণী সংগ্রামগুলো হ'ল আর্থনীতিক শ্রেণীসংগ্রাম। এছাড়াও আছে বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হ'ল রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম। রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে—গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপকরণকে সামাজিক মালিকানায় আনা হয়। এখানে থাকে না শ্রমের আত্মসাৎ। ফলে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটে। গড়ে ওঠে শ্রেণীহীন সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রেণীগত সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, উৎপাদনের উপকরণগুলো সামাজিক মালিকানার আসে এবং শোষণের অবসান ঘটে।

সমাজবিপ্লবের পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে—শুরু হয় রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম। পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে শাসক ও শোষক শ্রেণী চেষ্টা চালায়, অন্যদিকে উৎপাদিকাশক্তি এগিয়ে যায়। উৎপাদিকাশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কে অসম বিকাশের ফলে এক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটায় এবং নতুন উৎপাদন সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করে। তখন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে আর কোন বাধা থাকে না।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা সমাজে শ্রেণীগত অবস্থানকে স্বীকার করলেও তাঁরা শ্রেণীগত দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেন না। তারা শ্রেণী সমঝোতা এবং জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে তুলে ধরেন। এঁদের মতে সমাজ জীবনে শ্রেণীসংগ্রামের কোন বিষয়গত ভিত্তি নেই। তাই তাঁরা সমাজে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বকে নিন্দা করেছেন। এঁরা আরও বলেন যে, মার্কস সমাজে স্বার্থের বিভিন্নতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমালোচকদের অভিযোগ, মার্কস ইতিহাসে শুধু শ্রেণীসংগ্রামই দেখেছেন—কিন্তু এর পাশাপাশি শ্রেণী সহযোগিতার ঘটনাকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই সমালোচনা ঠিক নয়। মার্কস ইতিহাস বিশ্লেষণ করে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব, উৎপাদন ব্যবস্থায় এদের বিভিন্ন অবস্থান, এদের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের অস্তিত্ব এবং একশ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শোষণ প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এবং ঐ প্রেক্ষাপটে

মূল্যায়ন

শ্রেণী সংগ্রামের ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যা বলেছেন তা বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই অত্যাচারী শোষকের সঙ্গে অত্যাচারিত শোষিতের সমঝোতা এবং সহযোগিতার কাল্পনিক কাহিনী তাঁর লেখার স্থান পায়নি।

আট : বিপ্লবের তত্ত্ব (Theory of Revolution)

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, আকস্মিক এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে কোন সরকারের পরিবর্তনকে বিপ্লব বলে। কিন্তু বিপ্লবের এই সংজ্ঞা ঠিক নয়। প্রথমত, এই সংজ্ঞায় বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। যেমন, ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক-বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটে—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, ১৯৭৩ সালে চিলিতে সালভাদর আলিন্দকে হত্যা করে সেখানে ফ্যাসীবাদী সরকার গঠিত হয়। প্রথমটি বিপ্লব এবং দ্বিতীয়টি প্রতিবিপ্লব। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের বুর্জোয়া সংজ্ঞায় সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ায় সামাজিক-আর্থনীতিক মৌলিক পরিবর্তনের ধারাকে তুলে ধরা হয়নি। মার্কসবাদ মনে করে, **সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ায় শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন এনে সমাজ প্রগতির মূল উৎস উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করাকে বলে বিপ্লব।** বিপ্লব হ'ল পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক ধ্বংস করে এক নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তুলে গুণগত পরিবর্তন আনা। বিপ্লবের ফলে পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে পুরানো আইন, মতাদর্শ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবসান ঘটে, গঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

বিপ্লবের সংজ্ঞা

মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্যতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে বলেই তাঁরা পুঁজিবাদের ধ্বংস যে অনিবার্য সে কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ এঁরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে দেখেছিলেন পুঁজিবাদী সংকটের এক নির্দিষ্ট পরিণতি হিসেবে।

বিপ্লবের অনিবার্যতা

মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত হিসেবে এর বিষয়গত এবং বিষয়ীগত উপাদানের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পুঁজিবাদের সংকটের ফলে বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না। শ্রমিক শ্রেণীকে সচেতনভাবে বিপ্লব সংগঠিত করতে হয়। তবে বিপ্লবের বিষয়গত এবং বিষয়ীগত শর্ত পালিত হলে তবেই বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে।

লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত এবং বিষয়ীগত শর্তকে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিকায় বিশদভাবে বিচার করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত শর্তগুলো হল : ১. পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদের ভিতকে দুর্বল করে। ফলে শাসক শ্রেণীর পক্ষে আর পুরানো কায়দায় শাসন চালান সম্ভব হয় না। সমাজের ওপরতলায় গভীর সংকট দেখা যায়। ২. শোষিত শ্রেণীর দুঃখ, যন্ত্রণা এবং বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করে এবং ৩. শোষিত শ্রেণী মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হয়।

বিপ্লবের বিষয়গত শর্ত

বিপ্লবের সাফল্যের জন্য এর বিষয়ীগত শর্তগুলো পালিত হওয়া প্রয়োজন। বিষয়ীগত শর্তগুলো হ'ল : ১. শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার ; ২. বিপ্লবে সামিল হবার জন্য গণশক্তির বিকাশ ; ৩. জনগণের সংগ্রাম ও বিপ্লবে নেতৃত্বদানের উপযোগী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব। উপরোক্ত বিষয়গত এবং বিষয়ীগত শর্ত প্রতিপালিত হলে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত বলে মনে করা যেতে পারে।

বিষয়ীগত শর্ত

বিপ্লব সহিংস পথে হবে না শান্তিপূর্ণ পথে হবে সে সম্পর্কে কোন যান্ত্রিক ফরমুলা নেই। বিপ্লব কোন্ পথে হবে তা একান্তভাবেই শাসক শ্রেণীর ওপরে নির্ভর করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছায় কখনও রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করে না। বরং তারা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে বিপ্লবী শক্তিকে আঘাত হানে এবং তাকে দমন করার চেষ্টা করে। বিপ্লবী শক্তিকেই বলপ্রয়োগ করে তাকে প্রতিরোধ করে বিপ্লবকে রক্ষা করতে হয়। সুতরাং বিপ্লব সহিংস হবে, কি হবে না, তা নির্ভর করে শাসক শ্রেণীর মতিগতির ওপরে। শ্রমিকশ্রেণী বিনা প্রয়োজনে একবিন্দু রক্তও খরচ করতে চায় না। শ্রমিকের রক্তপাত তাদের কাছে কখনও কাম্য হতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লবকে আপাত দৃষ্টিতে ধ্বংসাত্মক ঘটনা বলে মনে হলেও বিপ্লব হ'ল একটা সৃষ্টিশীল সুখী জীবনের অঙ্গীকার। সুতরাং শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবের জন্য শ্রমিকের রক্ত উৎসর্গ করে কার সুখী জীবন সৃষ্টি করবে?

সহিংস না, অহিংস

মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্বকে অনেকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, বিপ্লব হ'ল সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন, এটা হল হিংসাত্মক ও জবরদস্তিমূলক কাজ। আবার কেউ কেউ বলেন, সাংবিধানিক উপায়ে বিধিবদ্ধ সরকারকে পরিবর্তন করা অগণতান্ত্রিক কাজ। আবার বিপ্লবের ক্ষয়ক্ষতির দিকটি তুলে ধরে অনেকে বিপ্লবের প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। এঁদের মতে বিপ্লবের মূল্য বড় বেশী। তাই অনেক সমালোচক বিপ্লবকে বাদ দিয়ে সংস্কারের পথে পরিবর্তন আনার কথা বলেন। অনেকে আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিপ্লব এনে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। সমালোচকদের ঐ সকল বক্তব্যের পেছনে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চিন্তাধারা কাজ করছে বলে তাঁরা বিভিন্নভাবে বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্বকে আক্রমণ করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যতদিন কায়েম থাকবে, সমাজে যতদিন শোষণ ও অসাম্য থাকবে—ততদিন সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্বের প্রয়োজন স্বীকৃত হতে বাধ্য।

সমালোচনা

নয়ঃ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ (Democratic Socialism)

মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বা Democratic Socialism-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু উপাদানের কৃত্রিম সমন্বয় সাধন করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থনীতিক ক্ষমতার মিশ্রণ এবং সমন্বয় করার প্রয়াস থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উদ্ভব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শ এবং লেসেফেয়ার অর্থনীতির ফলশ্রুতিতে একদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রসারিত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে জনগণের দুঃখ ও দারিদ্র্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কার্লাইলকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ঐ সময়ে জনগণের ব্যাপক অংশ আহার, বাসস্থান এবং বস্ত্রহীনভাবে জীবন যাপন করার সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করতো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক কল্যাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। এই সময়ে একদল তাত্ত্বিক ঘোষণা করেন যে, অ্যাডাম স্মিথ বা রিকার্ডোর আর্থনীতিক বিধির দ্বারা সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবার এঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকেও কাম্য বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে ঐ সব তাত্ত্বিকেরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে আর্থিক সমতা, শ্রমিকের কাজের অবস্থার উন্নতি, উন্নয়নমূলক এবং ইতিবাচক সামাজিক কর্মসূচী ইত্যাদিকে যুক্ত করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন।

উৎপত্তি

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উৎপত্তি ব্যাপারে জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির (Social Democratic Party) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। **গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে** জার্মান পণ্ডিত **এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন** (Edward Burnstein)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও দুজন জার্মান চিন্তাবিদ্, রডবার্টাস (J. K. Rodbertus) এবং ল্যাসেল (F. Lassale)-এর নাম

বার্নস্টাইন

উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁরা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র থেকে যাত্রা শুরু করে শোধনবাদী পথ ধরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে এসে উপনীত হন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণের ধ্যান-ধারণাকে যুক্ত করে এঁরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নামে পরিচিত তত্ত্বটিকে তুলে ধরেন।

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ব্যাপারে ইংলণ্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী (Fabian socialists) গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীরা একাধারে জন স্টুয়ার্ট মিল এবং অন্যদিকে প্রুঁধো ও কার্ল মার্কসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এঁদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন এবং ঐ সমন্বয়ের চেষ্টার ফলশ্রুতি হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দর্শন। সিডনি ওয়েব, এইচ. জি. ওয়েলস, গ্রাহাম ওয়ালাশ, বার্নাড 'শ প্রমুখেরা ঐ মতবাদ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এঁরা শ্রেণী সংগ্রামের পথ এবং বৈপ্লবিক পদ্ধতি বর্জন করে শ্রেণী সমন্বয়ের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আত্মপ্রকাশের পেছনে ফেবিয়ান গোষ্ঠীর অবদান ও প্রভাব অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কি ?

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল লক্ষ্য হ'ল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। এঁরা মনে করেন যে, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রাম বা বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। এঁরা বল প্রয়োগের পরিবর্তে বোঝাপড়া এবং অনুমোদনের মাধ্যমে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক উপায়ে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান। এঁরা মনে করেন, শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের দ্বারা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং তাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন অবস্থাতেই বলপ্রয়োগের দ্বারা সমাজের পরিবর্তন কাম্য নয়। এঁরা নিয়মতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধিকার থেকে মুক্ত করে তাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়োগ করতে চান। গণতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণকে সুনিশ্চিত করা, শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করার ব্যাপারে এঁরা আগ্রহী। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ শ্রেণীর শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার হিসেবে মনে করে না এবং স্বাভাবিকভাবেই এরা রাষ্ট্রের অবলুপ্তির (withering away of the state) তত্ত্বকে স্বীকার করে না। এক কথায়, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বুর্জোয়া স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক সমতার একটা মিশ্রিত রূপ—গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

মতবাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ

জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল মার্কসবাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে বর্জন করে বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রচার করে—যা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নামে পরিচিত। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিকদের চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মুখ্য প্রবক্তা বার্ণষ্টাইন প্রচার করেন যে, বিপ্লবের পথ বর্জন করেও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী যে কোন দল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বার্ণষ্টাইন আরও মনে করেন যে, আর্থিক সংকটের ফলে ধনতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়বে বলে মার্কস যে বক্তব্য রেখেছেন, তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং বিপ্লবের পথ বর্জন করে নিয়মতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের কোন চরম ও চূড়ান্ত লক্ষ্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করা সম্ভব এবং শ্রমজীবী মানুষের উন্নতি সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

রড বার্টাস্ কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (utopian socialism) এবং জার্মান ভাববাদের মধ্যে সমন্বয় করে প্রচার করেন যে, সমাজ হল শ্রমবিভাজনের ওপরে ভিত্তি করে গঠিত একটি জৈবিক প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু এখানে স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার না করে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন—যা সামাজিক প্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ল্যাসেল মনে করেন, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, সমষ্টির মঙ্গল সাধনই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী গ্রহণের দ্বারাই ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। ল্যাসেল শ্রমিকদের হাতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিৎ বলে মনে করেন—কিন্তু ঐ অধিকার হিংসার পথে নয়, গণতান্ত্রিক পথে আদায় করতে হবে।

ব্রিটেনের শ্রমিক দলও গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সমর্থক। এই দল মনে করে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান না ঘটিয়েও শিল্পের ব্যাপক জাতীয়করণ, জাতীয় আয়ের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, শ্রমিকদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন এবং সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

১৯৫৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আবাদী সম্মেলনে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার অংগীকার করা হয়। ঐ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজবাদেরই আর একটা রূপ। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকবে—পাশাপাশি কিছু কিছু সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। শিল্প ও বাণিজ্যের ওপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে বাড়ানো হবে এবং কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক নীতি ও আইন গৃহীত হবে। সুতরাং বলা যায়, পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে জনকল্যাণমূলক কিছু কিছু সংস্কার গ্রহণ করার ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলে মনে করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের বৈশিষ্ট্য ও মৌল নীতি

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে বৈশিষ্ট্য তথা নীতিগুলোকে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

প্রথমত, এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়, বরং বলা যায় গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র পূর্ণ হতে পারে না এবং সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করে না (Democracy is not complete without socialism)। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা তাই গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের প্রাণ বলে মনে করেন, গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য বলে মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শ্রেণী সংগ্রাম এবং বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে এবং থাকবে। শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংগ্রামের পরিবর্তে সমন্বয় এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনকে এই তত্ত্ব স্বীকার করে না।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তন ধারায় বিশ্বাসী। এই তত্ত্ব বিপ্লবের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পন্থায় ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মনে করে।

চতুর্থত, এই তত্ত্বের প্রবক্তারা, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণীহীন সমাজ গঠন এবং সর্বহারার একনায়কত্বে বিশ্বাসী নন। এঁরা মনে করেন বিভিন্ন শ্রেণীর সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণীশাসন এবং শোষণের হাতিয়ার হিসেবে মনে করে না। বরং রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে দেখে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রাষ্ট্রের ইতিবাচক কার্যাবলীর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে। স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রাষ্ট্রের অবলুপ্তিকে স্বীকার করে না।

ষষ্ঠত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা মনে করেন, যে-কোন সমাজব্যবস্থাতেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় যদি সেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত

হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা বিশেষ ধরনের আর্থিক ভিত (Base) গঠন করা প্রয়োজন—সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন নন। কিছু কিছু শিল্পের জাতীয়করণ বা সামাজিকীকরণ করলেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে বলে এরা ধারণা পোষণ করেন।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পার্থক্য

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর গভীর পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদের মত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মনে করে না যে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শাসন এবং শোষণের হাতিয়ার। মার্কসবাদ যেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (সহিংস বা অহিংস), শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য মনে করে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ তা মনে করে না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সমন্বয়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবর্তন, শ্রেণীহীন সমাজের পরিবর্তে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং সর্বহারার নায়কত্বের পরিবর্তে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। মার্কসবাদ বৈপ্লবিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। রাষ্ট্র সম্পর্কেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ভিন্ন ধারণা পোষণ করে—রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সম্পর্কীয় মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। মার্কসবাদ বিশ্বাস করে ধনতন্ত্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এই বিশ্বাসের অংশীদার নয়। সর্বোপরি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন—মার্কসীয় এই নীতিকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ স্বীকার করে না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা মনে করেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্ত হ'ল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা। তাঁদের মতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্গে 'সমাজবাদ' শব্দটি যুক্ত থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা মার্কসবাদের ঘোরতর বিরোধী। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের পার্থক্য খুব স্পষ্ট। এই পার্থক্য পরিমাণগত নয়, এই পার্থক্য মৌলিক পার্থক্য।

সমালোচনা

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্বটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে যদি বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বোঝায়, তবে এই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার থেকে শুরু করে উৎপাদন, বণ্টন এবং অন্যান্য ব্যাপারে চরম অধিকার থাকে। ঐ অধিকারকে স্বীকার করে এবং বজায় রেখে আর যাই হোক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অন্যদিকে ঐ অধিকারগুলোর উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমন্বয় সম্ভব নয়। এই অবাস্তবতার জন্যই অনেকে পরিহাস করে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে 'সোনার পাথরবাটি' বলেন।

দ্বিতীয়ত, তাই বার্ণস (E. M. Burns) বলেছেন যে, পৃথকভাবে সমাজতন্ত্রে বা গণতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভব, কিন্তু একইসঙ্গে দুটি আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব নয় (The name of this movement is almost a contradiction in terms. It is possible to achieve either democracy or socialism separately but difficult to have both in combination)।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। সমাজের আর্থিক কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন না করে সমাজবাদের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। কিন্তু সমাজে যারা উৎপাদনের উপাদান থেকে শুরু করে সকল সুযোগ-সুবিধার মালিক তারা কিছুতেই স্বেচ্ছায় সমাজের আর্থিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন মেনে নেবেন না। সুতরাং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কোথায় ? তাই কোথাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা সফল হয়নি।

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকার অর্থ হ'ল পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্ব। পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে সহযোগিতার অর্থ হ'ল সমাজে শোষণ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখা। যেমন, রবার্ট ওয়েন শ্রমিক ও মালিককে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানান। সুতরাং সমালোচকেরা বলেন যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা শ্রেণী সহযোগিতা ও শ্রেণী সমন্বয়ের নামে শোষণব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখতে চেয়েছিলেন। শ্রেণী সহযোগিতার তত্ত্ব আর্থিক অসাম্য ও অবিচারকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

পঞ্চমত, সমালোচকেরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তাদের 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। শ্রমিকদের স্বার্থে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন, কিছু কিছু শিল্পের জাতীয়করণ এবং কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে বলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রবক্তারা মনে করেন। কিন্তু সমাজের মৌল আর্থিক কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর না করে নিছক সংস্কারের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা যায় না। সংস্কারের পথ যত সুন্দর ও প্রশস্ত হোক না কেন ঐ পথ কখনও সমাজতন্ত্রে পেঁছে দিতে পারে না।

ষষ্ঠত, সমালোচকদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ হ'ল পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের এক কৃত্রিম এবং গোঁজামিল সমন্বয়। এটা হ'ল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্য হল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়। সংস্কার ও গোঁজামিলের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রশ্নমালা

1. উদারনীতি বা উদারনৈতিক মতবাদটি আলোচনা কর। এই মতবাদটির বিরুদ্ধে কি কি সমালোচনা করা যেতে পারে ? (এক দেখ)
2. উদারনীতির বৈশিষ্ট্য ও মৌল সূত্র আলোচনা কর (এক দেখ)
3. উদারনীতি কাকে বলে ? উদারনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলেচনা কর। (এক দেখ)
4. মার্কসবাদ কাকে বলে ? মার্কসবাদের উৎস আলোচনা কর। (দুই দেখ)
5. মার্কসবাদ কাকে বলে ? মার্কসবাদের বিকাশে কার কার অবদান রয়েছে ? মার্কসবাদের প্রধান সূত্রগুলো কি কি ? (দুই দেখ)
6. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আলোচনা কর। (তিন দেখ)
7. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কাকে বলে ? তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। (চার দেখ)
8. উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব সম্পর্কে টীকা লিখ। (পাঁচ দেখ)
9. মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনা কর। (ছয় দেখ)
11. রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী বক্তব্য আলোচনা কর। এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলো কি ? (ছয় দেখ)
12. মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনা করে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সম্পর্কে টীকা লিখ (ছয় দেখ)
13. মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। (সাত দেখ)
14. মার্কসীয় বিপ্লবের তত্ত্ব আলোচনা কর। (আট দেখ)
15. বিপ্লবের সংজ্ঞা দাও। বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত শর্তগুলো কি ? বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য কর। (আট দেখ)

15. মার্কসবাদের সংজ্ঞা দাও এবং মার্কসবাদের যে কোন একটি তত্ত্ব আলোচনা কর। (দুই থেকে আট দেখ)

16. টীকা লিখ ঃ

(ক) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (খ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (গ) রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (ঘ) মার্কসবাদের উৎস।

17. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য ও মৌল নীতিগুলো কি? (নয় দেখ)

18. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদের ত্রুটিগুলো কি? (নয় দেখ)

19. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। (নয় দেখ)

20. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কাকে বলে ব্যাখ্যা কর। এই মতবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের তুলনা কর। (নয় দেখ)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(ক) বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্ দাও ঃ

1. উদারনীতির একজন প্রবক্তা হলেন (হেগেল, মার্কস, বেন্থাম)।
2. (ভাববাদী, হিতবাদী, বস্তুবাদী) দার্শনিকেরা উদারনীতির সমর্থক।
3. উদারনীতির নির্যাস হল (ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্রকর্তৃত্ব)
4. ব্যক্তিস্বাধীনতা (গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, উদারনীতি, মার্কসবাদ)-এর মূল উপাদান।
5. (উদারনীতি, ভাববাদ) সকল প্রকার কর্তৃত্ব বিরোধী।
6. ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সংরক্ষণ ও প্রসারিত করে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সুনিশ্চিত করা যায়—একথা বলে (মার্কসবাদ, উদারনীতি)।
7. উদারনীতি রাষ্ট্র কর্তৃত্বকে (সীমিত, অবাধ) রাখতে চায়।
8. (উদারনীতি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ) মানুষের সহজাত মহত্ত্ব এবং মানবতাবাদে বিশ্বাসী।
9. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেন (জে. এস. মিল, কার্ল মার্কস, বার্নস্টাইন)।
10. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তত্ত্বের আত্মপ্রকাশের পেছনে (আরিস্টটল, হেগেল, ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীদের) অবদান রয়েছে।
11. (মার্কসবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ) শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করে না।
12. (মার্কসবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের) মূল বক্তব্য হ'ল হিংসার পথে নয়, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
13. বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব—একথা বলে (মার্কসবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ)।
14. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণী শাসনের যন্ত্র (মনে করে, মনে করে না)।
15. মার্কসবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজের পার্থক্য (মৌলিক, পরিমাণগত)
16. গণতন্ত্র ছাড়া সমাজতন্ত্র হয় না—একথা বলে (উদারনীতি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ)
17. মার্কসবাদের অন্যতম উৎস হ'ল (হিতবাদ, জার্মান ভাববাদ, উদারনীতি)।
18. মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মার্কসের সহযোগী ছিলেন (এঙ্গেলস, হেগেল, স্তালিন)।
19. মার্কসবাদী তত্ত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে (বেন্থাম, বার্নস্টাইন, লেনিন)-এর অবদান সর্বাধিক।
20. (কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ) মার্কসবাদের অন্যতম উৎস।
21. উৎপাদিকা শক্তি = মানুষের শ্রম + প্রকৃতিদত্ত সম্পদ + (উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদনের হাতিয়ার)
22. উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি উপাদান হল (উৎপাদন সম্পর্ক, সামাজিক সম্পদ) এবং উৎপাদিকা শক্তি।
23. মার্কসবাদের ভিত্তি হ'ল (হিতবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, উদারনৈতিক মতবাদ)।
24. রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কথা বলে (উদারনীতি, মার্কসবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ)।
25. রাষ্ট্র হল (ভিত্তি, উপরিসৌধ)।
26. আর্থিক ব্যবস্থা হল (ভিত্তি, উপরিসৌধ)।
27. প্রচলিত সমাজগুলোর ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস—একথা বলেছেন (মার্কস, লেনিন, স্তালিন)

28. রাষ্ট্র হল শোষণের যন্ত্র—একথা বলেছেন (হেগেল, বেন্থাম, মার্কস)।
29. (মার্কসবাদ, উদারনীতি) মনে করে রাষ্ট্র হ'ল বুর্জোয়া শ্রেণীর সব কাজকর্ম দেখাশোনার একটি কার্যকর কমিটি।
30. রাষ্ট্র হল পশুশক্তির প্রকাশ—একথা বলে (মার্কসবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ)
31. 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তত্ত্বের প্রবর্তক (হেগেল, মার্কস, মাও-সে-তুং)
32. শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শ্রমের আত্মসাৎ ঘটে—একথা বলে (গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, মার্কসবাদ)
33. বিপ্লব হ'ল (সমাজের গুণগত পরিবর্তন, নিছক শাসক পরিবর্তন)
34. বিপ্লবের সাফল্যের জন্য (বিষয়গত এবং বিষয়ীগত, ভাবগত, গণতান্ত্রিক) শর্ত প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন।
35. বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হবে, না সহিংস হবে তা নির্ভর করে (শাসকশ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীর) ওপরে।
36. বিপ্লব থেকে প্রতিবিপ্লব (ভিন্ন, অভিন্ন)।
37. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি (সৃজনশীল, শুধুই ধ্বংসাত্মক, ধ্বংসের পরে সৃজনশীল) কর্মযজ্ঞ।
38. হেগেলের দ্বন্দ্ব (বস্তুজগৎ, ভাবজগৎ) বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়।
39. মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে (বস্তুজগৎ, ভাবজগৎ) বিশ্লেষণে ব্যবহার করেন।
40. (হেগেল, মার্কস) মনে করেন যে ভাবজগৎ হল বস্তুজগতের প্রতিফলন।
41. (মার্কসবাদ, ভাববাদ, হিতবাদ) মনে করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য।

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

1. উদারনীতির তিনজন প্রবক্তার নাম লিখ।
2. উদারনীতি যে সকল স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে চায় সেগুলোর নাম লিখ।
3. মার্কসবাদের মুখ্য প্রবক্তা কে কে?
4. মার্কসবাদের বিকাশ ও সৃজনশীল প্রয়োগে কার অবদান বেশী?
5. মার্কসবাদের উৎসগুলো কি কি?
6. দুজন বিখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদের নাম লিখ।
7. কাল্পনিক সমাজবাদের দুজন প্রবক্তার নাম লিখ।
8. তিনজন ভাববাদী দার্শনিকের নাম লিখ।
9. মার্কসবাদের তিনটি প্রধান তত্ত্বের নাম লিখ।
10. কে প্রথম দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রকাশ করেন?
11. উৎপাদিকা শক্তি কাকে বলে?
12. উৎপাদন সম্পর্ক কাকে বলে?
13. শ্রেণী কাকে বলে?
14. বিপ্লবের বিষয়গত শর্ত কি?
15. বিপ্লবের বিষয়ীগত শর্ত কি?
16. বিপ্লবের সংজ্ঞা দাও।
17. উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব কাকে বলে?
18. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তিনজন প্রবক্তার নাম লিখ।
19. গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কাকে বলে?
20. গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
21. মার্কসবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দুটি পার্থক্য দেখাও।

উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

দ্বিতীয় পত্র

Constitutions are codes of rules which aspire to regulate the allocation of functions, powers and duties among the various agencies and officers of Government and define the relationship between these and the Public.

—S. E. Finer

১

সংবিধান
(Constitution)

মানুষের জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজন এবং চাহিদা মেটাবার জন্যে সমাজজীবনে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই স্বতন্ত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই যাতে নিজ নিজ আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে তার জন্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই কিছু কিছু নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করতে হয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে বিধিবদ্ধ ঐ সকল নিয়মাবলীকেই সেই প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। রাষ্ট্রও একটি প্রতিষ্ঠান। অন্য পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মত রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যেও বিভিন্ন নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। যেহেতু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র অনেক বৃহৎ তাই এর কার্যাবলী বহুমুখী, জটিল ও ব্যাপক। স্বাভাবিক কারণেই তাই রাষ্ট্রের সংবিধান ব্যাপক ও জটিল হতে বাধ্য।

এক : সংবিধান কাকে বলে? (What is a Constitution ?)

প্রতিটি সংস্থার সংগঠনগতরূপ যা থেকে জানা যায় তাকে সে সংস্থার সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। কোন রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি ও তার স্বরূপ যা থেকে জানা যায়, তাকে সে রাষ্ট্রের সংবিধান

বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের গঠন কিরূপ হবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হবে কিভাবে, সরকারের কাজকর্ম পরিচালিত কিভাবে হবে, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য কি হবে, সরকারের সঙ্গে নাগরিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক কি হবে—এ সকল বিষয়ে প্রতিটি রাষ্ট্রে কতকগুলো নিয়মকানুন থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার ঐ নিয়মকানুনগুলোকে বলে রাষ্ট্রের সংবিধান বা শাসনতন্ত্র (constitution)। **লর্ড ব্রাইসের মতে, যে আইন ও প্রথার ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রের জীবন বয়ে চলে তাকে সংবিধান বলে** (The constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on)। **ডাইসী মনে করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে নিয়মকানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যবহার ও বণ্টনের রীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাই সংবিধান। হুইয়ার বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে এবং যেসব বিভাগ দ্বারা শাসনক্ষমতা পরিচালিত হয় তাদের নিয়ন্ত্রিত করার নিয়মাবলীকে সংবিধান বলে** (The Constitution is the body of rules which regulates the ends for which and the organ through which Government power is exercised)। এস. ই. ফাইনার মনে করেন যে, সংবিধান হ'ল কতকগুলো বিধিবদ্ধ আইন—যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের ভেতর কার্যাবলী, ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা পোষণ করে এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে।

সংবিধান কাকে বলে

মনে রাখতে হবে, সংবিধান একটি আইনগত ধারণা এবং এর আইনগত একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এজন্য সংবিধানের পবিত্রতা (sanctity) ও অলঙ্ঘনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সংবিধান লয়, ক্ষয় বা পরিবর্তনের উর্ধ্বে। বস্তুত, যুগের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে সংবিধানকেও পরিবর্তন করতে হয়। সেজন্য বলা হয়, সংবিধান তৈয়ারী করা যায় না—গড়ে ওঠে (Constitutions grow and are not made)।

নিছক আইনগত দৃষ্টিকোণ ছাড়াও রাষ্ট্রের আর্থিক বিন্যাস ও শ্রেণীস্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের সংজ্ঞা উপস্থিত করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেকে মনে করেন যে, দেশের আর্থিক কাঠামো (base) এবং উপরি-কাঠামোর (super-structure) পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সংবিধান গড়ে ওঠে। কোন সমাজে আর্থিক ক্ষমতা—অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন এবং মুনাফা সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। আর্থিক ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্যে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতারও কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন হয়। তাই যে কোন সমাজের সংবিধান সেখানকার আর্থিক দিক থেকে প্রাধান্যকারী শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান্যকেই সুনিশ্চিত করে। অর্থাৎ মনে করা হয় যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্য দিয়ে সেই দেশের শাসক শ্রেণীর শ্রেণী-স্বার্থ প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হল কোন সমাজব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরের শ্রেণীর-সম্পর্ক তথা শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিফলন।

সংবিধান শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন

দুই : সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions)

সাধারণভাবে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : (১) **লিখিত এবং অলিখিত সংবিধান** (Written & Unwritten Constitutions) এবং (২) **নমনীয় ও অনমনীয় সংবিধান** (Rigid & Flexible Constitutions)। এবার উভয়শ্রেণীর সংবিধানের সংজ্ঞা এবং দোষ-গুণ আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল।

১. লিখিত ও অলিখিত সংবিধান

রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মৌল নীতিগুলো এক বা একাধিক দলিলে যখন লিপিবদ্ধ থাকে তখন তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধানের উদাহরণ হল ভারত, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের সংবিধান। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, কোন দেশের সংবিধান পুরোপুরি লিখিত (বা পুরোপুরি অলিখিত) হয় না। ভারতের সংবিধান লিখিত বলার অর্থ এই নয় যে, ভারতের শাসনব্যবস্থায় অলিখিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বা প্রথার কোন ভূমিকা নেই। বস্তুত কোন সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত হতে পারে না—অনেক সাংবিধানিক বিষয় আছে যা প্রচলিত রীতিনীতি এবং নজিরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কোন সংবিধানকে লিখিত বলার অর্থ হল এই যে, সংবিধানের মৌল নীতিগুলো একটি সাংবিধানিক দলিলে বিধিবদ্ধ ও সংকলিত (codified) করা হয়েছে—যদিও সাংবিধানিক কাজকর্ম চালাতে গিয়ে কিছু কিছু অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতি গড়ে উঠতে পারে।

লিখিত সংবিধান কাকে বলে ?

লিখিত সংবিধানের প্রথম এবং প্রধান গুণ হল এই যে, ইহা সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। লিখিত সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক সকল বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে বলে শাসন পরিচালনায় সুবিধা হয়, দেশের শাসন কাজ সহজ ও সরল হয়। সরকারের কাজকর্ম কিভাবে চলছে বা চলা উচিত জনসাধারণও তা বুঝতে পারে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে যে, লিখিত সংবিধানের মধ্যেও সব কিছু সম্পূর্ণভাবে লেখা থাকে না, কাজকর্ম চালাতে গিয়ে কিছু কিছু অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতি গড়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়ত, আলাপ-আলোচনা এবং বিবেচনার মধ্য দিয়ে লিখিত সংবিধান প্রবর্তিত হয় বলে, লিখিত সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে এবং এই সংবিধান অনেক বেশী যুক্তিসম্মত ও সুস্পষ্ট হয়। তৃতীয়ত, লিখিত সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি সংবিধানেই লিখিত থাকে বলে প্রয়োজনে ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায়। চতুর্থত, লিখিত সংবিধানে জনগণের অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। তবে যে সকল দেশের সংবিধান লিখিত নয় সেই সকল দেশের জনগণ কোন অধিকার ভোগ করে না এ কথা মনে করার কারণ নেই।

লিখিত সংবিধানের গুণ

লিখিত সংবিধান ত্রুটিহীন নয়। প্রথমত, প্রচলিত রীতিনীতির উৎপত্তি হয় বাস্তব প্রয়োজন থেকে। তাই অলিখিত সংবিধানে বাস্তব প্রয়োজন থেকে উৎসারিত রীতিনীতি স্থান পায়। কিন্তু কোন বাস্তব প্রয়োজন আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য না হলে তা লিখিত সংবিধানে স্থান পায় না। ফলে অনেক সময় লিখিত সংবিধানের দ্বারা কোন একটি বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধ নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, লিখিত সংবিধান পরিবর্তনের জন্য যে পদ্ধতি বিধিবদ্ধ থাকে তা অনেক ক্ষেত্রে এত জটিল হয় যে প্রয়োজনের সময় দ্রুত সংবিধানকে সংশোধন করে কাম্য পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয় না।

দোষ

কোন দেশের সংবিধান অলিখিত হতে পারে। বহু বছর ধরে চলছে এরূপ রীতিনীতি ও প্রথার (conventions) দ্বারা ঐ সকল দেশ শাসিত হয়। প্রয়োজনে আগের নজির মেনে (precedence) শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টক্‌ভিল (Tocqueville) এ কারণে বলেছিলেন যে, ব্রিটেনে কোন সংবিধান নেই। অবশ্য ব্রিটেনের সংবিধানের সকল বিষয়বস্তুই অলিখিত নয়। বিভিন্ন লিখিত দলিল ও সনদ ব্রিটেনের শাসন পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ব্রিটেনে লিখিত দলিল বা সনদের ভূমিকা গৌণ, সর্বজনস্বীকৃত প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতির ভূমিকাই মুখ্য। সুতরাং বলা যায় যে, দেশের সংবিধান অলিখিত বলার অর্থ এই নয় যে, ঐ দেশের সাংবিধানিক সকল বিষয়বস্তুই অলিখিত। যেমন, ব্রিটেনের সংবিধানের কিছু কিছু বিষয় বিভিন্ন দলিল, আইন এবং অন্যান্য সূত্রে লিখিত আছে। তবে একটি দলিলে বিধিবদ্ধ ও সংকলিত (codified) নয় বলে এবং বেশীর ভাগ বিষয় অলিখিত প্রচলিত রীতি-নীতির (conventions) দ্বারা চালিত হয় বলে ব্রিটিশ সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়।

অলিখিত সংবিধান কাকে বলে ?

অলিখিত সংবিধানের **প্রধান গুণ** হচ্ছে এই যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের প্রয়োজন এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সংবিধানিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। **দ্বিতীয়ত**, অলিখিত সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন আনুষঙ্গিক এবং জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। তৃতীয়ত, আইন সর্বস্ব বা তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ পরিহার করে প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে অলিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে।

অলিখিত সংবিধানের গুণ

অলিখিত সংবিধানের প্রধান দোষ হল, এ ধরনের সংবিধান স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট নয়। সাংবিধানিক বিষয়বস্তু লিখিতভাবে না থাকায় সংবিধানের নির্দিষ্টতা ব্যাহত হয়। **দ্বিতীয়ত**, অলিখিত সংবিধান লিখিত সংবিধানের মত মর্যাদা ও পবিত্রতার (sanctity) অধিকারী হয় না বলে মনে করা হয়। **তৃতীয়ত**, অলিখিত সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে না—কারণ এই সংবিধান প্রবর্তনের ব্যাপারে জনগণের বা জনপ্রতিনিধিদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না।

দোষ

পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণভাবে লিখিত বা সম্পূর্ণভাবে অলিখিত সংবিধান দেখতে পাওয়া যায় না। তাই অনেকে সংবিধানকে 'লিখিত' ও 'অলিখিত' এরূপ শ্রেণীবিভাগ পছন্দ করেন না।

২. অনমনীয় ও নমনীয় সংবিধান

লর্ড ব্রাইস সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় বা **নমনীয় (Flexible)** এবং দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয় **(Rigid)** এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যে সংবিধানকে সাধারণ আইন তৈয়ারীর পদ্ধতিতে দেশের আইনসভায় অতি সহজে পরিবর্তন করা যায়, তাকে বলে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। আবার অন্যদিকে, যে সংবিধানকে সাধারণ আইন তৈরীর পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না এবং পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ও জটিল কোন পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, সেই সংবিধানকে অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

লর্ড ব্রাইসের মতে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজভাবে পরিবর্তনশীল বলে সংকটকালে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অথচ সংবিধানের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে একে সংশোধন করা যায়।[১] উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, যদি কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে অন্যান্য সাধারণ আইনের মত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নিছক অনুমোদনের দ্বারা সংবিধানকে সংশোধন করা সম্ভব, তবে ঐ সংবিধানকে আমরা সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলব। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের উদাহরণ হল ব্রিটিশ সংবিধান।

নমনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

কিন্তু আর এক শ্রেণীর সংবিধান আছে যাদের পরিবর্তন বা সংশোধন করা সহজ নয়। ঐ ধরনের সংবিধান সংশোধন করতে হলে জটিল ও বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না, একমাত্র সংবিধান নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সংশোধন করা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যদি দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করার জন্য আইন সভার উভয় কক্ষের দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন এবং তার পরে ঐ সংশোধনকে আবার তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্য দ্বারা গৃহীত (Ratified) হতে হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উল্লেখ করা যায়।

অ-নমনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল বলে একে গতিশীল ও অনির্দিষ্ট বলা হয়। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধন করা সহজসাধ্য নয় তাই একে স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট

১. They can be stretched or bent, so as to meet emergencies without breaking their framework.

—Lord Bryce.

বলে অনেকে মনে করেন। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মূল পার্থক্য নির্ণয় করে সি. এফ. স্ট্রং (Strong) বলেছেন যে, **সাধারণ আইন তৈরীর পদ্ধতিতে সংবিধানকে সংশোধিত করা যায় অথবা যায় না—সেটাই ঐ দু শ্রেণীর সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য।**[১]

এদের মধ্যে পার্থক্য

অর্থাৎ ব্রিটেনে দেখা যাবে, সাধারণ আইন যেমন পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদনের দ্বারা পাশ করা যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই সংবিধানের সংশোধন করাও সম্ভব। সংবিধান সংশোধনের ঐরূপ পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেই। তাই ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যথাক্রমে সহজ পরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ভারতের সংবিধানকে নমনীয় বা অনমনীয় বলা যায় না। ভারতের সংবিধান হ'ল নমনীয় ও অনমনীয় পদ্ধতির মিশ্রণ।

নমনীয় সংবিধানের দোষ-গুণ

নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের **প্রথম** গুণ হল এই যে, এই ধরনের সংবিধানকে প্রয়োজনের সময়ে সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলে এই সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** সংকটের সময়ে বা জরুরী অবস্থায় সংবিধানের কাঠামোকে আঘাত না করেও এই ধরনের সংশোধন দ্বারা সহজেই কাম্য পরিবর্তন সাধন করা যায়। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায়, *They can be stretched or bent so as to meet emergencies without breaking the framework.* **তৃতীয়ত,** সংবিধান নমনীয় হলে তা পরিবর্তনের জন্য সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। মার্কিন সংবিধান নমনীয় নয় বলে সেখানে বিচারালয় কর্তৃক সংবিধানের ব্যাখ্যার সাহায্যে সংবিধান পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গুণ

নমনীয় সংবিধানের কতকগুলো ত্রুটি আছে, সেগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন। **প্রথমত,** নমনীয় সংবিধানে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা যায়। এ ধরনের সংবিধান সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলে একে প্রতিনিয়তই সংশোধন করা হয়। যেমন, ভারতের সংবিধান পুরোপুরি নমনীয় নয়। তা সত্ত্বেও বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে ৫২ বার এই সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** সংবিধানের বেশী নমনীয়তা থাকলে সংবিধানের মর্যাদা ও পবিত্রতা ব্যাহত হয় এবং সংবিধান জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। **তৃতীয়ত,** সংবিধান নমনীয় হলে বিভিন্ন স্বার্থের টানাপোড়েনের ফলে তা বার বার পরিবর্তিত হয়। যখন যে দল ক্ষমতাসীন হয় সেই দল নিজেদের স্বার্থে বা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবিধানকে সংশোধন করে, আবার অন্যদল ক্ষমতাসীন হয়ে তাকে পরিবর্তন করে। **চতুর্থত,** নমনীয় সংবিধান সহজেই পরিবর্তনশীল বলে এ ধরনের সংবিধান নাগরিকদের মৌল অধিকার, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারে না।

দোষ

অনমনীয় সংবিধানের দোষ-গুণ

এবার অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

অনমনীয় সংবিধানের **প্রধান** গুণ হল এই যে, এই ধরনের সংবিধান স্থিতিশীল। অনমনীয় সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি জটিল হবার জন্য যখন তখন বা ইচ্ছেমত ঐ সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায় না। ফলে ঐ অনমনীয় সংবিধান স্থিতিশীলতার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

গুণ

দ্বিতীয়ত, অনমনীয় সংবিধানকে সহজে এবং ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না বলে এই সংবিধান জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং অধিকতর মর্যাদার অধিকারী হয়।

---

১. "The whole ground of difference here is whether the process of constitutional law making is or is not identical with the process of ordinary law making."—C. F. Strong.

তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে ইহা অধিকতর উপযোগী ; কারণ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানে ঐ ব্যবস্থাগুলোর পরিবর্তন ঘটে না।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অনমনীয় সংবিধান অপরিহার্য। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের ক্ষমতার এক্তিয়ার বাড়াতে পারে।

অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনব্যবস্থা কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নয়। এই সংবিধানের কিছু কিছু দোষ আছে।

প্রথমত, দেশের প্রয়োজনে কোন সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলেও অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এর ফলে শাসনতান্ত্রিক সংকট বা শাসনতান্ত্রিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনমনীয় সংবিধান চলতে পারে না। ফলে, সঙ্কটকালে জনসাধারণ সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা লক্ষ্য সাধনের ঝোঁক দেখা দেয়। মেকলে বলেছেন, *The great cause of revolution lies in this that while nations move onward, constitution stand still.*

তৃতীয়ত, প্রয়োজনের সময় সংবিধান সংশোধন করতে না পারার জন্য সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়াস শুরু হতে পারে।

চতুর্থত, সংবিধান খুব বেশী অনমনীয় হলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সুনিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান খুব বেশী অনমনীয় হবার জন্য সেখানে বিচারকের ব্যাখ্যার সাহায্যে সংবিধানকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন মেটাতে হয়।

নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের দোষ-ত্রুটি দূর করে **উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা উচিত**—অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অধ্যাপক লাস্কির মতে, কোন সংবিধান যেমন ব্রিটিশ সংবিধানের মত অতটা সুপরিবর্তনশীল হওয়া ভাল নয়, তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত অতটা দুষ্পরিবর্তনশীল হওয়াও উচিত নয়। তাঁর মতে, আইনসভার দু-তৃতীয়াংশের অনুমোদন পেলে তবেই সংবিধানের পরিবর্তন করা চলবে—এরূপ নীতি থাকা ভাল। স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংবিধান সংশোধিত হওয়া উচিত নয়। লাস্কির ঐ নীতিকে ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ অনেকাংশে প্রয়োগ করেছেন।

নমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানের পার্থক্য পরিমাণগত

লওয়েল (Lowell) মনে করেন যে, সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যকার পার্থক্য মূলগত বা গুণগত নয়, তা একান্তভাবেই পরিমাণগত। অর্থাৎ কোন মূলগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে এদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়নি। এদের পার্থক্য যে পরিমাণগত নয়, তা সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বিশ্লেষণের ভেতর দিয়েই প্রমাণ করা যেতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে অভিহিত করা হয় এবং আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, এখানে সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে কষ্টকর এবং জটিল পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঐ সব নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও সেখানে সংবিধানের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধানের মাত্র কয়েকটি সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাকী অনেক সংশোধন সম্ভব হয়েছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। সেখানে প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হয়েছে এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথা ও

বিচারালয়ের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান থাকার জন্য যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয় ; সেখানে প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সংবিধানের সংশোধন সহজসাধ্য হয়েছে। তাই ম্যাকবেন ও মুনরো দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধানের চেয়ে কম নমনীয় ও কম পরিবর্তনশীল নয়।

তেমনি বিপরীত দিক থেকে দেখা যাবে যে, ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ সংবিধান অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক এবং সব সময় সহজভাবে ব্রিটিশ সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। ব্রিটেনের সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও মতের সংঘাত দেখা যায় এবং রক্ষণশীল ইংরাজ জাতির মতামত জানার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও সেখানে জনমত ও জনগণের সচেতনতাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নেই।

এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান কোন ক্রমেই স্থাণুর মত থাকতে পারে না, পরিবর্তনের সহজ পথ নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। তেমনি সুপরিবর্তনীয় সংবিধানও বিভিন্ন বিধিনিষেধের দ্বারা এর পরিবর্তনশীল চরিত্রকে হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যেমন নমনীয় হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি কালক্রমে নমনীয় সংবিধানের ভেতর দুষ্পরিবর্তনশীল উপাদান জড়ো হয়। এর কারণ দুষ্পরিবর্তনশীল ও সুপরিবর্তনশীল সংবিধানের ভেতর কোন মূলগত প্রভেদ নেই। বস্তুত এদের মধ্যকার পার্থক্য আপেক্ষিক ও পরিমাণগত।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের পরিবর্তনশীলতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সংবিধান কতটা সুপরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয় তা নীচে বিচার করা হল।

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যতম দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে মনে করা হয়--কারণ, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করার নিয়মাবলী এখানে খুবই জটিল ও কষ্টকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন করতে হলে প্রথমে কংগ্রেসের প্রতিটি কক্ষের দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অথবা অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলীর এক জাতীয় সভার (national convention) দু-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করতে হবে। এ দুটি পদ্ধতির কোন একটির দ্বারা যদি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলে তা রাজ্যগুলোর তিন-চতুর্থাংশ আইনসভার দ্বারা অথবা রাজ্যসমূহের বিশেষ সভার তিন-চতুর্থাংশ ভোটের দ্বারা গৃহীত হতে হবে। উপরোক্ত দু' ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন ও দু'রকমের অনুমোদন (Ratification) ব্যবস্থার ফলে সংবিধান সংশোধনের চার রকমের পদ্ধতি নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক দিক থেকে মার্কিন সংবিধান সংশোধন করা খুবই কঠিন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি জটিল হলেও সেখানে প্রথাগত বিধি এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে যতটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে মনে হয় বাস্তবক্ষেত্রে ঐ সংবিধান ততটা দুষ্পরিবর্তনীয় নয়।

খ. ব্রিটেন : তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটেনের সংবিধান খুবই সুপরিবর্তনশীল। কারণ, ব্রিটেনে সাধারণ বিল যে ভাবে একটি কক্ষে পাশ করাবার পর অন্য কক্ষে পাঠানো হয় এবং সেখানে গৃহীত হলে রাজকীয় স্বাক্ষর লাভ করে তা আইন হিসেবে বলবৎ করা হয়, ঠিক ঐ রকম আইন প্রণয়নের মত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রিটেনে সংবিধান সংশোধন করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে তাই ব্রিটেনের সংবিধান নমনীয়। কিন্তু সংগে সংগে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ সংবিধান যতটা নমনীয় বলে মনে হয়, বাস্তবক্ষেত্রে তা অতটা নমনীয় নয়। কারণ সেখানে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জনমত, আইনসভার আলাপ-আলোচনা ও বিভিন্ন মতের সংঘাত যেভাবে

প্রভাব বিস্তার করে ও জটিলতা সৃষ্টি করে তাতে ব্রিটিশ সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় বলা উচিত নয়।

গ. সোবিয়েত ইউনিয়ন : সোবিয়েত ইউনিয়নে সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অতটা নয়। সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে সুপ্রীম সোবিয়েত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সংশোধন করা যায়। অধ্যাপক লাস্কির মতে সংবিধান বেশি পরিমাণ সুপরিবর্তনশীল বা বেশি পরিমাণ দুষ্পরিবর্তনশীল কোনটাই হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে আইনসভার দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধিত করার নিয়ম থাকা উচিত। সুতরাং সোবিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে সুপরিবর্তনশীল ও দুষ্পরিবর্তনশীলের মাঝামাঝি বললেই বোধ হয় সঙ্গত হবে।

তিন : ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি (Nature of Indian Constitution)

সংবিধানের উপরোক্ত দুটি শ্রেণীবিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানের দুটি প্রকৃতি এবার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। **প্রথমত,** ভারতের সংবিধান লিখিত এবং **দ্বিতীয়ত,** ভারতের সংবিধানের নমনীয়তা।

১. ভারতের লিখিত সংবিধান

স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মাত্র সাতটি ধারা (articles), ২৪টি উপধারা এবং সাত হাজার শব্দ আছে। আমাদের সংবিধানে প্রথম ছিল ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তপশীল (schedule)। এখন পর্যন্ত ৫২ বার সংবিধান সংশোধনের পর ভারতের সংবিধানের কলেবর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের সংবিধান এত বড় হওয়ার কয়েকটি কারণ দেখান হয় : ১. সাধারণত সংবিধানে শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর উল্লেখ থাকে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে প্রশাসনের বিশদ খুঁটিনাটি নিয়েও অনেক নির্দেশ ও বিধান দেওয়া হয়েছে ; ২. পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধান থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা এক আদর্শ সংবিধান রচনার চেষ্টা করেছেন বলে আমাদের সংবিধানের কলেবর বেড়েছে ; ৩. আমাদের দেশের আয়তন এত বড় এবং এর সমস্যাবলী এত জটিল বলে সংবিধানের আকার এত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে ; ৪. কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থা নয়, অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থাও আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সংবিধানের আয়তন বড় হয়েছে ; ৫. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক বিশদভাবে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে বলে সংবিধান দীর্ঘ হয়েছে।

সংক্ষিপ্ততা আদর্শ সংবিধানের একটি গুণ এবং এদিক থেকে বিচার করে ভারতের সংবিধানের বড় আকার অনেকের কাছে কাম্য মনে হয়নি।

২. ভারতের সংবিধানের নমনীয়তা

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শাসনতন্ত্র সব সময়েই লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া দরকার। লিখিত না হলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে সব সময়েই বিবাদ এবং সংঘাত দেখা দিতে পারে। উভয় সরকারের মধ্যে কেউ যাতে অন্যের অধিকার সংকুচিত করতে না পারে সেজন্য সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের শাসনতন্ত্র আংশিকভাবে সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় এবং আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় বা অনমনীয়। ভারতের সংবিধানের কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই পরিবর্তন করা যায়, আবার কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি বা স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের দুষ্পরিবর্তনীয় ধারাগুলো সংখ্যায় অল্প ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই বাস্তবে ভারতের সংবিধান নমনীয়। এর প্রমাণ বিগত ৩৫ বছরে ভারতের সংবিধান ৫২ বার সংশোধন করা হয়েছে (জানুয়ারী ১৯৮৫ পর্যন্ত)।

ভারতের সংবিধানের সংশোধনবিধিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়

(১) কতকগুলো বিষয় আছে যাদের সংশোধন করা অতি সহজ, ব্রিটেনের সংবিধান সংশোধনের মত। কোন সাধারণ বিল সংসদের উভয় কক্ষে সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে (by simple majority) ও পরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে আইনে পরিণত হতে পারে। অর্থাৎ সংবিধানের কতকগুলো ধারা সাধারণ বিলের মত সহজ পদ্ধতিতেই সংশোধিত হতে পারে। যেমন, নির্বাচন-আইন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংবিধান, নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ, অনুন্নত অঞ্চল ও তপশীলভুক্ত জনসমষ্টির প্রশাসন সম্পর্কে সংবিধানের ধারাগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তত্ত্বগত-ভাবে এগুলো সংবিধান সংশোধন হলেও সংবিধানের ভাষায় এগুলোকে সংবিধানের সংশোধন মনে করা হয় না (not to be deemed to be amendment of the constitution)।

কতকগুলো ধারা সাধারণ বিলের মতই

আবার কয়েকটি বিষয় আছে যাদের উপরোক্ত সাধারণ পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় বটে, তবে তার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য-আইনসভার অনুরোধ, সম্মতি ও পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। মনে রাখা দরকার, আমাদের সংবিধান অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজ নিজ সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে হলে বা একটি রাজ্যের অংশ নিয়ে তা অন্য রাজ্যের সংগে জুড়ে দিতে হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর পরামর্শ নিতে হবে। পরামর্শ বলতে 'সম্মতি' বোঝায় না। রাজ্য সরকার 'সম্মতি' না দিলেও সংসদ রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে। কেবল জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংসদের এ ধরনের ক্ষমতা নেই।

কতকগুলো ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাকে জানান দরকার

তবে দু একটি ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভা সংবিধান সংশোধন করতে নিজেই উদ্যোগী হতে পারে। যদি কোন রাজ্যের বিধানসভা (নিম্ন কক্ষ) দু-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব পাশ করে যে, ঐ রাজ্যে বিধান পরিষদ (উচ্চ কক্ষ) স্থাপন করা হোক বা বিধান পরিষদ থাকলে তা বিলোপ করা হোক তা হলে ভারতীয় সংসদ ঐ রাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষ প্রতিষ্ঠা বা দ্বিতীয় কক্ষের বিলোপ করতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, ঐরূপ পরিবর্তনকে সংবিধানের সংশোধন বলা হবে না।[১] যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ১৯৬৯ সালে বিধানপরিষদ বিলোপ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এবং সংসদে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানপরিষদের বিলোপ ঘটে।

রাজ্যের উদ্যোগক্ষমতা কতটুকু

(৩) সংবিধানের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের সংবিধান দুটি পদ্ধতিতে সংশোধিত হতে পারে ঃ

(ক) ভারতের সংবিধান সংশোধনের ঐ দুটি পদ্ধতির প্রথমটিতে রাজ্যে আইনসভাগুলোর কোন ভূমিকা নেই। সংসদের যে-কোন একটি কক্ষে একই মর্মে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করে উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে ঐ সংশোধনী পাশ করাতে হবে। প্রত্যেকটি কক্ষে সমর্থনসূচক ভোটের সংখ্যা যেন ঐ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি হয়। উভয় কক্ষে এভাবে বিলটি পাশ হলে তা রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয়। গৃহীত ঐ প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে

বিশেষ পদ্ধতি—রাজ্যসরকারের বিনা সম্মতিতে

১. অবশ্য কোন রাজ্যের বিধানসভা অনুরোধ করলেই সংসদ তা মানাতে বাধ্য এমন নয়। ১৯৫০ সালে বোম্বাই-এর বিধানসভা দ্বিতীয় কক্ষ বিলোপ করার প্রস্তাব পাশ করে, কিন্তু ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সংসদ ঐ বিষয়ে কোন আইন প্রণয়ন করে না। বোম্বাই প্রদেশ ১৯৬০ সালে দ্বিধা বিভক্ত হবার পরে মহারাষ্ট্র আইনসভার দুটি কক্ষ, কিন্তু গুজরাটে একটি কক্ষ রয়েছে। আবার ১৯৫৭ সালে নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের জন্য সংসদ দুটি কক্ষের ব্যবস্থা করে, কিন্তু ঐ রাজ্য তা মেনে নেয় না।

পারেন না, এবং প্রথা অনুসারে অসম্মতিও জানাতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ঐ সংশোধনী গৃহীত হল বলে ঘোষিত হবে।

বিশেষ পদ্ধতি—রাজ্যগুলোর সম্মতিসহ

(খ) আবার কতকগুলো বিষয় বা ধারা সংশোধন সম্পর্কে এই পদ্ধতির সঙ্গে রাজ্য আইনসভাগুলোর সম্মতি প্রয়োজন। দেশের অন্তত অর্ধেক অঙ্গরাজ্য আইনসভা তা সমর্থন (ratified) করলে তবে সংশোধনী বিল পাশ হল বলে গ্রাহ্য হবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনবিষয়ক ও আইন প্রণয়নবিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট, সংসদে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব এবং সংবিধান সংশোধন নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ উপরের পদ্ধতিতে সংশোধিত হবে। ঐ সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যসমূহের স্বার্থ জড়িত আছে বলে তাদের মত নেওয়া দরকার বিবেচনা করে তাদের সম্মতি নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করার পরে সংশোধনটি গৃহীত হবে।

ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিকে একটি ছকের সাহায্যে দেখান যেতে পারে ঃ

ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

১. সংসদের উভয়কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা + রাষ্ট্রপতির সম্মতি

৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী

(ক) সংসদের উভয়কক্ষের ১/২ সদস্য এবং সংসদে উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের ২/৩ অংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত + রাষ্ট্রপতির সম্মতি

(খ) সংসদের উভয়কক্ষের ১/২ সদস্য এবং সংসদে উপস্থিত ভোটদানকারী ২/৩ অংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত + ১/২ সংখ্যক অঙ্গরাজ্য দ্বারা অনুমোদন + রাষ্ট্রপতির সম্মতি

যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত প্রায় দুশো বছরে মাত্র পঁচিশবার সংবিধানের সংশোধন করা হয়েছে, সেখানে বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের সংবিধান ৫২ বার সংশোধিত হয়েছে। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সংবিধানকে খাপ খাওয়াতে গেলে সংশোধন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সংবিধানের উদ্দেশ্য হল সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ যাতে সহজে আসে তাতে সাহায্য করা। সুতরাং সংবিধান সংশোধন করা অন্যায় কিছু নয়। কিন্তু এত ঘন ঘন সংবিধান পরিবর্তন করলে সংবিধানের অলঙ্ঘনীয়তা ও পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সংবিধান খুব নমনীয় বলে বিবেচিত হয়। ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যে বহুদিন একটি দলের বিপুল রাজনৈতিক সংখ্যাধিক্য থাকার জন্য অল্প সময়ে এত বেশি সংখ্যক বার সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিতে ব্রিটিশ বা মার্কিন মডেল বা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করা হয়নি। এটি সংবিধান প্রণেতাদের নিজস্ব আবিষ্কার।

২. ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ব্রিটেনের মত সরল ও নমনীয় নয়, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত জটিল ও অনমনীয় নয়। এটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে।

৩. ভারতে সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব সংসদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, এজন্য গণপরিষদ গঠনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

৪. কয়েকটি ব্যাপারে ভারতে সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোর অনুমোদন প্রয়োজন হলেও সাধারণভাবে এখানে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগুলোর ভূমিকা উপেক্ষিত হয়েছে।

চার: উত্তম সংবিধানের বিষয়বস্তু ও গুণ (Contents and Qualities of a Good Constitution)

একটি ভাল বা আদর্শ সংবিধানের বিষয়বস্তু এবং উপাদান কি হবে এবং এর কি কি গুণ থাকবে সংবিধানের ছাত্র হিসেবে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। নীচে একটি উত্তম সংবিধানের বিষয়বস্তু ও গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল ঃ

উত্তম সংবিধানের বিষয়বস্তু

সংবিধানের বিষয়বস্তু কী হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সংবিধানের উদ্দেশ্যের ওপর। শাসনতন্ত্র কি কেবলমাত্র সরকারের ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে, না, তা মূলত ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে গৃহীত হবে—এ বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা ঐকামত হতে পারেননি। সেজন্যই বিভিন্ন দেশে সংবিধানের বিষয়বস্তু হিসেবে এখনও সর্বজনস্বীকৃত কোন নীতি স্বীকৃতিলাভ করেনি। কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগম করাই সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উত্তম সংবিধানের কি কি বিষয়বস্তু থাকা উচিত তা আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমত, সংবিধানের প্রারম্ভেই একটি প্রস্তাবনা (**Preamble**) থাকা উচিত, যার মধ্য দিয়ে সংবিধানের আদর্শ ও মূল উদ্দেশ্য (**Philosophy and Spirit**) সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হতে পারে। এরূপ প্রস্তাবনা থাকলে সংবিধানের যে সকল ধারা যথেষ্ট পরিমাণে সুস্পষ্ট নয়, তাদের প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য যে শাসকমণ্ডলী থাকবে তাঁদের নির্বাচন পদ্ধতি ও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটতে না পারে। সংবিধান যেমন একদিকে সরকারের ক্ষমতা স্থির করে, তেমনি অপর দিকে সরকার কি কি করার অধিকারী নয় তাও নির্দেশ করে। সরকারের কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করা সংবিধানের কর্তব্য।

তৃতীয়ত, ঠিক তেমনি ভাল সংবিধানে আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগীয় সদস্যদের নির্বাচন বা মনোনয়ন পদ্ধতি এবং তাদের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ থাকা উচিত।

চতুর্থত, সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উত্তম সংবিধানের দ্বারা স্থির থাকা একান্ত কাম্য। এরূপ হলে বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার পারস্পরিক বিরোধ দেখা দেয় না এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বদলে নিয়ন্ত্রিত থেকে সুস্থ শাসন পরিচালনায় সাহায্য করে।

পঞ্চমত, যেহেতু সংবিধানকে ব্যক্তিস্বাধীনতার উৎস ও রক্ষাকবচ মনে করা হয়, সেজন্য সমাজজীবনে নাগরিকগণ পারস্পরিক ক্ষেত্রে এবং সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করতে পারে তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা ও বিচারালয় কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কে. সি. হুইয়ার অবশ্য জনগণের অধিকারকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার বিরোধী। তিনি মনে করেন যে, আদর্শ আইন ও অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করবে এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কিন্তু আদর্শ সংবিধান অধিকারকে লিপিবদ্ধ করবে না।[১]

ষষ্ঠত, সরকারী কাজ, সরকারী হিসাব পরীক্ষা, নির্বাচন পরিচালনা কে করবে তা স্থির করা এবং এ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আদর্শ সংবিধানে নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

১. "The ideal constitution···would contain a few or no declaration of rights, though ideal system of law would define and guarantee many rights." —K.C. Wheare

সপ্তমত, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধান পরিবর্তন করার অধিকারী কে এবং কি উপায়ে তার পরিবর্তন হবে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন।

উত্তম সংবিধানের গুণ

একটি আদর্শ বা উত্তম সংবিধানের যে সকল গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. সংবিধানের সর্বপ্রধান গুণ হল সুস্পষ্টতা। সুস্পষ্টতা বলতে বক্তব্যের নির্দিষ্টতা, ভাষার স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা বোঝান হয়। সংবিধান এরূপ সুস্পষ্ট হলে বিষয়বস্তুর অর্থ নিয়ে মতান্তর ঘটার সুযোগ কম থাকে। সংবিধানে এমন কোন কথা বলা ঠিক নয় যার দুই বা ততোধিক অর্থ করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে অনেকে আদর্শস্থানীয় বলে মনে করেন, কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে যে, সুস্পষ্টতার অভাবে সংবিধানের একই শব্দের ব্যাখ্যা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম করেছে। সুতরাং যথাসম্ভব সুস্পষ্ট করে সংবিধান রচনা করা প্রয়োজন।

সুস্পষ্টতা

২. সংবিধানকে অতিরিক্ত দীর্ঘ ও ব্যাপক করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুগুলো যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় তবে তা বৃহদায়তন হতে বাধ্য। সেজন্য উত্তম সংবিধানে কেবলমাত্র মৌলিক বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত নির্দেশ থাকা উচিত—কোন বিষয়ের ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আদর্শ। ভারতের সংবিধান অতিরিক্ত ব্যাপক। মার্কিন সংবিধানে মাত্র ৭টি ধারা আছে ; আর ভারতের সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ও আটটি পরিশিষ্ট আছে। সংবিধান ব্যাপক হলে তা অনাবশ্যকভাবে জটিল হয়ে পড়ে। তাই হুইয়ার বলেছেন যে, সংক্ষিপ্ততা আদর্শ সংবিধানের অপরিহার্য গুণ।[১] অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান স্বাভাবিক কারণেই একটু বড় হতে বাধ্য।

সংক্ষিপ্ততা

৩. অতিরিক্ত সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় না হয়ে সংবিধানের মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত বলে লাস্কি প্রমুখ অনেকে মনে করেন। কারণ, সংবিধান একান্তভাবে নমনীয় হলে তার স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। আবার বেশি-দুষ্পরিবর্তনীয় হলে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না। তাই ব্রাইস বলেছেন যে, সংকটকালে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অথচ মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে যেন সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায়। সংবিধান যদি নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তবেই তা সম্ভব।

অতিরিক্ত সুপরিবর্তনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় নয়

৪. অনেকের মতে উত্তম সংবিধান লিখিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, অলিখিত সংবিধান অনেক বেশি অস্পষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। ব্রিটেনের ন্যায় শতকের পর শতক ধরে যে সংবিধান বিবর্তন ও পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির জন্ম দিয়েছে তা অলিখিত হলেও চলতে পারে বটে ; কিন্তু নতুন অবস্থায় সংবিধান লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

অলিখিত

৫. জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলোকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার ওপর অনেকে গুরুত্ব দেন। যেহেতু সংবিধান ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ, সেজন্য তা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকলে সেগুলো লঙ্ঘন করা কষ্টকর হয় এবং ওগুলো বজায় রাখার সংগ্রামে আইনসম্মত পন্থাও জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকে। তবে মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা ঠিক কি না সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। লাস্কি মনে করেন,

মৌলিক অধিকার

১. "The essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible." —K. C. Wheare

মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত, কিন্তু হুইয়ার এদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নন।

পাঁচ : ভারতের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Salient Features of Indian Constitution)

ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন করা হয়েছিল। গণ পরিষদে **১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের বর্তমান সংবিধান গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হতে তা কার্যকর হয়।** প্রতিটি দেশের সংবিধানেরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। একটু লক্ষ্য করলে আমরা ভারতের শাসনতন্ত্রেরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের যে সকল বৈশিষ্ট্য আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে সেগুলি আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে, বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যের পছন্দময় চয়ন ও সংযোজনে আমাদের সংবিধান সমৃদ্ধ। নীচে ভারতের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হল :

১. দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান

স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মাত্র সাতটি ধারা (articles), ২৪টি উপধারা এবং সাত হাজার শব্দ আছে। আমাদের সংবিধানে প্রথমে ছিল ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তপশীল (Schedule)। এখন পর্যন্ত ৫২টি সংশোধন যুক্ত হওয়ায় ভারতের সংবিধানের কলেবর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings) বলেছেন যে, ভারতের সংবিধান খুব দীর্ঘ ও বিস্তারিত। ভারতের সংবিধান এত বড় হওয়ার কয়েকটি কারণ দেখান হয় : ১. সাধারণত সংবিধানে শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলোর উল্লেখ থাকে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে প্রশাসনের বিশদ খুঁটিনাটি নিয়েও অনেক নির্দেশ ও বিধান দেওয়া হয়েছে ; ২. পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধান থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা এক আদর্শ সংবিধান রচনার চেষ্টা করেছেন বলে আমাদের সংবিধানের কলেবর বেড়েছে ; ৩. আমাদের দেশের আয়তন এত বড় এবং এর সমস্যাবলী এত জটিল বলে সংবিধানের আকার এত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে ; ৪. কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ব্যবস্থা নয়, অঙ্গরাজ্যের শাসন ব্যবস্থাও আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সংবিধানের আয়তন বড় হয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ হয়নি ; ৫. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে নানাবিধ সম্পর্ক বিশদভাবে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে বলে সংবিধান দীর্ঘ হয়েছে।

সংক্ষিপ্ততা আদর্শ সংবিধানের একটি গুণ (*The essential characteristics of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible*) এবং এদিক থেকে বিচার করে ভারতের সংবিধানের বড় আকার অনেকের কাছে কাম্য মনে হয়নি।

২. সংসদীয় শাসনব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, মূলত দীর্ঘদিন বৃটিশ শাসনের প্রভাবে আমাদের দেশে সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থা (Parliamentary Government) প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী। সংসদ আইন প্রণয়ন করে, সরকারকে টাকাপয়সা মঞ্জুর করে, কর আদায়ের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং শাসন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে। যদিও ভারতের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে আছেন একজন রাষ্ট্রপতি এবং আপাতদৃষ্টিতে আমাদের শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত (Presidential) সরকার বলে মনে হয়, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপতি মোটামুটিভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional head), প্রকৃত ক্ষমতা সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। তাই, আমাদের সংবিধানের প্রকৃতি সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদীয় (Parliamentary or Cabinet System)।

কিন্তু ব্রিটেনের মত ভারতেও সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও প্রাধান্য এত বেশি যে সংসদের ভূমিকা অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে। তাই ভারতের শাসনব্যবস্থা কাঠামোগত দিক থেকে সংসদীয় হলেও অনেকে বাস্তবে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে ব্রিটেনের মত প্রধানমন্ত্রীর সরকার (Prime Ministerial Government) বলতে শুরু করেছেন।

৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে (federal structure) গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে একটি করে রাজ্য সরকার আছে। কতকগুলো বিষয়ের (৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং অন্য কতকগুলো বিষয়ের (৬২টি) শাসনভার রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আছে যুগ্ম তালিকা (৫২টি বিষয়)। এই তালিকার অধীন বিষয়গুলো কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য যুগ্মভাবে ভোগ করে। তবে এগুলোর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছে। উপরোক্ত তিনটি তালিকায় যে সকল বিষয়ের কথা উল্লিখিত হয়নি ; সেই সকল বিষয়ে শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সংবিধান পারদর্শী পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, ভারতে কেন্দ্রের ক্ষমতা খুব বেশি এবং এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এমন ভাবে গঠন করা হয়েছে, যাতে জরুরী অবস্থায় একে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে। সংবিধান পারদর্শীরা তাই মনে করেন, ভারত পুরাপুরি যুক্তরাষ্ট্রীয় নয়, ভারত হল আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়। কে. সি হুইয়ারের ভাষায় বলা যায়, *In the class of quasi-federal constitutions it is probably proper to include the Indian constitution of 1950.*

৪. সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

চতুর্থত, সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রস্তাবনার বক্তব্য অনুযায়ী ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সমাজতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক আদর্শ নয়, একটি আর্থনীতিক ব্যবস্থাও বটে। তাই প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় বলা যায় তত্ত্বগত দিক থেকে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ ও আর্থনীতিক কাঠামো হল সমাজতন্ত্র। আরও বলা হয়েছে, ভারত রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নেই—ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। নাগরিকদের জন্য সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করে ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন যে, আমাদের সংবিধানে জনগণের জন্য কোন আর্থনীতিক অধিকার স্থান না পাবার জন্য গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ গণতন্ত্র কেবলমাত্র একটি শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় না—গণতন্ত্র হ'ল একটা আদর্শ—যা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। কোন নির্দিষ্ট ও বংশানুক্রমে রাজত্বকারী শাসক বা রাজার পরিবর্তে ভারতে জনগণ দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন, তিনি বংশানুক্রমে রাজত্ব করেন না। তাই ভারত একটি প্রজাতন্ত্র। মনে করা হয় যে, ভারতের সংবিধানের দর্শন (Philosophy) প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

৫. নির্দেশাত্মক নীতি

পঞ্চমত, আমাদের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে কতকগুলো নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles) কথা বলা হয়েছে। ঐ নীতিগুলোর মধ্য দিয়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঐ নীতিগুলোর সঙ্গে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রেখে শাসন কর্তৃপক্ষকে দেশ শাসনের কাজ চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলো হ'ল রাষ্ট্রশাসনের নির্দেশরেখা (guide line in the governance of the country)। তবে ঐ নীতিগুলোকে মান্য না করা হলেও কোন নাগরিক আইনের সাহায্যে আদালতের মাধ্যমে ঐগুলোর প্রয়োগ দাবী করতে পারবে না।

তাই সমালোচকেরা মনে করেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিতে আদালত গ্রাহ্য নয় এমন কতকগুলো মহৎ আদর্শের উল্লেখ সংবিধানের শোভাবর্ধন ছাড়া কিছু নয়। সেজন্য স্যার জেনিংস বলেছেন, নির্দেশাত্মক নীতিগুলো সাধু আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

৬. **মৌলিক অধিকার**

ষষ্ঠত, আমাদের সংবিধানের আর একটি প্রধান বৈশিষ্টা হল যে, ৬টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সংবিধানে লিপিবন্ধ করা হয়েছে। ঐ মৌলিক অধিকারগুলো হ'ল ঃ ১. সাম্যের অধিকার ; ২ স্বাধীনতার অধিকার ; ৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ; ৪. ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার ; ৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং ৬. সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। (এ ছাড়াও সাধারণ অধিকার হিসেবে আছে সম্পত্তির অধিকার)। ভারতের যে কোন নাগরিকের কাছেই ঐ সকল মৌলিক অধিকার বিশেষ মূল্যবান। ঐ অধিকারগুলোই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার ভিত্তি। সাধারণত অন্যান্য দেশে মৌলিক অধিকারের উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক সমতা আনা বা আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমতা প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের এই মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের বিভিন্ন অধিকারকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে।

ভারতের সংবিধানে সংযোজিত মৌলিক অধিকারগুলোর বেশির ভাগই নেতিবাচক (negative) এবং অধিকারগুলো চরম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অধিকারগুলোর ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ (reasonable restriction) আরোপ করে এদের সীমিত করা হয়েছে। তাছাড়া জনগণের জন্য কোন আর্থনীতিক অধিকার মৌলিক অধিকারে স্থান পায়নি।

৭. **ধর্ম-নিরপেক্ষ**

সপ্তমত, আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state) বলা হয়েছে। ব্রিটেনে খ্রীষ্টীয় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মকে এবং পাকিস্তানে ইস্‌লাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। ধর্মের জন্য সেখানে সরকারী অর্থও খরচ করা হয়। কিন্তু ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই এবং সরকার কোন ধর্মের পোষণ ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করে না। সরকারী উৎসাহে কোন ধর্মমত প্রচারিতও হয় না।

৮. **এক-নাগরিকত্ব**

অষ্টমত, ভারত কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতের সংবিধানে এক-নাগরিকত্ব (uni-citizenship) স্বীকৃত হয়েছে। এর অর্থ হল এই যে, ভারতে নাগরিকত্ব বলতে সর্বভারতীয় নাগরিকত্ব বোঝায়, প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জন্য আলাদা নাগরিকত্ব ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন সংবিধানে দ্বি-নাগরিকতা স্বীকৃত।

৯. **নমনীয় ও অনমনীয়ের সংমিশ্রণ**

নবমত, আমাদের সংবিধান আংশিক নমনীয় ও আংশিক অনমনীয় (partly rigid and partly flexible)। লিখিত সংবিধান সাধারণত অনমনীয় হয়। কিন্তু আমাদের সংবিধানের কোন কোন অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সহজভাবে পরিবর্তিত করা চলে। আবার কোন কোন অংশের পরিবর্তন করেতে হলে বিশেষ ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।[১] সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ভারতীয় সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক হুইয়ারের মতে, *This variety in the amending process is wise but rarely found.*

১০. **সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা**

ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য সংখ্যালঘু এবং সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য (যেমন, বর্ণগত, ভাষাগত এবং উপজাতি শ্রেণী) আমাদের সংবিধানে নানা ব্যবস্থা আছে। সংখ্যালঘুদের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা খুব বেশী দেশের সংবিধানে নেই।

---

১. 'ভারতের সংবিধানে নমনীয়তা' দ্রষ্টব্য।

সর্বশেষ, আমাদের সংবিধানে বিভিন্ন প্রকার প্রথা বা অলিখিত ব্যবহারিক রীতিনীতি (**conventions**) এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। কোন দেশের সংবিধান লিখিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কালক্রমে প্রচুর অলিখিত নিয়মকানুন গড়ে ওঠে। ঐ সকল প্রথা, রীতিনীতি শাসনতন্ত্রের লিখিত ধারাগুলোর ন্যায় সমান মর্যাদা লাভ করে। আমাদের নিজস্ব প্রথা ও রীতিনীতি না গড়ে উঠলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে নিয়ে শাসন পরিচালনা করা হয়। স্যার আইভর জেনিংসের ভাষায় বলতে গেলে, *The machinery of Government is essentially British and the whol-collection of British constitution's conventions has apparently becn incorporated as conventions.*

নমুনা প্রশ্ন

1. 'সাংবিধান' বলতে তুমি কি বোঝ ? সাংবিধানের শ্রেণীবিভাগ কর। (এক দেখ) [T. S. B. '79, H. S. C. '80]
2. 'সংবিধান' বলতে কি বোঝায় ? লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য যথোপযুক্ত উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর। (দুই এবং তিন দেখ) [H. S. C. '82]
3. (ক) 'লিখিত' ও 'অলিখিত' এবং (খ) 'সুপরিবর্তনীয়' ও 'দুষ্পরিবর্তনীয়' সংবিধানের পার্থক্য দেখাও। (দুই দেখ) [H. S. C. '82]
4. সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ কর এবং এদের দোষ-গুণ আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '78 and '84]
5. একটি উত্তম সংবিধানে কি কি বিষয়বস্তু ও গুণ থাকা উচিত তা আলোচনা কর। (চার দেখ)
6. ভারতের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয় ? (তিন দেখ)
7. ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (পাঁচ দেখ) [H. S. C. '78, T. S. B. '79]
8. ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। (পাঁচ দেখ) [H.S.C. '81 ; 83 and '85]
9. ভারত একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—আলোচনা কর (পাঁচ দেখ) [T. S. B. '79]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্ দাও :—

১. পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে (নমনীয়, অনমনীয়) সংবিধান।
২. ভারতে (রাষ্ট্রপতি-শাসিত, মন্ত্রিপরিষদ পরিচালিত) শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে।
৩. ভারতের শাসনব্যবস্থা (এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়)। [H. S. C. '80]
৪. ভারত একটি (ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মীয়) রাষ্ট্র।
৫. ভারত একটি (সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)
৬. ভারতের সংবিধান (লিখিত, অলিখিত)।
৭. ব্রিটিশ সংবিধান (নমনীয়, অনমনীয়)।
৮. ভারতের সংবিধান (নমনীয়, অনমনীয়, নমনীয় বা অনমনীয় কোনটাই নয়)।

2. শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ভারত একটি সার্বভৌম — — গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। (সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ)
(খ) ভারতের সংবিধানের —— অধ্যায়ে নির্দেশাত্মক নীতির কথা বলা হয়েছে। (চতুর্থ)
(গ) গণপরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় —— সালের —— তারিখ। (১৯৪৯, ২৬শে নভেম্বর)
(ঘ) ভারতের সংবিধান —— সালের —— তারিখ থেকে কার্যকর হয়। (১৯৫০, ২৬শে জানুয়ারী) [H. S. C. '79]

"The fault with most classifications of governments is that they do not rest upon any consistent scientific principle which will serve as a basis for the differentiation of governments with respect to their fundamental characteristics. No single classification can be of much value ; there must be as many classifications as there are points of view from which the government may be considered.

—**J. W. Garner**

২

সরকারের রূপ

Forms of Government

সকল দেশের সরকারের রূপ এবং প্রকৃতি এক নয়। প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরকারের শ্রেণীবিভাজনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সরকারের শ্রেণীবিভাজনের জন্য কোন স্বীকৃত মানদণ্ড না থাকায় আরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পর্যন্ত অনেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের শ্রেণীবিভাজনের চেষ্টা করেছেন। ফলে বিভিন্নভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে—কিন্তু ঐগুলো কোন বৈজ্ঞানিক নীতি বা স্বীকৃত মানদণ্ডের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে, সরকারের শ্রেণীবিভাজন তথা সরকারের রূপ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনেক আলোচনা হলেও ঐ শ্রেণীবিভাজন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক বা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

এক : সরকার কাকে বলে ? (What is Government ?)

'সরকার' শব্দটি সাধারণভাবে নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকেও সরকার বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে **সরকার শব্দটির অর্থ রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র।** রাষ্ট্র

হল একটা মানসিক ধারণা, আমরা তাকে অনেকটা কল্পনা করে নেই। **বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশ বা আদেশ জানতে পারা যায় সরকারের মাধ্যমে।** সমাজে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। রাষ্ট্র তাদের মধ্যে একটি। রাষ্ট্র তার সদস্যদের ওপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের ইচ্ছা নাগরিকেরা কি করে জানতে পারে? রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায় আইনের মধ্য দিয়ে। আইন হ'ল রাষ্ট্রের আদেশ বা নির্দেশ। আইনের পেছনে কি উদ্দেশ্য তা বুঝেই আমরা রাষ্ট্রের ইচ্ছা বুঝতে পারি। কেউ যদি আইন ভঙ্গ করে, তবে তার অর্থ হল, সে রাষ্ট্রের আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করছে, রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছে না। সরকারই আইন তৈরি করে এবং কেউ আইন ভঙ্গ করলে সরকার তাকে শাস্তি দেয়। সরকার হল একটি বাস্তব ধারণা। আইনসভা, রাজা বা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা, সৈন্য, পুলিশ, বিচারসভা, এই সব মিলেই সরকার। সরকারের কাজ হল রাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজকর্ম করা। বস্তুত, সরকার নামক শাসন প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের কর্ণধার।

সমাজের যেমন পরিবর্তন ঘটে, সেরূপ যুগে যুগে রাষ্ট্র ও সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'দাস রাষ্ট্র', 'সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র' ও 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' ইত্যাদি দেখা গিয়েছে। বর্তমানে যেমন পৃথিবীর অনেক দেশে 'সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' স্থাপিত হতে দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সকল দেশের সরকারের মধ্যেই কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা সমপ্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সকল দেশের সরকারই আইন, শাসন ও বিচারের কাজ চালাবার জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে দেশে এদের কাঠামোগত পার্থক্য আছে। ঐ পার্থক্যের ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব।

দুই: আরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Aristotle's Classification of Government)

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর বিখ্যাত 'পলিটিক্স' নামক গ্রন্থে সরকারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন। সরকারের শ্রেণী বিভাগ করার সময়ে তিনি দুটি মান বা উপাদান সামনে রেখেছিলেন—প্রথমত, শাসকের সংখ্যা এবং দ্বিতীয়ত, শাসনের উদ্দেশ্য। সরকারের চরম ক্ষমতা ক'জন লোকের হাতে ন্যস্ত আছে এবং কি উদ্দেশ্যে সে ক্ষমতার ব্যবহার হচ্ছে—এ দুটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল, কতজন লোক রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করছে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে তাঁর বিচার্য বিষয় ছিল, কাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ঐ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে। যাঁর হাতেই এই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকুক না কেন, তিনি যদি দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তবে তা হ'ল সরকারের স্বাভাবিক রূপ (natural form)। আর যদি সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, তবে তা হ'ল সরকারের বিকৃত রূপ (perverted form)।

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ
১. ক্ষমতা ক'জনের হাতে
২. শাসকেরা কার স্বার্থ দেখে

আরিস্টটলের মতে সরকারের ক্ষমতা একজনের হাতে থাকলে তাকে রাজতন্ত্র (Monarchy) বলা হয়। কিন্তু সেই শাসক যদি নিজের স্বার্থ অনুযায়ী স্বেচ্ছাচারীর মত শাসন করেন তবে তাকে স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) বলে। যদি অল্প সংখ্যক লোকের হাতে শাসনক্ষমতা থাকে তবে তাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)। কিন্তু এই অভিজাততন্ত্র স্বার্থপরের নীতি গ্রহণ করলে তাকে বলে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)। যদি বহু সংখ্যক ব্যক্তি শাসনের অধিকারী হয় এবং সকলের স্বার্থে দেশ শাসিত হয়, তবে তিনি তাকে পলিটি (Polity) বা সু-গণতন্ত্র বলেছেন। কিন্তু বিশৃঙ্খল জনতা সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন না মেনে স্বেচ্ছাচারিতা চালালে তাকে তিনি জনতন্ত্র (Mob-rule) বা কু-গণতন্ত্র (Democracy) আখ্যা দিয়েছেন।

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি নীচে দেওয়া হল ঃ

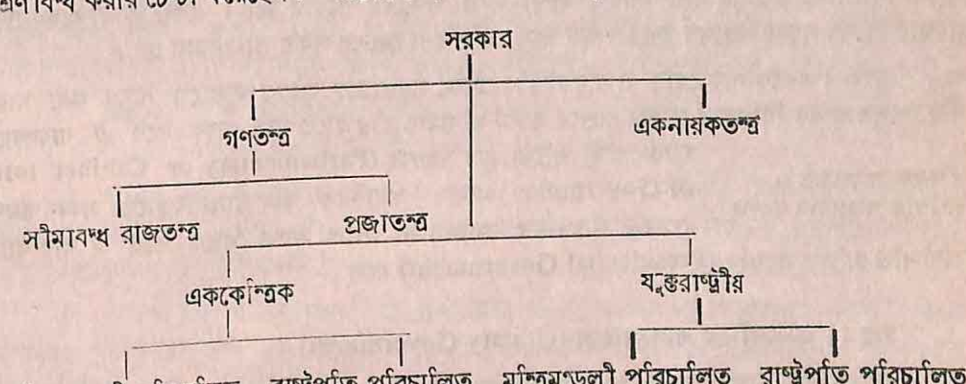
কার হাতে ক্ষমতা	স্বাভাবিক রূপ (সকলের হিতের জন্য)	বিকৃত রূপ (শাসকের স্বার্থের জন্য)
একজন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কয়েকজন	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুজন	পলিটি	জনতাতন্ত্র বা গণতন্ত্র

তিন ঃ আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Modern Classification)

সরকারের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক কালের পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। তাই আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে বর্তমানে বর্জন করা হয়েছে। নিছক কাঠামো দেখে কোন সরকারের রূপ বোঝা যায় না। যেমন, ব্রিটেনে শাসন বিভাগের শীর্ষে একজন রাজা বা রানী থাকেন। তাই বলে ব্রিটেনকে পুরোপুরি রাজতন্ত্র বলা যায় না। আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ হল কেবলমাত্র একটি সংখ্যাগত (quantitative) বিভাগ। কোন সরকারের গুণগত রূপ বা ধরন (quality) এর দ্বারা প্রকাশিত হয় না। আরিস্টটল যাকে 'পলিটি' বলেছেন, তাকে আজকাল গণতন্ত্র (Democracy) বলা হয়। তাঁর জনতাতন্ত্র (mobrule) হল আধুনিক গণতন্ত্রের বিকৃত-রূপ।

আরিস্টটলের শ্রেণী বিভাগের ত্রুটি

আধুনিক পণ্ডিতেরা (বিশেষত, ম্যারিয়ট ও লীকক্) তাই ভিন্ন পদ্ধতিতে সরকারকে শ্রেণীবন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের শ্রেণীবিভাগ নীচে তুলে ধরা হ'ল ঃ



সাম্প্রতিককালের অনেক পণ্ডিত আধুনিক সরকারকে তিনটি ব্যাপক শ্রেণীতে ভাগ করার পক্ষপাতী। এগুলো হ'ল ঃ

১. **গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র** (Democracy and Dictatorship)
২. **এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়** (Unitary and Federal)
৩. **রাষ্ট্রপতি চালিত ও আইনসভা পরিচালিত** (Presidential and Parliamentary)

যে-শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের স্বার্থে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রে সকল ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য হয় এবং জনমত অনুযায়ী দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, অথবা একটি দল একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি বা দলের দলপতি সর্বাধিনায়ক হয়ে বসে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

গণতন্ত্রকে দু ভাগে বিভক্ত করা চলে। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র। যে শাসন ব্যবস্থায় দেশের শাসন-ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায়, সে ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজতন্ত্র দু-প্রকার হতে পারে, যথা—অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited Monarchy)।

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র

বর্তমানে অবাধ রাজতন্ত্র পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে। বর্তমানে উন্নত গণচেতনার যুগে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য পরিচালিত হতে পারে না, এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা আজকাল কল্পনাও করা যায় না।

সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন রাজা থাকেন বটে, কিন্তু কার্যত তাঁর কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামেই রাজা, তাঁর নামে মন্ত্রীরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ ধরনের রাজতন্ত্রে রাজা রাজত্ব (reign) করেন, কিন্তু শাসন করেন (rule) মন্ত্রীমণ্ডলী। ব্রিটেনের বর্তমান রানী এলিজাবেথও এই শ্রেণীর রাজ্ঞী।

যখন দেশের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে বংশানুক্রমে কোন রাজা থাকে না, জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি থাকেন, তখন সেরূপ সরকারকে প্রজাতন্ত্র (Republic) বলা হয়।

শাসন পরিচালনার জন্য কোন রাষ্ট্রে এক, না দু' শ্রেণীর সরকার আছে—এই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার আবার দু ধরনের হতে পারেঃ এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। যখন সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার থাকে এবং সেই কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের সমগ্র অঞ্চলের জন্য সকল বিষয়ে এককভাবে আইন প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগ করে, তখন তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। যখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা আঞ্চলিক সরকার এবং সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার—উভয়ই চলতে থাকে, তখন ঐ ব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। আঞ্চলিক সরকার-গুলো নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করে ওগুলো প্রয়োগ করে। কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশের সকল অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করে এবং দেশের সর্বত্র তা প্রয়োগ হয়।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

সরকার এককেন্দ্রিক হোক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় হোক, সরকারকে আরও দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যদি দেশের শাসন বিভাগের ক্ষমতা বাস্তবে একটি মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত থাকে তবে ঐ ব্যবস্থাকে মন্ত্রিমণ্ডলী-পরিচালিত সরকার (Parliamentary or Cabinet form of Government) বলে। অন্যদিকে, যদি শাসনবিভাগের সকল ক্ষমতা একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে তবে ঐ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার (Presidential Government) বলে।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার

চার : এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (Unitary Government)

আগেই বলা হয়েছে যে, শাসন ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতা সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা হবে অথবা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর বণ্টিত হবে—এই নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র—এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

এককেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে ?

কোন রাষ্ট্রে যখন সরকারী ক্ষমতার প্রয়োগ এবং আইন প্রণয়নের জন্য সংবিধানগত ভাবে একটিমাত্র কর্তৃত্ব (authority) বা সরকার থাকে, তখন তাকে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলে

অভিহিত করি। ঐ সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় সরকার বলা হয়। এককেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong) বলেছেন যে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সকল রকম নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থাকে, কারণ সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনসভা ছাড়া অন্য কোন আইন প্রণয়ন সংস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।[১] অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শুধুমাত্র শাসনক্ষমতাই একটিমাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত থাকে না, আইন প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্বও একটিমাত্র কেন্দ্রীয় আইনসভা ভোগ করে।[২] এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল এলাকায় পরিব্যাপ্ত থাকে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সংস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে এবং বাস্তবে প্রতিটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেই স্বায়ত্তশাসনমূলক বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা রয়েছে। এমন কি ঐ সকল আঞ্চলিক সংস্থার শাসন ও নিয়ম-কানুন প্রণয়নের জন্য স্বতন্ত্র সংস্থাও থাকতে পারে। কিন্তু ঐ সকল সংস্থা কেন্দ্রীয় শাসন ও কেন্দ্রীয় আইনবিভাগীয় সংস্থার কর্তৃত্ব মান্য করে এবং তার অধীনে থেকে পরিচালিত হয়। এরা কেন্দ্রীয় আইনবিভাগকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী নয়। বস্তুত কেন্দ্রীয় আইনসভাই এদের সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রীয় আইনের দ্বারাই এরা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা বাদে অন্য কোন সমমর্যাদাসম্পন্ন আইনসভার অস্তিত্ব এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় থাকতে পারে না।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, নওওয়ে, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর এককেন্দ্রিক চরিত্র। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক সংস্থা থাকে বটে, কিন্তু ঐ সংস্থাগুলো অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বীকৃত নয়—সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র চরম কর্তৃত্ব হিসেবে স্বীকৃত এবং কেন্দ্রীয় আইনসভাই একমাত্র সার্বভৌম আইনসভার মর্যাদা ভোগ করে।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

অন্যান্য শাসনব্যবস্থার মত এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার দোষগুণ রয়েছে। নীচে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার গুণ আলোচনা করা হল:

১. এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র দেশে একই আইন, নিয়ম-কানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। ফলে তা দেশে সমরূপতা (uniformity) রক্ষায় সাহায্য করে। সমগ্র দেশে একটি সরকার এবং একই প্রকারের আইন থাকার জন্য বিভিন্ন সরকার প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধিতা ঘটার সম্ভাবনা থাকে না এবং শাসনব্যবস্থা অনাবশ্যক জটিল না হয়ে সহজ ও সরল হয়ে ওঠে।

২. এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র কর্তৃত্বের (authority) অস্তিত্ব থাকায় জরুরী অবস্থায় ঐ সরকার অধিকতর দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে পারে।

৩. এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় জনগণের আনুগত্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত না হবার জন্য দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব। বস্তুত এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় জনগণের মধ্যে বিভেদকামী মনোবৃত্তি কম দেখা দেয়।

৪. এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় এই নমনীয়তা ও সুপরিবর্তনশীলতা এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শাসনব্যবস্থার এই নমনীয়তা এককেন্দ্রিক সরকারকে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে সাহায্য করে। উপরন্তু এই শাসনব্যবস্থা আর্থনীতিক দিক থেকেও সুবিধাজনক, কারণ এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থেকে সরকার পরিচালনার ব্যয় অনেক কম হয়।

---

১. "The essence of a unitary state is that the power of the Central Government is unrestrained, for the constitution does not admit any other law making body than the Central one."
—C. F. Strong

২. "The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power."
—Dicey

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

১. প্রতিটি অঞ্চলের জনসাধারণের ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী নিজেদের কল্যাণার্থে শাসন পরিচালনা করার গণতান্ত্রিক নীতি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সরকার গঠনের অধিকার থাকে না। ফলে এই ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিকাশের সহায়ক নয় এবং এই ব্যবস্থা স্যামগ্রিক ভাবে জাতীয় প্রগতির পরিপন্থী।

২. রাষ্ট্রের আয়তন কম হলে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা চলতে পারে কিন্তু বিশাল ও বিরাট রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার একেবারেই অচল। বিশাল রাষ্ট্রে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি অঞ্চলের জনগণের অভাব, অভিযোগ ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে সুশাসনের ব্যবস্থা করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভারতের মত বিশাল দেশে যদি এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা থাকে তবে দিল্লী থেকে সুদূর আসাম বা তামিলনাড়ু বা গুজরাটে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হোত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

৩. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সরকারকে স্বৈরচারী করে তোলে এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাই লাস্কি মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভক্ত করেই ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের সংযত রাখা যেতে পারে।

পাঁচ : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Federal Form of Government)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংবিধানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রাজিল, মেক্সিকো ইত্যাদি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়।** যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে।

যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে ?

অনেক সময় দেখা যায় যে, শাসনকাজের সুবিধার জন্য বা জাতি, ধর্ম ভাষাগত বিভিন্নতার জন্য বা অন্য কোন কারণে একটি রাষ্ট্রকে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে বা প্রদেশে বিভক্ত করে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে সরকার এবং কেন্দ্রে আর একটি সরকার স্থাপন করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়। আবার কখনও দেখা যায়, কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বৈদেশিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা বা আর্থনীতিক স্বার্থে মিলিত হয় এবং নিজেদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বজায় রেখেও একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। একই রাষ্ট্রে পাশাপাশি এরূপ আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব যে শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের মিলন ঘটতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে। ফাইনার বলেছেন যে, **যেখানে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক এলাকাগুলোতে ন্যস্ত থাকে এবং অন্যান্য অংশ কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।** (A federal state is one in which part of authority and power is vested in the local areas while another part is vested in a central institution deliberately constituted by an association of the local areas)।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবিভাজন নীতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেয়া হয় যাতে রাষ্ট্রের সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বা যৌথ-স্বার্থসম্পন্ন বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকারের এক্তিয়ারে রাখা হয়। উভয় পর্যায়ের সরকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্বাধীন থেকে কাজ পরিচালনা করে এবং একে অন্যের ব্যাপারে সাধারণত

হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অধ্যাপক কে. সি. হুইয়ার বলেছেন: যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ক্ষমতাবণ্টনের এমন পদ্ধতি অনুসরণ করে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলো প্রত্যেকেই নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে স্বাধীন থাকে এবং পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে।[১]

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করার ব্যাপারে একই নীতি অনুসরণ করা হয় না—এই ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary powers) অঙ্গরাজ্যগুলোকে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে এর বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, সেখানে অংগরাজ্যগুলোর ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে। ভারতে অবশ্য ঐ দুটির কোন নীতিকে না মেনে তৃতীয় আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সরকারের সকল ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করে একটি অংশ কেন্দ্রের, অপর অংশ অঙ্গরাজ্যগুলোর এবং তৃতীয় অংশ যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর যুগ্ম কর্তৃত্ব থাকবে। তবে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় নিয়ে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বই বজায় থাকবে।

যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে **উভয় পর্যায়ের সরকারই নিজ নিজ এলাকায় মোটামুটিভাবে স্বাধীন থেকে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী** এবং একে অন্যের ব্যাপারে তত্ত্বগত দিক থেকে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ডাইসি মনে করেন যে, সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সমন্বয়মূলক সংস্থার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিভক্ত করে দেওয়াকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলে।[২]

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য

ডাইসি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পেছনে যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তা না হলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ডাইসির মতে জাতীয় ঐক্য এবং অঙ্গরাজ্যের স্বাধিকারের সমন্বয় সাধনের রাজনৈতিক পন্থা হল যুক্তরাষ্ট্র (A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state-rights)। যখন পাশাপাশি অবস্থিত স্বতন্ত্র ভু-খণ্ডের অধিকারী বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্যভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ঐ জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ এবং মিলিত হতে চায়, অথচ প্রতিটি জাতীয় জনসমাজ-বিশিষ্ট অঞ্চল তাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়—তখন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র ঐ আপাত-বিরোধী ইচ্ছা দুটো রূপায়িত হতে পারে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থার রাজনৈতিক সমাধান হ'ল যুক্তরাষ্ট্র গঠন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছা পোষণ না করে শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই সে দাবী পূরণ করতে পারে। আবার ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা পোষণ না করে শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্য ভোগের দাবী করলে প্রত্যেকটি জনসমাজের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করে ঐ ইচ্ছা পূরণ করা যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই যুগপৎ ইচ্ছা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লাভ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

১. আগেই বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দু শ্রেণীর সরকারের (two sets of

---

১. "By the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional governments are each within a sphere, co-ordinate and independent." —K. C. Wheare

২. "Federalism means the distribution of the powers of the State among a number of co-ordinate bodies each originating in and controlled by the constitution." —Dicey

governments) অবস্থিতি দেখা যায়। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এক প্রকার এবং কেন্দ্রে আর এক প্রকার সরকার অবস্থান করে।

২. সংবিধানগত স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উৎপত্তি ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দু শ্রেণীর সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন ও পরস্পরের এক্তিয়ার শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দেশ করে দেয়া হয় ; যদিও ঐ বণ্টন নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের। নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে উভয় সরকারই চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেউ কারও অধীন নয়।

৩. সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে যাতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহ সুনিশ্চিতভাবে পরিচালিত হতে পারে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত (written constitution) হওয়া প্রয়োজন। উড্রো উইলসনের মতে লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য না হলেও এর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪. সংবিধানের অবিসংবাদিত প্রাধান্য (supremacy of the constitution) যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সংবিধানের প্রাধান্য না থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম চলতে পারে না।

৫. সংবিধানের ধারাগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলোর অধিকার ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Judiciary) থাকা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে অথবা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে কোন মতভেদ উপস্থিত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তার নিষ্পত্তি করবে। অর্থাৎ এককথায় যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য (supremacy of Judiciary) থাকা উচিত। বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য রক্ষার দ্বারাই সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬. কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলোর সরকার যাতে নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করে অন্যের ক্ষমতা হস্তগত ও আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid) হওয়া কাম্য।

৭. সমানাধিকারের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের জন্য আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার দুটি কক্ষ সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বা উচ্চকক্ষে (Second or Upper Chamber) অঙ্গরাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা হয়।

বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের কতটা পরিমাণ অস্তিত্ব রয়েছে তার ভিত্তিতে হুইয়ার (Wheare) যুক্তরাষ্ট্র এবং আধা-যুক্তরাষ্ট্র (quasi-federal) এই দু' ধরনের শ্রেণীবিভাগ করার পক্ষপাতী। কোন কোন রাষ্ট্র কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র হলেও বাস্তবে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানের এত অভাব থাকে যে তাকে পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশের শাসনব্যবস্থাকে আধা-যুক্তরাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য দুটি পদ্ধতি গৃহীত হতে পারে। অনেক সময় ছোট ছোট কতকগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র সার্বিক উন্নতি এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে (অথবা অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা বিজিত হয়ে) কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির (process of centralisation) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে থাকে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। আবার অনেক সময় একটি বৃহৎ রাষ্ট্র শাসনের সুবিধার জন্য নিজেকে কয়েকটি আঞ্চলিক সরকারে বিভক্ত করে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির (process of decentralisation) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে থাকে (যেমন, কানাডা যুক্তরাষ্ট্র)।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত

উপরোক্ত পদ্ধতি দুটির মধ্যে যে কোনটির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হোক না কেন, কোন একটি রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যাবে কিনা অথবা ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও তা সাফল্যলাভ করতে পারবে কিনা, তা কতকগুলো বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভর করে। **অনুকূল ঐ বাস্তব অবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত বলা হয়।**

প্রথমত, যে সকল অঞ্চল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করতে হলে ঐ অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ হবার ইচ্ছা থাকতে হবে। এবার আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যে, কোন্ কোন্ কারণে বা অবস্থায় জনসমাজ সংঘবদ্ধ হতে চায়। ক. প্রথমেই আসে ভৌগোলিক সান্নিধ্যের প্রশ্ন। ভৌগোলিক সান্নিধ্য জনসমাজের ভিতর এমন একটা একাত্মবোধ জাগায় যার ফলে বিভিন্ন জনসমাজের ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয়। অন্যদিকে ভৌগোলিক ব্যবধান যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্তরায় সৃষ্টি করে; খ. আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধা ও উন্নতির সম্ভাবনা ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা বিশেষভাবে জাগ্রত করতে সাহায্য করে; গ. সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনবোধ থেকে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছা দেখা দেয়; ঘ. ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, ঐতিহ্যগত উপাদানের অভিন্নতাও এরূপ ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে থাকে; ঙ. জাতীয়তাবোধের প্রেরণাও বিভিন্ন জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে আগ্রহী করে।

দ্বিতীয়ত, মিল এবং ডাইসির মতে শুধুমাত্র ঐক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, দেখতে হবে ঐ ইচ্ছাকে কার্যকর করার ক্ষমতা আছে কিনা। সুতরাং ইচ্ছাকে কার্যকর করার যোগ্যতা থাকতে হবে। ঐ যোগ্যতা যে সকল উপাদানের ওপর নির্ভর করে তা হ'লঃ ক. ভৌগোলিক বিস্তৃতি, জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে সম-অবস্থা; খ. প্রচুর অর্থবল ও লোকবল; গ. উচ্চতর রাজনৈতিক আদর্শ ও শিক্ষা।

তৃতীয়ত, আগেই বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আর একটি শর্ত হ'ল এই যে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চাইবে অথচ তারা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করতে ইচ্ছুক হবে না (There will be desire for union, but not for unity)। সুতরাং অঙ্গরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় শর্ত।

চতুর্থত, ডাইসির মতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনসমাজ বাদে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারে না।[১] কারণ সাংবিধানিক আইন এবং বিচারবিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং আইনকে শ্রদ্ধা ও মান্য করা এবং বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি কোন জনসমাজের না থাকলে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারে না।

উপরোক্ত শর্তগুলো পালিত হলে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং তাকে সফল করা সম্ভব। কিন্তু এও দেখা গেছে যে, দুটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা একরকম হওয়া সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা এবং অন্য রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সুতরাং এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, **যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং তাকে সফল করার জন্য উপরোক্ত শর্তগুলো প্রয়োজনীয় হলেও, অপরিহার্য নয়।**

ছয়ঃ যুক্তরাষ্ট্রগুলোতে কেন্দ্রিকতার সাম্প্রতিক প্রবণতা (Recent Centralising Trends)

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা কি অনুপাতে এবং কোন্ নীতিতে বণ্টিত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয়

১. "A Federal system can flourish only among the communities imbued with a legal spirit."

সরকার খুবই শক্তিশালী, আবার কোথাও কোথাও দেখা যাবে যে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কোন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলোকে দুর্বল রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে ক্রমবর্ধিত করলে বাস্তবে এক সময় তা এককেন্দ্রিক সরকারে রূপান্তরিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে কে কোন্ ক্ষমতা ভোগ করবে সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সাধারণত, বৈদেশিক সম্পর্ক, সামরিক বিভাগ, মুদ্রা, বৈদেশিক ব্যবসায়, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি সমগ্র দেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে। এ ছাড়া সকল যুক্তরাষ্ট্রেই প্রধান প্রধান কর আদায়ের ব্যাপক ক্ষমতা কেন্দ্রের অধীনে থাকে।

সম্প্রতিকালে সর্বত্রই যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সব যুক্তরাষ্ট্রে পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণের দ্বারা পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা হচ্ছে। ফলে সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার শক্তিশালী হচ্ছে। তাই বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের কারণ হল পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যাপক প্রয়োগ (Planning is the D. D. T. of federalism)।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধকালীন ও জরুরী অবস্থায় বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, কেন্দ্র কর্তৃক কর আদায়ের নতুন নতুন এলাকা ও অধিকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে আর্থিক দিক থেকে অঙ্গরাজ্যগুলোকে সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। এটা কেন্দ্রিকতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার একটা কারণ।

এ সকল কারণে ভারতসহ সকল যুক্তরাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারগুলোর শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। কেন্দ্রিকতার এই প্রবণতা একই ধারায় চলতে থাকলে কাঠামোগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র হলেও বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রগুলো এককেন্দ্রিক সরকারে পরিণত হচ্ছে।

কেন্দ্রিকতার এই প্রবণতার ফলে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে একটা তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করছে।

সাত : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দোষগুণ (Merits and Demerits of a Federation)

এর আগে আমরা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আলোচনা করেছি। মূলত এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার যা ত্রুটি তাই যুক্তরাষ্ট্রের গুণ এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার যা গুণ যুক্তরাষ্ট্রের তাই ত্রুটি। নীচে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দোষ ও গুণ আলাদাভাবে আলোচনা করা হল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণ

১. যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সুবিধা হিসাবে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও বড় রাষ্ট্রের শক্তি এবং সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে।

২. এরূপ শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বতন্ত্র আইনসভা ও সরকার থাকার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহশীল হয়।

৩. যে রাষ্ট্রের জনগণ নানাপ্রকার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মগত ও ভাষাগত পার্থক্যের দ্বারা বিভক্ত থাকে সেখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অধিকতর উপযোগী।

৪. ডাইসিকে অনুসরণ করে তাই বলা যায় যে, বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজের একদিকে নিজস্ব অধিকার রক্ষার আগ্রহ এবং অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ইচ্ছা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়েই নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৫. এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যাপকতার মধ্যে কোনরূপ পরীক্ষামূলক কাজ চালানো বিপজ্জনক, কারণ এতে বহুসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে নানারূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে।

৬. একটিমাত্র সরকার বৃহৎ দেশ শাসন করলে সুশাসনের অভাব দেখা যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যা ও অবস্থা সম্পর্কে আঞ্চলিক সরকারগুলো অধিকতর অবহিত ও ওয়াকিবহাল থাকায় দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা করা যেতে পারে।

৭. যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী সরকারের (কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক) অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা কম। কারণ সংবিধান ও বিচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু গুণ আছে ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থা দোষমুক্ত নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, যা নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল, দুর্বল এবং ব্যয়বহুল। এর জটিলতার জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা কষ্টকর। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দু স্তরের শাসন পরিচালনা করার জন্য প্রচুর সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটে।

২. কর্তৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত থাকার জন্য এবং বিভিন্ন প্রকারের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি (formality) গ্রহণ করতে হয় বলে যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য যুদ্ধের সময়, জাতীয় সংকটকালে এবং জরুরী অবস্থায় অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

৩. নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হবার জন্য পক্ষপাতহীন বিচার সর্বদা আশা করা যায় না। ফলে, অঙ্গরাজ্যগুলো অবহেলিত থাকে এবং উপেক্ষিত হবার ঐ মানসিকতা যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করে।

৪. আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরস্পরবিরোধী আইন প্রণয়নের ফলে ব্যক্তিগত অধিকার ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক সময়ই যুক্তরাষ্ট্রে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি দেখা যায়।

৫. যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান থাকে বলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে একে সহজে সংশোধন করা যায় না। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহজে পরিবর্তিত করা যায় না বলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে সংবিধান পরিবর্তনের রীতি প্রচলিত হয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ঐ সকল দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, প্রতিটি অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে ঐকবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সম্ভব। যে রাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা খুব বেশি সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র দুটিতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে।

আট ঃ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Indian Federation)

কাঠামোগত দিক থেকে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, যদিও আমাদের সংবিধানের কোথাও যুক্তরাষ্ট্র বা federation শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ভারতের সংবিধান কতটা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভারতের সংবিধানে কতটা আছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য

আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো ভারতের শাসনব্যবস্থায় কতটা স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে।

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত লিখিত সংবিধান থাকে এবং ঐ লিখিত সংবিধান থেকে ক্ষমতা লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোতে দু ধরনের সরকার বা দ্বৈত সরকার **(Dual Government)** সহাবস্থান করে। ভারতের সংবিধান লিখিত এবং এখানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোতে দ্বৈত সরকারের অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় (বা জাতীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয়) সরকার এবং ৫০টি অঙ্গরাজ্য (State) সরকার আছে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং চার ধরনের অঙ্গরাজ্য ও আঞ্চলিক সরকার দেখতে পাওয়া যায়। ঐগুলো হল ইউনিয়ন রিপাবলিক, অটোনমাস রিপাবলিক, অটোনমাস রিজিয়ন এবং ন্যাশনাল এরিয়া। ভারতেও আমরা একটি কেন্দ্রীয় এবং অনেকগুলো অঙ্গরাজ্যের সরকার দেখতে পাই। অর্থাৎ সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য দু ধরনের সরকার সহাবস্থান করে।

মোট ২২টি অঙ্গরাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।[১] কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ছাড়াও প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে রাজ্য সরকার আছে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন (Distribution of Powers) করে দেয়। ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতার বণ্টনের জন্য তিনটি তালিকা আছে। প্রথমটি কেন্দ্রীয় তালিকা—(Union List)। এতে সমগ্র দেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো আছে এবং ঐগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় তালিকাকে বলে রাজ্য তালিকা (State List)। এই তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলো অঙ্গরাজ্যগুলোর এক্তিয়ারভুক্ত। তৃতীয় তালিকা বা যুগ্ম তালিকার (Coneurrent List) অন্তর্গত বিষয়গুলোর ওপর কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য উভয়ের এক্তিয়ার আছে। **যেমন শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত।** তবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয় নিয়ে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারই স্বীকৃত হবে—এ কথা সংবিধানে বলা হয়েছে।

সঙ্গতভাবেই বলা যায়, ভারতে কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিমাণ খুব বেশি এবং অঙ্গরাজ্যগুলোকে ন্যায্য ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।[২]

---

১. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

অঙ্গরাজ্য	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
(১) অন্ধ্রপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বিহার,	(১) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ,
(৪) মহারাষ্ট্র, (৫) গুজরাট, (৬) মধ্যপ্রদেশ,	(২) অরুণাচল প্রদেশ,
(৭) হরিয়ানা, (৮) হিমাচল প্রদেশ,	(৩) চণ্ডিগড়,
(৯) জম্মু ও কাশ্মীর, (১০) কেরালা,	(৪) দাদরা ও নগর হাভেলী,
(১১) মণিপুর, (১২) মেঘালয়, (১৩) কর্ণাটক,	(৫) দিল্লী,
(১৪) নাগাভূমি, (১৫) উড়িষ্যা, (১৬) পাঞ্জাব,	(৬) গোয়া-দমন ও দিউ,
(১৭) রাজস্থান, (১৮) তামিলনাড়ু,	(৭) লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিন দিভি
(১৯) ত্রিপুরা, (২০) উত্তরপ্রদেশ,	(৮) মিজোরাম,
(২১) পশ্চিমবঙ্গ, (২২) সিকিম	(৯) পণ্ডিচেরী

[৩৭তম সংবিধান সংশোধন আইনে সিকিমকে ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।]

২. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ক্ষমতাবণ্টন নীতিকে যাতে সহজে পরিবর্তন করা না যায় বা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর ক্ষমতার ভারসাম্য যাতে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা না যায় সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনশীল (Rigidity of the Constitution) হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতের সংবিধান সহজ পরিবর্তনশীল বা দুষ্পরিবর্তনশীল কোনটাই নয়—এটি মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করেছে।[১]

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র যাতে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে বা অঙ্গরাজ্যগুলো যাতে কেন্দ্রের ক্ষমতায় ও অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে তা দেখার জন্য একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Independent Federal Judiciary) থাকে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হল স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং এর ওপর ঐ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগ এবং সংবিধানের প্রাধান্য (Supremacy of the Judiciary and Constitution) থাকা প্রয়োজন। সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে বা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অস্তিত্বই যথেষ্ট নয়, বিচারবিভাগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। বিচারবিভাগের প্রাধান্য রক্ষার দ্বারা সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষিত হয়। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিচারবিভাগীয় প্রাধান্য রক্ষিত হয়নি। ভারতে শাসনতন্ত্রের অন্যতম বিশেষজ্ঞ শ্রীদুর্গাদাস বসুর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগের প্রাধান্য ও ব্রিটেনে সংসদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ভারতে ঐ দু-এর মধ্য-পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে (...wonderfully adopts the via media between the American system of judicial supremacy and English principle of parliamentary supremacy)। **যাহোক কাঠামো ও প্রকৃতিগত দিক থেকে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়।**

কিন্তু ঐ সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর **অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে আমাদের সংবিধান কয়েকটি দিক থেকে স্বতন্ত্র।** ভারতের সংবিধান কেন্দ্রকে এত বেশি প্রাধান্য দিয়েছে যে তুলনায় অঙ্গরাজ্যগুলোকে নিতান্ত ক্ষমতাহীন বলে মনে হয়। তাই অনেকে মনে করেন যে, ভারতে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। এরূপ মনে করার কারণগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ঘাটতি

১. যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর যে মর্যাদা, ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলো সে মর্যাদা পায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে "অংগরাজ্যের অধিকার" (State Rights) নামে যে বিধান আছে, আমাদের সংবিধানে তা নেই। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আগে ভারতের অংগরাজ্যের সম্মতিও লওয়া হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংগরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে কি না তা স্পষ্টভাবে বলা নেই। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যের ঐ অধিকার আছে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, কোন অংগরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

২. ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি মান্য করা হয়নি। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের তিনটি তালিকা ভারতের সংবিধানে স্থান পেয়েছে। প্রথম তালিকায় (কেন্দ্র তালিকা) ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় তালিকায় ৬৭টি বিষয় আছে। একে 'রাজ্য তালিকা' বলে। ঐ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অংগরাজ্যগুলো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তৃতীয় তালিকাকে বলে 'যুগ্ম তালিকা'। যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলো সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। তবে যুগ্ম তালিকার অধীন কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্র এবং কোন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যই বজায় থাকবে। ঐ তিনটি তালিকার বাইরে যে সকল

১. ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ক্ষমতা অনুল্লেখিত থাকবে সেগুলো সম্পর্কে কর্তৃত্বের অধিকার কেন্দ্রকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারে ভারতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেছে। সেখানে রাজ্য সরকারগুলোর আলাদা সংবিধান আছে। কিন্তু ভারতের রাজ্যগুলোর জন্য আলাদা কোন সংবিধান নেই।

৪. আমাদের নাগরিকদের দ্বিনাগরিকত্বেরও কোন অধিকার নেই, আমরা সকলেই ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। দ্বি-নাগরিকত্ব না থাকাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী বলে মনে করা হয়।

৫. ভারতের অঙ্গরাজ্যসমূহের ভূখণ্ডের পরিবর্তন ও নাম পরিবর্তন করা যায় এবং ঐ অধিকার কেন্দ্রীয় সংসদের। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা করা কখনও সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল *an indestructible union composed of indestructible states.*

৬. ভারতে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হয়। তাঁরা ইচ্ছা করলে রাজ্য আইনসভায় গৃহীত যে কোন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাতে পারেন।

৭. ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিরাও রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। সুইজারল্যাণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ দেখা যায় না।

৮. যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিনিধির সংখ্যা সমান থাকা উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চকক্ষ সিনেটে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত। ধনজনশালী বৃহৎ নিউইয়র্ক ও ক্ষুদ্র আলাস্কা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে দুজন করে প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু ভারতের রাজ্যসভায় প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা সমান নয়; যেমন, উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি ৩৪ জন এবং আসামের প্রতিনিধি মাত্র ৭ জন। রাষ্ট্রপতি মনোনীত ১২ জন সদস্যও রাজ্যসভায় আছেন।

৯. যদি দুটি বা ততোধিক অঙ্গরাজ্যের আইনসভা এমন প্রস্তাব পাশ করে যে, অঙ্গরাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করলে ভাল হয়, তা হলে (২৫২ ধারা অনুযায়ী) ঐ বিষয়ে ভারতীয় সংসদ আইন করতে পারবে। আরও একটি বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্যের অধিকারভুক্ত বিষয়ের ওপর আইন করতে পারে। ভারত সরকার বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সংগে সন্ধি বা চুক্তি করলে ঐ চুক্তির শর্ত পালনের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে কেন্দ্র আইন করতে পারে (২৫৩ ধারা)।

১০. জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণের এত বেশি অধিকার থাকে যে, সাধারণ অবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলো যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে জরুরী অবস্থায় সেটুকু স্বাধীনতাও ভোগ করতে পারে না। ঐ অবস্থায় আমাদের সংবিধান প্রায় এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

১১. অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিকতার ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল। বর্তমানে আর্থনীতিক পরিকল্পনার দরুন রাজ্য সরকারগুলোকে অর্থের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় বলে তাদের স্বাধীনতা একান্তভাবে সংকুচিত। পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণের ফলে ভারতে কেন্দ্রিকতার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। আবার অনেকে মনে করেন যে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একদলীয় শাসন দীর্ঘকাল চলেছে বলে এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক ক্রমাগত বাড়ছে।

তাহলে ভারতকে কি যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যায়?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে কতকগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় মৌল বৈশিষ্ট্য আছে এবং কাঠামোগত দিক থেকে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলা যায়। কিন্তু অন্য দিকে ভারতের সংবিধানে কতকগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় মৌলনীতির ঘাটতি দেখা যাচ্ছে যার জন্য ভারতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রাধান্য খুব বেশি এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাধীকার খুবই সীমিত। এ সকল কারণে অধ্যাপক জেনিংস্ (Jennings) বলেন, ভারত হল এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র যেখানে কেন্দ্রিকতার প্রবণতা খুব

বেশি (a federation with strong centralising tendency)। অধ্যাপক হুইয়ার (Wheare) মনে করেন যে, ভারতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে তার সঙ্গে কিছু কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে (A system of government which is quasi-federal……a unitary state with subsidiary federal features, rather than a federal state with subsidiary unitary features)। শ্রীদুর্গাদাস বসুও এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, **ভারতের সংবিধান পুরোপুরি যুক্তরাষ্ট্রীয় বা পুরোপুরি এককেন্দ্রিক—এর কোনটাই নয়। ভারতের সংবিধানে উভয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটেছে।** আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র হলেও সংবিধানে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে (The Constitution of India is neither federal nor purely unitary, but is a combination of both. It is a Union or a composite state of novel type. It enshrines the principle that in spite of federation the national interest ought to be paramount)। তাই অনেকে বলেন **ভারতের শাসনব্যবস্থা আংশিক যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আংশিক এককেন্দ্রিক।**

উপসংহার : ভারত আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়

একটি সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কি-না তা কেবল লিখিত ধারা-উপধারার মধ্যেই নিহিত থাকে না। সংবিধানের দৈনন্দিন প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তা কার্যকর করার সময়ে প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। লিখিত আকারে যাই থাকুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মধ্য দিয়েই তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি গড়ে ওঠে। বিগত ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরের দেশ-শাসন থেকে দেখা যায় যে, একদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। তাই শ্রীদুর্গাদাস বসু মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় যে, ভারতে একদিকে কেন্দ্রিকতার বন্ধনগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর অবলুপ্তি ঘটেছে (The unitary bonds have in some respects been futher tightened, the federal features have altogether withered away)।

কেন্দ্রিকতার প্রবণতা বৃদ্ধি

ভারতে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রিকতার কারণ হিসেবে আমরা তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি : ১. অর্থের জন্য কেন্দ্রের ওপর রাজ্যসরকারসমূহের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা, ২. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ণ এবং ব্যাপক ক্ষমতা এবং ৩. দীর্ঘদিন যাবৎ সকল রাজ্য ও কেন্দ্রে একটি দল (কংগ্রেস) কর্তৃক শাসন-পরিচালনা। সাধারণ নির্বাচনের পরে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হবার পর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন অ-কংগ্রেসী অঙ্গরাজ্য সরকারের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের এ ব্যাপারে তীব্র মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে। অনেকে মনে করেন, অঙ্গরাজ্যগুলো বঞ্চিত হচ্ছে, জনগণের মধ্যে এ ধরনের মনোভাবের ব্যাপক প্রসারের জন্য সাম্প্রতিককালের আসাম ও পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হচ্ছে। সম্প্রতি দাক্ষিণী অঙ্গরাজ্যগুলোতে কেন্দ্রবিরোধী জেহাদ ঘোষিত হয়েছে। এসকল কারণে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার **সারকারিয়া কমিশন** (Sarkaria Commission) নিয়োগে বাধ্য হয়েছেন।[১]

---

১. ভারতে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয় প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং গভীর রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। ফলে একদিকে আসাম, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে অঙ্গরাজ্য সরকারগুলো, বিশেষ করে অ-কংগ্রেসী সরকারগুলো, ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রকতার প্রবণতা থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবস্থা মোকাবিলায় প্রস্তুত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ও আর্থিক ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করে আসছে। কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভারতের চারটি অ-কংগ্রেসী রাজ্য সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে মোকাবিলা করার জন্য ঐ রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের একটি সংস্থা গঠন করেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্ ধরেই নাড়া পড়েছে। ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পরীক্ষার জন্য সারকারিয়া কমিশন (Sarkaria Commission) গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

যাহোক, সকল কিছু বিচার-বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো থাকলেও এখানে এককেন্দ্রিকতার প্রবণতা খুব বেশি। তাই কাঠামোগত দিক থেকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও ভারতের শাসনব্যবস্থাকে বাস্তবে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-federal) বলাই সঙ্গত। সুতরাং কে. সি. হুইয়ারকে (K. C. Wheare) অনুসরণ করে বলা যায়ঃ *In the class of quasi-federal constitutions it is probably proper to include the Indian Constitution of 1950.*

নয়. ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Powers Between Central and State Governments in India)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যের সরকার কি কি বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। মূলত ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসনবিধিকে অনুসরণ করে কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বলা হয়েছিল যে, যেসব বিষয় কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্যকে দেয়া হল বলে আইনে কোন উল্লেখ নেই সে সব বিষয় অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের হাতে থাকবে। ঐ নিয়মের বদলে ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছে যে, অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলো (Residual powers) থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ভারতীয় সংবিধানের এরূপ ক্ষমতা বণ্টন রীতিতে নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, ঐরূপ না করলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিশেষভাবে ব্যাহত হত। বর্তমানে ভারতে আরও বেশি কেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

আইন প্রণয়ন ও শাসনের সমগ্র ক্ষমতাকে ভারতের সংবিধানে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ (১) কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), (২) রাজ্য তালিকা (State List) এবং (৩) যুগ্ম-তালিকা (Concurrent List)।

ক. কেন্দ্রীয় তালিকাঃ কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি বিষয় ছিল, কিন্তু পরে একটি বিষয় বাদ যাওয়ায় বর্তমানে ৯৬টি বিষয় আছে। কেন্দ্রীয় তালিকার অধীন বিষয় সম্পর্কে ভারতীয় সংসদই আইন প্রণয়ন করতে পারে, কোন রাজ্যসরকারের ঐ বিষয়গুলোর ওপর কোন এক্তিয়ার নেই। দেশরক্ষা, যুদ্ধ ও শান্তি, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী, অস্ত্রোৎপাদন, বৈদেশিক বা পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় বিষয়, রেলপথ, জাহাজ, নাগরিকত্ব, ডাক-তার ও বেতার ব্যবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বীমা, আদমসুমারী, প্রধান প্রধান বন্দর, শেয়ার বাজার, লবণ, খনি, আফিম, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণ ও জাতীয় ঋণ প্রভৃতি এবং আরও অনেক বিষয় ঐ তালিকাতে রয়েছে।

খ. রাজ্য তালিকাঃ রাজ্য তালিকায় ৬৬টি বিষয় ছিল, কিন্তু পরে বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি বাদ যাওয়ায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকার ৬১টি বিষয় আছে। এগুলোর ওপর সাধারণ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। কেবল বিভিন্ন রাজ্যসরকারই এদের সম্পর্কে নিজ নিজ অঞ্চলে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, জেল ও বিচারব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জনস্বাস্থ্য, পথঘাট, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কৃষি-শিক্ষা ও গবেষণা, পরিবহণ, জল সরবরাহ, সেচব্যবস্থা, ভূমি-ব্যবস্থা, সমবায় আন্দোলন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ৪২তম সংবিধান সংশোধনীতে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে যুগ্ম তালিকায় আনা হয়েছে।

যদিও ঐ সব বিষয় রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত, তা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন এবং শাসন করতে পারেন। যেমন, (১) রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে, (২) একের বেশি রাজ্যসরকার অনুরোধ জানালে, (৩) রাজ্য সভার

দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে এবং (৪) পররাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি বা চুক্তি পালনের জন্য প্রয়োজন মনে করলে—সংসদ রাজ্য তালিকার অধীন ঐ সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার অঙ্গরাজ্যের হাত থেকে নিজ হাতে তুলে নিতে পারে।

গ. যুগ্ম-তালিকা ঃ যুগ্ম তালিকাতে ৪৭টি বিষয় লিপিবন্ধ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার উভয়েই ঐ সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারেন। তবে উভয়ের আইনের মধ্যে বিরোধ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্যসরকারের আইন বাতিল হয়ে যায়। ফৌজদারী আইন ও কার্যবিধি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেওয়ানী বিচার ও কার্যবিধি, শ্রমিক বিরোধ, সামাজিক বীমা, পুনর্বাসন, জন্মমৃত্যুর খতিয়ান, কারখানা, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, পুস্তক, ছাপাখানা, ছোট ছোট বন্দর, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দেউলিয়া প্রভৃতি বিষয় যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কিছুদিন আগে **শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায়** আনা হয়েছে।

যে-সব বিষয় ঐ তিনটি তালিকার কোথাও উল্লিখিত হয়নি সে সকল অনুল্লিখিত বা অবশিষ্ট বিষয়সমূহ (Residuary Powers) কেন্দ্রের অধীন থাকবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলো কি কি বিষয় থেকে আয় করতে পারবে তাও সংবিধানে লিপিবন্ধ আছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে আয়ের উৎসগুলোও বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, আয়কর, সম্পত্তি কর, বাণিজ্য শুল্ক, অভ্যন্তরীণ দ্রব্যাদির ওপর শুল্ক, রেলপথ, ডাক ও তার ইত্যাদি হল কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের উৎস। আয়করের কিছু অংশ বিভিন্ন রাজ্যসরকারের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় এবং পাট রপ্তানি শুল্কের কিছু অংশ পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলোকে (যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি) দেয়া হয়।

রাজ্যসরকারগুলোর আয়ের উৎস হল ভূমি-রাজস্ব, কৃষি-আয়কর, বিক্রয়-কর, রেজিস্ট্রেশন, বিদ্যুৎ কর, আবগারী শুল্ক, প্রমোদ কর, কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত আয়করের অংশ এবং অর্থ-সাহায্য (Grants-in-aid)।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। কেন্দ্র ও রাজ্য প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে বা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আইনগত চরম কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলোর শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন। সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, রাজ্যসরকারগুলোর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের দ্বারা প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করতে হবে এবং রাজ্যসরকারগুলোর শাসন-ক্ষমতা যেন কখনই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতার পরিপন্থী না হয় বা তাকে ব্যাহত করে। তা ছাড়া যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিতে পারবে এবং ঐ নির্দেশ অনুসারে রাজ্যসরকারকে শাসন চালাতে হবে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনবোধ করলে রাজ্য-তালিকার অধীন বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারবে এবং রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রের হাতে তুলে নিতে পারবেন।

দশ ঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Centre and States)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে আইনগত, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয়, অর্থসম্বন্ধীয়, রাজস্ব আদায় ও বণ্টনগত নানাপ্রকার সম্পর্ক থাকে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যেকার বিভিন্ন সম্পর্ক আলোচনা করা হল ঃ

ক. আইনগত সম্পর্ক (Legislative Relations)

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্র অধিকতর শক্তিশালী

আগেই বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের সপ্তম তপশীলে তিনটি তালিকা আছে ঃ কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্যতালিকা এবং যুগ্ম-তালিকা। ঐ তিনটি তালিকার বহির্ভূত বিষয় (residuary powers) সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে সেই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকায় উল্লিখিত নেই এরূপ অবশিষ্ট বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে

উভয়ের প্রণীত আইনের মধ্যে বিরোধ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্য-সরকারের আইন বাতিল হয়ে যায়।

সাধারণ অবস্থায় রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন করতে সক্ষম না হলেও কয়েকটি অবস্থায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। **প্রথমত,** যদি রাজ্যসভায় (Council of States) উপস্থিত সভ্যগণ দু-তৃতীয়াংশের ভোটে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন আবশ্যক বা যুক্তিসঙ্গত তা হলে সংসদ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। এরূপ আইনের মেয়াদকাল এক থেকে আড়াই বছরের বেশি হবে না।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র ভারত কিংবা এর কোন অঞ্চলের নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার যুক্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা (Emergency) ঘোষিত হলে সংসদ ঐ ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে রাজ্য-তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করতে পারবে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সংসদ এ ধরনের আইন করলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রত্যাহার হওয়ার পর এরূপ আইনের মেয়াদ আরও ছমাস কাল বলবৎ থাকবে।

তৃতীয়ত, দুটি বা ততোধিক রাজ্যসরকার যদি মনে করে যে, রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন করার ক্ষমতা না থাকলেও ঐ সকল রাজ্যসরকারের সুবিধার জন্য ঐ বিষয়ে সংসদেরই আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য তা হলে অঙ্গরাজ্যের সেই আইনসভাগুলো ঐ মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে এবং সংসদ ঐ রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

চতুর্থত, কোন বিষয় রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হলেও কোন সন্ধিশর্ত বহাল করার বা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন চুক্তি ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

যদি রাজ্যসরকারের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইন সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের অথবা বর্তমানে প্রচলিত আইনের বিরোধী হয়, তা হলে রাজ্যসরকারের প্রণীত ঐ আইন রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত হবে এবং তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হলে তবে বলবৎ হবে। এ ধরনের আইন সম্পর্কে সংশোধনমূলক আইন প্রণয়ন করার অধিকার সংসদের আছে।

খ. প্রশাসনিক সম্পর্ক (Administrative Relations)

কেন্দ্রীয় সংসদ প্রণীত আইন ভারতের সব অঙ্গরাজ্যে প্রয়োগ করা বাধ্যতামূলক। কোন রাজ্যসরকার সংসদ-প্রণীত কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। সাধারণ অবস্থায় সংসদ কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি শাসন করতে পারবে। কিন্তু জাতীয় অথবা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে রাজ্যসরকারগুলোকে নির্দেশ দিতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোর অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণ বিষয়ে অঙ্গরাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারবে এবং সেজন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকা চুক্তিমত দিতে বাধ্য থাকবে।

শাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও কেন্দ্রের ক্ষমতা অধিক

কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে রাজ্যতালিকার বাইরে যে-কোন বিষয়ের শাসনভার অঙ্গরাজ্যকে অর্পণ করতে পারবে। এর জন্য যে ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তিমত তা দিতে বাধ্য থাকবে।

ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যে-কোন বিচারালয়ের রায়, ডিক্রী অথবা হুকুম ভারতের ভূখণ্ডের অধীন যে-কোন স্থানে জারি হতে পারবে।

একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে কোন নদী কিংবা জলের ব্যবহার, বণ্টন, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোন বিরোধ বা অভিযোগ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে সালিশীর ব্যবস্থা করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন, তা হলে জনসাধারণের কল্যাণকল্পে রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য পরামর্শ-পরিষদ নিয়োগ করতে পারবেন।

গ. অর্থসম্বন্ধীয় সম্পর্ক (Financial Relations)

আইনসম্মত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন সরকার কোন কর ধার্য করতে পারবে না। ভারত সরকার কর্তৃক আদায়ী রাজস্ব, ভারত সরকারের ঋণলব্ধ অর্থ এবং ভারত সরকারের ঋণদান খাতে আদায়ী অর্থ ভারতীয় সঞ্চিত ভাণ্ডারে বা রাষ্ট্রীয় তহবিলে (Consolidated Fund of India) জমা হবে। রাজ্যসরকারগুলোর রাজস্বখাতে আদায়ী অর্থ ও ঋণলব্ধ অর্থ রাজ্যসরকারের সঞ্চিত ভাণ্ডারে (Consolidated Fund of the State) জমা হবে।

আর্থিক জরুরী অবস্থা

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে, ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা হলে তিনি সংবিধানের ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। ঐ জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়সম্পর্কিত সকল প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজন বোধ করলে রাজ্যসরকারের কর্মচারীদের মাইনে কমাতে পারবেন।

ঘ. রাজস্ব আদায় ও বণ্টনের পদ্ধতি

ক. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কয়েকটি কর রাজ্যসরকার সংগ্রহ করবে এবং তা থেকে আদায়ী রাজস্ব লাভ করবে ; যেমন, দলিলাদির ওপর ধার্য কর, ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্যের ওপর শুল্ক ইত্যাদি।

খ. ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য কর এবং তা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে ; যেমন, কৃষিজাত ভিন্ন অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় কর, সম্পত্তি কর (Estate duty) ; রেলপথে, সমুদ্রপথে বা বিমানপথে পণ্য ও যাত্রীর ওপর ধার্য প্রান্তকর (Terminal tax) ; রেলপথের যাত্রীভাড়া ও মাশুলের উপর ধার্য কর ; শেয়ার ও ফাট্‌কা বাজারে (Stock exchange) লেনদেনের ওপরে ধার্য কর ; সংবাদপত্র ক্রয় অথবা বিক্রয় এবং তাতে বিজ্ঞাপনের ওপর ধার্য কর।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কয়েকটি কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে বণ্টিত হবে, যেমন—আয়কর।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা এই রাজ্য ক'টিকে প্রতি বছর পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ওপর ধার্য রপ্তানি শুল্কের আয়লব্ধ অর্থের কিছু অংশ কেন্দ্র নির্দিষ্ট নিয়মে বণ্টন করে। ঐ অর্থসাহায্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের ওপর দায়যুক্ত থাকবে।

যে সকল কর বা শুল্কের সঙ্গে রাজ্যসরকারগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তার প্রবর্তন, পরিবর্তন বা সংশোধনমূলক কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া পার্লামেণ্ট বা সংসদের কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারবে না।

এ সকল বিষয়েও কেন্দ্রের প্রাধান্য দেখা দেয়

কেন্দ্রীয় সংসদ কোন রাজ্যসরকারকে যে পরিমাণ সাহায্যদান করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করবে সেই পরিমাণ সাহায্য করতে পারবে। ঐ অর্থ রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের ওপর দায়যুক্ত হবে। উপজাতিদের কল্যাণ সাধনের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হবে ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে ঐ অর্থ দেয়া হবে এবং তা রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারের ওপর দায়যুক্ত থাকবে।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে সম্পদ বণ্টনের নীতি ও পরিমাণ স্থির করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি করে **অর্থ কমিশন (Finance Commission) গঠন করা হয়।** রাষ্ট্রপতি ঐ কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের মনোনীত করবেন। কমিশন যে সুপারিশ করবেন তা সংসদ গ্রহণ করতেও পারে, নাও করতে পারে। তবে সাধারণত অর্থ-কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করেন। অঙ্গরাজ্যের আর্থিক অবস্থা, প্রয়োজন ইত্যাদি সকল কিছু বিচার-বিবেচনা করে কমিশন প্রতি পাঁচ বছরের জন্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর আর্থিক প্রাপ্য স্থির করে।

ভারতে আইনবিভাগীয়, শাসনবিভাগীয় এবং অর্থ সম্পর্কীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য ও কেন্দ্রিকতার ঝোঁক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জমাট বেঁধে উঠছে।

এগার ঃ আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet System and Presidential System)

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, আধুনিক সরকারকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর একটি হ'ল আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। শাসন পরিচালনায় রাষ্ট্রপ্রধানের একক ভূমিকা প্রধান, না আইনসভা ও মন্ত্রিসভায় ভূমিকা প্রধান এই দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারকে উপরোক্ত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার কাকে বলে ?

আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সকল ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিসভাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। মন্ত্রিসভা তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার একজন রাজা বা রানী বা রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক, প্রকৃত শাসক নন। তিনি জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না (**The symbol of nation, but does not rule the nation**)। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু সরকারের প্রধান নন। তাঁর পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নেই, সুতরাং দায়িত্বও নেই। তাঁর নামে মন্ত্রিসংসদ শাসনকার্য পরিচালনা করে।

মন্ত্রিরা আইনসভার সদস্য থাকেন এবং মন্ত্রিসংসদ তার নীতি ও কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। আইনসভা বা পার্লামেণ্ট যে আইন পাশ করে সেই আইন অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে দেশ শাসন করতে হয়। তাই এই ব্যবস্থায় আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভাকে দায়ী থাকতে হয়। এজন্য এই ব্যবস্থাকে পার্লামেণ্টারী বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বলে। মন্ত্রিসভার কাজ যদি আইনসভা অনুমোদন না করে তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে এই শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল সরকারও (Responsible Government) বলা হয়। মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা এবং আইনসভার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মানা হয় না। **ব্রিটেন, ভারত** ইত্যাদি দেশে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার দেখতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার কাকে বলে ?

অপরদিকে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন রাষ্ট্রনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকে। তাঁকেই বলা হয় রাষ্ট্রপতি। তিনি একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসনবিভাগের প্রধান। তিনি নামেও শাসক, কাজেও শাসক। এরূপ শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার কিছুটা স্বতন্ত্রীকরণ থাকে। আইনসভা আইন রচনা করে, রাষ্ট্রপতি শাসন করেন। আইনসভার কাছে রাষ্ট্রপতির কোন দায়িত্ব থাকে না, তিনি দায়ী থাকেন জনসাধারণের কাছে। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ**। এ ছাড়াও পাকিস্তান, ফ্রান্স, মিশর, ঘানা, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা দেখা যায়।

কিন্তু দেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকলেই তা রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার নাও হতে পারে। দেখতে হবে যে, রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কি না। যেমন, ভারতে যদিও একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু ভারতের শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভা বা আইনসভা চালিত শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কারণ, এখানে রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ক্ষমতা বাস্তবে খুবই কম। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ ছাড়া অচল। তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন। মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের

কাছে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করে এবং দায়িত্বশীল থাকে। এখানে রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক প্রধান (Constitutional or Titular Head) মাত্র। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন রাষ্ট্রপতি আছেন, সেখানকার সরকারকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলা হয়। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান নয়, তিনি প্রকৃত প্রধান। তিনি তাঁর কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী নন এবং তাঁর হাতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে এবং বাস্তবে তিনি তা প্রয়োগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নিযুক্ত হন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁকে পদচ্যুত করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীরা তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারী এবং তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন এবং দরকার হলে তিনি তাঁদের পদচ্যুত করতে পারেন।

মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থা উভয়েরই সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। একটির যা গুণ, অপরটির তাই ত্রুটি।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের গুণ

আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার গুণগুলো নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. মন্ত্রিসভা পরিচালিত ব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকে। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় বলতে গেলে, *It secures an essential co-ordination between bodies whose creative interplay is the condition of effective government.*

২. এই ব্যবস্থায় সংকটের সময়ে বা প্রয়োজনমত মন্ত্রিসভা বদল করে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা চলে। অধ্যাপক বেজ্‌হট্, ডাইসি প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নমনীয়তা ও প্রসারশীলতা (flexibility and elasticity) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বিশেষ গুণ।

৩. আইনসভার প্রতিনিধিগণ সকল সময় জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন, ফলে দেশে জনমতের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এতে শাসনবিভাগ দায়িত্বশীল (responsible) হয়। শাসন কর্তৃপক্ষ আইনসভার কাছে দায়ী থাকে বলে পরোক্ষভাবে জনমত তথা জনসাধারণের কাছে দায়িত্ববোধও তাদের মনে সঞ্চারিত হয়। অধ্যাপক ব্রাইসের ভাষায়, *Being in constant contact which members of the opposition party, as well as in still closer with those of their own, they have opportunities of feeling pulse of the assembly and through it the pulse of public opinion.*

৪. এই ব্যবস্থায় জনগণের সঙ্গে শাসকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষিত হয় বলে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৫. রাজতন্ত্র বজায় রেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষে (যেমন ব্রিটেন) এই ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের ত্রুটি

মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু ত্রুটিও আছে ঃ

১. অনেকে মন্ত্রিসভা-চালিত ব্যবস্থাকে দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। কারণ, মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী ও আইনসভা একে অন্যের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে।

২. আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং আইনসভার আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিদের সময় নষ্ট হয়, ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে।

৩ এই শাসনব্যবস্থায় সরকার সহজ পরিবর্তনশীল হয় বলে দীর্ঘকাল ধরে কোন সরকারী নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

৪. এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিরা শাসন পরিচালনার চেয়ে বাক্‌সর্বস্ব, জনপ্রিয় ও গণমনোহরণে বেশি দক্ষ হয়ে পড়েন। নির্বাচকদের নিয়ে মন্ত্রিদের ব্যস্ত থাকতে হয় বলে সাধারণত তাঁরা শাসনে যথেষ্ট সময় দিতে এবং শাসনের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন না।

৫. মন্ত্রিসভা-চালিত শাসন আসলে বহুশাসকের শাসন। তাই এই শাসনব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ এবং বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে।

৬. অনেকে মনে করেন, আসলে মন্ত্রিসভা-চালিত শাসন হল দলীয় স্বৈরাচার। আইনসভায় কোন একটি রাজনৈতিক দলের একাধিপত্য থাকলে ঐ শাসনব্যবস্থা দলীয় একনায়কতন্ত্রে পরিণত হতে পারে।

৭. মন্ত্রিসভা-চালিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী আইনসভা পরিচালিত হয়। আইনসভা হয়ে ওঠে মন্ত্রিসভার ইচ্ছাকে সম্মতিদানের আইনসম্মত যন্ত্র। এই ব্যবস্থায় আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে মন্ত্রিসভায় নায়কত্ব (cabinet dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের গুণ

এবার রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকারের দোষগুণ আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

১. রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হল এর স্থায়িত্ব। স্থায়িত্ব আছে বলে এই ব্যবস্থায় নীতি ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালান যায়। তাতে দেশে ও বিদেশে রাষ্ট্রের মর্যাদা বাড়ে।

২. রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থায় শাসক নির্বাচনী প্রচার কাজের চেয়ে শাসনের কাজে অধিকতর মনঃসংযোগ করতে পারেন।

৩. এই ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ, রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার কাজের এলাকা আলাদা।

৪. জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা খুবই কার্যকর। রাষ্ট্রপতির কোন সমমর্যাদাসম্পন্ন সহকর্মী থাকে না এবং সেখানে মন্ত্রিসভা থাকলেও মন্ত্রিরা বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। ফলে অতি দ্রুতভাবে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তা প্রয়োগ করতে পারেন।

(৫) যে দেশে বেশি সংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকে এবং ঘনঘন মন্ত্রিসভা বদল হয়, এরূপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন খুবই উপযোগী। কারণ রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বা আইনসভার মর্জিমত শাসনবিভাগের পতন ঘটে না। অধ্যাপক ব্রাইস বলেন যে, *Legislatures are less dominated by party spirit under the Presidential system than under the Cabinet system.*

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের দোষ

রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাও কম নয়। নীচে রাষ্ট্রপতিচালিত ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো আলোচনা করা হল ঃ

১. রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকার ফলে কুশাসনের আশংকা থাকে।

২. এ ব্যবস্থায় আইনসভার কাছে শাসক দায়িত্বশীল থাকে না বলে এতে স্বৈরাচারিতার সম্ভাবনা বেশি।

৩. এই শাসন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কার তা বোঝা যায় না।

৪. জনমতের প্রাধান্য ও ভূমিকা এই শাসনব্যবস্থায় কম থাকে, ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ উপেক্ষিত হয়।

৫. আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে কার কত ক্ষমতা—সবসময় এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কালক্রমে বিচারবিভাগের প্রাধান্য গড়ে ওঠে।

৬. এই শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ও প্রসারশীলতা খুবই কম, প্রয়োজনমত উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরকারের প্রশাসনে (মন্ত্রিসভায়) নিয়ে এসে শাসনব্যবস্থা সরল করা চলে না। অধ্যাপক বেজ্‌হটের ভাষায়, *There is no elastic element, everything is rigid, specified, stated.*

উপসংহারে বলা যায় যে, **আজকের দিনের জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের চেয়ে আইনসভা-চালিত বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনই জনসাধারণ অধিকমাত্রায় পছন্দ** করে বলে মনে হয়। দলীয় ব্যবস্থার প্রসার, জনমতের প্রাধান্য, স্বৈরাচারিতার প্রতি বিমুখতা, আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা দ্বারা শাসন-পরিচালনার প্রতি প্রবণতা—এ সকল কারণে মন্ত্রিসভা-চালিত প্রথা অনেকের কাছে তুলনামূলক ভাবে ভাল বলে মনে হচ্ছে। এমন কি অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও আইনসভা বা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্তমান যুগে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারের প্রাধান্য

বার ঃ মন্ত্রিপরিষদ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি (Basic Principles or Features of the Cabinet system)

ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি দেশে মন্ত্রিসভা-পরিচালিত বা আইনসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এরূপ শাসনব্যবস্থা কতকগুলো মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, এরূপ শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে সংসদের কোন না কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। যেমন ভারতে কোন মন্ত্রী একটানা ছমাসের মধ্যে সংসদের কোন কক্ষের সদস্য না হতে পারলে তাঁর মন্ত্রিপদ বাতিল হয়ে যায়। সাধারণত অধিকাংশ মন্ত্রী সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্য হন। এ নীতির অর্থ ও গুরুত্ব হল এই যে সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্য হলে তাঁরা জনপ্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করেন।

১. মন্ত্রিদের সংসদের সদস্য হতে হবে

শাসনবিভাগের সঙ্গে আইনসভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য। যে দল মন্ত্রিসভা গঠন করে সে দলের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে এবং মন্ত্রিসভার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী আইনসভা পরিচালিত হয়। আইনসভা ও শাসনবিভাগের মধ্যে বিরোধের ফলে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু মন্ত্রিসভা-চালিত ব্যবস্থায় এরূপ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

২. আইনসভা ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

মন্ত্রিপরিষদ সাধারণভাবে আইনসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকে। যৌথ দায়িত্বের নীতির অর্থ হল মন্ত্রিদের সকল সময় একটি সমমতাবলম্বী গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা। ভারতের সংবিধানে [৭৫(৩) ধারায়] বলা হয়েছে, *The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.* মন্ত্রিপরিষদের সভায় মন্ত্রিরা মতপার্থক্য প্রকাশ করতে পারেন বা নিজ নিজ মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু যখন মন্ত্রিপরিষদ সামগ্রিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রতিটি মন্ত্রী তখন সেই নীতি বা সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে বাধ্য—নয়তো তাঁকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে হয়। এই যৌথ দায়িত্বের নীতি না থাকলে মন্ত্রিপরিষদের সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। মন্ত্রিসভা আইনসভা বা সংসদের কাছে যৌথভাবে দায়ী থাকে। বিশেষ কোন একজন মন্ত্রী যদি সংসদের আস্থা হারান বা মন্ত্রিসভার কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব যদি সংসদে বাতিল হয়ে যায়, তা হলে যৌথ দায়িত্বের নীতি অনুযায়ী সমগ্র মন্ত্রিসভাই পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে।

৩. যৌথ দায়িত্ব

সবশেষে, দেশের শাসনব্যবস্থায় যে নেতৃত্ব, উদ্যোগ, বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রয়োজন মন্ত্রিসভা বা আইনসভাচালিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার ধারক হল মন্ত্রিপরিষদ। যে কোন গোষ্ঠীরই যেমন এক একজন পথ-নির্দেশক নেতা থাকা প্রয়োজন, মন্ত্রিসভার পক্ষেও তেমনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অপরিহার্য। মন্ত্রিসভার মধ্যমণি প্রধানমন্ত্রী, তিনিই এর ভিত্তিপ্রস্তর। তিনি মন্ত্রিপরিষদের নিয়োগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বা রানীকে পরামর্শ

৪. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব

দেন। তিনি মন্ত্রিদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, ঐক্য রক্ষা করেন, পরস্পরের বিবাদ মেটান। কেবিনেট সদস্যদের প্রত্যেকের মর্যাদা সমান। তবুও দলের নেতা এবং রাষ্ট্র প্রধানের (রানী বা রাষ্ট্রপতি) প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি প্রথম এবং প্রধান। প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র সরকারের প্রধান নয়, তিনি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান এবং সে জন্য তিনি সংসদেরও নেতা হিসেবে স্বীকৃত। মন্ত্রিসভার তিনি সভাপতি। রাষ্ট্রপ্রধান (অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি বা রাজা) এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে তিনিই সংযোগ সেতু।

অনেকে মনে করেন, আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সংসদের কর্তৃত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং মন্ত্রিসভা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে (Decline of Parliament and rise of Cabinet dictatorship)। ভারতেও এর লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই মন্ত্রিসভার তরফ থেকে উত্থাপন করা হয়। সাধারণ সভ্যদের বিল ততটা গুরুত্ব পায় না। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুগামীদের সমর্থনের জোরে মন্ত্রিসভার তরফ থেকে উত্থাপিত প্রায় সকল প্রস্তাবই বিনা বাধায় পাশ হয়। ফলে, সংসদ কেবলমাত্র সম্মতিসূচক শীলমোহর দেয়ার যন্ত্রে পরিণত হয়। এ ছাড়াও আধুনিক আইন-কানুন ও বাজেট রচনা এত জটিল এবং এত খুঁটিনাটি তথ্যে ভারাক্রান্ত থাকে যে সংসদের সাধারণ সভ্যদের পক্ষে তা অনুসরণ করে এ বিষয়ে কোন আলোচনা বা সমালোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সংসদে এত খুঁটিনাটি আলোচনার সময়ও খুব কম। আবার সরকারী কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ একমাত্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সর্বোপরি, সরকারের বিরোধিতা করলে কোন সাধারণ সদস্যের পক্ষে পুনরায় দলীয় মনোনয়ন পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এই সকল কারণে দেশে দেশে আইনসভাগুলোর অবনয়ন ঘটছে। **মন্ত্রিপরিষদীয় ব্যবস্থা ক্রমেই কেবিনেটের একনায়কতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।**

কেবিনেট একনায়কতন্ত্রের দিকে প্রবণতা

তের : ভারত সরকারের প্রকৃতি : রাষ্ট্রপতি-শাসিত না মন্ত্রিসভা-শাসিত ? (India : Presidential or Parliamentary) ?

ভারতের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা (Parliamentary form of Government) প্রবর্তিত হয়েছে। আইনসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ব্রিটেনে এবং **বস্তুত ব্রিটেন-ই আইনসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার জননী**। ভারতের সংবিধান ব্রিটেনের আইনসভা-পরিচালিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ এবং অনুসরণ করেছে। সুতরাং ভারতের আইনসভা-পরিচালিত সরকারের রূপরেখা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংবিধানের অবদান অনস্বীকার্য।

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আইনসভা-পরিচালিত সরকারের শীর্ষে থাকেন একজন নামসর্বস্ব প্রধান—যাঁর আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ছাড়া প্রকৃত কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে না। আমাদের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে এরূপ নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে আছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি অবশ্য ব্রিটেনের রানীর মত বংশানুক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন না—জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি প্রায় ব্রিটেনের রানীর মতই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কিনা এ ব্যাপারে সংবিধান পারদর্শীরা একদা এক উত্তেজক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের গৃহীত রীতিনীতি (established conventions) এবং ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্য দিয়ে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রিটেনের রাজা-রানীর মতই ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র, বাস্তবে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

আইনসভা-পরিচালিত সরকারের রীতি হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতে একটি মন্ত্রিসভা বা কেবিনেট আছে। এই মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে

শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মন্ত্রিদের আইনসভার সদস্য হতে হয় না এবং আইনসভার কাছে তাঁদের কোন দায়-দায়িত্বও থাকে না। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী রীতি অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে বাধ্য। মন্ত্রিরা যে কোন কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন এবং আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। এরূপ শাসন পদ্ধতিকে দায়িত্বশীল সরকার নামে অভিহিত করা হয়।

মন্ত্রীদের নিয়োগের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিজস্ব ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় ব্রিটেনের রানী বা ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এরূপ স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতা নেই। ব্রিটেনের রানী বা ভারতের রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করতে এবং তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু সংসদের নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে বা পরবর্তীকালে কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিলোপ ঘটলে (যেমন জনতা দলের ভাঙ্গনের জন্য ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল) নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মন্ত্রিসভার ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাতিল করার অধিকার সাধারণত নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের থাকে না।

পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করে বলে এবং মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য থাকেন বলে এরূপ শাসনব্যবস্থায় আইনসভা ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আইনসভায় যে সকল আইন রচিত হয় বা আইনসভার বিবেচনার জন্য যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপনা করা হয় তা আগেই মন্ত্রিসভা কর্তৃক স্থির করা হয়। বস্তুত পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা থাকে না। বর্তমান যুগে দলীয় ব্যবস্থা দানা বেঁধে ওঠায় এবং দলগত-শৃঙ্খলা গুরুত্ব লাভ করায় শাসনবিভাগ বা মন্ত্রিসভাই আইনসভা পরিচালনা করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যে সকল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার আছে, সেখানে আইনসভা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শাসনবিভাগের থাকে না এবং এজন্য ঐ দুটি বিভাগের মধ্যে কিছুটা ক্ষমতা পৃথকীকরণ দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার আইনসভা বা পার্লামেণ্ট সার্বভৌম। ব্রিটেনের কোন আদালত ব্রিটিশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইনকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করতে বা তাকে বাতিল করতে পারে না। কিন্তু ভারতের সংবিধান কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে না। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসরণ করে ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে ভারতের সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনের সাংবিধানিক প্রশ্ন বিচার-বিবেচনা করার সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে মার্কিন বিচারালয়ের মত ভারতের বিচারালয়ের ক্ষমতা এতটা ব্যাপক নয়। অর্থাৎ ভারতে বিচার বিভাগের প্রাধান্য আংশিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্রতিককালে ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করে পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম করার দাবী উঠেছে। কোন কোন মহল থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনের সাংবিধানিক প্রশ্ন বিচার-বিবেচনার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের হাত থেকে তুলে নিয়ে ভারতের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংসদকে ব্রিটেনের মত সার্বভৌম করা হোক এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের দাবী উঠেছে। ঐ দাবী অনুযায়ী ৪২তম সংশোধনী আইনে ভারতের বিচারালয়কে সংবিধান সংশোধনী আইনের যথার্থতা বিচারের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তবে সংশোধনী আইন (amendment act) ছাড়া সংসদ প্রণীত অন্যান্য আইন সংবিধানসম্মত কিনা তা বিচারের অধিকার ভারতের বিচারালয়ের (সুপ্রীম কোর্ট) রয়ে গিয়েছে।

যাহোক বলা যায় যে, ভারতের সংবিধান মূলত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করে ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে এবং পার্লামেণ্টারী বা **সংসদীয় শাসনব্যবস্থার** সব বৈশিষ্ট্যই মোটামুটিভাবে ভারতের সংবিধানে গৃহীত হয়েছে।

চৌদ্দ : রাজতন্ত্র (Monarchy)

অনেক রাষ্ট্রে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা সার্বভৌম শক্তি একজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং তাঁকে রাজা বা রানী নামে অভিহিত করা হয়। যে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে রাজা বা রানী থাকেন ঐ শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র (Monarchy) বলে। রাজতন্ত্রে সাধারণত রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে শাসনক্ষমতা লাভ করেন। প্রাচীনকালে ভারতে কোন কোন অঞ্চলে বা রোমে প্রজাসাধারণ কর্তৃক রাজা নির্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজতন্ত্র দু ধরনের হতে পারে : ১. **নিরঙ্কুশ বা অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy)** এবং ২. **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)**।

সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ

অবাধ রাজতন্ত্র

পৃথিবীতে দু-একটি দেশ ছাড়া আজকাল আর অবাধ রাজতন্ত্র দেখা যায় না। ফ্রান্সের বুরোঁ বংশ, রাশিয়ার রুমানফ্, অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বুর্গ, জার্মানীর হোহেন-জোলার্‌ন্ ও তুর্কির সুলতান ইত্যাদি অবাধ রাজতন্ত্র আজ ইতিহাসের পাতা থেকে লুপ্ত। যে ফরাসী দেশের চতুর্দশ লুই একদিন দম্ভ করে বলেছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র" (I am the State), সেই দেশে এখন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বলা যায়, অবাধ রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে।

অবাধ রাজতন্ত্রের যুগ শেষ হয়েছে

শাসনকার্য চালাবার দক্ষতার দিক থেকে বিচার করলে অবাধ রাজতন্ত্রের কতকগুলো গুণের দিক অস্বীকার করা যায় না। এর গুণ হল উদ্যম, তৎপরতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাংগঠনিক সরলতা। একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অবাধ ক্ষমতার অধিকারী রাজা প্রজার বহু মঙ্গল সাধন করতে পারেন। প্রাচীন কালে অবাধ রাজতন্ত্রের যুগে বহু মহানুভব রাজা রাজত্ব করেছেন, যেমন—অশোক, আকবর, শার্লেমেন ইত্যাদি। এ কারণেই রামরাজ্যের আদর্শ এখনও ম্লান হয়নি। কিন্তু রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হন এবং তিনি যদি নিজের স্বার্থে রাজ্যশাসন করেন তা হলে সাধারণের জীবনে মঙ্গল সুদূর-পরাহত। বর্তমান যুগে অবাধ রাজতন্ত্র মোটেই লোকপ্রিয় নয়। এর কারণ হল : ক. সাম্যের অধিকারের ধারণা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু রাজতন্ত্রে সাম্যের অধিকারের কোন স্থান নেই ; খ. রাজতন্ত্রে সাধারণ নাগরিকদের কর্মোদ্যম নষ্ট হয় ; গ. ব্যক্তি এমন অধিকার রাজতন্ত্রে লাভ করিতে পারে না যা মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম বিকাশ ঘটাতে পারে ; এবং ঘ. বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রত্যাশা রাজতন্ত্র পূর্ণ করতে পারে না। ঙ. সর্বোপরি, রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ধ্যান ধারণা বিরোধী।

দোষ ও গুণ

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

যখন রাজা নিজে শাসন পরিচালনা করেন না, দেশের সংবিধানের শীর্ষে থেকে শোভা পান (reigns but does not govern) এবং প্রকৃত শাসনক্ষমতা ভোগ না করে কেবল আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেন তখন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছাকে রাজা সম্পাদন করেন মাত্র। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে যোগ্যতা-সম্পন্ন রাজার জনহিতকর কাজ করার সুযোগ যেমন কম, অপরদিকে অযোগ্য রাজা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর কাজ করারও সুযোগ পান না। প্রজা বিদ্রোহের দ্বারা বা রাজা কর্তৃক স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা অবাধ রাজতন্ত্র থেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের রূপান্তর ঘটতে দেখা যায়। ব্রিটেনের রানী নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কিছু কিছু গুণ আছে। দেশের প্রধান শাসক সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হলে দেশে নির্বাচনের সময়ে অসম্ভব রকমের উত্তেজনা, রেষারেষি ও কলহের সূত্রপাত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে রাজমুকুট হস্তান্তরিত হলে রাজকার্য পরিচালনার ধারায় অবিচ্ছিন্ন সংযোগ থাকে। তবে এই প্রথার অনেক ত্রুটিও আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে একের পর এক যোগ্য রাজা জন্মায় না। তা ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক হলেও রাজা এবং রাজতন্ত্রের জন্য ব্যয় কম হয় না। দেশের সাধারণ নাগরিকেরা আজকাল তাদের সাম্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্য রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব পছন্দ করেন না।

গুণ ও দোষ

পনের ঃ প্রজাতন্ত্র কাকে বলে ? (What is Republic ?)

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রে আমরা 'প্রজাতন্ত্র' কথাটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করি। প্রজাতন্ত্র বা *Republic* শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ *res publica* থেকে—যার অর্থ জনগণের ব্যাপার (public affairs)।

লীকক্ মনে করেন, রাজতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা বোঝাবার জন্য 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। জেলিনকও মনে করেন যে, একজনের বদলে বহু ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে 'প্রজাতন্ত্র' বলে। রুশো অবশ্য মনে করেন যে, রাজতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)—সরকারের রূপ যাই হোক না কেন, শাসনব্যবস্থা যখন সামাজিক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয় তখন তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অন্যতম রূপকার ম্যাডিসন (Madison) বলেছেন যে, প্রজাতন্ত্র সেই শাসনব্যবস্থাকে বলে যেখানে ক. শাসক শাসনক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং খ. শাসকেরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা সৎ আচরণের দ্বারা জনগণের সন্তোষ বিধান পর্যন্ত শাসন পরিচালনা করেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মত

প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোকে (city state) প্রজাতন্ত্র বলা হত। এজন্য প্লেটো ও আরিস্টটলের লেখায় 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকেরা অগাস্টাসের সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে পর্যন্ত রোমের শাসনব্যবস্থাকে প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। প্রাচীনযুগে সেই সকল রাষ্ট্রকেই প্রজাতন্ত্র বলা হত যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে শাসক রাজত্ব করতেন না এবং যেখানে জনগণের সম্মতি বা সমষ্টিগত শক্তি সরকারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করত।

ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে যখন ক্রমওয়েলের শাসন শুরু হয় তখন তাকে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়েছিল। **মূলত রাজতন্ত্রের অনুপস্থিতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকলে সেরূপ সরকারকে 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত করা হত।** আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লবের পেছনে রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাব খুবই প্রকট ছিল। তাই আমেরিকায় স্থায়ী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় এবং ফরাসীদেশে বিপ্লবোত্তর যুগে কিছুদিনের জন্য প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছিল।

বর্তমান যুগে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি প্রাচীন যুগের মত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। যে শাসনব্যবস্থায় **মূলত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো** দেখা যায় বর্তমানে তাকে 'প্রজাতন্ত্র' বলা হয় ঃ

১. কোন রাজা বা সম্রাট বংশানুক্রমে দেশ শাসন করেন না ;

২. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতায় যিনি থাকেন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা ভোগ করেন না এবং শাসনক্ষমতা ব্যক্তিগত অধিকার বলে মনে করেন না ;

৩. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন অথবা নবনির্বাচিত ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ;

৪. শাসনক্ষমতা মূলত জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

আরও **সাম্প্রতিককালে,** বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে **'প্রজাতন্ত্র' কথাটির ব্যাপক এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।** যেমন, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্র থেকে শুরু করে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত। অতীতে **স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের ক্ষমতা ও সার্বভৌমিকতার** প্রতিষ্ঠাই 'প্রজাতন্ত্র' গঠনের মূল উপাদান রূপে বিবেচিত হত। বর্তমানে স্বাধীনতা সংগ্রামের এরূপ কোন ঐতিহ্য বা জনগণের সার্বভৌমিকতার প্রতিষ্ঠা 'প্রজাতন্ত্র' গঠনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয় না।

ষোল : প্রজাতান্ত্রিক ভারত (India as a Republic)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) নামে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের বর্তমান সংবিধান কার্যকর হয়েছে এবং প্রস্তাবনা অনুযায়ী সেদিন থেকে ভারত একটি প্রজাতন্ত্র। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নতুন সংবিধানে ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয় এবং প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করে থাকি।

প্রজাতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি তা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এবার দেখা যাক প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের সংবিধানে কতটা পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতের শাসনক্ষমতার শীর্ষে বংশানুক্রমে রাজত্ব করার অধিকার-প্রাপ্ত কোন রাজা বা রানী বা সম্রাট নেই। ভারতের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে আছেন একজন রাষ্ট্রপতি। তিনি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের (পাঁচ বছর) জন্য শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। পাঁচ বছর পরে তিনি যদি পুনর্নির্বাচিত হন, তবে আবার ক্ষমতাসীন হন। কিন্তু তিনি নির্বাচনে না দাঁড়ালে বা নির্বাচিত হতে না পারলে রাষ্ট্রপতি পদে নবনির্বাচিত ব্যক্তির হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন। অর্থাৎ ভারতের শাসক-প্রধান রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

কোন রাজার বা সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁর রাজত্ব যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর সন্তানদের হাতে ন্যস্ত হয়—এরূপ কোন উত্তরাধিকার-নীতি প্রজাতন্ত্রে থাকে না এবং স্বভাবতই ভারতেও নেই। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি পরপর দুবার অর্থাৎ দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনিও দশ বছরের জন্য ঐ পদে আসীন ছিলেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের পরে ডঃ জাকির হোসেন ঐ পদে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি হন শ্রীভি. ভি. গিরি। তাঁর পরে রাষ্ট্রপতি হন যথাক্রমে শ্রীফকরুদ্দীন আলী আমেদ ও শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন শ্রীজ্ঞানী জৈল সিং। উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে দেখা যাবে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংবিধানে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতের যে কোন নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন এবং ঐ পদে নির্বাচিত হতে পারেন।

ম্যাডিসন প্রজাতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে জনগণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করেন। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের ভূমিকাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে সন্দেহ নেই। বলা হয়েছে "আমরা ভারতের জনগণ" সংবিধান রচনা করেছি এবং ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার জন্য শপথ গ্রহণ করছি। এ ছাড়াও ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে যে মহৎ আদর্শ ও দর্শনের অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির দ্বারা জনগণের যে সকল অধিকারগুলোকে রূপায়িত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ভারতের প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে শক্তিশালী করেছে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য ভারতের শাসনব্যবস্থাকে স্বাভাবিকভাবেই 'প্রজাতন্ত্র' নামে অভিহিত করা যায়। তবে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় একবার মাত্র প্রজাতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার ছাড়া আমাদের এত বড় সংবিধানের অন্য কোথাও 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটির আর কোন উল্লেখ না থাকায় কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘ সংবিধানে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি একবারও ব্যবহার না করাকে ডঃ ডি. এন. সেন রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও আইনগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।[১] 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি আমাদের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক জীবনে এবং আইনগত ক্ষেত্রে কিরূপ পরিগ্রহ করতে চায় তার কিছুটা ব্যাখ্যা আমাদের সংবিধানে থাকা উচিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

নমুনা প্রশ্ন

1. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাকে বলে? কি ভাবে তুমি এর সঙ্গে এককেন্দ্রিক সরকারের পার্থক্য নির্দেশ করবে? (পাঁচ ও তিন দেখ)

2. এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দোষ-গুণ আলোচনা কর। (চার ও পাঁচ দেখ) [H. S. T. '78]

3. যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি? (পাঁচ দেখ) [H. S. C. '78]

4. যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্ত আলোচনা কর। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কি কি শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন? (পাঁচ দেখ)

5. যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর এবং এর গুণাগুণ বিচার কর। (পাঁচ ও সাত দেখ) [H. S C.' 80]

6. যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। এর সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? (পাঁচ এবং ছয় দেখ) [H. S. C. '83]

7. ভারতের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। (আট দেখ)

8. ভারত কি একটি যুক্তরাষ্ট্র? —যুক্তিসহ আলোচনা কর। (আট দেখ) [H. S. C. '79]

9. ভারতের সংবিধান আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আংশিকভাবে এককেন্দ্রীয়—এই মতবাদ পর্যালোচনা কর। (আট দেখ) [H. S. C. '84]

10. মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকারের পার্থক্য নির্ণয় কর। এ দুটি শাসনব্যবস্থার দোষ-গুণ আলোচনা কর। (এগার দেখ) [H. S. C. '79]

11. সংসদ-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদ-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? (এগার দেখ) [H. S. C. '81 and '83]

12. সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি? (এগার দেখ) [H. S C. '85]

13. মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মূলনীতিগুলো বা বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। (বারো দেখ) [T. S. B. '79]

14. ভারতের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-চালিত না মন্ত্রিসভা-চালিত—যুক্তিসহ আলোচনা কর। (বারো দেখ)

16. রাজতন্ত্র কাকে বলে? অবাধ রাজতন্ত্রের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পার্থক্য দেখাও। (চৌদ্দ দেখ) [H. S. C. '79]

16. প্রজাতন্ত্র কাকে বলে? (পাঁচ দেখ) [H. S. C. '78]

---

১. 'Nowhere in the text of this longest constitutional document in history is the expression 'Republic' used. This is significant from political, constitutional and legal points of view,' —*From Raj to Swaraj*. Dr. D. N. Sen, P. 249

17. 'ভারত একটি প্রজাতন্ত্র'—আলোচনা কর। (ষোল দেখ)

অথবা, ভারতকে কি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও। (ষোল দেখ) [H. S. C. '81]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) একজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার স্বাভাবিক রূপকে — বলে। (রাজতন্ত্র)

(খ) একজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার বিকৃত রূপকে — বলে। (স্বৈরতন্ত্র)

(গ) কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার স্বাভাবিক রূপকে — বলে। (অভিজাততন্ত্র)

(ঘ) বহুজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তার অস্বাভাবিক রূপকে — বলে। (গণতন্ত্র)

(ঙ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিপরীত শাসনব্যবস্থা হ'ল — শাসনব্যবস্থা। (এককেন্দ্রিক)

(চ) যুক্তরাষ্ট্রে — শ্রেণীর সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। (দু)

(ছ) ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের জন্য —টি তালিকা রয়েছে। (তিন)

(জ) কেন্দ্র তালিকায় —টি ক্ষমতা রয়েছে। (৯৬)

2. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্ (√) দাও :

(১) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের তৃতীয় তালিকাকে বলে (কেন্দ্র তালিকা, যুগ্ম তালিকা, রাজ্যতালিকা)।

(২) ভারতের সংবিধানে বর্তমানে শিক্ষা বিষয়টি' (কেন্দ্রীয় তালিকার, যুগ্ম তালিকার, রাজ্য তালিকার) অন্তর্ভুক্ত। [H. S. C. '81]

(৩) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হ'ল (21, 22, 23)। [H. S. C. '81 and '82]

(৪) আইনসভা বা মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান (নাম-সর্বস্ব, প্রকৃত) শাসক।

(৫) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় বা সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভাকে (আইনসভা, রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারবিভাগ)-এর কাছে দায়ী থাকতে হয়। [H. S. C. '78]

(৬) রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান (আইনসভা, মন্ত্রিসভা, জনসাধারণ)-এর কাছে দায়ী থাকেন।

(৭) প্রজাতন্ত্রে প্রধান শাসক (উত্তরাধিকার সূত্রে, নির্বাচিত হয়ে) ক্ষমতা লাভ করেন।

(৮) ভারত (1947 সালের 15ই আগস্ট, 1950 সালের 26শে জানুয়ারী, 1957 সালের 23শে জানুয়ারী) প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

(৯) (ব্রিটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) প্রজাতন্ত্র।

(১০) সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বোঝায় (যেখানে একটি পার্লামেন্ট আছে, নির্বাচিত পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা আছে)। [H. S. C. '78]

(১১) ভারতে (আইনসভা-পরিচালিত, রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত) শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। [T.S.B. '79]

(১২) ভারতের শাসনব্যবস্থা (যুক্তরাষ্ট্রীয়, এককেন্দ্রিক, আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়)। [H. S. C. '80]

(১৩) যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (থাকে, থাকে না)। [H. S. C. '84]

(১৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (রাষ্ট্রপতিশাসিত, সংসদশাসিত) সরকার আছে। [H. S. C. '84]

"A Society in which reason governs the contact of men and one in which each man feels responsibility for his action is also a society in which every man contributes some thought and feeling to the common life……Democracy as an ideal is, therefore, a society not of similar persons but of equals in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole."

—C. D. Burns

৩

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

Democracy and Dictatorship

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ এবং গণতন্ত্র শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলে বিশেষভাবে পরিচিত। আমাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে 'গণতন্ত্র' শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। অথচ লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায়, একশ বছর আগেও 'গণতন্ত্র' শব্দটি যথেষ্ট বিতৃষ্ণা এবং ভীতি সৃষ্টি করতো। বর্তমানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র ব্যাপকভাবে গৃহীত সরকারের একটা রূপ বা কাঠামো হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেনি, গণতন্ত্র একটা আদর্শ, একটা জীবন দর্শন, সমাজ সংগঠনের একটা কাম্য রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এক : গণতন্ত্র (Democracy)

সরকারের একটা রূপ বা কাঠামো হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বহুল প্রচলন দেখা যায়। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা

আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। **কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন হল, গণতন্ত্র বলতে আমরা কি বুঝি ?** প্লেটো এবং আরিস্টটল মনে করতেন, যেখানে শাসনক্ষমতা ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং শাসক বা শাসকরা জনগণের স্বার্থে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাকে গণতন্ত্র বলে। তাঁদের মতে গণতন্ত্র সরকারের স্বাভাবিক রূপ নয়—বিকৃত রূপ। কিন্তু আরিস্টটল প্রদত্ত গণতন্ত্রের এই ব্যাখ্যা বর্তমান যুগে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করা হয়। মোটামুটিভাবে মনে করা হয়, যে শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী তাকে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলে। বস্তুত গণতন্ত্রের শব্দগত অর্থও তাই। 'গণতন্ত্র' শব্দটি *Demos Kratia* নামে দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত—যার অর্থ হল 'জনগণের ক্ষমতা'।

গণতন্ত্র কাকে বলে ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের একটি সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন—যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তাঁর মতে **গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত সরকার** (Goverment of the people, by the people and for the people)। গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির জন্য আব্রাহাম লিংকনের বহুল প্রচারিত এই সংজ্ঞাটিকে আমরা প্রথমে বিশ্লেষণ করব। **প্রথমত, জনগণের সরকার** শব্দ দুটোর দ্বারা বোঝান হয়েছে সরকারের কাজকর্ম, চিন্তাধারা সকল কিছুই দেশের জনসাধারণের চিন্তা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির অনুরূপ হবে। সরকার যেন জনজীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে জনস্বার্থবিরোধী চিন্তা বা কর্মসূচী গ্রহণ না করে, জনসাধারণ যেন ঐ সরকারকে সকল সময় নিজেদের বলে মনে করতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** লিংকনের সংজ্ঞা অনুযায়ী গণতন্ত্র **জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার** অর্থাৎ যাঁরা শাসন করবেন তাঁরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং যতদিন জনসাধারণ তাঁদের শাসনক্ষমতায় রাখতে ইচ্ছুক হবে ততদিন তাঁরা শাসনকার্য চালাবেন। ইচ্ছা করলে জনসাধারণ তাঁদের পরিবর্তন করে নূতন শাসক নির্বাচিত করতে পারেন। জনগণের প্রতিনিধি আইনসভা গঠন করবে এবং ঐ প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা জনগণের হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করবে। জনপ্রতিনিধিরা সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জনগণের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং তার সংগে নিজেদের চিন্তা, ধারণা ও আদর্শকে সংযুক্ত করবে। **তৃতীয়ত, জনসাধারণের জন্য সরকার** বলতে বোঝান হয় যে, এই সরকার জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী। সমাজের সকল মানুষের উন্নতি এবং কল্যাণের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ। কোন দল, উপদল বা শ্রেণী নয়, দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক এবং সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করা যে সরকারের লক্ষ্য ও আদর্শ তাই গণতান্ত্রিক সরকার।

লিংকন প্রদত্ত সংজ্ঞা

লিংকনপ্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রথমত, 'জনগণের সরকার' দ্বারা গণতন্ত্রে জনগণই সরকারের উৎস একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** 'জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার' বলতে জনগণের প্রতিটি অংশ সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এটাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত সীলি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সীলি বলেছেন, যেখানে শাসনব্যবস্থায় সকলে অংশ গ্রহণ করে সেই শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে।[১] কিন্তু সর্বসাধারণ সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে না এবং করতেও পারে না। ডাইসি মনে করেন, যেখানে তুলনামূলকভাবে জনগণের একটি বিরাট অংশ শাসনকাজ পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাকেই 'জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার' বলা যেতে পারে। লর্ড ব্রাইসও গণতন্ত্র বলতে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের অধিকাংশের (তিন-চতুর্থাংশের) শাসন প্রবর্তনের কথা

অন্যান্য সংজ্ঞা

১. "A Government in which everyone has a share" —Seeley

বলেছেন।[১] **তৃতীয়ত**, 'জনগণের সরকার' বলতে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনই সরকারের মূল লক্ষ্য হিসেবে বোঝান হয়েছে।

ম্যাকআইভার মনে করেন যে, গণতন্ত্র বলতে কে শাসন পরিচালনা করবে (সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অথবা অন্য কোন অংশ) তা বোঝায় না, এর দ্বারা কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা স্থির করাকে বোঝায়।[২] সুতরাং এই অর্থে মনোনয়নের স্বাধীনতাই **(freedom of choice)** গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় সকলের প্রবেশাধিকার বুঝিয়েছেন। এরূপ ব্যবস্থা কার্যকর হলে শাসক ও শাসিতের আদিম ও চিরন্তন প্রভেদ লুপ্ত হয়ে সকল মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা সামগ্রিকভাবে জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। গণসার্বভৌমত্ব ও জনকল্যাণই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, কারণ ব্যক্তিগত অধিকার ও সাম্য ছাড়া গণসার্বভৌমত্ব ও জনকল্যাণ কার্যকর হতে পারে না। বস্তুত সাম্যই গণতন্ত্রের ভিত্তি।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে **গণতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের** উল্লেখ করা যায়। **প্রথমত**, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের ওপর নির্ভরশীল থাকে (resting on public opinion) এবং জনমতই গণতন্ত্রের প্রাণ। **দ্বিতীয়ত**, গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের একটি বিরাট অংশকে সক্রিয়ভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করতে হয়। সকল নাগরিকের সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকে না। সুতরাং গণতন্ত্র যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। **তৃতীয়ত**, তত্ত্বগত দিক থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। **চতুর্থত**, জনকল্যাণই গণতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাম্য নীতিই এর মূল ভিত্তি। অর্থাৎ গণতন্ত্র হল সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক দিক থেকে সমঅধিকারসম্পন্ন মানুষের সমাজ।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলকথা হল বিভিন্ন বিকল্প পথ ও মতের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতা। কে শাসন করবে, কোন্ নীতিতে শাসন চলবে—এ সকল বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা দরকার। বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন চিন্তা থাকতে পারে—এ কথা সবার মনে রাখা উচিত। বিভিন্ন ভাবাদর্শের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোলে। মত পার্থক্যের স্বাধীনতা এবং অধিকার আমার আছে—ঐ অধিকারকে বলপূর্বক দমন করা উচিত নয়। বুলেট চাই না, ব্যালট চাই—এটাই গণতান্ত্রিক নীতি।

সমাজের মধ্যে নানা ভাবাদর্শ থাকলে এক-একটি রাজনৈতিক দল এক-একটি ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোতে তাই বহুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও সহাবস্থান অপরিহার্য। সমাজের মধ্যে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন চিন্তা ও আদর্শকে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাদের চোলাই করে (distillation) সরকারী নীতিতে রূপান্তরিত করা হয়। সেই নীতি অনুযায়ী আইন তৈরি করে রাষ্ট্রের পরিচালন চলতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবাদর্শ প্রবাহিত হয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সচল রাখে (*flow from social reservoir into the system of the democratic state and turn the wheels of the political mechinery in that system*)।

---

১. "A Government in which the will of the majority of qualified citizens rules, taking the qualified citizens to constitute the great bulk of the inhabitants, say, roughly, at least three-fourths, so that the physical force of the citizens coincides (broadly speaking) with their voting power" —Lord Bryce

২. "Democracy is not a way of governing, whether by majority or otherwise, primarily a way of determining, who shall govern, and broadly, to what ends." —MacIver

গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো বিভিন্ন ভাবাদর্শের সুস্থ প্রতিযোগিতা, বিরোধ-মিলন-সৃজন ও রূপান্তরণের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে।

দুই : গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideal)

গণতন্ত্র বলতে সরকারের নিছক একটি কাঠামো বা রূপ বোঝায় না—গণতন্ত্রের অর্থের আরও গভীরতর ও বিস্তৃততর এক ব্যঞ্জনা আছে। বিস্তৃততর অর্থে গণতন্ত্র সমাজ সংগঠনের আদর্শ রূপ। গণতন্ত্র হ'ল সভ্য মানুষের নিয়মবোধ, শৃংখলাবোধ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সমাজব্যবস্থা। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ এবং সম্পদ এই আদর্শের ভিত্তি, সাধারণ মানুষের কল্যাণময় সমাজবোধের ওপর এটা প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ হল রাষ্ট্র সমাজের সেবা করবে, তাকে গ্রাস করবে না। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করে তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধনই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। ব্যক্তি নিজের কল্যাণের পথ নিজেই স্থির করবে। ভয়, কাপুরুষতা, বীরপুজো এবং স্বার্থান্ধতার বদলে ন্যায়নিষ্ঠা ও সহজ বিচারবোধের সাহায্যে সাধারণ নাগরিকরা নিজেরা রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করবে। সাধারণ মানুষ নিজেরা শাসন করবে এবং নিজেরাই শাসিত হবে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ কাকে বলে

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্সের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস্ (Pericles) উদাত্ত কণ্ঠে ঐ মহান্ আদর্শের জয়গান করেছিলেন : "আমাদের শাসনতন্ত্রের নাম গণতন্ত্র, কারণ এটা অনেকের দ্বারা পরিচালিত, কয়েকজনের দ্বারা নয়। আমাদের আইন সবার জন্য সমান ন্যায়বিচার রক্ষা করে, আমাদের জনমত প্রত্যেকটি কীর্তির মহত্ত্বকে সম্মান দেয়, কোন শ্রেণীগত কারণে নয়, কেবলমাত্র উৎকর্ষের জন্য। আমাদের গণজীবনে আমরা যেমন প্রত্যেককে ইচ্ছামত নিজ শক্তি প্রকাশের সুযোগ দেই, ঠিক তেমনি দৈনন্দিন পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ভাবাদর্শ আমাদের পরিচালিত করে। ব্যক্তিগত চলাফেরায় আমরা খোলাখুলি ও বন্ধুত্বপূর্ণ, সরকারী কাজকর্মেও আমরা নিখুঁতভাবে আইনের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলি। শ্রদ্ধা যে সংযম আনে আমরা তা মেনে চলি ; পদে যে-ই অসীন থাক না কেন, কর্তৃত্ব ও আইনের প্রতি আমাদের আনুগত্য……আমরা সৌন্দর্যের প্রেমিক, কিন্তু অপ-মানসিকতার নয়। আমাদের নাগরিকরা ব্যক্তিগত ও সরকারী কাজকর্ম উভয় ক্ষেত্রেই সমান উৎসাহী, নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে নিমগ্ন থেকে তারা রাষ্ট্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া থেকে বিরত থাকে না। অন্যান্য রাষ্ট্র হতে আমরা পৃথক্, সেখানে রাষ্ট্র সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিকে তারা 'শান্ত' বলে, আমরা ঐ ব্যক্তিকে 'অকেজো' বলে মনে করি। সব সরকারী নীতি সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নেই অথবা বিতর্ক করি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং নিজে উপস্থিত থেকে। কারণ, আমরা মনে করি কথা বলা এবং কাজ করায় কোন বিরোধ নেই ; বরং আলাপ-আলোচনা না-করে যে কাজ করা হয় তা বিফল হতে বাধ্য।"

গণতন্ত্রের মূলকথা ব্যক্তি এবং ব্যক্তির আত্মানির্ভর স্বাধীনতা। ব্যক্তির স্বাধীনতার দুটি শর্ত। প্রথমত, সে একজন পূর্ণ ব্যক্তি, তার জীবনে কল্পনা সম্পূর্ণভাবে তার নিজের বিচার ও বিবেচনার বিষয়। কাণ্টের (Kant) ভাষায় বলা চলে, "ব্যক্তি কখনও কারও উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার নয়।" প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর লক্ষ্য একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব। **দ্বিতীয়ত,** ঐ পরিপূর্ণ লক্ষ্যশীল ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতি নির্ভর করে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশের ওপর। গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো সেই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ রচনা করে। যে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি বংশমর্যাদা বা অর্থকৌলিন্যকে সম্মান দিতে অভ্যস্ত, সেই সমাজে কেবলমাত্র ভোটের অধিকার বা আইনের চোখে সমতা প্রকৃত গণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারে না। সি. ডি. বার্নস (C. D. Burns) তাই বলেছেন, *Democracy as an ideal is therefore, society not of similar persons but of equals, in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole.*

তিন ঃ গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Democracy)

গণতন্ত্রকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্র।

১. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করত। তখনকার দিনে ছোট ছোট এক-একটি শহর নিয়ে এক-একটি রাষ্ট্র গঠিত হত, রাষ্ট্রের জনসংখ্যাও ছিল কম। রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিকরা সবাই প্রকাশ্য স্থানে বা সভায় মিলিত হয়ে ভোট দিয়ে আইন প্রণয়ন করত। এ ভাবে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করত। **একেই বলা হয় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)।** এখনও **সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র** দেখতে পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দোষ-গুণ

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ শাসনপরিচালনার সব কাজে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করে বলে এখানে গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে। জনগণই এক জায়গায় মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করে এবং সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনগণকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে জনগণের নামে প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সম্ভব হয় না। বস্তুত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেই আক্ষরিক অর্থে জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

কিন্তু জনবহুল এবং আয়তনে বড় রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বর্তমানের বৃহদাকার রাষ্ট্রের বিপুল জনসমাজ একটি স্থানে মিলিত হয়ে আইন-প্রণয়ন হতে শুরু করে দৈনন্দিন সরকারী প্রশাসন পরিচালনা করতে পারে না। একমাত্র প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রেই তা সম্ভব ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন নতুন জটিল বিষয় নিয়ে সরকারকে সর্বদা বিব্রত থাকতে হয়। দেশের আপামর জনগণের পক্ষে ঐ জটিল সমস্যা সমাধানে এবং প্রশাসন পরিচালনায় ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন বাস্তবে অসম্ভব ও অকাম্য।

২. পরোক্ষ গণতন্ত্র

আয়তনে ছোট এবং অল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্রেই কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলো আয়তনে অনেক বড়, লোকসংখ্যাও অনেক বেশী। আধুনিক রাষ্ট্রের সমস্যাও খুবই জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে একটি সভায় মিলিত হয়ে ভোট দিয়ে আইন পাশ করা অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দিন আর নেই। **এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের (Indirect Democracy)** আবির্ভাব ঘটেছে। **এই পরোক্ষ** গণতান্ত্রিক **ব্যবস্থাকে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাও** (Representative Government) বলা হয়।

পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করে না। তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ঐ প্রতিনিধিরা আইনসভায় মিলিত হয়ে আইন পাশ করে এবং শাসনবিভাগের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। জনসাধারণ এভাবে নিজেদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে। এরূপ শাসনব্যবস্থার উপকারিতা হল এই যে, আইন রচনা ও শাসনকাজে অশিক্ষিত জনতা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সাধারণ লোকের শাসনকাজে খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ কম, যোগ্যতাও কম। তাই অল্পসংখ্যক প্রতিনিধির মাধ্যমে—আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা তুলনামূলকভাবে ভাল ব্যবস্থা।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা বজায় রেখে যাতে আধুনিক যুগের বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিকেরা প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ পেতে পারেন সে জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন, **প্রথমত,** অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কোন আইন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

দ্বারা পাশ না করে দেশের অধিকাংশ লোকের মতামত জানার জন্য ঐ আইনের ওপরে গণভোট (Referendum) গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। বিলের পক্ষে বেশীর ভাগ লোকের ভোট পড়লে তবে তা আইনে পরিণত হতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** ভোটদাতাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ যদি মনে করে যে, কোন বিশেষ একটি আইন হওয়া দরকার, তবে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে এ বিলের খসড়া আইনসভায় উপস্থিত করতে পারে। একে বলে গণউদ্যোগ (Initiative)। **তৃতীয়ত,** যদি কোন প্রতিনিধি তাঁর ভোটদাতাদের মতের বিরুদ্ধে আইনসভায় ক্রমাগত ভোট দেন বা মতামত প্রকাশ করেন তবে কিছু সংখ্যক ভোটদাতা তাঁকে প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে অপসারণের দাবী বা প্রত্যাহার আজ্ঞা (Recall) জানাতে পারেন। পৃথিবীতে দু একটি দেশে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোর দু-একটি গৃহীত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সুইজারল্যাণ্ডে গণভোট ও গণ-উদ্যোগের কথা বলা যেতে পারে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও জনপ্রতিনিধি অপসারণ ব্যবস্থা (Recall) আছে, তবে ঐ সকল পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় না।

পরোক্ষ গণতন্ত্রকে যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ করার উপায়

কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে ডঃ ফাইনার (Finer) ও আরও অনেকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমান যুগে দলীয় প্রথা প্রবর্তনের ফলে গণভোট মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, এরূপ অবস্থায় গণভোট বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রত্যাহার আজ্ঞা পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর করার সম্ভাবনা খুবই কম। এ ছাড়াও প্রত্যাহার আজ্ঞা জনগণের উত্তেজনা, অসন্তোষ এবং অন্ধ সংস্কারের ক্রীড়নকে পরিণত হতে পারে। গণভোট, গণউদ্যোগ ইত্যাদি পদ্ধতিগুলোকে রূপায়িত করতে হলে আইন প্রয়োগ এবং আইন বিচারের জন্য জনগণের যে পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা থাকে না। এ সকল কারণে ডঃ ফাইনার সহ অনেকে মনে করেন যে. জনগণের সার্বভৌমিকতা আছে তা প্রমাণ করার জন্য ঐ পদ্ধতিগুলো বজায় রাখা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে ঐ পদ্ধতিগুলো বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ত্রুটি

চার : গণতন্ত্রের দোষ ও গুণ (Merits and Demerits of Democracy)

গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই এবং এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা—একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার শেষ নেই। প্লেটো ও আরিস্টটলের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নানা কারণে গণতন্ত্রের ওপর চরম আক্রমণ চলেছে।

গণতন্ত্রের দোষ

সমালোচকেরা বলেন যে, গণতন্ত্র সবাইকে সমান চোখে দেখে বলে সেখানে ব্যক্তির যোগ্যতা সমাদর পায় না। গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করে, ব্যক্তির গুণের ওপর জোর দেয় না। ফলে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠের শাসন নয় ; গড়ের শাসন (rule of the average)। গড় নাগরিকেরা সর্বদাই প্রাচীনের প্রতি আকৃষ্ট, নতুন নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা গ্রহণে তারা অক্ষম, তারা অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতিনীতির দাস। রক্ষণশীল ও প্রগতি বিরোধী গড় নরনারীর ভাবাদর্শ গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোর ভিত্তি। এ কারণেই আরিস্টটল গণতন্ত্রকে জনতাতন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর মতে জনতারাজ বা জনতাতন্ত্র অতি নিম্ন ও নিকৃষ্ট ধরনের সরকার।

দ্বিতীয়ত, অনেক দেশেই বেশীর ভাগ লোক অশিক্ষিত ও অক্ষম। তাই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় ঐ অক্ষম ও অশিক্ষিতরাই শাসনকাজ চালান। এ জন্যই রাষ্ট্রশাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। কার্লাইল তাই উপহাস করে গণতন্ত্রকে 'নির্বোধের রাজত্ব' বলে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র যদিও নামে জনসাধারণের শাসন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য কয়েকটি চতুর ও ক্ষমতাপ্রিয় লোকের হাতেই থাকে। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই রাজনৈতিক দলগুলোকে করায়ত্ত করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। রাজনৈতিক দলগুলোর সংগঠন *Iron law of oligarchy* মেনে রচিত হয়। সাধারণ কোন নাগরিকের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে না। সাধারণ নাগরিকের সমগ্র জীবনের রাজনৈতিক তৎপরতা হল অতি-আবেগ ভরে কোন-না-কোন নেতাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা। কয়েকজন নেতায় সিদ্ধান্ত সকলে মানতে বাধ্য হয়, নেতার জয়গানে সকলে মুখর হয়। এ অবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের কথা উপহাসের মতো শোনায়।

চতুর্থত, মার্কসবাদীরা মনে করেন, সমাজে আর্থনীতিক শ্রেণীবিভাগ থাকার ফলে সর্বজনীন গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করতে পারে না এবং প্রকৃত গণতন্ত্র থাকতে পারে না। যে শ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় আগ্রহী তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে ভুল সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করে নির্বাচনে জয়লাভ করে। এইভাবে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা আপাতদৃষ্টিতে সর্বজনীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক মনে হলেও বাস্তবে তা নয়।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রে একজন বা কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে না বলে জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত নেয়া সম্ভব হয় না। গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনায় প্রথাগত **(formal)** নিয়ম মেনে চলতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট হয়। দ্রুত আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী নয়। বিভিন্ন শ্রেণী ও উপদল বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর **(pressure group)** চাপে সঠিক নীতি গ্রহণ করা যায় না। প্রধানমন্ত্রী বল্ডউইনের ভাষায় বলা চলে, *Democracy is always two years behind than dictatorship.*

ষষ্ঠত, অধ্যাপক ব্রাইস্ বলেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রের রূপ বিকৃত। কারণ অর্থের লোভে ভোটদাতা, আইনসভার প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারীরা সহজে ধনিকদের শিকার হয়ে পড়ে। ফলে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র বা সরকার আর নিরপেক্ষ থাকে না। সরকারী কাজকর্মের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিতরণ গণতন্ত্রকে বিকৃত করে তোলে।

সপ্তমত, অনেকের মতে গণতন্ত্র একান্তভাবেই অবৈজ্ঞানিক, ইহা গোঁড়ামির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মনস্তাত্ত্বিক ও জীববিজ্ঞানগত কারণে গণতন্ত্রকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক দিক হতে দেখা যায় যে, জনতার যূথমনোবৃত্তি (**mass psychology**) কখনই সুচিন্তিত কোন বৈজ্ঞানিক মনের প্রকাশ নয়।[১] যূথবন্ধ মানুষ চিন্তার ধার ধারে না, সে চমক ও শ্লোগানে বিশ্বাসী। জীবতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায় যে, মানুষে মানুষে চিন্তাশক্তিতে পার্থক্য থাকবেই। ঐ পার্থক্য অংশত জন্মদ্বারা স্থিরীকৃত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ম্যাকডুগালের **(McDougall)** ভাষায় বলা যায়ঃ *Capacity for intellectual growth is inborn—that is hereditary, and also that is corelated with social status.*

সর্বোপরি, আঞ্চলিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি পাঠানো একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। কারণ, কোন অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি অগণিত ভোটদাতার বিভিন্ন ধরনের এবং পরস্পর-বিরোধী ঝোঁক ও আবেগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তাই অধ্যাপক কোলের **(Cole)** মতে সফল গণতন্ত্রের ভিত্তি হওয়া উচিত সমাজের বিভিন্ন জীবিকা অনুযায়ী নির্বাচন-ব্যবস্থা **(functional representation)**।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হল মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি। কিন্তু যতই শিক্ষার প্রসার হবে এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে, ততই নাগরিকদের ওপর যূথ

১. "Politics is only in a slight degree the product of eonscious reason : it is largely a matter of sub-conscious processes of habit and instinct, suggestion and imitation,"

—Graham Wallas

বা গণমনস্তত্ত্বের প্রভাব কমতে থাকবে। জীবতাত্ত্বিক যুক্তিটিও খুব দুর্বল। মানুষের জন্মগত গুণাবলী এবং পরিবেশজাত প্রভাব এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে যে এদের আলাদা করা চলে না।

বিরুদ্ধ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়

তৃতীয়ত, শ্রেণী শাসনের যুক্তিও সকল সময় সমভাবে প্রযোজ্য নয়। আজকাল এক একটি দলে বিশেষ এক-একটি শ্রেণীর নিরঙ্কুশ প্রভাব আর দেখতে পাওয়া যায় না। তাই সরকারের নীতি নির্ধারণ বা আইন প্রণয়নের সময়ে ধনিকশ্রেণী, মজুরশ্রেণী এবং আমলাতন্ত্র (bureaucracy) এই তিন দিক হতেই চাপ আসতে থাকে। তাই ল্যাস্কি বলেছেন যে, সরকারের আইনকানুন সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের নানাপ্রকার টানাপোড়েনের ফল (a parallelogram of forces)। সুতরাং গণতন্ত্রকে আজকাল নিছক ধনিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র বললে হয়তো তা অতি-সরল ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হবে।

গণতন্ত্রের গুণ

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তিগুলো আলোচনা করা হল। এবার দেখা যাক গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ গুণগুলো কি কি। প্রথমত, গণতন্ত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন পার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি না করে "স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব" (Doctrine of Natural Rights) অনুযায়ী সকল মানুষের সামনে সমান অধিকার ও সুযোগের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মানুষ স্বাধীন হয়ে এবং সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে—এই মূলনীতি গণতন্ত্র স্বীকার করে সবাইকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করে থাকে। এজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকের সমান অধিকার ও দাবী স্বীকৃত। এরূপ সাম্যের পরিবেশ মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটায় এবং সমাজে প্রভুত্ব ও দাসত্বের ব্যবধান দূর করে। এ প্রসঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কনের অমর বাণী প্রণিধানযোগ্য ; "আমি কারও দাস হতে চাই না, তাই আমি কারও প্রভুও হব না।"

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে শাসন ও শাসিতের ভিতর অনতিক্রমণীয় ব্যবধান বা পার্থক্য নেই। বেন্থামের মতে সুশাসনের সমস্যা হল শাসন ও শাসিতের স্বার্থকে এক ও অভিন্ন করে তুলে ব্যাপকতর জনগণের ব্যাপকতর কল্যাণ সাধনের সমস্যা। গণতন্ত্র শাসক ও শাসিতের পার্থক্য দূর করে ব্যাপক জনসমাজের ব্যাপক কল্যাণে (greatest good for the greatest number) ব্রতী হতে পারে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসকমণ্ডলী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে এবং জনগণের দ্বারা পরিবর্তনীয়। সুতরাং এরূপ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

চতুর্থত, গণতন্ত্র মানুষের যতটা মর্যাদা দেয় আর কোন শাসনব্যবস্থা এরূপ মর্যাদা দেয় না। গণতন্ত্রে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমান যত্নশীল। তাই টকভিল বলেছিলেন যে, সকল শ্রেণীর জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য গণতন্ত্রের মত আর কোনও শাসনব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।[১]

পঞ্চমত, সকল মানুষের সহযোগিতা গণতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং গণতন্ত্রে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বলে এখানে সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রাধান্য লাভ করে থাকে।

ষষ্ঠত, গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী শাসিত হয় বটে, কিন্তু সংখ্যালঘুদেরও এখানে যথোচিত গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আইনসভা, সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, সংবাদপত্র

---

১. "No political form has hitherto been discovered which is equally favourable to the prosperity and development of all the classes."

—Tocquevile

ইত্যাদির দ্বারা সংখ্যালঘুরা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সরকার অনেক ক্ষেত্রে ঐ সকল মতামত অনুসারে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে।

সপ্তমত, গণতান্ত্রিক আদর্শ মানুষকে সুস্থ দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে বলে গণতান্ত্রিক শাসনে মানুষ দেশকে এবং দেশের জনগণকে ভালবাসতে শেখে এবং এর ফলে এক মহত্তর সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানবসভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

পাঁচ ঃ গণতন্ত্র সফল হওয়ার শর্ত (Conditions for the Success of Democracy)

গণতান্ত্রিক সরকারের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে একে সফল করে তুলতে পারলে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই, কি অবস্থায় গণতন্ত্র সফল হতে পারে তা আলোচনা করা দরকার। ইংরাজ পণ্ডিত জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, তিনটি অবস্থা বজায় থাকলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে। ঐগুলো হল গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রয়োজনীয় তিনটি শর্ত।

গণতন্ত্র গ্রহণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা

প্রথমত, কোন দেশে গণতন্ত্র সফল হতে হলে দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারকে গ্রহণ করার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। জনগণের সকল অংশের মনে এরূপ ইচ্ছা দেখা যায় না। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং ঐ শাসনব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন – এরূপ বোধ তাদের মনে জাগরিত হওয়া দরকার। গণতান্ত্রিক সরকার গ্রহণ করার মত মানসিক ক্ষমতাও তাদের থাকা দরকার। গণতন্ত্রে সকল ব্যক্তির মূল্য সমান। তাই গণতন্ত্রে অন্যের ওপর নিজের মতামত জোর করে চাপিয়ে দেবার ইচ্ছা বর্জন করতে হবে। কেউ নিজের মত চাপিয়ে অন্য কোন নাগরিকের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে দমন করে রাখতে পারবে না। যেখানে এরূপ উন্নত মানসিক স্তরে জনসমষ্টি উঠতে পারে না সেখানে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ইচ্ছা ও ক্ষমতা

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হলে বা গণতান্ত্রিক সরকার আক্রান্ত হলে **গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে দেশের জনগণকে ইচ্ছুক থাকতে হবে।** ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অন্যান্য অধিকার রক্ষা করার জন্য কেবল সদিচ্ছা পোষণ করলেই চলবে না, প্রত্যেক নাগরিককে প্রয়োজনের সময়ে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হয়ে উঠতে হবে। 'যা ইচ্ছে ঘটুক, আমার তাতে কিছু যায় আসে না'—এরূপ মনে করলে চলবে না ; এ ধরনের মনোভাব থাকলে গণতন্ত্র রক্ষা পায় না। দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মনে অবহেলা, ঔদাসীন্য, সংগ্রামবিমুখতা থাকলে অল্পসংখ্যক কুচক্রী লোক নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। তাই জনচিত্তের বৃহত্তর অংশের গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সরকার রক্ষা করার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিশ্চয় থাকা দরকার।

কাজগুলো নিয়মিত করার ইচ্ছে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রকে সচল রাখতে হলে যে কাজকর্মগুলো প্রত্যেকটি নাগরিকের করা দরকার সেই কাজে তাদের বিমুখ হলে চলবে না। গণতন্ত্রকে কার্যকর রাখার জন্য যে সকল কাজ করা দরকার, সেগুলো করতে আলস্য দেখালে চলবে না। যেমন, যোগ্যতম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো দরকার—ভোট দেওয়ার সময়ে ঐ কথা সবার মনে রাখা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কর ফাঁকি দেয়া উচিত নয়, ভোট বিক্রি করা উচিত নয়। নাগরিকদের মনে দায়িত্ব সম্পর্কে এরূপ মানসিকতা গড়ে উঠলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে।

মিলের মতে গণতন্ত্রের দুর্বলতা ও বিপদ

চতুর্থত, এ সকল শর্ত ছাড়াও মিল কতকগুলি দুর্বলতা ও বিপদের (infirmities and dangers) কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি দূর না হলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। যেমন, **দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের মতামত বা প্রয়োজনের কথা মনে না রেখে দেশ শাসন করে, তবে দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে।** তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। আবার, যদি গণতান্ত্রিক কোন দেশ অপর কোন দেশকে

আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, তবে মাতৃভূমির গণতান্ত্রিক আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সুস্থ, সবল, সততাপূর্ণ ও উন্নত 'জনমত' (public opinion) থাকা দরকার। এই জনমত গঠন করতে হলে উচ্চ রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। আরিস্টটল এ জন্য বলেছেন যে, রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। শিক্ষার অভাব থাকলে গণতন্ত্রের প্রতি নাগরিকদের অকুণ্ঠ নিষ্ঠা স্থায়ী হতে পারে না। দারিদ্র্য, অভাব এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক।

জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থা

ষষ্ঠত, গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সবচেয়ে আগে দেশের আর্থনীতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা দরকার। বুভুক্ষু নাগরিকের কাছে স্বাধীনতা মূল্যহীন ; কেবল সকলের জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলেই গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। দেশে আর্থনীতিক অসাম্য থাকলে জনগণের মধ্যে শ্রেণীবিবাদ ও শ্রেণীসংঘর্ষ সৃষ্টি হতে থাকে। সমাজে কলকারখানা ও জমির মালিকানা অর্থাৎ আর্থনীতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় দেশ নিজেই নিজের মধ্যে বিভক্ত থাকে। তাই অনেকের মতে, গণতন্ত্র সফল করার জন্য আরও একটি শর্ত প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানা দূর করে দেশে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। তা না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র থাকতে পারে কেন ?

সপ্তমত, পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। গণতন্ত্রে নানা মত, নানা পথ এবং নানা রাজনৈতিক দল থাকে। ঐ সব দল ও মতের প্রচারের মধ্য দিয়ে জনগণ কোন্ মত বা পথ গ্রহণযোগ্য তা স্থির করে এবং এইভাবে বিভিন্ন মতের সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক বনিয়াদ শক্তিশালী হয়। কিন্তু কোন দেশের জনগণের যদি পরমতসহিষ্ণুতা না থাকে, তবে সেখানে অন্য মতকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ফলে সেখানে বিভিন্ন মতের সুস্থ প্রচারের পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সুতরাং অন্যের মত সহ্য করার মত মানসিকতা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

অষ্টমত, গণতন্ত্রকে চোখের মণির মত রক্ষা করার জন্য জনগণকে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্যই বলা হয়, সতত প্রহরাই গণতন্ত্রের পুরস্কার (eternal vigilance is the price of democracy)। যে দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, শাসনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর রক্ষায় যত্নবান নয় এবং এ ব্যাপারে সতর্ক নয়, সেখানে গণতন্ত্র সফল হওয়া কষ্টকর।

নবমত, দেশের **নাগরিকগণ যদি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত না হয় তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হতে পারে না।** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য নির্বাচকমণ্ডলী তথা নাগরিকদের যোগ্যতা ও বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। প্রতিনিধি নির্বাচন হতে শুরু করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে জনগণের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনেক। জনগণ শিক্ষিত না হলে তারা গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

সর্বোপরি, **দায়িত্বশীল, যোগ্য এবং শক্তিশালী বিরোধীদলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত।** সরকারের কাজের দোষ-ত্রুটি সমালোচনা না করা হলে গণতন্ত্র দলীয় বা ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে পরিণত হতে পারে। যোগ্য বিরোধী দলকেই এ ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তা ছাড়া জনগণ সরকারী দলের কাজকর্মে সন্তুষ্ট না হলে যাতে বিকল্প দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আসীন করে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে পারে, তার জন্য গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা প্রয়োজন।

ছয় : ভারতে গণতন্ত্র সাফল্যের শর্তগুলো আছে কী ? (Are the Conditions for the suceess of Democracy Present in India ?)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ ইচ্ছা প্রকাশ করেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং এর অস্তিত্ব রক্ষা করা যায় না। গণতন্ত্র সাফল্যের শর্তগুলো প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। **সুতরাং আমাদের দেখা প্রয়োজন, গণতন্ত্র সাফল্যের শর্তগুলো ভারতে আছে কি-না এবং থাকলেও কতটা পরিমাণে আছে।**

প্রথমত, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শিক্ষিত জনসাধারণ প্রয়োজন, যাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থাকবে, একে রক্ষা করার ক্ষমতা থাকবে এবং যারা গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ভারতের জনগণের বেশির ভাগ নিরক্ষর, শিক্ষার সুযোগসুবিধা এখনও আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নাগালের বাইরে। তাই এদেশে অজ্ঞ-নিরক্ষর জনগণের ভোট ভয় দেখিয়ে বা প্রভাব বিস্তার করে বা অন্য উপায়ে লাভ করা যায়। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা ভারতের জনগণের ব্যাপক অংশের নেই—এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। শিক্ষার অভাবের জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রের জন্য তৃষ্ণারও (thrust for democracy) অভাব ভারতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের জনগণ বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও আঞ্চলিকতায় বিভক্ত। এ ছাড়া রাজনৈতিক চিন্তার বিভিন্নতা তো আছেই। ফলে ভারতের জনগণের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতার অভাব দেখা দিয়েছে। অথচ অন্য পথ ও মতকে সহ্য করা এবং অন্য মতাবলম্বীদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে তিক্ততা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রমাণ করে যে আমাদের দেশে পরমতসহিষ্ণুতার অভাব আছে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি আসাম ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলী উল্লেখ করা যায়।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা প্রয়োজন। যদিও ভারতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে কেন্দ্রে এককভাবে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেই। এরূপ অবস্থায় একদলীয় স্বৈরাচার গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে ধ্বংস করে।

চতুর্থত, সুস্থ, সবল, সততাপূর্ণ ও উন্নত জনমতই গণতন্ত্রের প্রাণ। আমাদের দেশে এরূপ সুস্থ জনমত গঠনের সমস্যা অনেক। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিসন ও রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ প্রয়োজন এবং দৃষ্টিকোণ থেকে জনমত তৈরি করে। এরা নিজ নিজ গোষ্ঠী ও শ্রেণী-স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবাদ পরিবেশন করে এবং জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করে। ভারতের অধিকাংশ জনগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে পারে না। এজন্য ভারতে সৎ ও উন্নত জনমতের অভাব দেখা যায়।

সর্বোপরি, আর্থনীতিক দিক থেকে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে প্রত্যেকের সুস্থভাবে জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। আমরা জানি বুভুক্ষু জনগণের কাছে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দগুলোর কোন মূল্য নেই। সুতরাং যে দেশে আর্থনীতিক অসাম্য প্রবল, জনগণের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান বেদনাজনক, লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক পাগলের মত দিশাহারা হয়ে জীবন যাপন করে, অনাথ ও ভিক্ষুকে যে দেশ পূর্ণ সে দেশে গণতন্ত্র কিভাবে সফল হবে ?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র সফল হতে হলে যে সকল শর্ত প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন, তার অধিকাংশই ভারতে নেই। তবে, দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ভারতের জনমানসের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসীবাদী ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী মনোভাব খুবই দৃঢ়। গণতন্ত্র ব্যর্থ হলে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র দেখা দিতে পারে—এ ভয় হতেই

গণতন্ত্রের স্বপক্ষের শক্তিগুলো ভারতে শক্তিশালী হচ্ছে এবং ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম রাখতে সাহায্য করছে।

সাত : একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

গণতন্ত্রের বিকল্প এবং সম্পূর্ণ বিরোধী শাসনব্যবস্থা হল একনায়কতন্ত্র। যখন কোন রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অবাধ শক্তির অধিকারী হয়ে রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা দখল করে এবং সার্বভৌম শক্তির একমাত্র অধিকারী হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে, তখন ঐ শাসনব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র বা Dictatorship বলা হয়।

একনায়কতন্ত্র শুধু সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়। প্রাচীনকালেও একনায়কতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে। আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রমুখ রাষ্ট্রনায়করা ছিলেন বিখ্যাত একনায়ক।

পৃথিবীতে বিগত দুটি মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের নগ্ন ও বীভৎস একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। ইতালী ও জার্মানীতে যথাক্রমে মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট দলের ও হিটলার নাৎসী দলের একনায়কতন্ত্র (Party Dictatorship) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে ঐ দু দেশেই দলগত একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্রে **(Personal Dictatorship)** পরিণত হয়। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানে ঐ ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী একনায়কতন্ত্র। স্পেনের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো (যার কিছুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে) বর্তমান যুগে একনায়কের নিদর্শন।

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হল—এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক। একনায়কতন্ত্রে জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য থাকে। মুসোলিনীর ভাষায় বলতে গেলে, *Everything for the state, nothing outside the state.* রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক দেশের সকল ক্ষমতার উৎস এবং শাসনকাজের পরিচালক। এক দিকে তিনি আইন প্রণয়নকারী এবং অন্যদিকে বিচার ও আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার সর্বোচ্চ আধার। গণতন্ত্রের আদর্শ হল—রাষ্ট্রই চরমকাম্য নয়, মানবকল্যাণের জন্য রাষ্ট্র একটি উপায় মাত্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়—ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের অধীন করতে চায়। দলের নেতাকে মানতে হবে এবং নেতার মতকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করতে হবে। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা জনগণের থাকে না। একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের স্থান নেই।

একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে না। সকল নাগরিককে এক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করার চেষ্টা চলতে থাকে। সর্বোপরি একনায়কতন্ত্র ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে লোকের মনে এক ধরনের কল্পনার জগৎ তৈরী করে তোলে, একে myth বলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার প্রতিষ্ঠান এবং সৈন্য ও গুপ্তচর বাহিনী করায়ত্ত করে অবিরাম প্রচার ও ভয়ের মাধ্যমে দেশের মধ্যে একনায়ক সম্পর্কে একপ্রকার নির্বোধ আকর্ষণ গড়ে তোলা হয়। ক্রমে ক্রমে লোকের মনে অন্ধ ভক্তি ও অনুসরণের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। মুসোলিনী নিজেই বলেছেন, *We have created our myth. The myth is a faith, it is passion. Our myth is the nation*......এইভাবে একনায়কতন্ত্র যুক্তি, বিচারশক্তি ও মানবিকতার পরিবর্তে এক অন্ধ আনুগত্য, জাতি বা বর্ণবিদ্বেষ এবং সামরিক শক্তির দম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

দু' ধরনের একনায়কতন্ত্র

পৃথিবীতে দু ধরনের একনায়কত্ব দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমী দেশগুলোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় রেখে শ্রমিক ও কৃষককে শোষণের ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের দলপতি একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, জার্মানীর একনায়কতন্ত্রের নাম ছিল নাৎসীবাদ (Nazism)। ইতালীতে ফ্যাসিবাদী (Facism) একনায়কতন্ত্র দেখা দিয়েছিল এবং মুসোলিনী ছিলেন ফ্যাসিবাদী একনায়ক। স্পেনে, গ্রীসে, ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়নে যে একনায়কতন্ত্র দেখা যায় তা এদের থেকে সর্বদিক থেকে আলাদা। **এর নাম সর্বহারার একনায়কত্ব** (dictatorship of the proletariat)। সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে শ্রমিক ও কৃষক নিজেরা দল গঠন করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে। যতদিন পর্যন্ত শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে দেশের অধিবাসীরা উন্নত হয়ে না ওঠে, ততদিন ঐ একদলীয় শাসন চলতে থাকে। এই দু'রকম একনায়কতন্ত্রে পার্থক্য আছে। প্রথম ধরনের একনায়কতন্ত্র মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে এবং সাম্রাজ্যবাদী বা উগ্র সামরিক মত (Imperialistic or Militarist doctrine) প্রচার করে। দ্বিতীয় প্রকার একনায়কতন্ত্র মূলত শ্রমিক-কৃষকের রাজত্ব। এখানে অধিকাংশ জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে দেশে দ্রুত আর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করে। সুতরাং **একে গণতন্ত্রের সর্বোচ্চরূপ মনে করা হয়।** নতুন সোভিয়েত সংবিধান সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র (State of the whole people) বলে অভিহিত করেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র কেন দেখা দিয়েছিল তার কারণ আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের হাতে এত বেশী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল যে, গণতান্ত্রিক বোধ ও ব্যক্তির অধিকার বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** রণক্লান্ত ও বুভুক্ষু জনতা দেখল যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশের একদল লোক আরও ধনী হয়ে উঠল অথচ দরিদ্র জনসাধারণ দরিদ্রতর হল। কি ভাবে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় সে সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই তারা যে কোন পরিবর্তনের সমর্থক হয়ে পড়েছিল। **তৃতীয়ত,** জনসাধারণ ভেবেছিল যে, দেশের আইনসভাগুলো হল বাগাড়ম্বরের স্থান, এতে অর্থের অপচয় হয়, সময় নষ্ট হয়, কর্মকুশলতা হ্রাস পায়। অথচ একনায়কত্বে অল্প সময়ে অনেক বেশি কল্যাণমূলক কাজ সাধিত হয়। চতুর্থত, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে পরাজিত রাষ্ট্রগুলোকে অত্যন্ত অবমাননাকর শর্তে রাজী হতে হয়েছিল। ফলে জনমত ছিল খুবই বিক্ষুব্ধ। জাতির ত্রাণকর্তা একনায়ক এরূপ ক্ষুব্ধ জনমতকে নিজের ক্ষমতা বিস্তারের কাজে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। **পঞ্চমত,** অনেক দেশে শ্রমিক ও কৃষকেরা ভোটের জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এ আশঙ্কায় ধনিকেরা গণতান্ত্রিক প্রথা বিসর্জন দিয়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তি একনায়কের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ কারণ

একনায়কত্বের উৎপত্তির কতকগুলো পরোক্ষ (indirect) কারণও আছে : (i) বেতার, বিমান, টেলিফোন, রেলগাড়ী, সংবাদপত্র ইত্যাদি যোগাযোগের উপাদানগুলোর আবিষ্কার ও উন্নতির ফলে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত (centralised) হয়ে উঠছে। (ii) সাধারণ মানুষ আজ আর নিজের মনের অভিভাবক নয়। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যুব মনকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না শিখিয়ে সে 'কি চিন্তা করবে' তা শেখানো হচ্ছে। আধুনিক শিল্প-প্রধান যুগে মানুষের জীবন অনেকখানি যান্ত্রিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠছে, আত্মিক জীবন নষ্ট হয়ে মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রজীবে পরিণত হচ্ছে। সবসময় রুটির চিন্তায় আচ্ছন্ন মানুষ তাই বাগাড়ম্বরের চমকপ্রদ কথার বিভ্রান্ত হয়ে নায়কের অন্ধ অনুসরণে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

একনায়কতন্ত্রের পরোক্ষ কারণ

একনায়কতন্ত্রের গুণ

একনায়কতন্ত্রে আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলো গুণ দেখতে পাওয়া যায়, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। একনায়কতন্ত্রের প্রধান গুণ হল সময় সংক্ষেপ। গণতান্ত্রিক শাসনে কোন কাজ করতে গেলে বহু সময় ও আলোচনার প্রয়োজন। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। একনায়ককে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করতে হয় না। তিনি নিজে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, তাই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্য বিলম্ব ঘটে না। বিশেষত, এই শাসন-

ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দলগত বিরোধের স্থান নেই। বার্নার্ড শ তাই বলেছেন, 'জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র অভাবনীয়, অসম্ভব' সাধারণ নাগরিক "শ্লোগান" বিশ্বাসী, তাই সে অধিনায়কভক্ত। একনায়কতন্ত্রের অধীনে খুব কম সময়ের মধ্যেই কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতি সম্ভব বলে মনে করা হয়।

একনায়কতন্ত্রের দোষ

কিন্তু উপরোক্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই নানাকারণে একনায়কতন্ত্র বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করেন। এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে না, সাধারণত এরূপ সরকার পশুশক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। জনমত প্রকাশ করার পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যায়। একনায়ক অন্য রাষ্ট্র ও জাতিগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার চেষ্টায় বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করে ও যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। এ জন্যই পৃথিবীতে একনায়ক শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। একনায়কতন্ত্রে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। বর্তমান যুগে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনগণ স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে প্রস্তুত নয়। এ জন্যই বর্তমান যুগে একনায়কতন্ত্রের কোন স্থান নেই।

দোষ

আট : গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র (Democracy Versus Dictatorship)

গণতন্ত্রের অনেকগুলো দুর্বলতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গণতন্ত্রের দুর্বলতাগুলোকে এভাবে তুলে ধরা যায় : (১) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ সৃষ্টি হয় না, (২) গণতন্ত্র দলগত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করে, (৩) অধিকাংশ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে গণতন্ত্র অনেক সময়ে ভ্রান্তমত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, (৪) আইন-সভায় কেবল কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা ঘটে, দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয় না। (৫) গণতন্ত্রে আইনসভার প্রাধান্য থাকে, অথচ আইনসভায় উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আইনবিদের অভাব দেখা যায়, (৬) বিভিন্ন দল পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করে, ফলে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয় এবং সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। গণতন্ত্রের এ সব ত্রুটির জন্যই যে একদা পৃথিবীর কোথাও কোথাও একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু গণতন্ত্রের ঐ সকল দোষ সংশোধনযোগ্য। গণতান্ত্রিক আদর্শ বা সরকার অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ বা সরকার এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে দেখা যায়নি। যদি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য দূর করা যায়, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গড়ে তোলা হয় তবেই জাতির মধ্যে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব লোপ পাবে, গণতন্ত্র সফল হয়ে উঠবে।

আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র সর্বোত্তম

অনেকে বলেন, বিভিন্ন কারণে কিছুদিনেক জন্য একনায়কতন্ত্র সমর্থনযোগ্য হলেও হতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য একনায়কতন্ত্র সমর্থিত হতে পারে না। গণতন্ত্রই সর্বোত্তম ব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই। গণতন্ত্রে সাম্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শকে মর্যাদা দেয়া হয়। একনায়কতন্ত্রে নাগরিকদের উপর বাধ্যতামূলক যে আদর্শ ও নির্দেশ চাপিয়ে দেয়া হয় গণতন্ত্রে ব্যক্তির ওপর ঐ নিপীড়ন নেই। বর্তমানে তথাকথিত পশ্চিমী দেশগুলোতে যে গণতন্ত্র দেখা যায় তাতে অবশ্যই ধনী শ্রেণীর একাধিপত্য বজায় থাকে। এটাও এক ধরনের শ্রেণীগত নায়কতন্ত্র। গণতান্ত্রিক আদর্শ সকল দিক থেকে একটি উন্নত আদর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই।[১]

নয় : গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy)

অষ্টাদশ শতকে স্বাধীনতা, সাম্য ও সমানাধিকারের দাবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমান শতকে তা ব্যাপক আর্থনীতিক অধিকার ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দাবীতে

১. 'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রূপান্তরিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক চিন্তা, চেতনা ও আদর্শের প্লাবনে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব ইতিহাসের আবর্জনা হিসেবে কোথায় ভেসে গিয়েছে। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ—তাই চিন্তা, শিক্ষা, কর্ম প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা গণতান্ত্রিকবোধ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঐ আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছি। গণতন্ত্রের প্রসার এবং ব্যাপ্তি দেখে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাপূর্ণ।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, গণতন্ত্রের সামনে গভীর সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছে, কারণ—গণতন্ত্র মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ধনবৈষম্যকে দূর করে গণতন্ত্র আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাই দেখা যাবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা ছাড়াও গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে নাগরিকগণের যে চেতনা ও প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই লয়েড (Lloyd) মনে করেন যে, নাগরিকগণের নির্লিপ্ততা ও আলস্যের জন্য গণতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।[১]

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্রের নানাবিধ ত্রুটি আছে, গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয়। এর কারণ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে সকল শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন তা যথাযোগ্যভাবে পালিত হচ্ছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, তাই বলে গণতন্ত্রের কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর *Modern Democracies* নামক বিখ্যাত বই-এ এ বিষয়ের অবতারণা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আধুনিক যুগের পরীক্ষানিরীক্ষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরও মনে করেন যে, সরকারের কোন রূপ-ই মানুষের চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারে না এবং সরকারের প্রতিটি রূপেরই কিছু পরিমাণ চরিত্রগত ত্রুটি থাকবে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, ভীতি ও অন্যায়ের উৎসকে সমূলে উৎপাটিত করে ব্যক্তি জীবনের সামনে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করার ব্যাপারে সরকারের অন্যান্য রূপ থেকে গণতন্ত্র অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

ব্রাইস যথার্থই বলেছেন যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের সমালোচকেরা কিন্তু এর পরিবর্তে উন্নত স্তরের অন্য কোন শাসনব্যবস্থার নির্দেশ করতে পারেননি (However grave indictment that may be brought against Democracy, its friends can answer, what alternative do you offer ?)। এর দ্বারা কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও গণতন্ত্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা এবং ইহা সর্বজনীনভাবে গৃহীত (destined to be universal) হতে বাধ্য? গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিতে হলে আমাদের রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ আদর্শ ও গুণের দিক থেকে ঐ শাসনব্যবস্থাগুলো গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। সুতরাং যতদিন গণতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করার জন্য গণতন্ত্র থেকে উন্নত স্তরের কোন শাসনব্যবস্থার উদ্ভাবন না হচ্ছে, ততদিন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার বিশেষ কোন কারণ নেই।

১. "Democracy is in danger of growing stale through the laziness of its members."
—Lloyd

নমুনা প্রশ্ন

1. গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ আলোচনা কর। (এক ও তিন দেখ)
2. "গণতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিধিত্বমূলক।" —উদাহরণসহ আলোচনা কর। (তিন দেখ)
3. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কাকে বলে ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিচার কর। (তিন দেখ) [H. S. C. '80 and '83]
4. গণতন্ত্রের দোষগুণ আলোচনা কর। (চার দেখ)
5. গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি আলোচনা কর। ঐ শর্তগুলি বর্তমান ভারতে আছে কি ? (পাঁচ ও ছয় দেখ) [H. S. C. '79 and '85]
6. একনায়কতন্ত্র বলতে কি বোঝায় ? একনায়কতন্ত্রের দোষ-গুণ আলোচনা কর। (সাত দেখ) [H. S. C. '84]
7. গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের তুলনা কর। (আট দেখ)
8. একনায়কতন্ত্র কাকে বলে ? এর দোষগুণ কি কি ? (সাত দেখ) [H. S. C. '80]
9. গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আলোচনা কর। (নয় দেখ)
10. গণতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলা হয় কেন ? (চার ও নয় দেখ) [H. S. C. '79]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। (ক) আব্রাহাম লিঙ্কন কর্তৃক প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও।
(খ) গণতন্ত্রকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ? (দুটি)
(গ) একজন ফ্যাসিস্ট একনায়কের নাম কর। (মুসোলিনী)
(ঘ) একজন নাৎসী একনায়কের নাম কর। (হিটলার)
(ঙ) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র কোথায় আছে ? (সোভিয়েত ইউনিয়নে)

"The essence of Government is Executive. The Legislature and Judiciary are merely the instruments for constitutionalising it."

—Corry

৪

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ

Organs of Government

সরকারী কার্য প্রক্রিয়াকে তিনটি ভাগে প্রচলিত করার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আরিস্টটল সরকারী কাজকে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বা *Deliberative*, শাসন সংক্রান্ত বা *Majesterial* এবং বিচার সংক্রান্ত বা *Judicial*—এই তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও সরকারী প্রক্রিয়ার তিনটি অঙ্গ হল শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ। আইনবিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসনবিভাগ তাকে কার্যকর করে এবং বিচারবিভাগ আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়। আইনসভা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা এবং এই সংস্থাই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এই ধারণা অনেকে পোষণ করেন। কিন্তু বর্তমান যুগে শাসন-বিভাগের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনসভার অবমূল্যায়ন ঘটছে। অনেকে তাই বলেন, বস্তুত সরকারের নির্যাস হ'ল শাসনবিভাগ আর তাকে নিয়মতান্ত্রিক বা আইনগত রূপ দেবার হাতিয়ার হল আইনসভা ও বিচারবিভাগ। এইজন্যই বলা হয়, বর্তমান যুগের রাষ্ট্র হ'ল শাসনবিভাগীয় রাষ্ট্র বা *Executive State.*

এক ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং এদের কাজ (Different Organs of Government and their Functions)

আগেই বলা হয়েছে সরকারের ক্ষমতা ও কাজকে তিনটি প্রক্রিয়া বা তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই তিন ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। ঐগুলো হল, আইনবিভাগ বা আইনপ্রণয়ন বিভাগ (Legislature), শাসনবিভাগ (Executive) এবং বিচারবিভাগ (Judiciary)। এই তিনটি বিভাগ সরকারের তিনটি অঙ্গ এবং এদের প্রত্যেকের কাজ স্বতন্ত্র ধরনের এবং এদের কাজের এলাকাও আলাদা।

তিনটি বিভাগ

ক. দেশের শাসন পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করা দরকার। ঐ আইন প্রণয়নের জন্য দেশে থাকে আইনসভা বা আইন পরিষদ। আইনসভাকে ব্যবস্থাপক বিভাগও বলা হয়। আইনসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ভোটে বিল পাশ করে আইন প্রণয়ন করা এই বিভাগের কর্তব্য। খ. শাসন বিভাগের কাজ হল আইনবিভাগ যে সকল আইন রচনা করে সেগুলোকে প্রয়োগ করা ও আইন অনুসারে শাসনকার্য চালানো। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তা বিচারের জন্য শাসন বিভাগ আসামীকে বিচার বিভাগের কাছে উপস্থিত করে। গ. বিচার বিভাগের কাজ হল অপরাধ বিচার করে আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়া। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সকল যুক্তি শুনে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কি না বিচারবিভাগ তা স্থির করে এবং অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে তাকে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়।

তিনটি বিভাগের কাজকর্ম

একটি উদাহরণের সাহায্যে তিনটি বিভাগের কাজ বোঝান যেতে পারে। মনে কর, ব্যক্তির ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য আইনসভা একটি আইন রচনা করল যে, কেউ অন্যের জিনিস চুরি করলে তার ছ'মাস কারাদণ্ড হবে। ঐ আইন রচনার উদ্দেশ্য দেশে চুরি নিবারণ করা। ঐ আইন রচনা করা আইনসভা বা আইন বিভাগের কাজ। ধরা যাক, একটি চোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এলো। ঐ পুলিশ ও থানা শাসনবিভাগের অংশ সুতরাং ঐ সকল শাসনবিভাগের কাজ। শাসনবিভাগের কাজ হল আইন অনুযায়ী শাসন করা এবং আইনভঙ্গকারীর দোষ প্রমাণিত হলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা। থানার হাজত থেকে চোরকে বিচারের জন্য বিচারালয়ে হাজির করা হয়। বিচারালয়ে নানা শ্রেণীর হাকিম বা বিচারক আছেন। বিচারকদের কর্তব্য হল আইন-ভঙ্গকারীকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া। আদালতে চোরটির বিচার হবে, সাক্ষীসাবুদ নেয়া হবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শোনা হবে। তার পরে বিচারক সাব্যস্ত করবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি না। যদি দোষী বলে প্রমাণিত হয়, তবে আইন অনুযায়ী বিচারক তাকে শাস্তি দেবেন। আর নির্দোষ হলে তাকে মুক্তি দেবেন। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগের কার্যকলাপ দেখতে পাই।

উদাহরণ

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ—এই তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হলেও বাস্তবে দেখা যাবে যে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির ওপর তিনটি বিভাগের ক্ষমতাই ন্যস্ত থাকে। বস্তুত উপরোক্ত তিনটি বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হলেও সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীই (Elite) শাসন, আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা ভোগ করে।

অন্য মত

দুই ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Theory of Separation of Powers)

প্রাচীনকালে রাজাদের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। রাজা নিজেই ইচ্ছেমত আইন প্রণয়ন করতেন। ঐ আইন ভাল কি মন্দ তা নিয়ে

কারও কিছু বলার অধিকার ছিল না। রাজা নিজেই সৈন্যসামন্ত ও লোকজন নিয়ে সেই আইন প্রয়োগ করতেন ; সুতরাং আইন প্রয়োগের ব্যাপারেও তিনি সর্বেসর্বা ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি যাকে আইনভঙ্গকারী বলে আটক করতেন নিজেই তার বিচার করতেন। অর্থাৎ, **প্রাচীনকালে, শাসকেরা আইন, শাসন ও বিচারের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখতেন এবং ইচ্ছেমত ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।** স্বভাবতই, এরূপ অবস্থায় নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকতে পারে না এবং শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ঐ অবস্থার প্রতিবাদেই ক্ষমতা পৃথকীকরণ বা স্বতন্ত্রীকরণের তত্ত্ব প্রচারিত হয়। আরিস্টটলও বহুদিন আগেই সরকারের কাজের বা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। তবে ফরাসী লেখক মন্তেস্কুই (Montesquieu) প্রথম এই মতবাদটির বৈজ্ঞানিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Spirit of Law* নামক বই-এ। সুতরাং **মন্তেস্কুকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রধান প্রবক্তা বলা যেতে পারে।** ইংরেজ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্ল্যাকস্টোনও (Blackstone) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির একজন বড় সমর্থক। পরবর্তীকালে হ্যামিলটন (Hamilton) স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের ভূমিকাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

মন্তেস্কু ও ব্ল্যাকস্টোন

মন্তেস্কুর মতে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে পরস্পর থেকে পুরোপুরি আলাদা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে একজন ব্যক্তির হাতে শাসন, আইন ও বিচারের ক্ষমতা ন্যস্ত না করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির হাতে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করা প্রয়োজন—যাতে এক বিভাগ অন্য বিভাগকে প্রভাবিত করতে না পারে। যদি শাসনবিভাগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া যায় তা হলে স্বৈরাচারী আইনের সৃষ্টি হবে, ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। যদি শাসনবিভাগকে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দেয়া হয় তবে বিচার প্রহসনে পরিণত হবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। তেমনি বিচার এবং আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একই হাতে থাকলে নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়ার আশংকা থাকে, কারণ ঐ অবস্থায় একই ব্যক্তি বিচারক ও আইন প্রণেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।[১] অর্থাৎ মন্তেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি তিনটি সূত্রের ওপর নির্ভরশীল : ১. এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ পরিচালনা করবে না ; ২. একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি একাধিক বিভাগের কাজ সম্পাদন করবে না ; ৩. এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। মন্তেস্কু ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্য ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, ব্রিটেনের জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে—কারণ ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়েছে বলে সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটেনি।

মন্তেস্কুর বক্তব্য

কোন দেশের শাসনকর্তা নিজেই যদি নিজের ইচ্ছেমত আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করেন, নিজেই যদি সেই আইনের প্রয়োগকর্তা হন এবং আইনভঙ্গ করলে নিজেই যদি তা বিচারের দায়িত্ব লাভ করেন, তবে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন এবং যাদের অবাঞ্ছিত মনে করেন তাদের ইচ্ছেমত শাস্তি দিতে পারেন। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শাসক রাজ্যপাল আদালতকে এ মর্মে আদেশ দেন যে, কোন একজন বিশেষ লোককে শাস্তি দেওয়া হোক, আর আদালতও যদি আইন ও ন্যায়কে পদদলিত

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

১. "If the legislative and executive powers are united in the same person or body of persons, there is no liberty, because of the danger that the same monarch or the same senate may make tyrannical laws and execute them tyrannically. Nor again is there any liberty if the judicial power is not separated from the legislative and the executive. If it were joined to the legislative power, the power of the life and liberty of the citizens would be arbitrary ; for the judge would be the law maker. If it were joined to the executive power, the judge would have the force of an oppressor."

করে ঐ আদেশ পালন করে, তবে দেশে যে অবিচার শুরু হবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পদদলিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। অথবা শাসনবিভাগীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আইনসভাকে জনকল্যাণ বিরোধী কোন একটি বিশেষ আইন পাশ করার জন্য নির্দেশ দেন, আর আইনসভাও যদি ঐ আদেশ পালন করে সঙ্গে সঙ্গে আইনটি বিধিবদ্ধ করে, তবে গণতন্ত্র কিভাবে রক্ষিত হবে?

সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা এবং গণতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে দেয়া উচিত। আইন, শাসন বা বিচার বিভাগ কেউ কারও অধীনে থাকবে না, প্রত্যেকের কার্যক্ষেত্র আলাদা হবে, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের অনাচার প্রতিরোধ করবে (from the very nature of things power should be a check to power)। এইভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা পাবে। সুতরাং সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে মন্তেস্কু **ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ** (safeguard of libetry) হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন।

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

মন্তেস্কু মনে করেন, সরকারের তিনটি বিভাগ পরস্পর থেকে আলাদা হবে এবং প্রতিটি বিভাগ আলাদা ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দ্বারা পরিচালিত হবে যাতে প্রতিটি বিভাগ প্রতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। তাঁর ভাষায় বলা যায়, *The three powers then must be separated, exercised by different individuals in such a way as to act as checks and balances upon one another.*

মন্তেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্ব **নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির** সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনে করা হয় যে সরকারের প্রতিটি বিভাগ স্বতন্ত্র এবং নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে স্বাধীন থাকলেই পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সরকারী ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারের একটি বিভাগ অন্য বিভাগকে তখনই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যখন প্রতিটি বিভাগ **সমক্ষমতাসম্পন্ন** হয়। অর্থাৎ মন্তেস্কু সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিকেই সমক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, শাসক শ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাকে শাসন, আইনপ্রণয়ন ও বিচার—এ তিনটি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত রাখলেও বাস্তবে দেখা যাবে শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির ওপর তিনটি বিভাগেরই ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা

যদিও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের মধ্যে কিছু যুক্তি আছে, তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে বাস্তবে এই নীতি প্রয়োগ করা দুরূহ এবং প্রয়োগ করলেও রক্ষা করা কঠিন। **ক্ষমতা ও কাজের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়।** বর্তমানে সরকারের জনকল্যাণকর কাজকর্ম এত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শাসনব্যবস্থা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে, কোন বিভাগই অন্য বিভাগের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। এক বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া অন্য বিভাগের কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব।

শাসনব্যবস্থা জটিল

সরকারকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে ব্লুনৎস্লী (Bluntschli) বলেছেন যে, দেহ থেকে মস্তিষ্ককে আলাদা করলে জীবদেহের মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর থেকে আলাদা করলে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটবে। শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার-বিভাগ—এগুলো সরকারের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বিভিন্ন অঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া যেমন দেহ বাঁচতে পারে না; সেরূপ তিনটি বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া সরকার অচল হয়ে পড়ে। লাস্কি (Laski) বলেছেন, "আইনসভা অনেক সময় শাসন বিষয়ের কোন কোন কাজ করে······তারা বিচার বিষয়ক কর্তব্যও করে······শাসনবিভাগ, বিশেষত আজকাল, এমন ধরনের অনেক কাজ করে যাকে আইন বিষয়ক

সরকার জীবদেহের সঙ্গে তুলনীয়

কাজ থেকে আলাদা করা যায় না……বিচারবিভাগ প্রায়ই শাসনবিভাগের মত কাজ করছে…… তারা আইনসভার মতও ক্ষমতা প্রয়োগ করে……"।

বিভাগগুলো স্বতন্ত্র নয়

মন্তেস্কু সরকারী ক্ষমতার তিনটি বিভাগকে 'তিন ধরনের ক্ষমতা' (three kinds of power) বলে ভুল করেছেন। ঐ বিভাগগুলো "আলাদা নয়, পরস্পর সংলগ্ন—কেন্দ্রীয় শক্তির আধার থেকে বিদ্যুৎ যেমন বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, এখানে তেমনি আইন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের রূপ ধরে সকল বিভাগের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে।"[১]

এই নীতি অচলাবস্থা ও সংঘাত সৃষ্টি করবে

জন স্টুয়ার্ট মিলের (J. S. Mill) মতে সরকারের প্রতিটি বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয় তা হলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। কারণ, প্রতিটি বিভাগই অপর বিভাগকে কোন সাহায্য না করে কেবলমাত্র নিজ নিজ ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। এর ফলে সরকারের কর্মদক্ষতা হ্রাস পাবে। লাস্কিও মনে করেন, শাসন, আইন এবং বিচারবিভাগের কাজকে যদি সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা হয় তা হলে প্রতিটি বিভাগই নিজ নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে তা অন্যের ওপর চাপাবার চেষ্টা করবে। এ ভাবে বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।

কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে এই নীতি প্রয়োগ সম্ভব নয়

কোন কোন সমালোচকের মতে আধুনিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনকল্যাণ নীতির সার্থক রূপায়ণ করতে হলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জটিলতা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আইনবিভাগের স্থান সবার ওপরে। আইন-বিভাগ শুধুমাত্র আইনই রচনা করে না, ইহা শাসনবিভাগীয় কাজও করে। কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়। মন্তেস্কু তিনটি বিভাগকে সমান ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়। বাস্তব-ক্ষেত্রে আইনবিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং মন্তেস্কুর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তাঁর নীতি ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। বার্কার (Barker) অবশ্য মনে করেন যে, সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসনবিভাগের প্রাধান্যই বর্তমান যুগে বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয়। শাসনবিভাগ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নের বহু ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, মন্তেস্কু রাষ্ট্রব্যবস্থায় তিনটি বিভাগের ক্ষমতার সমতা ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ঐ ধারণা ভ্রান্ত।

তিনটি বিভাগের ক্ষমতা সমান নয়

সকল বিভাগকেই সকল কাজ করতে হয়

বর্তমান যুগে সরকারের কাজকর্মের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। শাসন বিভাগকে অনেক সময় আইন প্রণয়ন করতে হয়। আইনসভার অধিবেশন সারা বছর ধরে চলে না। একটি অধিবেশনের পর হয়তো সভার কাজ কয়েক মাস বন্ধ থেকে পুনরায় অধিবেশন শুরু হয়। ঐ দুটি অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালে জরুরী প্রয়োজন হলে শাসনবিভাগই সাময়িক ভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে। বিচারবিভাগও নূতন আইনের সৃষ্টি করতে পারে। বিচারকগণ আবশ্যক বোধ করলে ন্যায় বিচারের জন্য আইনের নূতন ব্যাখ্যা দান করে নূতন আইনের সৃষ্টি করতে পারেন। তেমনি আইনসভাও অনেক সময় বিচারবিভাগের কাজ করে। রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালের কর্তব্যের ত্রুটি হলে আইনসভায় তাঁদের বিচার হয়। এমতাবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি রাষ্ট্রীয় কাজের দ্রুত রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করে।

ভারত, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশে মন্ত্রিপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ এত বেশি যে, সেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রচলিত নেই বললেই

১. "Insulated rather than isolated—the current from the central powerhouse taking the form of law and the political process, runs equally through all of them."

চলে। মন্ত্রীরা শাসন বিভাগের কর্তা, কিন্তু তাঁরা আইনসভারও সদস্য এবং আইনসভার নিকট দায়ী। ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে জরুরী আইন প্রণয়ন করতে পারেন।

বাস্তব জগতে এই নীতি প্রয়োগ করা হয় না

কিছুদিন আগে পর্যন্তও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন একাধারে শাসনকর্তা ও বিচারপতি। তিনি জেলার শাসন-বিভাগের কর্তা এবং ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদিও স্বতন্ত্রীকরণের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তবুও কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে, সে দেশেও ঐ তিনটি বিভাগের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সংযোগ আছে। সুতরাং মন্টেস্কু যে ধরনের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি সমর্থন করেছেন তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে অতিরিক্ত ক্ষমতা বিভাজনের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হয়ে শাসনকার্য অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমালোচকেরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুতপক্ষে এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়নি। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যত এই নীতির কিছু প্রয়োগ ঘটেছে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের প্রয়োগ যদি সম্ভব এবং কাম্য হত তবে নিশ্চয়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই তত্ত্বকে কার্যকর করা হত। যদিও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে এর বিশেষ অবদান রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণের জন্য এই নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং তা কাম্যও নয়। **সুতরাং বলা যায়, ক্ষমতার পুরোপুরি স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়।**

এই নীতি অকাম্য এবং কার্যকর করা সম্ভব নয়

তিন: বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ (Application of the Theory in Different Constitutions)

বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কতটা প্রয়োগ ঘটেছে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারত ও সোবিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কতটা কার্যকর হয়েছে তা নীচে আলোচনা করা হল:

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কিছুটা পরিমাণে কার্যকর হয়েছে, যদিও মার্কিন সংবিধানে এই নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে শাসন পদ্ধতির এক মৌলিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করেছেন। ডঃ ফাইনার (Dr. Finer) বলেছেন যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রভাবেই হোক বা ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদেই হোক, সংবিধান প্রণেতাগণ ঐ নীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কার্যকর করেছেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি, যিনি শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী তিনি আইনসভা দ্বারা নির্বাচিত না হয়ে পরোক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তিনি আইনসভার সদস্য নন এবং আইনসভার অধিবেশনে যোগদান করেন না। অবশ্য শাসন পরিচালনার সুবিধের জন্য তিনি আইনসভার কাছে বাণী পাঠাতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বক্তৃতা করতে পারেন। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আইনসভা-প্রণীত আইনকে বাতিল করতে বা ভিটো দিতে পারেন। এভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইনবিভাগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ আইনসভাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইন ও শাসনবিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি।

শাসন ও বিচারবিভাগীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় প্রধান হয়েও বিচারকদের নিযুক্ত করে থাকেন এবং তিনি বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত অপরাধীর দণ্ড

মকুব বা হ্রাস করতে পারেন। অন্যদিকে মার্কিন সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট আইনবিভাগ কর্তৃক গৃহীত আইনের বৈধ্যতা বিচার করে এবং কোন আইন সংবিধান বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত হলে ঐ আইনকে বাতিল করতে পারে। সংবিধানের এই সূত্রগুলো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে লঙ্ঘন করেছে বলা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, করলে সংবিধান অচল হয়ে যাবে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

খ. ব্রিটেন: ব্রিটেনের সংবিধান দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, সেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়েছে। যেমন, রাজা বা রানী মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন, পার্লামেন্ট আইন রচনা করে এবং বিচারবিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ঐ বিভাগগুলো একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে এবং ঐ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়নি। বস্তুত ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে।

ব্রিটেনের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা যদিও শাসনবিভাগীয় সংস্থা, কিন্তু এরাই প্রকৃতপক্ষে আইনসভাকে পরিচালিত করে। আইনসভায় যে সকল বিল পাশ করা হয় তা মূলত ক্যাবিনেটের দ্বারা আগেই গৃহীত ও স্থিরীকৃত হয়। রাজা বা রানী শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল অনুমোদন করে তা আইনে পরিণত করার অধিকারী। আবার তাঁরা বিচারবিভাগ কর্তৃক অপরাধীর প্রতি প্রদত্ত দণ্ড মকুব ও হ্রাস করতে পারেন। ব্রিটেনের লর্ড চ্যান্সেলার ক্যাবিনেট বা শাসনবিভাগের সদস্য হয়েও লর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিচার-বিভাগের প্রধান বলে পরিগণিত হন। এই সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয়নি।

গ. ভারত: ভারতের সংবিধানে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে আলাদা করে দেখানো হলেও এখানে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর করা হয়নি। ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিলে স্বাক্ষর দান করে তা আইনে পরিণত করেন, জরুরী অবস্থায় জরুরী আইন প্রণয়ন করেন, বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, অপরাধীদের দণ্ড মকুব বা হ্রাস করে থাকেন, প্রয়োজনবোধে তিনি পার্লামেন্ট, বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা এবং মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করতে পারেন। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নন, তাঁর আইন ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও আছে। ভারতে মন্ত্রিমণ্ডলী শুধুমাত্র শাসনক্ষমতাই ভোগ করেন না, তাঁরা আইনসভারও সদস্য। বস্তুতপক্ষে মন্ত্রিসভাই আইনসভা পরিচালনা করেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র শাসনবিভাগ পরিচালনা করেন না, তাঁর নির্দেশে আইনসভাও পরিচালিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নেতা। ভারতে জেলাশাসক বা মহকুমা-শাসকেরা শুধুমাত্র যথাক্রমে জেলা ও মহকুমার সর্বময় শাসনকর্তা ছিলেন না, তাঁরা ফৌজদারী মামলায় বিচারপতির দায়িত্বও পালন করতেন। এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, ভারতের আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র বা পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত নয়, বরং এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

ঘ. সোবিয়েত ইউনিয়ন: মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে অবশ্য-গ্রহণীয় কোন আদর্শ হিসেবে মনে করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে সোবিয়েত শাসন-ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের উল্লেখ করা যায়। প্রেসিডিয়াম আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত, কিন্তু এর ক্ষমতা আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রসারিত।

চার: সরকারের শাসনবিভাগ (The Executive)

আইনসভা যে সকল আইন পাশ করে তাকে প্রয়োগ ও কার্যকর করে তোলার দায়িত্ব যে বিভাগের ওপর ন্যস্ত, তাকে শাসনবিভাগ বলে। অর্থাৎ আইনের মধ্য দিয়ে যে ইচ্ছে ব্যক্ত হয়

তাকে কার্যকর করার জন্য যে ব্যক্তিসমষ্টি থাকে তাদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। আইনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত ইচ্ছা কার্যকর এবং আইন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য সরকারের শাসনবিভাগ নিযুক্ত থাকে।

বিভিন্ন দেশে শাসনবিভাগ গঠনে বৈচিত্র্য

শাসনবিভাগ গঠনের ব্যাপারে বৈচিত্র্য দেখা যায়, সকল দেশে একইভাবে শাসন বিভাগ গঠিত হয় না। কোন কোন দেশে শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানে একজন রাজা (বা রানী) এবং কোন কোন দেশে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। এদের **প্রধান শাসক** (Chief Executive) বলে। ভারতের রাষ্ট্রপতি, ব্রিটেনের রানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি—এঁরা সবাই নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রধান শাসক। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন ব্যবস্থায় ঐ রাজা বা রাষ্ট্রপতির হাতে কোন প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা থাকে না, **শাসন বিভাগীয় প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে।** মন্ত্রীরা যতদিন আইনসভায় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করেন—ততদিন পর্যন্ত তাঁরা শাসন-ক্ষমতায় আসীন থাকেন। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনে প্রধানশাসক **রাষ্ট্রপতিই শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী** বা **প্রকৃত শাসনকর্তা**। কোন কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি চার বছর ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সাত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কিন্তু ভারত অথবা ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থা বলা হয় না। এগুলো হল মন্ত্রি সংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসনকর্তা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু মন্ত্রিদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী মন্ত্রিদের কাজ করতে হয়।

বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রী বা কর্মকর্তা সহ এক বিরাট কর্মচারীবাহিনী নিয়ে শাসনবিভাগ গঠিত হয়। এক একজন মন্ত্রী এক একটি বিভাগ পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেক বিভাগের মন্ত্রিদের অধীনে অসংখ্য কর্মচারী থাকে। প্রতিযোগিতামূলক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষার দ্বারা উচ্চপদস্থ স্থায়ী সরকারী কর্মচারীরা নিযুক্ত হয়। এদের বলা হয় আমলা। এরা এবং অন্যান্য অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী শাসনকার্য চালায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই (তিনি প্রকৃত শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক যা হোন) আইন ও সংবিধানের চোখে দেশের মুখ্যশাসক।

কাদের নিয়ে শাসনবিভাগ গঠিত হয়

শাসনবিভাগের কার্যাবলী

আধুনিক যুগে শাসনবিভাগ অন্যান্য বিভাগ থেকে অধিকতর ক্ষমতা, মর্যাদা ও গুরুত্ব ভোগ করে। তাই বর্তমানে রাষ্ট্রকে শাসনবিভাগীয় রাষ্ট্র (**Executive State**) বলা হয়। অধ্যাপক গার্নার শাসনবিভাগের কাজকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: ১. কূটনৈতিক (**Diplomatic**), ২. প্রশাসনিক (**Administrative**), ৩. সামরিক (**Military**), ৪. বিচার-সংক্রান্ত (**Judicial**) এবং ৫. আইন-সংক্রান্ত (**Lagislative**)।

১. কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্রবিষয়ক

কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতাবলীকে তিনটি বিষয়ে ভাগ করা যেতে পারে:

১. বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা; ২ কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ ও কর্মচারিগণকে নিয়োগ ও গ্রহণ করা, এবং ৩. সন্ধি বা চুক্তি করার ক্ষমতা। সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় দূতসমূহকে বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত করে থাকেন এবং বিদেশীয় প্রতিনিধি বা দূতদের গ্রহণ করে থাকেন। যিনি নামসর্বস্ব শাসক হন তিনি প্রকৃত শাসকের (ক্যাবিনেট) পরামর্শে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। চুক্তির ক্ষেত্রে সকল দেশেই তা কার্যকর করার জন্য আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক।

২. **প্রশাসনিক**

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক কর্তব্যকে শাসন বিভাগের প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা শাসন বিভাগের প্রাথমিক কর্তব্য। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা শাসন বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব। এজন্য শাসনবিভাগের অধীনে জেলা এবং জেলার নিম্ন স্তরে শাসক ও পুলিশ বাহিনী নিযুক্ত থাকে।

৩. **সামরিক**

তৃতীয়ত, সকল রাষ্ট্রেই সামরিক ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকে। দেশ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি নিয়োগ করা এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার ভার থাকে শাসনবিভাগের ওপর। ব্রিটেনে শাসনবিভাগের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করার ভারও অর্পণ করা হয়েছে। শাসনবিভাগের অধীনে সেনাবাহিনী (পদাতিক, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী) নিযুক্ত থাকে। এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যুদ্ধের সময় প্রায় সকল রাষ্ট্রের শাসনবিভাগই নাগরিকগণের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ বিবেচনাসাপেক্ষে সাময়িকভাবে বাতিল করে দিতে পারে।

৪. **বিচার সংক্রান্ত**

চতুর্থত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও প্রদান করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আছে অপরাধীকে ক্ষমা করার, দণ্ড হ্রাস করার অথবা মকুব করার অধিকার ইত্যাদি।

৫. **আইন বিষয়ক**

প্রতি দেশে প্রধান শাসক কিছু কিছু আইন-বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আইন-কানুন, বিধিনিষেধ ও বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশের খসড়া প্রণয়নের ভার শাসনবিভাগের ওপর থাকে বলে তাঁরা কার্যত ঐ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ আইনের খসড়াসমূহ উত্থাপন করে এবং আইনসভায় তা অনুমোদন করিয়ে নেয়। অর্ডিন্যান্স এবং অন্যান্য অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার (delegated legislation) বিবিধ ধারা কার্যকর করার অধিকার শাসনবিভাগকে প্রদান করা হয়েছে। আবার আইনসভার অনুমোদিত কোন আইনের খসড়াকে শাসনবিভাগ নাকচ করে দিতে পারে যদি তার ওপর 'ভেটো' (veto) প্রদান করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে শাসনবিভাগের প্রভাবও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান যুগে শাসনবিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধি

শাসনবিভাগের ক্ষমতা ও মর্যাদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বর্তমান যুগে শাসনবিভাগ শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে না বা আইনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যে ইচ্ছে ব্যক্ত হয় তাকে কার্যকর করতেই প্রয়াসী হয় না, বস্তুত শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের বহুমুখী কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও আইনসভার হাতে যে বিরাট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তা প্রকারান্তরে শাসনবিভাগই ভোগ করে—শাসনবিভাগের নির্দেশ ও ইচ্ছে অনুযায়ী আইন প্রণীত হয়। এ জন্যই বলা হয়, প্রধান শাসক বর্তমান যুগে 'প্রধান আইনপ্রণেতা' (chief executive is the chief legislator)। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে আইনসভার অবনয়নের (decline of legislature) ফলে শাসনবিভাগের তথা মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব (dictatorship of the cabinet) দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, বিটেনের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী—অর্থাৎ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের শাসকদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সমসাময়িক যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বস্তুত বর্তমানে ব্রিটিশ সরকারকে প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত সরকার (Prime Ministerial Government) নামে অভিহিত করা হয়।

শাসনবিভাগের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের কাছে শাসনবিভাগের মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রধান শাসক বা প্রকৃত শাসকের নাম আমাদের মুখে মুখে ফেরে।

আমরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, প্রেসিডেণ্ট ব্রেজনেভ, প্রেসিডেণ্ট রেগন, প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার প্রমুখের নাম সকলে জানি। কারণ আমরা উপলব্ধি করি যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য অনেকাংশে এদের ওপর নির্ভর করে। শুধু নিজের দেশের জনগণই নয়, এদের দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমগ্র পৃথিবীর মানুষের স্বার্থকে আন্দোলিত করার ক্ষমতা রাখে।

পাঁচ : রাজনৈতিক প্রশাসক এবং তাঁর কার্যাবলী (Political Executive and his Functions)

প্রধান শাসক (ব্রিটেনের রানী, ভারতের রাষ্ট্রপতি) থেকে শুরু করে মন্ত্রী, আমলা এবং নিম্নতম সরকারী কর্মচারী পর্যন্ত সবাই প্রশাসক। সাংবিধানিক ক্ষমতা, মর্যাদা, পদ (designation) ও স্তর অনুযায়ী প্রশাসকদের শ্রেণীবিন্যাস করা হলেও এঁরা সকলেই সাধারণভাবে প্রশাসক। কিন্তু এঁরা সবাই প্রশাসক হলেও মন্ত্রী এবং আমলা বা সরকারী কর্মচারীরা একই জাতের প্রশাসক নয়। প্রশাসকদের আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : ১. রাজনৈতিক প্রশাসক (Political Executive) এবং ২. পেশাগত বা স্থায়ী প্রশাসক (Professional or Permanent Executive)।

রাজনৈতিক প্রশাসক কাকে বলে ?

ব্রিটেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রীরা এক শ্রেণীর প্রশাসক—যাঁদের রাজনৈতিক প্রশাসক (Political Executive) নামে অভিহিত করা হয়। মন্ত্রীরা রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতা থেকে প্রশাসন মঞ্চে আবির্ভূত হন। মন্ত্রিত্বলাভের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতা ও প্রভাব বিচার্য বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। ফলে, মন্ত্রিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসক হিসেবে অনভিজ্ঞ থাকেন। রাজনৈতিক প্রশাসকেরা মূলত রাজনীতিবিদ্—রাজনীতিই তাঁদের প্রশাসক করে তোলে। রাজনৈতিক ক্ষমতা যতদিন এঁদের হাতে থাকবে ততদিন তাঁরা শাসনক্ষমতায় থেকে প্রশাসকের ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসকদের অস্থায়ী প্রশাসকও বলা চলে। ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক প্রশাসক বা তাঁর দল নির্বাচনে পরাজিত হলে প্রশাসকের পদ ত্যাগ করেন। রাজনৈতিক প্রশাসকদের কোন প্রশাসনিক দক্ষতা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে; কিন্তু এদের মূলধন রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক প্রশাসককে শৌখিন বা অপেশাদারী (Ameteures) প্রশাসকও বলা হয়। যেন, শখ করে প্রশাসক হয়েছেন, আবার শখ মিটলেই প্রশাসন থেকে সরে দাঁড়াবেন। প্রশাসন এঁদের পেশা নয়, পেশা হল রাজনীতি। স্থায়ী প্রশাসক থেকে মন্ত্রী হয়েছেন এরূপ নজীর প্রায় নেই বললেই চলে। সাধারণত, পেশায় রাজনীতিবিদ্, আইনজ্ঞ, শিক্ষক, সাংবাদিক, এমনকি ভবঘুরে ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব লাভ করেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এঁদের কারও প্রশাসন ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। যেমন, এক সময়ে ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছেন একজন দার্শনিক এবং অন্য সময়ে একজন সাংবাদিক যাঁরা যুদ্ধ এবং প্রশাসন ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ।[১] এরূপ ঘটনা ভারতেও বিরল নয়।

বস্তুত, গণতন্ত্রের প্রধান নিয়ামক এই রাজনৈতিক প্রশাসকগণ, যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক ব্যাপারে এঁরা একেবারেই অনভিজ্ঞ।[২]

ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক প্রশাসকদের কাছে প্রশাসনটা একান্তভাবেই শৌখিন ব্যাপার যেহেতু তাঁরা অপেশাদার। তাঁদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগের মানদণ্ড দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা

১. "The British War office has been headed at times by a philosopher or a journalist, the admiralty by a merchant or a barrister and a Board of Trade by a university professor."
—Munro

২. "The hallmark of democracy is dominance of government by politicians popularly oriented, chosen and accountable, and those skilled in popular politics are inevitably and desirably amateurs in everything else."
—Paul H. Appleby

নয়, নিয়োগ ঘটে একান্তভাবেই রাজনৈতিক কারণে। স্বভাবতই যে দপ্তরের প্রশাসনে তাঁরা নিযুক্ত হন সে ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা থাকে সামান্য। তাঁরা স্থায়িভাবে একই প্রশাসনিক পদে বেশিদিন আসীন থাকেন না। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ অথবা দপ্তর পরিবর্তন প্রায়শই ঘটে বলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সমান সুযোগও তাঁদের থাকে না। এককথায় তাঁরা রাজনীতিতে যত দক্ষই হন না কেন প্রশাসনিক ব্যাপারে এঁরা হলেন অনভিজ্ঞ এবং অপেশাদার।[৩]

অ-রাজনৈতিক বা স্থায়ী প্রশাসক

প্রতিটি দেশে আর একদল প্রশাসক আছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রশাসকদের মত অস্থায়ী, শৌখিন এবং অপেশাদার নয়। এরা অ-রাজনৈতিক, স্থায়ী, পেশাদার, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশাসক। সরকারের উচ্চপদস্থ আমলা (সচিব) থেকে শুরু করে সরকারী কর্মচারীরা এই পর্যায়ের প্রশাসক। সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করা থেকে শুরু করে নীতি প্রয়োগ এবং সরকার নামক যন্ত্রকে সচল রাখার ব্যাপারে এঁদের নিরলস ভূমিকা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।[২]

বস্তুত, বর্তমান যুগে সরকার মানেই হল পেশাগত প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত সরকার (government by professional administrators)। সরকার পরিচালনায় সরকারী কৃত্যকের গুরুত্বের মূল কারণ দুটি। প্রথমত, মুষ্টিমেয় অস্থায়ী ও অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসক বা মন্ত্রিদের পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ব বোধ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে রাজনৈতিক প্রশাসকদের নেতিবাচক ভূমিকা এবং অন্যদিকে স্থায়ী প্রশাসকদের ইতিবাচক ভূমিকা সরকারী কৃত্যককে গুরুত্ব দান করেছে। তৃতীয়ত, প্রশাসন ক্রমশ টেকনিক্যাল (technical) এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ে (specialised) পরিণত হয়ে উঠেছে। তাই প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন যা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে পারে। সরকারী কর্মচারীরা প্রশাসনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় এবং স্থায়িভাবে এ কাজ করার সুযোগ পাবার ফলে তাঁরা সব সময়ই প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান।

রাজনৈতিক শাসকের কার্যাবলী

শাসনবিভাগের কার্যাবলী সংক্রান্ত গতানুগতিক ধ্যানধারণা বর্তমান যুগে অচল। শাসন-বিভাগকে বিশেষ করে রাজনৈতিক শাসককে বর্তমানে সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রনৈতিক প্রক্রিয়াকে চালনা করতে হয়। অ্যালান বল বলেছেন, *The traditional areas of executive actions, such as foreign policy, defence and internal policy have been joined by the crucial roles modern government play in management of the economy and in attending to satisfy demands for social welfare.*

বর্তমান যুগে রাজনৈতিক প্রশাসকেরা কার্যাবলীকে এককথায় জনপ্রশাসনের (Public Administrations) ভাষায় বলা যায় POSDCORB। অর্থাৎ, P (Planning) পরিকল্পনা করা ; O (Organization) প্রশাসন-সংগঠন পরিচালনা করা ; S (Staffing) যথাস্থানে যথাযোগ্য কর্মী মোতায়েন বা নিয়োগ করা ; D (Directing) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা ; Co (Co-ordinating) প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা ; R (Reporting) সংবাদ প্রদান করা এবং B (Budgeting) বাজেট রচনা করা।

৩. "......The minister must of necessity be a paramount amateur, and the civil servant a permanent expert." —Finer

৪. "The permanent civil service is to be found not only in the administration, but also in legislation and finance ; it not only administers the laws, it largely shapes them ! it not only spends the proceeds of taxation, it largely decides how much is to be raised and how." —Ramsay Muir

অনেকে রাজনৈতিক প্রশাসকের কার্যাবলীকে তিনটি ব্যাপকভাগে চিহ্নিত করতে চান। এগুলো হল নীতি নির্ধারণ করা (Policy Formulation), পরিকল্পনা করা (Planning) এবং সংগঠন পরিচালনা করা (Organization)। এদের সংগে রাজনৈতিক প্রশাসনকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making), সমন্বয় সাধন (Co-ordination) এবং নেতৃত্বদানের (Leadership) দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়।

রাজনৈতিক প্রশাসকের কার্যাবলীর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর বাইরেও রাজনৈতিক প্রশাসকের আরও কিছু কিছু কাজ সম্পাদন করতে হয়। তাই রাজনৈতিক প্রশাসকের কার্যাবলীকে একসংগে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন, সরকারের রূপ ও কাঠামো (যেমন রাষ্ট্রপতি-পরিচালিত সরকার, মন্ত্রিসভা-পরিচালিত সরকার) অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রশাসকের কাজে কিছুটা হেরফের হতে পারে, তবে মোটামুটিভাবে সকল রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক প্রশাসক নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে :

১. **নীতি-নির্ধারণ :** প্রশাসক যে সকল মৌখিক, লিখিত বা অনুমিত মৌল কার্যধারা অনুসরণ এবং প্রয়োগ করে তাকে নীতি বলে (A policy is verbal, written or implied basic guide to action that is adopted and followed)। অ্যাপেলবির (Paul H. Appleby) ভাষায় বলা যায়, সরকারী কাজকর্মের নির্যাস (essence) হল নীতি। নীতি পথ নির্দেশ করে যার ওপর ভিত্তি করে সরকারের কার্যধারা স্থির করা হয়। সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা রাজনৈতিক প্রশাসকের। সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। কি আইন প্রণয়ন করা হবে তা থেকে শুরু করে সামরিক প্রতিরক্ষা, অর্থ, বৈদেশিক সম্পর্ক, সামাজিক ন্যায়, শিক্ষা সংক্রান্ত সব কিছুই এর অন্তর্গত।

২. **আইন প্রণয়ন :** ব্যাপক অর্থে নীতি নির্ধারণের মধ্যে আইন প্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত হলেও রাজনৈতিক প্রশাসকের কাজ হিসেবে একে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। আইন-প্রণয়ন আইনবিভাগের কাজ হলেও বর্তমানযুগে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে শাসনবিভাগ এবং এই কারণে আইনসভার ওপর শাসনবিভাগের প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকারে রাজনৈতিক শাসকই আইনসভা পরিচালনা করে। যা হোক, আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা থেকে শুরু করে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, আইনসভায় আলোচনার কর্মসূচী স্থির করা ইত্যাদি সকল কিছুই রাজনৈতিক শাসককে করতে হয়।

৩. **পরিকল্পনা :** সরকারের ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যধারার ভিত্তি হল পরিকল্পনা। শাসনবিভাগীয় প্রয়াসের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করা এবং সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় আবিষ্কারকে পরিকল্পনা বলে। সরকারের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা থেকে উৎসারিত এবং এই পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় রাজনৈতিক শাসকদের। রাজনৈতিক শাসকদের রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনার রূপরেখা ও অগ্রাধিকার স্থির হয়।

৪. **জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা :** জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা রাজনৈতিক প্রশাসকের অন্যতম প্রধান কাজ (The management of national economy is the largest and most important category of all)। এক সময় ছিল যখন কর ধার্য করে রেভিনিউ সংগ্রহ করা এবং সেই টাকা খরচ করার মধ্যেই সরকারের অর্থসংক্রান্ত কাজকর্ম এবং দায়দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সামাজিক ন্যায় ও সেবার প্রসার, সরকারী উদ্যোগ ও সরকার-পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ ইত্যাদির জন্য জাতীয় অর্থনীতি নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে। বাজেট প্রণয়নও জাতীয় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

৫. **সংগঠন গড়া ও তা চালু রাখা :** রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাপক কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারী সংগঠন গড়া ও একে চালু রাখা রাজনৈতিক শাসকের অন্যতম কর্তব্য। সরকারের দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা নিয়ে যে ব্যাপক ও বৃহদায়তন কাঠামো গঠন করা হয় তাকে সংগঠন বলে। লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং এই সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা

থেকে শুরু করে সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কাঠামো ও সংস্থা ইত্যাদি গঠন ও তাকে রক্ষণ করা রাজনৈতিক শাসকের বিশেষ দায়িত্ব।

৬. **আনুষ্ঠানিক কাজ ঃ** রাজনৈতিক শাসককে কিছু আলংকারিক বা আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। কর্মচারী নিয়োগ, বিচারপতি নিয়োগ, রাষ্ট্রদূত নিয়োগ অনেকটা নীতি নির্ধারণের অন্তর্গত হলেও রাজনৈতিক শাসকের আনুষ্ঠানিক-কর্তব্যের মধ্যে এগুলোও পড়ে। এ ছাড়াও বিদেশের রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি কিছু কিছু একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক কাজও রাজনৈতিক শাসককে সম্পন্ন করতে হয়।

৭. **নেতৃত্ব দান ঃ** বর্তমান যুগে রাজনৈতিক প্রশাসকদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নেতৃত্ব দান। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সচল ও কার্যকর রাখার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সরকারকে সুযোগ্য ভাবে পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব দান করা একটি অপরিহার্য কাজ হিসেবে দেখা দিয়েছে। জনগণকে নেতৃত্বদান, সরকারী কর্মচারীদের নেতৃত্ব দান, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এদের গতিশীল রাখার জন্য নেতৃত্ব দান করা যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক শাসকের প্রধানতম দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসক হিসেবে সাফল্য লাভ করার জন্য তাঁর নেতৃত্বসুলভ গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সরকারী প্রক্রিয়াতে নেতৃত্ব দান করাকে রাজনৈতিক প্রশাসকের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ বলা যায়।

ছয় ঃ এক-সদস্যবিশিষ্ট শাসক ও বহু-সদস্যবিশিষ্ট শাসক (Single and Plural Executives)

শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কার হাতে অর্পিত হয়েছে—এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ডঃ গার্নার শাসককে **একক শাসক** (Single Executive) ও **বহু শাসক** (Plural Executive) এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যখন কোন দেশের শাসনক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের (বা কয়েকজন ব্যক্তি যাঁরা যৌথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে) হাতে অর্পিত থাকে তখন তাকে **একক শাসক বলে**। মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক শাসকের উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সেখানকার রাষ্ট্রপতি পদাধিকারীর হাতে থাকে বলে তাঁকে একক শাসক বলা হয়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ রাষ্ট্রেই আমরা একক শাসকের প্রাধান্য দেখতে পাই।

একক শাসক কাকে বলে ?

অন্যদিকে যখন কোন রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সম-ক্ষমতার অধিকারী একাধিক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, তখন আমরা একে **বহু শাসক** (Plural Executives) বা **গোষ্ঠী শাসক** নামে অভিহিত করি। ইতিহাসে 'বহুশাসক'-এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন এথেন্সে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত থাকত। প্রাচীন রোমের সংবিধানেও এরূপ নজির দেখতে পাওয়া যায়। স্পার্টার (Sparta) শাসনব্যবস্থায় একই সঙ্গে দুজন রাজার শাসন লক্ষ্য করা যায়। তবে ঐ সকল প্রাচীন ধরনের বহু শাসকবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা ইতিহাসে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি।

বহু শাসক কাকে বলে ?

ইদানীং কালে সুইজারল্যান্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নে 'বহু শাসক' প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। সুইশ সংবিধানে সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা সাতজনকে নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদের (Federal Council) ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে যদিও নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সভাপতি আছেন, কিন্তু বাস্তবে ঐ সাতজনই সম-ক্ষমতার অধিকারী। সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী শাসন বিভাগীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ঐ সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় ৩৩ জন সদস্য নিয়ে। যদিও সভাপতিমণ্ডলীর একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান আছেন, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে এঁরা সকলেই সমক্ষমতাসম্পন্ন যৌথ সদস্য।

উদাহরণ ঃ সুইস ও সোবিয়েত ব্যবস্থা

দোষ-গুণ

ডঃ গার্নার মনে করেন যে, 'একক শাসক' ব্যবস্থায় দায়িত্ব পালন অনেক বেশি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। কারণ বহু শাসক থাকলে বিভিন্ন মতের সমন্বয় করা খুবই কঠিন।[১] দ্বিতীয়ত, ঐ কারণেই 'একক শাসক' দ্রুততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারে। সিজউইক মনে করেন যে, বিপদের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'একক শাসন' অপরিহার্য। তৃতীয়ত, দায়িত্বশীলতার দিক হতে 'বহু শাসক' থেকে 'একক শাসক' অধিকতর কাম্য। চতুর্থত, 'একক শাসনে' কর্মদ্যোগ অবিভক্ত থাকে। পঞ্চমত, এই শাসন ব্যবস্থায় গোপনীয়তা রক্ষা করা সহজ।

একক শাসন ব্যবস্থায় পক্ষে যুক্তি

অন্যদিকে বহু শাসক বা গোষ্ঠী-শাসন ব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হয় যে, এরূপ ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার কম হয়। একজন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে কিন্তু সমষ্টির পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী-শাসনে জনগণের স্বাধীনতা হরণের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে বলে অনেকে মনে করেন। তৃতীয়ত, গোষ্ঠী-শাসনের পক্ষে বলা হয় যে, একজনের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা যৌথ সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সুচিন্তিত এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেজন্য ইহা কাম্য।

বহু-শাসক ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি

কিন্তু শাসকের ত্রুটি খুঁজে বের করা ও দায়িত্ব আরোপ করার (fixation of responsibility) দিক থেকে গোষ্ঠী-শাসনের চেয়ে একক-শাসন ব্যবস্থা অনেক নির্ভরযোগ্য ; এই কারণে বিচারক স্টোরী (Story) মনে করেন যে, একজনকে নিয়ে শাসন বিভাগ ও বহুজনকে নিয়ে আইনসভা গঠন করাই শ্রেষ্ঠ (There ought to be a single executive and a numerous legislature)।

সাত ঃ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ (The Union Executive)

ভারতে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা বা আইনসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থার উৎস হ'ল ব্রিটেনের ক্যাবিনেট বা সংসদীয় ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থাকে *Westminster Model* বলে। দীর্ঘদিন ধরে ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার জন্য ঐতিহ্যগত সাযুজ্য এবং সংসদীয় ব্যবস্থার মানসিকতাই ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ। সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বগত দিক থেকে তিনিই প্রধান শাসক—বাস্তবে তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান মাত্র। তাঁকে পরামর্শ দানের জন্য আছে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভাই প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

শাসন বিভাগের প্রকৃতি

ভারতের সংবিধানের ৫৩ (১) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং ঐ ক্ষমতা তিনি সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে অথবা অধস্তন প্রশাসকের দ্বারা প্রয়োগ করবেন।[২] অর্থাৎ ভারতের প্রধান শাসক হলেন রাষ্ট্রপতি। আবার, সংবিধানের ৭৪ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে।[৩] অর্থাৎ শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চে আছেন রাষ্ট্রপতি এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে একটি

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ কাদের নিয়ে গঠিত

১. "A single person or a very small body of persons is better fitted for the discharge of such duties than a numerous assembly composed of many minds and entertaining a variety of views."
—Dr. Garner

২. "The executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution."
Article 53(1), Constitution of India

৩. "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions."
—Article 74 (1), Constitution of India

মন্ত্রিসভা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত মোটামুটি ভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তাই বাস্তবে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা যার পরিচালনা ও নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের পক্ষে একা এত বড় দেশের শাসন প্রত্যক্ষভাবে করা সম্ভব নয়, তাই প্রশাসনের জন্য আছে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের এক বিরাট বাহিনী। সুতরাং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনবিভাগ গঠিত।

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং দায়িত্বশীল প্রকৃত শাসক। নিয়মতান্ত্রিক শাসক হলেন রাষ্ট্রপতি ও তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি। প্রকৃত শাসক হল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা স্থায়ী নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তখন তারা মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রত্যক্ষ প্রশাসনের জন্য আছে বিপুলসংখ্যক স্থায়ী সরকারী কর্মচারী। সুতরাং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ গঠিত।

কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের ক্ষমতা আলোচনার সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতের সংবিধানের কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয়। তাই সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় সংসদ (পার্লামেণ্ট) যে সকল বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী সে সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে সেই সকল বিষয়েও কেন্দ্র কর্তৃক শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে। এ ছাড়া সংবিধানে যে যুগ্ম তালিকা আছে, ঐ তালিকার অধীন বিষয়গুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দিতে পারে এবং সংসদ ঐ বিষয়গুলো বিশেষ অবস্থায় নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে।

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের ক্ষমতা

আট ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি (The President of India)

ভারতের সংবিধান রচনা করে গণপরিষদ বা *Constituent Assembly*. গণপরিষদে অনেক আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ব্রিটেনের অনুকরণে ভারতে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান একজন রাষ্ট্রপতি। ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের সংবিধানের ৫২ নম্বর ধারায় বিধিবদ্ধ করা হয় যে ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন (There shall be a President of India) এবং রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। সুতরাং বলা যায়, ভারতের শাসনবিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে জানা প্রয়োজন রাষ্ট্রপতি কি ভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি খুবই জটিল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মত পরোক্ষভাবে একটি নির্বাচন সংস্থা (Electoral College) দ্বারা নির্বাচিত হন। ঐ নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয় ভারতীয় সংসদের (পার্লামেণ্টের) উভয় কক্ষের এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে। ঐ সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। আইনসভার মনোনীত সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল। ভোটের ব্যাপারে দুটি নীতি অনুসৃত হয়। প্রথমত, সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যদের মিলিত ভোটের সমপরিমাণ ভোট রাজ্য বিধানসভাগুলোর সদস্যদের থাকে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের ভোটগুলোর সমষ্টি যদি ধরা যায়, ১,০০,০০০, তবে ভারতের সকল বিধানসভাগুলোর সদস্যদের ভোটের সমষ্টিও ১,০০,০০০ হবে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্বে আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা হয়।

দুটি মূলনীতি

প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভার প্রতিটি সদস্যের ভোটের মূল্য স্থির করার জন্য প্রথমে সেই রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে এবং ঐ ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এবার যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সেই রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা সদস্যের ভোটের মূল্য। ভাগশেষ ৫০০ বা তার বেশী হলে ভোটের মূল্য আরও এক বাড়বে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মূল্য নির্ধারণের জন্য ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করতে হবে। মনে কর, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৩,৩৬০০৭০০ এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৮০। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রতিটি সদস্যের ভোটের মূল্য হবে $\frac{৩,৩৬,০০,৭০০}{২৮০ \times ১০০০} = ১২০ + ১ = ১২১$, কারণ জনসংখ্যা ৩,৩৬,০০,৭০০-কে ২৮০ দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ১২০। কিন্তু ভাগশেষ ৭৮০ হবার জন্য ভাগফলের সংগে এক যুক্ত হবে এবং সদস্যদের ভোটের মূল্য ১২১ ধরা হবে।

বিধানসভার সদস্যদের ভোটমূল্য নির্ণয়

সংসদের প্রতিটি সদস্যের ভোটের সংখ্যা স্থির করার জন্য প্রথমে রাজ্যগুলোর বিধানসভার সদস্যদের সমষ্টিগত ভোট সংখ্যা বের করে তাকে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্য দ্বারা ভাগ করতে হবে। নির্ণেয় ভাগফলই সংসদের প্রতিটি সদস্যের ভোটের মূল্য। মনে করা যাক, ভারতের সকল রাজ্যগুলোর বিধানসভা সদস্যদের ভোটের সমষ্টি (মূল্য) ৩,২০,০০০ এবং সংসদের দুই কক্ষের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৮০০। তা হলে সংসদের প্রতিটি সদস্যের ভোটের মূল্য হবে ৫০০।

পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোট মূল্য নির্ণয়

$$\frac{৩,২০,০০০}{৮০০} = ৪০০$$

এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি আলোচনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা (proportional representation by means of single transferable vote)। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচনে যে কজন প্রার্থী থাকবে ভোটদাতারা পছন্দ অনুযায়ী তাদের নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা বসাবে। নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য প্রার্থীকে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট যাকে 'কোটা' বলে তা পেতে হবে। ঐ 'কোটা' বার করার পদ্ধতি হ'ল ঃ

ভোটদান পদ্ধতি

$$\frac{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের বৈধ ভোট সংখ্যা}}{\text{নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা} + ১} + ১ = \text{প্রয়োজনীয় ভোট বা কোটা}$$

ধরা যাক, কোন নির্বাচন কেন্দ্রের মোট বৈধ ভোট সংখ্যা ১৫০০০ এবং নির্বাচন কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ১। এ অবস্থায়, $\frac{১৫০০০}{১+১} + ১ = \frac{১৫০০০}{২} + ১ = ৭৫০০ + ১ = ৭৫০১$টি ভোটকে 'কোটা' বলা হবে।

কোন প্রার্থী 'কোটা' সংখ্যক ভোট পেলে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। যদি দেখা যায় যে, কোনও প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বা 'কোটা' পাননি তবে সবচেয়ে কম ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রাপ্ত ভোটপত্র পছন্দ অনুসারে অন্যান্য প্রার্থীর পক্ষে হস্তান্তরিত করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রার্থী 'কোটা' সংখ্যক ভোট না পান, ততক্ষণ পর্যন্ত

যাঁরা কম ভোট পেয়েছেন নীচু থেকে তাঁদের এক-একজন প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তাঁর ভোটের হস্তান্তরকরণ পদ্ধতি চলতে থাকে।

একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যেতে পারে :

মনে কর, নির্বাচনে তিনজন প্রার্থী আছেন এবং প্রত্যেক প্রার্থী যা ভোট পেয়েছেন তা হ'ল :

বৈধ ভোটের সংখ্যা ১৫,০০০
'ক' ভোট পেয়েছে ৬,০০০
'খ' ভোট পেয়েছে ৫,০০০
'গ' ভোট পেয়েছে ৪,০০০
আসন সংখ্যা = ১

কোন প্রার্থীই 'কোটা' অর্থাৎ ৭৫০১টি, অথবা তার বেশি ভোট না পাওয়ায় অর্থাৎ কারও ভোটের 'কোটা' পূর্ণ না হওয়ার কাকেও নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা যাবে না। 'গ' সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছে, তাই 'গ'-কে নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে তার ভোট পত্রে 'ক' ও 'খ' দ্বিতীয় পছন্দের যে ভোটগুলো পেয়েছে ঐ ভোটগুলো 'ক' ও 'খ'-র সঙ্গে যুক্ত করা হল। মনে করি 'গ'-র ৪০০০ ভোটের মধ্যে ক ৫০০ এবং খ ৩৫০০ দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পেয়েছে। সুতরাং এবারে ভোট সংখ্যা হবে এইরূপ :

'ক'-এর ভোট ৬০০০ + ৫০০ = ৬৫০০
'খ'-এর ভোট ৫০০০ + ৩৫০০ = ৮৫০০
('গ' নির্বাচন থেকে বাদ গিয়েছে)

দ্বিতীয় বারে 'খ' 'কোটা'-র (৭৫০১) ভোট পাওয়ায় নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবে।

এই পদ্ধতি গ্রহণের কারণ

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে এরূপ জটিল সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নীতি এবং পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি-গ্রহণের কয়েকটি কারণ আছে। **প্রথমত,** ভারতের মত বিরাট দেশে কোটি কোটি ভোটদাতার পক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। **দ্বিতীয়ত,** ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করলে তিনি প্রকৃত ক্ষমতা দাবি করতে পারেন। তাঁকে প্রকৃত শাসনক্ষমতা দিলে মন্ত্রিপরিষদের হাতে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে না। এতে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার নীতি রক্ষা করা যায় না। **তৃতীয়ত,** নির্বাচকমণ্ডলীই যখন জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তখন এভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক বলে মনে করা চলে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেন্দ্রের দলীয় সরকারের প্রাধান্য পরিহার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়নীতিকে মর্যাদা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ এবং রাজ্যগুলির প্রতিনিধি উভয়কেই নির্বাচকমণ্ডলীতে স্থান দেয়া হয়েছে। এর ফলে জাতীয় সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্ভব হয়েছে। **চতুর্থত,** এটা না করে যদি সাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করা হত, তবে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা বেশি থাকলে সংখ্যালঘু ভোটেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকত। ঐ ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদার পক্ষে হোত হানিকর, তাই তা সমর্থনযোগ্য নয়। এই সকল কারণে ভারতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি ও পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ এবং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি

শপথ গ্রহণ

নির্বাচিত হবার পরে রাষ্ট্রপতিপদের দায়িত্ব গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহণ করে কার্যভার গ্রহণ করতে হয়। শপথ গ্রহণের সময় তিনি এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, তিনি বিশ্বস্ততার সংগে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন, সংবিধান ও আইন সংরক্ষণ করবেন এবং ভারতের জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপতি যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সকল কাজ করেন তার জন্য তাঁকে আদালতে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হয় না। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না বা তাঁকে ঐ অভিযোগে গ্রেপ্তার করাও যায় না।

আদালতের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা ও কার্যকাল

রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে হলে প্রার্থীকে ১. ভারতের নাগরিক হতে হবে, ২. তাঁর বয়স ৩৫ বছরের বেশি হবে, ৩. তাঁর সংসদের প্রথম কক্ষের, অর্থাৎ লোকসভার প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকতে হবে, ৪. তিনি সরকারী কোন লাভজনক কাজে (an office of profit) নিযুক্ত থাকতে পারবেন না।

যোগ্যতা

ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একই ব্যক্তি দু'বারের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। কিন্তু ভারতে এরূপ কোন নিয়ম নেই। তবে এখন পর্যন্ত ভারতে কোন রাষ্ট্রপতি দুবারের (two terms) বেশি সময় রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হননি। সুতরাং মনে হচ্ছে যে, ভারতেও একজন ব্যক্তি দুবারের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না এ ধরনের রীতি গড়ে উঠছে।

কার্যকাল

পদচ্যুত করার পদ্ধতি

সংবিধানের ৬১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত ও পদচ্যুত করতে পারা যায়। সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য সংসদের যে কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাবাকারে অভিযোগ আনতে পারে। যদি ঐ অভিযোগ সেই কক্ষের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্য দ্বারা গৃহীত হয় এবং অন্য কক্ষ কর্তৃক অনুসন্ধানের পর সেখানেও যদি দু-তৃতীয়াংশ সদস্য দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবে রাষ্ট্রপতি তাঁর পদ থেকে অপসারিত হবেন।

রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা

রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা পার্লামেণ্ট আইন করে স্থির করেন। বর্তমানে তিনি ভাতা ছাড়াও মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন পান এবং তাঁর ঐ আয় আয়করমুক্ত। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় সরকারী আবাসে (রাষ্ট্রপতি ভবন) বাস করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকালীন অবস্থায় তাঁর বেতন ও ভাতার পরিবর্তন করা যায় না। ইচ্ছা করলে অবশ্য তিনি কম বেতন গ্রহণ করতে পারেন। *President's Pension Act, 1951* অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরে তিনি বাৎসরিক ১৫,৯০০ টাকা অবসরকালীন ভাতা (**Pension**) পান।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে রাষ্ট্রপতির পদ থাকলেও মনে রাখতে হবে যে, ভারতে রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা নেই—ভারতে মন্ত্রি-সংসদ চালিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ব্রিটিশ রাজা বা রানীর মত ভারতেও রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসিত হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। প্রকৃত পক্ষে ব্রিটেনের মতই আমাদের দেশে প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলতে আমরা তাই মন্ত্রিসভার ক্ষমতাকেই বুঝি। তবু রাষ্ট্রপতির নামে ঐ সকল ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় বলে আমরা ঐ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নামে অভিহিত করতে পারি। সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, *The Executive powers of the Union shall be vested in the President*. রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাকে সাধারণত সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

ক. শাসন পরিচালনার ক্ষমতা বা শাসনমূলক কাজ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রাষ্ট্রপতি অবস্থিত এবং তাঁর নামেই দেশের সকল শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। তিনি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। তাছাড়া, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, নির্বাচন কমিশনের সভাপতি, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১. নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

যিনি কার্যত সরকার পরিচালনা করেন সেই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই তিনি অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেচনা প্রয়োগ করার বিশেষ কোন সুযোগ পান না। লোকসভার নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের সংসদের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির কোন উপায় থাকে না। তবে যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ায়, কোনো দলেরই নির্ভরযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে এবং একাধিক রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠন করা ছাড়া অন্য সমাধান চোখে না পড়ে, তখন রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষভাবে নিজস্ব বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে পারেন।

২. প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিদের নিয়োগ—মন্ত্রিসভা গঠন

বস্তুত ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জনতা দল থেকে ব্যাপক দল ত্যাগের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পদত্যাগ করায় এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ সময় বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর 'কোয়ালিশন' গঠন করে একাধিক নেতা মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার দাবী করেন। রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিচারশক্তি প্রয়োগ করে শ্রীচৌধুরী চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। সংবিধানে আরও বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে। যতদিন এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও নীতির উদ্ভব না হচ্ছে, ততদিন রাষ্ট্রপতিকে দেখতে হবে যে, কোন মন্ত্রিসভা সত্যই জনগণের আস্থাভাজন কি না। জনসাধারণের সমর্থন হারিয়েছে মনে করলে তিনি সংবিধানের ৭৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন ; ভারতে নিযুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করেন। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রপতির নামে করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি এই পদাধিকার বলে জল, স্থল এবং নৌ-বাহিনীর প্রধানদের নিযুক্ত করেন। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা ভোগ করেন।

৩. কূটনৈতিক ক্ষমতা

৪. সামরিক ক্ষমতা

খ. আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি এবং আইনসভার উভয় কক্ষ নিয়ে ভারতীয় সংসদ গঠিত। রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষ অথবা একটি কক্ষের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, অধিবেশন স্থগিত রাখতে পারেন এবং নিম্ন পরিষদ বা লোকসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বক্তৃতা করতে পারেন। কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হলে তিনি উভয় কক্ষের নিকট বাণী পাঠাতে পারেন [৮৬ (২) নম্বর ধারা]। রাষ্ট্রপতি সংসদে এরূপ বাণী পাঠালে তা নিয়ে সংসদে দ্রুত আলোচনা হবে। তবে সাধারণত রাষ্ট্রপতি এরূপ বাণী প্রেরণ করেন না, মন্ত্রিসভার সঙ্গে মতৈক্য না হলে তবেই সংসদের কাছে এরূপ বাণী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

সংসদ আহবান

সংবিধানের ৩৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষেই কয়েকজন সদস্যকে মনোনয়ন করতে পারেন। এরূপ সদস্য মনোনয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সব সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। নির্বাচন-পদ্ধতিতে ঐরূপ স্বার্থরক্ষা সম্ভব নাও হতে পারে, এ কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতিকে ঐ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

সংসদ-সদস্য মনোনয়ন

উভয় কক্ষের দ্বারা কোন বিল পাশ হলে তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি অবশ্য প্রয়োজন। একমাত্র রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পরেই কোন বিল আইনে পরিণত হতে পারে। বিলটিতে তিনি সম্মতি প্রদান করতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকতে পারেন। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করলে বিলটি সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় কক্ষ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয় তা হলে উক্ত বিল দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত করা হবে এবং সংবিধানের ১১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী তাঁকে সম্মতি প্রদান করতেই হবে।

বিলে সম্মতিদান

রাষ্ট্রপতি-প্রবর্তিত জরুরী আইনগুলি (Ordinance) আইনসভার পরের অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করতে হবে এবং সংসদের অনুমোদন না পেলে তা ছয় সপ্তাহ পরে বাতিল হয়ে যাবে। কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব-সম্মতি প্রয়োজন হয়। কোনো নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পুরানো কোনো রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন ইত্যাদি প্রস্তাব সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব-অনুমোদন প্রয়োজন (৩ নম্বর ধারা)। অর্থ-দাবী সংক্রান্ত কোন বিল বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের *Consolidated Fund* হতে খরচ সম্বন্ধীয় কোন বিলও রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি বাদে পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করা যায় না [১১৭ (১) এবং ১১৭ (৩) নম্বর ধারা]। তা ছাড়া আয়কর থেকে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার-এর মধ্যে বণ্টিত হয়। দেশে প্রচলিত সরকারী ভাষা পরিবর্তনের বিলেও রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন। সকল অর্থ-সংক্রান্ত বিল (Money Bills) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে সংসদে উত্থাপিত হয় বলে ঐগুলো পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি ফেরত পাঠাতে পারেন না।

কয়েকটি আইনে রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন

রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে তাঁর জরুরী আইন জারী করার ক্ষমতা (Ordinance-making power) আছে। সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকা অবস্থায় (সংবিধানের ১১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতি অর্ডিনান্স বা জরুরী আইন-প্রণয়ন করতে পারেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর ছয় সপ্তাহকাল পর্যন্ত ঐ সকল অর্ডিনান্স কার্যকর থাকে। সংসদের অধিবেশন শুরু হলে ঐ অর্ডিনান্স নিয়ে আলোচনার শেষে তা অনুমোদন, বা বাতিল করার অধিকার সংসদের আছে।

জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স জারীর ক্ষমতা

রাজ্যবিধানসভা কর্তৃক প্রণীত কোন বিল যদি রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠান (যেমন, কেরালা ভূমি-সংস্কার বিল, পশ্চিমবঙ্গে ছ'টি কলেজ অধিগ্রহণ বিল) এবং যদি রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি প্রদান না করেন তবে ওই বিল আইনে পরিণত হবে না। ঐ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নয়, রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভায় গৃহীত কোন বিল তার কাছে পাঠালে তবেই তিনি তা অনুমোদন বা নাকচ করতে পারেন। অবশ্য কার্যত তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ ক্রমেই ঐ সকল বিল অনুমোদন বা বাতিল করেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য রাজ্য আইনসভায় পাঠাতে পারেন। রাজ্যের আইনসভা বিলটি পুনরায় পাশ করে তাঁর কাছে পাঠালে তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে বিলটি নাকচ হয়ে যাবে।

রাজ্য বিধানসভা প্রণীত আইন বাতিল করার ক্ষমতা

গ. অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্য

রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় পরিষদে আগামী বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়ের বা বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অর্থ সংক্রান্ত দাবী এবং অর্থবিল রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে

সংসদে উত্থাপন করা হয়। আকস্মিক তহবিল (contingency Fund of India) রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে।

ঘ. রাষ্ট্রপতির জরুরী বিষয়ক ক্ষমতা

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে কতকগুলো জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers) দেয়া হয়েছে। জরুরী ক্ষমতাগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ

১. **জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণাঃ** সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, তা হলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য ১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর ৩৫২ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রথম জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ঐ বছর ৩রা ডিসেম্বর ৩৫২ ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। ১৯৭৫ সালে বৈদেশিক আক্রমণের এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে এরূপ জরুরী অবস্থা তৃতীয়বার ঘোষণা করা হয়েছিল। জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা দুমাসের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে—না হলে তা আর কার্যকর থাকবে না। সংসদের উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা বলবৎ থাকবে। ভারতে এরূপ জরুরী অবস্থা কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে সে সম্পর্কে সংবিধান কিছু নির্দেশ করেনি।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং রাজ্যগুলোর ওপর কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় রাষ্ট্রপতি বিশেষ আদেশ দ্বারা আদালত কর্তৃক নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলবৎ করা ক্ষমতা বাতিল করতে পারেন। সংবিধানের ২৫০ (১) ধারা অনুযায়ী রাজ্যতালিকার যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন করতে পারেন।

২. **রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণাঃ** রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থায় উদ্ভব হয়েছে তা হলে তিনি সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ঘোষণা জারী করে সে রাজ্যের মন্ত্রিসভা বাতিল করে ঐ রাজ্যে শাসন ক্ষমতা নিজহাতে গ্রহণ করতে পারেন। ঐ ঘোষণার বলে রাষ্ট্রপতি এরূপ আদেশ দিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংসদ দ্বারা পরিচালিত হবে। সংসদ তখন রাজ্য বিধানমণ্ডলীর আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর অর্পণ করতে পারে এবং ঐ ক্ষমতা অন্য কাউকেও প্রত্যর্পণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ সঞ্চিত তহবিল থেকে ঐ রাজ্যে অর্থব্যয়ের অনুমতি দিতে পারেন। এরূপ ঘোষণা দু মাসের বেশী স্থায়ী থাকে না। সংসদের উভয় কক্ষ প্রস্তাব পাশ করে ঐ ঘোষণা অনুমোদন করলে তা আরও ৬ মাস বলবৎ থাকে। ছয় মাস করে বাড়িয়ে এরূপ জরুরী অবস্থা ৩ বছর পর্যন্ত বলবৎ রাখা চলে। এ পর্যন্ত বহুবার পশ্চিমবঙ্গসহ অনেক অঙ্গরাজ্যেই ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. **অর্থ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণাঃ** যদি রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারতের বা এর কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা হলে তিনি সংবিধানের ৩৬০ নম্বর ধারা অনুসারে আর্থিক সংকটাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ অবস্থায় রাজ্যের অর্থ-সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনবোধ করলে রাজ্যসরকারকে নির্দেশ দিতে পারবে। সাধারণভাবে এরূপ ঘোষণার মেয়াদ দুমাস কাল বলবৎ থাকবে। তবে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দ্বারা গৃহীত হলে এর মেয়াদ বাড়ান যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের বর্তমান সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা এখন পর্যন্ত একবারও ঘোষণা করা হয়নি।

জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সমালোচনা

অনেকে মনে করেন, বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা, অঙ্গরাজ্যের শাসন সচল রাখা এবং আর্থনীতিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার এত ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া ঠিকই হয়েছে। জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলো রাষ্ট্রপতি প্রয়োগ করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শে। তাই তাঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঐ ক্ষমতাগুলো অপপ্রয়োগের আশংকা খুব বেশি নেই।

তবে বাস্তব ক্ষেত্রে জরুরী ক্ষমতা অপপ্রয়োগের আশংকা এত প্রবল যে, অনেকে রাষ্ট্রপতির হাতে এত বেশি ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমর্থন করতে পারেননি। অনেকে সঙ্গতভাবেই মনে করেন, ভারতে জরুরী অবস্থার মাধ্যমে শাসনবিভাগীয় স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। জরুরী অবস্থার সময় বিচারালয় শাসন বিভাগের কাজ বৈধ কিনা তা বিচার করতে পারে না—এই ব্যবস্থা ন্যায় ও গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী। তা ছাড়া জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু জরুরী অবস্থা কত দিন থাকবে, কি অবস্থায় তা ঘোষণা করা হবে এবং কতদিন তা রাখা উচিত, সংবিধানে সেরূপ কোন নির্দেশ নেই। ১৯৭৫ সালে শান্তির সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তাই শান্তির সময়ে জরুরী অবস্থা চলা উচিত নয়—এরূপ মত অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রকাশ করেছেন। সংবিধানের জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থার সমালোচনা করে এইচ. ভি. কামাথ আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, এর ফলে ভারতে এক সার্বিক পুলিশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

কোন রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করে যেভাবে অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা সহজেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন যে কোন রাজনৈতিক দলকে অঙ্গরাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসীন অন্য রাজনৈতিক দলকে সাংবিধানিক উপায়ে হেনস্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। **প্রথমত,** কোন অঙ্গরাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি মনে করলেই সেই অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতির মনে হবার কারণ কি বা কোথা থেকে তিনি খবর পেলেন—তা জানাবার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁর নেই এবং এ ব্যাপারে আদালতেরও কিছু করণীয় নেই। **দ্বিতীয়ত,** কোন অঙ্গরাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রপতির এরূপ নিশ্চিত ধারণা হওয়া এবং এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর নির্ভর করে না—এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ দলীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে কোনো অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা জারী করা হবে কিনা এবং ঐ সিদ্ধান্ত যথার্থ কিনা তা ব্যাখ্যা বা প্রমাণের কোন আইনগত ব্যবস্থা নেই। ফলে যখনই কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল ক্ষমতাসীন হয়, তখনই কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে পারে। অঙ্গরাজ্য সরকারকেও সর্বদাই তাই কেন্দ্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির শাসন জারীর আশংকার মধ্যে থাকতে হয়। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী তো বটেই, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিরও বিরোধী।

কে. ভি. রাও তাঁর *Parliamentary Democracy of India* নামক গ্রন্থে অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অ-যুক্তরাষ্ট্রীয়, অগণতান্ত্রিক, কুট-কৌশলপূর্ণ এবং অবিবেচনাপ্রসূত অবাস্তব বলে মন্তব্য করেছেন।

ঙ. বিচার বিষয়ক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ সকল বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতির অন্যান্য বিচার বিষয়ক ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ৭২ নম্বর ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি মার্জনা করতে পারেন, সাময়িকভাবে মুক্তিদান করতে পারেন, শাস্তির পরিমাণ কমাতে পারেন।

চ. রাজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

রাজ্যসমূহের শাসনতান্ত্রিক প্রধান বা রাজ্যপালদের রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন। কতকগুলো

বিল সম্বন্ধে রাজ্যের আইনসভায় আলোচনার আগে রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিতে হয়। যুগ্ম তালিকার অধীন কোন বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা প্রস্তাব গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরেই সেই প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে পারে।

ছ অন্যান্য ক্ষমতা

উপরোক্ত ক্ষমতা ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আরও কতকগুলো ক্ষমতা ভোগ করেন। ১· কোন অঞ্চলকে তপসিলী অধ্যুষিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা; ২· তপসিলী প্রশাসন অঞ্চল সম্পর্কে রাজ্যপালদের কাছ থেকে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠান; ৩ সংবিধানপ্রদত্ত কতকগুলো ব্যাপারে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা; ৪· কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের মতামত চেয়ে পাঠান; ৫· বিভিন্ন কমিশন নিয়োগ করা; ৬· জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা।

রাষ্ট্রপতির যে সকল ক্ষমতা আলোচনা করা হল ঐ ক্ষমতাগুলো প্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। **সুতরাং সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলো বিধিবদ্ধ করা হলেও বাস্তবে ঐ ক্ষমতাগুলো প্রয়োগের ক্ষমতা মন্ত্রিসভার।**

নয় ঃ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা (Position of the President)

আমরা রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতার করা আলোচনা করেছি। তত্ত্বগত দিক থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুবই ব্যাপক ও বিরাট। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো রাষ্ট্রপতি নিজে কতটা প্রয়োগ করেন তার দ্বারাই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব। ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে ব্রিটিশ সংবিধানের অনুকরণে। ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং সকল সরকারী ক্ষমতা তাঁর নামেই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব প্রধান—সকল ক্ষমতাই প্রয়োগ করে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা।

ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদের (Constituent Assembly) বিভিন্ন সদস্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত নিয়মতান্ত্রিক অথচ মর্যাদাপূর্ণ পদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। গণপরিষদের খসড়া কমিটির (Drafting Committee) সভাপতি ডঃ আম্বেদকার বলেছিলেন যে, সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটেনের রাজা বা রানী যে পদমর্যাদা ভোগ করেন, ভারতের রাষ্ট্রপতিও সে পদমর্যাদা ভোগ করবেন (**Under the Constitution the President occupies the same position as the King under the English Constitution**)। তিনি আরও বলেছিলেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু শাসকপ্রধান নন। তিনি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না। তিনি জাতির প্রতীক। কিন্তু প্রশাসনে তাঁর ভূমিকা হ'ল একটা আনুষ্ঠানিক যন্ত্রের মত—যার মাধ্যমে জাতির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। গণপরিষদে শ্রীজওহরলাল নেহেরুও বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতিকে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, যদিও তাঁর পদটিকে মর্যাদাপূর্ণ করা হয়েছে (**We have not given our President any real powers, but we have made his position one of great authority and dignity**)।

গণপরিষদের অভিমত ঃ রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান

পরবর্তীকালে সংবিধান পারদর্শীরা রাষ্ট্রপতির প্রকৃত ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই একটি আলোচনা চক্রে ঐ বিতর্কের সূত্রপাত করে বলেছিলেন যে, ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, গণপরিষদের সভাপতি থাকাকালীন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই বলেছিলেন যে, মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ, তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন, নিয়মতান্ত্রিক প্রধানমাত্র।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা নিয়ে বিতর্ক

ভারতের সংবিধানের ৭৪ (১) নম্বর ধারায় আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। এখন প্রশ্ন হল যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য কিনা? যদি দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য, তবে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক নামসর্বস্ব শাসক হতে বাধ্য। কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নিজের বিচারবুদ্ধিমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী হন তবে তাঁকে প্রকৃত শাসকের পর্যায়ে গণ্য করা উচিত।

মূল প্রশ্ন : রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানতে বাধ্য কি না

উপরোক্ত প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মতমার্থক্য আছে। বিখ্যাত সংবিধান পারদর্শী ডঃ ডি. এন. ব্যানার্জী মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য নন। বস্তুত সংবিধানে এরূপ কোন কথা নেই যে, তাঁকে মন্ত্রিসভার কথামত চলতে হবে।

কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী ভারতে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা আছে এবং রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকবেন। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের এরূপ বিধান থাকার অর্থ হল সংসদের আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করে কাজ করা বা এরূপ মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাস্তবে সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বাস্তবে এরূপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না যে, মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামত কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও অভিমত প্রকাশ করেছে যে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও ভারতে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত (*Ram Jawaya vs State of Punjab*)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। **এ সম্পর্কে যাতে কোন অনিশ্চয়তা না থাকে তার জন্য ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলবেন।**

মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানতে বাধ্য

এ ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধানের বিধান ছাড়াও বিগত প্রায় তিনযুগ ধরে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে সাংবিধানিক রীতিনীতি (conventions) গড়ে উঠেছে তাঁর মূল্যও কম নয়। ঐ সাংবিধানিক রীতিনীতি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, মন্ত্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করবে এবং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলবে। আজ পর্যন্ত আমাদের এমন একটি ঘটনার কথাও জানা নেই যেখানে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করেছেন বা মন্ত্রিসভার অজ্ঞাতসারে নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। ভারতের সাতজন রাষ্ট্রপতির শাসনের মধ্য দিয়ে এই সুস্থ রীতিই গড়ে উঠেছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটি মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত পদ, যদিও তিনি নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। কারণ ঐ ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন সংসদের আস্থাশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী। সর্বোপরি রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্পর্কে সকল বাকবিতন্ডার অবসান ঘটিয়ে **৪৪তম সংবিধান সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন।** তবে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত তাঁকে নিছক "জাঁকজমকপূর্ণ সাক্ষীগোপাল" বলা যায় না।

রাজনীতিও রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান করেছে

তবে সাম্প্রতিককালে (জুলাই, ১৭৭৯) প্রধানমন্ত্রী মোরারজী (জনতা দল) মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পরে রাষ্ট্রপতি যেভাবে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী পদের বিভিন্ন দাবীদারের মধ্য থেকে শ্রীচরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং শ্রীচরণ সিংহের পদত্যাগের পরে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের পরে কাকেও মন্ত্রিসভা গঠন করতে না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, **যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলতে বাধ্য, কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে কোন দল**

একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

দশ ঃ রাষ্ট্রপতির সংগে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক (Relation between the President and the Council of Ministers)

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদের সাংবিধানিক মর্যাদা অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্কটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির হাতে ব্যাপক শাসন-বিভাগীয়, আইন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রপতিকে কিছু বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল ঃ মন্ত্রিভার পরামর্শ না নিয়ে তিনি কি ঐ সকল ক্ষমতা নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারেন বা প্রয়োগ করেন ?

মন্ত্রিসভার সংগে সম্পর্ক

১. মন্ত্রিসভার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্কের আলোচনা মন্ত্রিসভা গঠন থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। সংবিধানে আছে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করবেন। লোকসভার নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের লোকসভার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে তালিকা রাষ্ট্রপতিকে পেশ করেন, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অর্থাৎ ঐ তালিকা অনুযায়ী ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা একান্তভাবেই আনুষ্ঠানিক।

মন্ত্রিনিয়োগে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা আনুষ্ঠানিক

২. মন্ত্রিসভার দায়িত্ব সম্পর্কে সংবিধানে [৭৫ (৩) নম্বর ধারায়] বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভা যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকবে। সুতরাং মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়িত্বশীল থাকে না, দায়িত্বশীল থাকে লোকসভার কাছে এবং লোকসভা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ করে মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে বাতিলের অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই।

মন্ত্রিসভা লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল

৩. রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন পদে নিয়োগের যে অধিকার ভোগ করেন সেগুলো মন্ত্রিসভার পরামর্শমত তাঁকে করতে হয়। রাজ্যপাল, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, অডিটর ও কম্পট্রোলার জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ও সদস্য, নির্বাচন কমিশনার, ফিনান্স কমিশনের সভাপতি ও সদস্য ইত্যাদি পদে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তথা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি চলেন।

মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ

৪. ১২৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্ডিনান্স জারী করা এবং ৩৫২, ৩৫৬, ও ৩৬০ নম্বর ধারা অনুষায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা হলেও এ ব্যাপারেও তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। এমনকি ক্ষমা প্রদর্শনের বিশেষাধিকারও তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করেন।

৫. সংসদে রাষ্ট্রপতি যে ভাষণ দেন তা মন্ত্রিসভা রচনা করে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা রচিত ভাষণ তাঁকে পাঠ করতে হয়। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর করেন।

৬. দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী এই বাহিনীকে পরিচালিত করতে পারেন না। এ ব্যাপারে জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে চলতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রপতির হাতে ব্যাপক ক্ষমতা সংবিধান ন্যস্ত করলেও বাস্তবে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক

প্রধানের হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করার অর্থ হ'ল এই যে ঐ ক্ষমতা তিনি সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, সংবিধানে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এরূপ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না যে, মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে বা মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারতের রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। সুপ্রীম কোর্টও ১৯৫৫ সালে *Ram Jawaya V. The State of Punjab* মামলায় বলেছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা বাস্তবে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত।[১] ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইন গৃহীত হবার আগে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা ছিল সাংবিধানিক রীতি। কিন্তু ৪৪-তম সংশোধনী আইন গৃহীত হবার পরে মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলা রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। কারণ ৪৪-তম সংশোধন আইন অনুযায়ী মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি পুনর্বিবেচনা করতে বলতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার পুনর্বিবেচিত সুপারিশ তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য (৭৪ নং ধারা)।

মন্ত্রিসভার পরামর্শমত
চলা বাধ্যতামূলক

মন্ত্রিসভার পরমর্শমত চলা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকলেও এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এই দুই ব্যক্তি-সত্তার ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, দক্ষতা, দলের ওপর প্রভাব এবং ভাবমূর্তির দ্বারা উভয় পদের মর্যাদা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, কোন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে তাঁর সময়কার রাষ্ট্রপতি যদি অধিকতর ব্যক্তিত্বপূর্ণ, শ্রদ্ধাভাজন, জনপ্রিয়, দক্ষ, দলের ওপর প্রভাবশালী এবং উজ্জ্বল ভাবমূর্তির অধিকারী হন তবে প্রচলিত সংবিধান কাঠামোর মধ্যেও তিনি রাষ্ট্রপতির পদকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হবেন।

১৯৭৯ সালে ভারতে এক সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয় এবং ঐ সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রপতি যেভাবে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করেন তাতে সাংবিধানিক সংকটকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়। ঐ শাসনতান্ত্রিক সংকট প্রমাণ করে যে, যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলতে বাধ্য, কিন্তু লোকসভার নির্বাচনে কোন দল বা বিভিন্ন দলের কোন জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা ভোগ করেন এবং কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এমন কোন তদারকী সরকার গঠিত হলে রাষ্ট্রপতি ঐ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য নন, বরং তদারকী সরকার অনেক ব্যাপারেই রাষ্ট্রপতির পরামর্শ মত চলতে বাধ্য থাকে।

সাংবিধানিক সংকটে
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি

রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী সম্পর্ক

সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে তিনিই হলেন যোগসূত্র। সুতরাং মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য নিয়ে কোন সংশয় নেই। ভারতে জওহরলাল নেহেরুর সময় থেকেই প্রধানমন্ত্রীর পদটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার ফলে মন্ত্রিসভার ওপরে তাঁর একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রধানমন্ত্রীর পদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ছায়ায় মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব ঢাকা পড়ে। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মানেই প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। সুতরাং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক বাস্তবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির আমলে প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. A.I.R. 1955, SC. (549)

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বার বছর (১৯৫০—৬২) রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরুর অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ও মতপার্থক্য ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জওহরলাল নেহেরুর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গভীর পার্থক্য ছিল। দৃষ্টিভঙ্গিগত মত পার্থক্যের জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে এঁদের মধ্যে মত পার্থক্য গড়ে ওঠে—যা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বিরোধের রূপ নেয়। ১৯৫১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবেদনে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নেহেরুকে জানান যে, মন্ত্রিসভার সুপারিশকে বাধ্যতামূলকভাবে না মেনে নিজস্ব স্বাধীন বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী তিনি (রাষ্ট্রপতি প্রসাদ) বিল বিবেচনা করা, বিলে স্বাক্ষর দান, বিল সংসদে ফেরৎ পাঠানো, সংসদে ভাষণ দান ইত্যাদি কাজগুলো করতে ইচ্ছুক। হিন্দু কোড বিল নিয়ে নেহেরুর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির গুরুতর মতভেদ ছিল এবং হিন্দু কোড বিলে স্বাক্ষর করার বাধ্যবাধকতা এড়াবার জন্যই তিনি ঐ প্রতিবেদন পাঠিয়ে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। যাহোক এ ব্যাপারে এ্যাটর্নী জেনারেল এম. সি. শীতলবাদ ও গণপরিষদের অন্যতম সদস্য এ কে আয়ার রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার বিরোধিতা করে বিস্তারিত ভাবে সাংবিধানিক যুক্তি উপস্থিত করেন এবং দেখান যে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করাই রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্ব। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও আর এ নিয়ে সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য কিনা সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রকাশ্যভাবে ১৯৬০ সালে প্রশ্ন তোলেন। সম্ভবত এই কারণেই ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

মূলত নেহেরুর ইচ্ছাতেই ডঃ রাধাকৃষ্ণান (১৯৬২-৬৭) ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুরই ছিল। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তীকালে এঁদের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, চীন-ভারত বিরোধের সময় থেকে নেহেরু বিরোধীরা ডঃ রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে শুরু করেন এবং এঁদের পরামর্শে ১৯৬২ সালে তিনি তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমেননকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য নেহেরুর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।[১] শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবার পরে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর ওপর ডঃ রাধাকৃষ্ণান প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ সাল থেকে শ্রীমতী গান্ধী নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী চলতে শুরু করেন। এই সময়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণানের বিভিন্ন বক্তৃতায় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার সুর ধ্বনিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়।

ডঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি পদে মাত্র দু বছর (১৯৬৭-৬৯) আসীন ছিলেন। তিনি মোটামুটিভাবে আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবেই কাজ করতেন এবং মন্ত্রিসভা তথা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোন সংঘাতে যাননি। তবে শোনা যায়, তিনি নাকি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উপেক্ষা করে চলেন।[২]

ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয় এবং শ্রী ভি. ভি. গিরি রাষ্ট্রপতি পদে (১৯৬৯-৭৪) নির্বাচিত হন। ভি. ভি. গিরি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডীর প্রার্থীপদের বিরোধিতা করে শ্রীগিরিকে ভোটদানের জন্য আহ্বান জানান। তিনি প্রত্যেককে দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী না চলে বিবেক অনুযায়ী ভোট দিতে অনুরোধ করেন। অন্যদিকে বামপন্থীরাও শ্রীগিরিকে সমর্থন করেন এবং শ্রীগিরি কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডিকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হন। সুতরাং সবদিক থেকেই রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত এবং পছন্দসই ব্যক্তি। তাই তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর নিজের লোক মনে করা হ'ত। প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই

১. *The Indian President and the Prime Minister,* Venkatachari p. 106.

২. Heads of the State, Inder Malhotra, P. 10-11.

আন্তরিক ও মধুর ছিল। কিন্তু এঁদের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। ফলে ১৯৭৪ সালে যখন তাঁর রাষ্ট্রপতি পদের প্রথম কার্যকাল (term) শেষ হয়, তখন শ্রীমতী গান্ধী দ্বিতীয়বারের জন্য শ্রীগিরিকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করতে অস্বীকার করেন এবং শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করা হয়।

শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ দু বছরের কিছু বেশি সময় (১৯৭৪-৭৬) রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শ মত চলতেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য বা সংঘাতে যেতেন না।

১৯৭৭ সালে জনতা দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি (১৯৭৭-৮২) রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। জনতা দল সরকার গঠনের তিন বছরের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে জনতা সরকারের পতন ঘটে এবং একটা সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। শ্রীরেড্ডি কিছুদিন নিছক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কাজ না করার সুযোগ পান। কোন একটি দলের সরকার গঠন করার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তিনি নিজস্ব বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং চৌধুরী চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং তদারকি সরকার গঠন করেন। এরপরে সাধারণ নির্বাচনের পরে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস দল পুনরায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়। শ্রীরেড্ডীর সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সম্পর্ক কখনও ভাল ছিল না—এমনকি উভয়ে কংগ্রেসে থাকা কালেও। ফলে ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে জ্ঞানী জৈল সিংকে প্রার্থী মনোনীত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি ?

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি' (**Prime Minister's President**) মনোনয়নের ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই প্রবর্তিত হবার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। ১৯৮২ সালে এই ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রীরা কখনও পছন্দমত রাষ্ট্রপতি পেয়েছেন, কখনও পাননি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে পছন্দমত ব্যক্তি শ্রী ভি. ভি. গিরিকে দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করতে চাওয়ায় কংগ্রেস দল দ্বিধা বিভক্ত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রী গিরির সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের সময় কংগ্রেস (ই) দলের থেকে একটা তত্ত্ব (**The same wavelength theory**) দাঁড় করিয়ে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি পদে এমন একজনকে নিয়োগ করা প্রয়োজন যিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন। কারণ এর দ্বারা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতাকে সুনিশ্চিত করা যায়। তাই ১৯৮২ সালে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত, বিশ্বাসভাজন এবং অনুগত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ভিত্তি প্রস্তুত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী শ্রী জ্ঞানী জৈল সিংকে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস মনোনীত করে এবং তিনি ঐ পদে জয়ী হন। পর্যবেক্ষকেরা বলেন, রাষ্ট্রপতি জৈল সিং একান্তভাবেই শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব প্রার্থী এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী চলবেন এবং উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন সম্ভাবনা দেখা দেবার অবকাশ ঘটবে না। জ্ঞানী জৈল সিং-কে আক্ষরিক অর্থে 'প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি' নামে অভিহিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর জীবিতকাল পর্যন্ত এদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল এবং এখন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জৈল সিং-এর সম্পর্ক ভাল। সুতরাং বলা যায় যে 'প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি' নিয়োগের যে প্রবণতা এতদিন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠার চেষ্টা চলছিল তা পুরোপুরি সফল হয়েছে। তবে এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে চালু থাকবে কিনা তা সব সময়ই প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, দক্ষতা প্রভৃতি গুণ এবং দলের ওপর প্রভাবের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

এগার ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হতে পারেন ? (Can the President of India become a Dictator ?)

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা আলোচনা করার সময়ে আমরা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে বলেছি যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান—প্রকৃত শাসক নন। তিনি একনায়কে পরিণত হতে পারেন কিনা সে সম্পর্কে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথমত, সংবিধান রচয়িতাদের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত করা। ডঃ আম্বেদকার সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত চলতে বাধ্য। এবং তিনি রাষ্ট্রপতির পদকে ব্রিটিশ রাজা বা রানীর পদের সমতুল্য বলে অভিহিত করেছিলেন ঃ *The President occupies the same position as the King under the English constitution. He is the head of the State but not of the executive. He represents the nation, but does not rule the nation. The president of the Indian Union will be generally bound by the advice of his ministers. He can do nothing contrary to their advice, nor can he do anything without their advice.*

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের অনেক ধারা উল্লেখ করা চলে যেখানে রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃতশাসক বলা সম্ভব নয়। পরোক্ষ নির্বাচনের তাৎপর্যই হল রাষ্ট্রপতির কোন প্রকৃত দায়িত্ব না-থাকা। সংবিধানে ৭৮ নম্বর ধারায় আছে যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। তিনি প্রকৃতশাসক হলে ঐ অধিকার ঘোষণার দরকার হত না। আর শুধু সিদ্ধান্ত 'জানবার' নয়, ঐ সিদ্ধান্ত 'গ্রহণের' অধিকারও তাঁর স্বভাবতই থাকত।

তৃতীয়ত, ভারতে দায়িত্বশীল সরকার **(Responsible Government)** গঠিত হয়েছে—সংসদের কাছে শাসনকার্যের জন্য দায়িত্বশীল হল মন্ত্রিসভা, রাষ্ট্রপতি নয়। ফলে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। রাষ্ট্রপতি যদি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করতে না পারেন তবে তাঁকে লোকসভা ভেঙ্গে দিতে হবে। পরের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর দল পুনরায় নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতিকেই পদত্যাগ করতে হবে।

চতুর্থত, আমাদের দেশে সাংবিধানিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, সব রীতিনীতি ও প্রথার পূর্ণ উদ্ভব এখনও হয়নি। ঐ সকল প্রথাই সংবিধানের কংকাল বা কাঠামোকে জীবন্ত রূপ দেন ও চলমান রাখে। ভারতে বিগত তিন যুগ ধরে যেটুকু রীতিনীতি গড়ে উঠেছে তা থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র ; প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নন।

পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতি কখনই সংবিধান বিসর্জন দিয়ে একনায়কে পরিণত হতে পারেন না। দেশের জনমত নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন থাকবে, আর রাষ্ট্রপতি সংবিধান লঙ্ঘন করে একনায়ক হবেন, এ কখনই স্বাভাবিক নয়। এরূপ ঘটনা কখনও ঘটলে রাষ্ট্রপতির কাজকে সংবিধান-বিরোধী বলা হবে, সংবিধানসম্মত নয়।

সর্বোপরি ৪৪তম সংশোধনী আইনে (*44th Amendment Act*) রাষ্ট্রপতির মর্যদা, ভূমিকা এবং তিনি একনায়ক হতে পারেন কিনা এই সংক্রান্ত সব তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বলা হয়েছে যে, সাংবিধানিক কাজ সম্পাদনের ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ মানতে বাধ্য থাকবেন। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় সাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপতির একনায়কে পরিণত হবার কোন সম্ভাবনা নেই এবং এ ব্যাপারে সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে মতপার্থক্যেরও আর কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু এতসব আইন, রীতি ও রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও একটা ব্যাপারে ভারতের রাষ্ট্রপতির সর্বাত্মক ক্ষমতালাভের একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। লোকসভার নির্বাচনে যদি কোন একটি দল বা একাধিক দলের কোয়ালিশন সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয় তবে সেক্ষেত্রে কি ঘটবে সে সম্পর্কে আমাদের সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। জনতা সরকারের পতনের পরে

কেন্দ্রে এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হতে পারতো। এ রকম অবস্থা সৃষ্টি হলে তাকে মোকাবিলা করার ব্যাপারে কোন সাংবিধানিক নির্দেশ না থাকায় অনেকে মনে করেন যে, ঐ অবস্থায় কেন্দ্রে কোন মন্ত্রিসভা না থাকলে রাষ্ট্রপতি সর্বাত্মক ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করতে পারেন।

বার ঃ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (The Vice-President of India)

সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ভারতে একজন উপরাষ্ট্রপতি আছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে উপরাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচন করা হয়। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত এক নির্বাচকমণ্ডলী একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। উপরাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রপতির মত পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে যে সকল যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন উপরাষ্ট্রপতির পদের প্রার্থীরও সেই সকল যোগ্যতা থাকতে হবে। তবে এ ব্যাপারে একটি পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীর লোকসভার প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, আর উপরাষ্ট্রপতি পদে দাঁড়াতে হলে রাজ্যসভার প্রার্থী হবার যোগ্যতা থাকতে হবে। লোকসভার সম্মতি থাকলে রাজ্যসভার সদস্যদের ভোটাধিক্যে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।

নির্বাচন পদ্ধতি

যোগ্যতা

অপসারণ

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি মার্কিন উপরাষ্ট্রপতির মত সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এটি উপরাষ্ট্রপতির অন্যতম প্রধান কাজ। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতির অসুস্থতা বা অনুপস্থিতি বা হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণণের অনুপস্থিতিকালে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতিরা রাষ্ট্রপতির কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুতে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতির কাজ

মর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতির স্থান রাষ্ট্রপতির পরেই। তবে রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও ভাববিনিময়ের মাধ্যমে ভারতের নীতি ও আদর্শ তুলে ধরা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় উপরাষ্ট্রপতির বিশেষ কোন কাজ নেই। সংবিধান প্রণেতারা ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদকে যথেষ্ট পরিমাণে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁকে খুব বেশী ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পণ করেননি।

মর্যাদা

তের ঃ ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (Union Council of Ministers)

আমরা আগেই বলেছি যে, ভারতে ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রে ক্ষমতা প্রয়োগের ও শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ওপর বর্তেছে। ভারতের সংবিধানের ৭৪(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির সাহায্য ও পরামর্শের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। (There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions)। যদিও সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য মন্ত্রিসভা থাকবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, শুধু মন্ত্রণা দান নয়, প্রকৃত শাসনের জন্যই মন্ত্রিসভা। সংসদের নিম্নকক্ষ বা লোকসভার নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল কর্তৃক সংসদে নির্বাচিত নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদেরও নিয়োগ করেন।

সব মন্ত্রীদের নিয়েই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় বটে, কিন্তু ভারতে আমরা তিন ধরনের মন্ত্রী দেখতে পাই এবং এঁদের মধ্যে একমাত্র যাঁরা 'ক্যাবিনেট' পর্যায়ের মন্ত্রী (Cabinet Ministers)

তারাই ক্যাবিনেটের সদস্য। অন্য দু ধরনের মন্ত্রীরা অর্থাৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Minister) ক্যাবিনেটের সদস্য নন। সাধারণত প্রতিটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে এক একটি দপ্তর ন্যস্ত করা হয়। যেমন, অর্থ দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর ইত্যাদি। অবশ্য কখনও কখনও রাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনেও স্বাধীনভাবে দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। প্রতিটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনে আবার রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী নিযুক্ত থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কোন্ মন্ত্রী কোন্ পর্যায়ের এবং কোন্ দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন তা রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। প্রতিটি মন্ত্রীকে সংসদের কোন-না-কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। কেউ মন্ত্রী হবার সময়ে সদস্য না থাকলে তাঁকে ছয় মাসের মধ্যে সংসদের সদস্য হতে হবে। ছয় মাসের মধ্যে সংসদের কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে না পারলে তিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারেন না। কতজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট গঠন করা হবে তা সংবিধানে বলা হয়নি এবং এ ব্যাপারে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম মানা হয় না।

মন্ত্রিদের বিভিন্ন স্তর ও গঠন

শাসন পরিচালনা করা, নীতি নির্ধারণ করা এবং আইন রচনা করার জন্য বিল তৈয়ারী করা ও তা উত্থাপন করা মন্ত্রিসভার কাজ। এ ছাড়া সংসদ কর্তৃক গৃহীত নীতি রূপায়িত করাও মন্ত্রিসভার দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা ঐ ব্যাপক এবং বিরাট দায়িত্ব পালন করে সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে।

মন্ত্রিসভার কাজ

মন্ত্রিসভা তার কাজের জন্য যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সংবিধানের ৭৫(৩) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে, *The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.* প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 'ক্যাবিনেট' দ্বারা গৃহীত হয়। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি কোন মন্ত্রী ঐক্যমত না হন, তবে হয় তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়, নয় ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হয়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সি. ডি. দেশমুখ 'ক্যাবিনেটের' সঙ্গে মতভেদের জন্য পদত্যাগ করেছিলেন। যাহোক, ক্যাবিনেট যে সিদ্ধান্ত নেয় এবং মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে তার জন্য মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও সংসদে প্রতিটি দপ্তরের মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্তরের কাজের দায়িত্ব, সাফল্য ও অসাফল্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন এবং সংসদে নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন। এক সময়ে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় লালবাহাদুর শাস্ত্রী রেল দুর্ঘটনার জন্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। যৌথ দায়িত্ব ছাড়াও দপ্তরের ব্যক্তিগত দায়িত্ব যে কোন মন্ত্রী এড়াতে পারেন না, এটা তারই প্রমাণ।

যৌথ দায়িত্ব

মন্ত্রিসভা যদি সংসদের আস্থা হারায় তবে সংসদ অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে মন্ত্রিসভাকে অপসারণ করতে পারে। তবে দলীয় প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য যতদিন লোকসভায় শাসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে ততদিন অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হবার সম্ভাবনা থাকে না। লোকসভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। তখন অন্য কেউ যদি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করার দাবী করেন এবং রাষ্ট্রপতি যদি সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন, তবে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেয়া হতে পারে। অন্যথায় রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন ব্যবস্থা করেন।

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা

বর্তমানযুগে পার্লামেণ্টারী প্রথায় মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও প্রাধান্য এতটা ব্যাপ্ত হয়েছে যে সকল ব্যাপারেই ক্যাবিনেট প্রায় নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাবিনেটের এই ক্রমবর্ধমান ও চরম ক্ষমতাকে কোন কোন সমালোচক "ক্যাবিনেটের একনায়কতন্ত্র" বা "ক্যাবিনেট ডিরেক্টরশিপ" নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের (Parliamentary control) বিভিন্ন মাধ্যম—অর্থাৎ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বিতর্ক, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি পন্থা প্রয়োগ করে সংসদ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ ছাড়াও মন্ত্রিসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কয়েকটি কমিটি রয়েছে এবং বিরোধীপক্ষ ঐ সকল কমিটির মাধ্যমেও মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক্যাবিনেট একনায়কতন্ত্র

সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। ক্যাবিনেট পরিচালনা, সরকারের নীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান ইত্যাদি সকল বিষয়েই প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চৌদ্দ : ভারতের প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister of India)

ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মধ্যমণি হলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ভোগ করেন এবং বস্তুত তিনিই হলেন সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি, চরম ক্ষমতা এবং ব্যাপক প্রভাবের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি শুধু সরকার বা প্রশাসনের প্রধান নন, সরকার পরিচালনা করে যে দল তিনি সেই দলের এবং জনগণের একটা ব্যাপক অংশের নেতা বা নেত্রী এবং জাতির মুখ্য মুখপাত্র। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা ও কর্মদক্ষতার ওপরে সমগ্র মন্ত্রিসভার ঐক্য, সংহতি, দায়িত্বশীলতা ও শাসনদক্ষতা নির্ভর করে। শুধু মন্ত্রিসভার নয়, সামগ্রিকভাবে সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই দায়ী। ব্রিটেনের ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও *Keystone of the Cabinet arch* বলা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে সাংবিধানিক বিধি খুবই সংক্ষিপ্ত। সংবিধানে [৭৫(১) নং ধারা] শুধু বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কোন্ নীতির ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীপদে নিয়োগ করবেন সে সম্পর্কে সংবিধানে কোন নির্দেশ নেই। তবে সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি হিসেবে লোকসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের লোকসভার নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ভূমিকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নীচে আলোচনা করা হল।

১. প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা

দলের নেতা হিসাবে দলের নীতি নির্ধারণ, দলের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি, দলের কর্মসূচী জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব। জনসাধারণকে নিজের দল সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া, তিনি দলের ঐক্যরক্ষা, সংহতিবৃদ্ধি ও সংগঠন সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থা করেন, বিরোধী দলগুলোকে সমালোচনা করে তিনি দেশে বিরোধী পক্ষের সমর্থন হ্রাসের চেষ্টা করেন। নির্বাচনীযুদ্ধে দলের জয়-পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও জনচিত্তে তাঁর কি স্থান এই সকল উপাদান এবং বিষয়ের ওপর। দেশের জনসাধারণ, বিশেষত, আমাদের দেশের অশিক্ষিত ও বীরপূজার মনোবৃত্তিসম্পন্ন জনমানস অনেক ক্ষেত্রেই কোন রাজনৈতিক দলের নীতিপদ্ধতি বিচারের বদলে ঐ দলের নেতাকে দেখে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে কেবলমাত্র দলীয় নেতা বা নেত্রী হলেই চলে না, প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জাতীয় নেতা বা জননেতা হতে হয়।

২. প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনা করেন

যে রাজনৈতিক দল লোকসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, রাষ্ট্রপতি সেই দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানান, কারণ তিনি **লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা** হিসেবে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন লাভে সক্ষম। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহূত হয়ে তিনি দলের অপরাপর নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অন্যান্য মন্ত্রীদের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি তা ঘোষণা করার পরে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিসভার কার্যক্রম স্থির করেন, মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন করে দেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন মন্ত্রিচালিত দপ্তরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা তাঁর অন্যতম কাজ। অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তিনি নিজেই পরিচালনা করেন। কোন মন্ত্রী অকাম্য বলে বিবেচিত হলে প্রধানমন্ত্রী

তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। ব্রিটেনের মত আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীকে তত্ত্বগতভাবে "সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম" (First among equals বা primus inter pares) বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে তিনি তার চাইতেও বেশী।[১]

৩. **প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের নেতা**

প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন, ক্যাবিনেটকে পরিচালিত করেন এবং ক্যাবিনেটকে নেতৃত্ব দেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ও নীতি ক্যাবিনেটে গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্যাবিনেট কোন সিদ্ধান্ত করতে পারে না—বরং প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই ক্যাবিনেট সম্মতির ছাপ দেয়। অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করেন এবং পরে ক্যাবিনেটকে তা জানান। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার মত জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা কার্যকর করা হয় এবং পরে তা ক্যাবিনেটে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, ক্যাবিনেট যে সকল গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলো হ'ল প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও সিদ্ধান্ত বা তার পরিপূরক।

৪. **প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা**

প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের নেতা। আইনসভার আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ এবং আইনসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনসভার নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। আইন-সভা আহ্বান করা, স্থগিত রাখা বা ভেঙে দেয়া সম্পর্কে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দেন। আইনসভায় কোন্ বিষয়, কবে, কতক্ষণ, কিভাবে আলোচিত হবে তা স্থির করতে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। আইনসভার দলীয় সদস্যের সমর্থনে দলীয় রাজনৈতিক নীতি অনুযায়ী তিনি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন এবং বিরোধী দলগুলোর সমালোচনার উত্তর দেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি লোকসভার নেতা (Leader of the House)। সরকারী নীতির তিনি যে ব্যাখ্যা দেন তাই সবাই সরকারী বক্তব্য বলে মনে করে। প্রধানমন্ত্রী সাধারণত লোকসভার সদস্য হন, কিন্তু রাজ্যসভাতেও তিনি সরকারী নীতি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। রাজ্যসভার সদস্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সংবিধানের দিক থেকে আইনবিরুদ্ধ নয়। বস্তুত ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি রাজ্যসভার সদস্যা ছিলেন।

৫. **প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা**

সংবিধানের ৭৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হল, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত ও নীতি রাষ্ট্রপতিকে জানানো। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কিছু জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী তা তাঁকে জানাবেন এবং কোন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিলে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য তিনি তা উপস্থিত করবেন। প্রধানমন্ত্রী একদিকে যেমন সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুরূপে কাজ করেন।

অনেকে মনে করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে রাষ্ট্রপতিরা দ্বিধাহীনভাবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন বা কাজ করেন। এর ফলে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ঐ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন।

---

১. Although in Cabinet, all its members stand on the equal footing, speak with equal voice and on the rare occasions when a division is taken are counted on the fraternal principle of one man one vote, yet head of the cabinet is Prime Minister who occupies a position which so long as it lasts is one of exceptional and peculiar authority.

৬. জাতির নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী

যে কোন জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী কেবল দলের নেতা হিসেবে আবদ্ধ না থেকে জাতির নেতার স্বীকৃত পান। প্রধানমন্ত্রীরা ঘন ঘন জনসভায় উপস্থিত হন এবং জনগণের সঙ্গে একটা সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে জনগণের মধ্যে তুলে ধরার ফলে প্রধানমন্ত্রীরা জাতীয় নেতায় পরিণত হন। বিশেষ করে জাতীয় সংকটের সময়ে, যেমন ভারত-পাক যুদ্ধের সময় একদিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তেজনাময় সংবাদ এবং অন্য দিকে পাকিস্তান সরকারের সাহায্যার্থে মার্কিন নৌবহরের দ্রুত ভারত সাগরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে জনগণ সকল দলীয় মত পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় নেতার আসনে বরণ করে নেয়। দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে কোন প্রধানমন্ত্রী যদি একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন উপহার দিতে পারেন এবং ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণের অধিকারী হন তবে সহজেই তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় নেতা হিসেবে বন্দিত হন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জাতিকে পরিচালনার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

৭. বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী সরকারের মুখ্য নীতি নির্ধারক ও মুখপাত্র। বর্তমান যুগে একদিকে মারণাস্ত্রের প্রসার এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার ঘটছে। প্রতিটি দেশকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে হয়, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, দেশের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ দেশের সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস চালাতে হয়, আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, জাতিপুঞ্জে দেশের স্বার্থের উপযোগী ভূমিকা পালন করতে হয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে এই সকল কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে বৈদেশিক নীতি, ঘটনাবলী ও সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হয় এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থরক্ষার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর এবং এই জন্য তাঁকে প্রায়ই বিদেশ সফর করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশ সফর ছাড়াও কমনওয়েলথ সম্মেলন, গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশের সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন এবং কখনও জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভাষণ দেন। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিতেও প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করেন। বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে শ্রীমতী গান্ধী বিভিন্ন দেশ সফর করে সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানী সৈন্যদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

৮. প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য কাজ ও ক্ষমতা

প্রধানমন্ত্রীকে আরও অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন, আন্তরাজ্য উন্নয়ন পরিষদ এবং আরও অনেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ঐসকল সংস্থার কাজে প্রধানমন্ত্রীকে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরিকল্পনা রচনায় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারেও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। সরকারের আর্থনীতিক নীতি তাঁর ইচ্ছা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী রচিত হয়। ব্যাংক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ প্রভৃতি কর্মসূচী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দল এবং সরকারের পক্ষে যে আর্থনীতিক স্লোগান তোলা হয় তারও প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ,' 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী 'গরিবী হটাও', 'বিশ-দফা কর্মসূচী' প্রভৃতি স্লোগানের প্রবক্তা।

নির্বাচন কমিশন, অর্থ কমিশন, রাষ্ট্র-কৃত্যক কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং সভাপতি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি ও প্রধান বিচারপতি, অ্যাটর্নী জেনারেল ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত

ব্যক্তির নাম নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা হয়। রাজ্যপাল পদেও প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। এক কথায় বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বাস্তবে একক ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি পদে কাকে মনোনীত করা হবে সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর পছন্দই শেষ কথা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী ও ক্ষমতার একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হ'ল—তবে এটা সব নয়। **প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে বলা যায়, সরকারের ক্ষমতা যেখানে এবং যতটা প্রসারিত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাও ততদূর এবং ততটা প্রসারিত।** এক কথায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে গণ-মাধ্যমের ভূমিকা

বর্তমান যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শাসনবিভাগীয় প্রধানদের ভাবমূর্তি সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁদের ব্যক্তিগত জনসংযোগ এবং গণ-মাধ্যমগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। শ্রীনেহেরু থেকে শুরু করে শ্রীমতী গান্ধী পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীরা ব্যাপক সংখ্যক জনসভায় যোগদান করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিশেষভাবে শ্রীনেহেরু এবং শ্রীমতী গান্ধী নিরলসভাবে অসংখ্য জনসভায় যোগদান করে জনগণের সঙ্গে একটা যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন—যা তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। দেখা গিয়েছে যে শ্রীনেহেরু এবং শ্রীমতী গান্ধীর জনসভাগুলোতে প্রচুর জনসমাগম হোত। শ্রীনেহেরুর বক্তৃতার প্রতি জনগণের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ১৯৮৪ সালের লোকসভার নির্বাচন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর সভাগুলোতেও প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার প্রসার ও পদমর্যাদা বৃদ্ধিতেও গণ-মাধ্যমগুলোর আশীর্বাদ রয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমার নিউজ রীল প্রভৃতি গণ-মাধ্যম প্রধানমন্ত্রীর ছবি, বক্তৃতা, বিদেশে সফর, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা ইত্যাদি বিজ্ঞানের আশীর্বাদে নিমেষের মধ্যে জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এই সকল গণমাধ্যম প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এমন একটা আবেশ রচনা করছে যা তাঁর ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা গড়ে তোলায় বিশেষভাবে সাহায্য করছে। জনমানসে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটা মোহগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে গণ-মাধ্যমগুলোর অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ঐ জনপ্রিয়তা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং ক্ষমতা সর্বাত্মক ও বহু দিকে ব্যাপ্ত। একজন সমালোচক বলেছেন যে, দীর্ঘ দিনের বিবর্তনের ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এই শতকের মাঝামাঝি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার যাত্রা পথ সেখান থেকে শুরু। বলাবাহুল্য তারপর থেকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বেড়ে বেড়ে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে অনেকেই ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে আর ক্যাবিনেট চালিত বা সংসদ চালিত শাসন ব্যবস্থা বলতে প্রস্তুত নন—তাঁদের মতে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও প্রধানমন্ত্রী চালিত সরকার বা *Prime Ministerial Government* চলছে। অনেকে মনে করেন যে, সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা ও সুযোগ পান ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা তো পাচ্ছেনই, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রপতি চালিত ব্যবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির চরম প্রশাসনিক ক্ষমতা। সুতরাং এঁদের মতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির যুক্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা হয়ঃ ১. ভারতের সংবিধান প্রণেতারা প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে ক্ষমতা ও মর্যাদার কথা ভেবেছিলেন বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীরা তাকে অতিক্রম করেছেন; ২. ভারতে সংসদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা গৃহীত হলেও প্রধানমন্ত্রীর

ক্ষমতা সংসদ চালিত ব্যবস্থাকে অতিক্রম করেছে ; ৩. একদিকে প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা ও মতাদর্শ এবং অন্যদিকে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংঘাত সৃষ্টি করেছে তারই ফলশ্রুতি হল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি ; ৪. ভারতে প্রভাব বিস্তারকারী একদলীয় ব্যবস্থায় (one dominant party system) দলনেতা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকলেও বিরোধী দলগুলোর শক্তি ও ভূমিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এতই গুরুত্বহীন যে ভারতে বাস্তবে প্রভুত্বকারী এক দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ঐ ব্যবস্থায় প্রভুত্বকারী দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রমাগত প্রসার ঘটেছে ; ৫. ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ব্যক্তিগত গুণ ও জনপ্রিয়তার দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর পদের যে ভিত্তি রচনা করেন শ্রীমতী গান্ধী সেই পদকে আরও ক্ষমতা ও মর্যাদায় ভূষিত করেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, ভারতের শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক, প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতির পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। কে রাজা বা রানী হবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তা স্থির করতে পারেন না, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কে হবেন সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। জরুরী অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খুবই বৃদ্ধি পায়।

বিগত প্রায় তিন যুগ ধরে ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে রীতিনীতি গড়ে উঠেছে তাতে দেখা যায়, ভারতের রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বিশেষ করে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছেন (জনৈক সমালোচক তাই বলেছিলেন যে, শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী না হয়ে রাষ্ট্রপতি হলে হয়তো ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদের চেয়ে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হবার রীতি গড়ে উঠত)। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তা দ্বারা পদটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছেন। বস্তুত, **প্রধানমন্ত্রীর পদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে পদাধিকারীর ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর।**

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার বিবরণ দিয়ে তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনুধাবন করা যায় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতা, রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের সুযোগ, দলীয় 'হুইপ', সরকারী নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন ইত্যাদি উপাদান প্রধানমন্ত্রীকে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী যদি কোন কোয়ালিশন সরকারের প্রধান হন (যেমন শ্রীচরণ সিং) তবে নানা বাস্তব অসুবিধার জন্য তিনি ঐ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন না।

এস. ই. ফাইনার মনে করেন ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা তত্ত্বগতভাবে 'ক্যাবিনেট সরকার' হলেও বাস্তবে তা হল 'প্রধানমন্ত্রীর চালিত সরকার' (Prime Ministerial Government)। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, মর্যাদা ও সার্বিক প্রভাবের জন্য ভারতের শাসনব্যবস্থাকেও **প্রধানমন্ত্রীর চালিত সরকার** বলা যায়। ভারতের প্রধামমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করেন, ক্যাবিনেট পরিচালনা করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত হিসেবে ছাপ মারা হয়। ক্যাবিনেট সদস্যারা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না—তাঁদের মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুগত থাকতে হয়। তাই ভারতের শাসন ব্যবস্থাকেও ক্যাবিনেট সরকার বা সংসদীয় সরকার না বলে প্রধানমন্ত্রীর চালিত সরকার বলাই যুক্তিসঙ্গত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন ভারতের সাংবিধানিক ও জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র।

তবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে চরম ক্ষমতা ও মর্যাদা আয়ত্ত করার পথে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায় জনমত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী স্বার্থ এবং প্রচার মাধ্যম। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার

সময়ের অত্যাচার জনিত কারণে জনমত শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে চলে যায়। তাই ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় জনমত শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধী ছিল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর নেতা জনতাদলে যোগ দেয়, একটি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী শ্রীমতী গান্ধীর ওপর বিরূপ হয় এবং সংবাদপত্রগুলো জরুরী অবস্থার নিন্দায় সোচ্চার হয়। ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদের বিপুল ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সতর্কতার অভাব এবং হঠকারিতার ফলে ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সুতরাং বলা যায়, ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী হবার সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে—কিন্তু তা সদ্ব্যহারের জন্য চাই ব্যক্তিগত গুণাবলী, অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা এবং সতর্কতা।

পনের : অঙ্গরাজ্যের শাসনবিভাগ (The State Executive)

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি গৃহীত হবার ফলে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে রাজ্য সরকার আছে। আবার এখানে পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় শাসন পদ্ধতি থাকার জন্য রাজ্যগুলোতেও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। **অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগ গঠিত হয় রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভা এবং স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে।**

রাজ্য শাসনবিভাগ গঠিত রাজ্যপাল, মন্ত্রিসভা ও কর্মচারীদের নিয়ে

রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত অঙ্গরাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান। নির্বাচিত হবার জন্য রাষ্ট্রপতি যে অতিরিক্ত মর্যাদাটুকু ভোগ করেন, মনোনীত হবার জন্য রাজ্যপাল তা ভোগ করেন না। রাজ্যপাল নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। রাজ্যের প্রকৃত শাসক হল মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য মন্ত্রিসভা। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে যে দল বা কয়েকটি দলের যে 'কোয়ালিশন' জয়ী হয়, সেই দল বা দলগুলির কোয়ালিশন রাজ্য-মন্ত্রিসভা গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী যেমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেন, তেমনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে থাকেন। ঐ অঙ্গরাজ্য মন্ত্রিসভার অধীনেও আছে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের এক বিরাট বাহিনী। রাজ্যের শাসনবিভাগীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের সাহায্যে রাজ্যপ্রশাসন পরিচালিত হয়। রাজ্যের শাসনবিভাগীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে পরে আলোচনা করা হবে।

ভারতের সংবিধানে রাজ্যসরকারের জন্য যে সকল ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সে সকল বিষয়ে শাসনের অধিকার রাজ্যের শাসনবিভাগের। সংবিধানের দ্বিতীয় তালিকাতে (রাজ্য তালিকা) রাজ্যসরকারের ক্ষমতার এক্তিয়ার বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও একটি যুগ্ম তালিকা আছে—যে সকল বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ তালিকা বা যুগ্ম তালিকার অধীন কোন বিষয়ে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করলে তার প্রয়োগ রাজ্য-শাসনবিভাগ করে। তবে যুগ্ম তালিকার অধীনস্থ বিষয়গুলো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যই বেশি। রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসন ছাড়াও রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপনের জন্য বিল রচনা, আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, রাজ্যের জন্য বাজেট রচনা ইত্যাদি অঙ্গরাজ্যের শাসনবিভাগের কাজের অধীন।

শাসনবিভাগের কাজ

ষোল : অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল (Governor of a State)

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকবেন (There shall be a Governor of each State)। অবশ্য দু বা ততোধিক রাজ্যের জন্য মাত্র একজন রাজ্যপালও নিযুক্ত হতে পারেন। রাজ্যপালের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। রাজ্যপালের ওপর রাষ্ট্রপতির আস্থা থাকা পর্যন্ত (during his pleasure) রাজ্যপাল নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নূতন রাজ্যপাল কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত

রাজ্যপালের নিয়োগ ও কার্যের মেয়াদ

থাকবেন। অবশ্য তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেও তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত আবেদনক্রমে পদত্যাগ করতে পারেন। রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে তিনি রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহণ করেন।

যোগ্যতা

রাজ্যপাল হতে হলে তাঁকে ৩৫ বছর বয়স্ক এবং ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার অথবা অন্য কোন রাজ্য-আইনসভার সদস্য থাকতে পারবেন না। রাজ্যপাল সরকারের কোন লাভজনক বা বেতনভুক্ কাজ গ্রহণ করতে পারবেন না। তাঁর মাসিক বেতন হবে ৫৫০০ টাকা। এ ছাড়া তিনি নানাবিধ ভাতা পান। রাজ্যপালের বেতনাদি একত্রীকৃতকোষ হতে দেয় (charged on the Consolidated Fund) এবং তা নিয়ে বিধানসভায় কোন ভোটাভুটি হয় না।

রাজ্যপাল মনোনীত হবার কারণ

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির মত নির্বাচিত নন, তিনি মনোনীত। নির্বাচিত হলে তিনি জনপ্রতিনিধির মর্যাদা দাবী করতে পারেন এবং দলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বেন এরূপ আশঙ্কার জন্য হয়তো তাঁকে মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল মনোনীত হবার নীতি সমালোচিত হয়েছে। কারণ মনে করা হয় যে, এরূপ অবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নক হয়ে চলবেন এবং ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যসরকারের যে স্বাধীনতা থাকে তা খর্ব হবে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা

রাজ্যপালের ক্ষমতাকে শাসনবিষয়ক, আইনবিষয়ক, অর্থবিষয়ক এবং বিচার বিষয়ক—এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উপরোক্ত চার শ্রেণীর ক্ষমতা ছাড়াও রাজ্যপালের কিছু কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের শাসনবিভাগীয় সকল ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর অর্পিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং বা অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে ঐ ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতির নামে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কাজ চলে, তেমনি অঙ্গরাজ্যের সকল কাজ রাজ্যপালের নামে করা হয়। রাষ্ট্রপতির মত রাজ্যপালও সাংবিধানিক বা আনুষ্ঠানিক শাসক (constitutional ruler) মাত্র। রাজ্যপাল সাধারণত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে সরকারী কাজ করে থাকেন।[১] অবশ্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ না-ও নিতে পারেন।

ক. **শাসনবিষয়ক ক্ষমতা :** যে সকল বিষয়ে রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে, সে সকল বিষয় নিয়েই রাজ্যের শাসনক্ষমতার বিস্তৃতি। তত্ত্বগতভাবে রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাজ্যপাল। সংবিধানে ১৬৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকেন, যদিও কার্যত আইনসভার আস্থার ওপরে তাঁদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল তথ্য ও সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানাবার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। এ ছাড়া কোন মন্ত্রী কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে আনীত কোন প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় আলোচনার জন্য তিনি নির্দেশ দিতে পারেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করার অধিকার তাঁর না থাকলেও ঐ নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণও রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন, অবশ্য নিযুক্তির পর ঐ সদস্যদের তিনি পদচ্যুত করতে পারেন না।

---

১. ১৯৫০ সালে সুনীলকুমার বসু ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম সেক্রেটারী মামলায় কলিকাতার হাইকোর্ট এইরূপ রায় দেন যে, রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য। ১৯৫৫ সালে আর. জে. কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ঐ মতকে সমর্থন করে বলেন যে, রাজ্যপাল শাসনবিভাগের প্রধান নামে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তাঁর অবস্থা ব্রিটেনের রাজার মত।

বিভিন্ন রাজ্যের উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি সংক্রান্ত ব্যবস্থার ক্ষমতা রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অন্তর্গত। এ সম্পর্কে রাজ্যপালকে ভারত সরকারের কাছে প্রতি বছর একটি বিবৃতি পেশ করতে হয়।

খ. **আইনবিষয়ক ক্ষমতা ঃ** রাষ্ট্রপতি যেমন সংসদের অঙ্গ, রাজ্যপালও সেরূপ রাজ্যের আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, স্থগিত রাখতে পারেন এবং নিম্নপরিষদ বা বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। তিনি আইন পরিষদের যে-কোন কক্ষে বাণী পাঠাতে পারেন বা বক্তৃতা দিতে পারেন। যে কোন বিল তাঁর সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। তিনি সম্মতি দান করতে পারেন; প্রত্যাখ্যান করতে পারেন বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্য যেকোন বিলকে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। আইনসভা ঐ বিল পুনরায় পাশ করলে রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দানে অস্বীকার করতে পারেন না।

আইনসভার অধিবেশন স্থগিতকালীন অবস্থায় রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জারী করতে পারেন। ঐ জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করতে হবে এবং আইনসভার অধিবেশন শুরু হবার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা আইনসভায় অনুমোদিত না হলে বাতিল বলে পরিগণিত হবে।

গ. **অর্থবিষয়ক ক্ষমতা ঃ** সংবিধানের ২০২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আর্থিক বছর শুরু হবার আগে রাজ্যের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসেব রাজ্যপালের নির্দেশে অর্থমন্ত্রী আইনসভার সামনে দাখিল করেন। রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব আইনসভায় উপস্থিত করা যায় না।

ঘ. **বিচারবিষয়ক ক্ষমতা ঃ** রাজ্যপাল জেলার প্রধান বিচারক এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ করেন। তিনি দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস, মকুব বা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।

ঙ. **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ঃ** মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে কাজ করতে হয়। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি তাঁকে কিছু কিছু নির্দেশ দিতে পারেন। যে সকল বিষয়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপাল 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' প্রয়োগ (discretion) করতে অধিকারপ্রাপ্ত সে সকল বিষয়ে তিনি রাজ্য মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ নিতে বাধ্য নন। 'স্বেচ্ছাধীন' ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের নিজস্ব সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। রাজ্যপালের বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত কার্যকলাপের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারবে না। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে আছে রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পাঠানো, মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ, রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাজ্য আইন-সভায় গৃহীত বিল পাঠানো, মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে নির্দেশ দান ইত্যাদি।

রাজ্যপালের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি একান্তভাবেই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যাপারেই তিনি দায়িত্বশীল রাজ্যমন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য।[১] আবার, যেহেতু রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপদে বহাল থাকেন, সেজন্য তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক সময় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রাজ্যমন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে ঐ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করেছিলেন। তাঁর ঐ কাজ সংবিধানসম্মত হয়েছিল কিনা এবং তা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ও সংসদীয় শাসনপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা এবং

রাজ্যপালের পদের মূল্যায়ন

১. "The basis of the State executive in this constitution is full responsible Government, and the Governor has in practice to accept the advice of the Council of Ministers."

—G. N. Joshsi

রাজ্যসরকার সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে সংবাদ ও পরামর্শ দানের অধিকার রাজ্যপালের পদটিকে নিছক শাসনতান্ত্রিক শাসকের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে।

সতের ঃ রাজ্যপালের সাংবিধানিক পদমর্যাদা (Constitutional Position of the Governor)

ভারতে কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে সংসদীয় ধাঁচের সরকার প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। সংবিধান প্রণেতারা চেয়েছিলেন যে, রাজ্য মন্ত্রিসভা যৌথভাবে বিধানসভার কাছে আস্থাশীল থাকবে এবং বিধানসভার আস্থাশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল চলবেন। তাঁরা রাজ্যপালের পদটিকে একটি মর্যাদাসম্পন্ন (dignified) অথচ নিয়মতান্ত্রিক পদে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। রাজ্যপালের হাতে কিছু কিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও তা কোনভাবেই দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার পরিপন্থী হবে না বলে ডঃ আম্বেদকার গণপরিষদে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন (The retention in, or the vesting the Governor with certain discretionary powers is in no sense contrary to or a negation of responsible Government)।[১] গণপরিষদের বিতর্ককালে কে. এম. মুন্সী বলেছিলেন যে, আমরা চাই রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার কথামত চলবেন এবং তাঁর পদমর্যাদা হবে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর মত।

নিয়মতান্ত্রিক প্রধান

গণপরিষদে ভারতের জন্য যে সংবিধান গৃহীত হয়েছে সেখানেও গণপরিষদের সদস্যদের বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, অঙ্গরাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত। সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, শাসন পরিচালনার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী তিনি মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করবেন, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করবেন, মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং যতদিন পর্যন্ত মন্ত্রিসভার ওপর বিধানসভার আস্থা থাকে ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় আসীন থাকতে দেবেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন আদালতের রায়-এ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট ***Ram Jawaya Kapoor v. State of Punjab*** মামলায় বলেছে যে, রাজ্যপালের সাংবিধানিক অবস্থান রাষ্ট্রপতির মত—বস্তুত অঙ্গরাজ্যে মন্ত্রিসভাই সরকার পরিচালনা করে।[২] কলিকাতা হাইকোর্টও একটি মামলায় বলেন যে, মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলা রাজ্যপালের পক্ষে বাধ্যতামূলক (**The Governor must act on the advice of the ministers**)।[৩]

আদালতের অভিমত

গণপরিষদের আলোচনা, সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং আদালতের রায় থেকে প্রতীয়মান যে, রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলতে বাধ্য এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি এমন কিছু করতে পারেন না যা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী। বস্তুত বর্তমান সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রথম দিকে এই ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। সমাজের সম্মানিত এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হোত এবং তাঁরা মোটামুটিভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তাই সরোজিনী নাইডু খেদ করে রাজ্যপালের পদকে **'স্বর্ণ'** পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখী' বলে অভিহিত করেছিলেন।

প্রথম দিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা

১. C. A. D. Vol. VIII.
২. 1955 SC. 549
৩. Sunil Kr. Bose v. West Bengal, A. I. R. 1952, Calcutta, P. 799.

কিন্তু পরবর্তীকালে রাজ্যপালের ভূমিকার পরিবর্তন শুরু হয়। **প্রথমত,** স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপালেরা রাজ্য মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য প্রতিবেদন পাঠাতে শুরু করেন। এইভাবে ১৯৫৯ সালে কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে বাতিল করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি বহু রাজ্যে এইরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। **দ্বিতীয়ত,** সংবিধানের ১৬৪(১) ধারা অনুযায়ী স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। **তৃতীয়ত,** বিধানসভা আহ্বানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দানের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী সরকারগুলোর প্রতি স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন মানদণ্ড অনুসরণ করা শুরু করেন। **চতুর্থত,** অনেক রাজ্যপাল বিধানসভার অনাস্থা থেকে সংখ্যালঘু (কংগ্রেসী) সরকারকে বাঁচাবার জন্য বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত রাখেন। **পঞ্চমত,** মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক আচরণ শুরু করেন। যেমন, বিধানসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও রাজ্যপাল তাপাসে হরিয়ানার কংগ্রেস (ই) নেতা বংশীলালকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। **ষষ্ঠত,** বিধানসভা বাতিল করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁরা কোন সুনির্দিষ্ট নীতি মান্য করেন না। **সপ্তমত,** অ-কংগ্রেসী সরকার-শাসিত রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে গৃহীত অনেক আইন-এ স্বাক্ষর না করে তাঁরা সেগুলো রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠান। প্রসঙ্গত, কেরালার নাম্বুদিরিপাদ সরকারের আমলে 'কেরালা শিক্ষা বিল' এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের আমলের কয়েকটি বিলের উল্লেখ করা যায়।

ভূমিকার পরিবর্তন

অনেকে মনে করেন যে, রাজ্যপালদের এই পরিবর্তিত সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং পরিবর্তিত ভূমিকা গ্রহণের ফলে রাজ্যপালরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা ছেড়ে অনেকাংশে প্রকৃত প্রধানের ভূমিকায় আসীন হয়েছেন বা হবার চেষ্টা করেছেন। অথচ সংবিধান রাজ্যপালদের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবেই গড়তে চেয়েছিল।

অন্যমত

অন্যদিকে অনেকে মনে করেন, রাজ্যপালের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজ্যপাল কেবল আনুষ্ঠানিক শোভাবর্ধনকারী পদাধিপতি নন, মন্ত্রীমণ্ডলীর কথা মত চলা ছাড়াও তাঁর নিজস্ব কিছু ক্ষমতা আছে। যেমন ঃ

ক. উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণী সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁকে প্রতি বছর সরাসরি রিপোর্ট পাঠাতে হয় ;

খ. যদি রাষ্ট্রপতির আদেশে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্য বা অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপর অর্পিত হয়, তবে সে ক্ষমতা তিনি রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ ছাড়াই ব্যবহার করেন ;

গ. সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ঠিকমত এবং সংবিধান অনুযায়ী চলছে কিনা সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ রিপোর্ট রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও যেতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করেন না। এ ছাড়াও মন্ত্রিসভার প্রতি বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন নেই বলে তাঁর মনে হলে তিনি তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে সেই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ঐ কারণে বাতিল করেছিলেন। যদিও ঘটনাটি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছিল এবং রাজ্যপালের এ ধরনের কোন সাংবিধানিক ক্ষমতা আছে কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

রাজ্যপালের নিজস্ব ক্ষমতা

ঘ. একটি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়েও রাজ্যপাল কিছুটা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। রাজ্যের আইনসভায় কোন দলের নিরঙ্কুশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে রাজ্যপাল অবস্থা বুঝে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ;

ঙ. কোন বিলে সম্মতি প্রদান না করে রাজ্যপাল তা রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদ একই দল দ্বারা পরিচালিত না হলে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিধি বেড়ে যায়। রাজ্যপাল তখন ভুলতে পারেন না যে, তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত, রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর তাঁর কার্যকাল নির্ভরশীল। ফলে তিনি সর্বদাই মনে করেন যে, তাঁর প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে—রাজ্যের মন্ত্রিসভার কাছে নয়;

চ. সর্বোপরি জরুরী অবস্থায় যখন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির 'এজেন্ট' বা প্রতিনিধি রূপে কাজ করেন তখনও তাঁর পক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এ সব কারণে অনেকে রাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় স্বার্থের সতর্ক প্রহরী (**watchdog of the centre**) বলে অভিহিত করেন।

অর্থাৎ এঁদের মতে, রাজ্যপাল শুধু রাজ্যের শাসনবিভাগের প্রধান নন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তিনি কেন্দ্রের প্রতিনিধি (Agent)। সুতরাং রাজ্যপাল সকল ব্যাপারে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলে নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা পালনে বাধ্য নন।

সর্বোপরি এঁরা মনে করেন যে, ভারতের ঐক্য, সংহতি এবং অখণ্ডতা রক্ষায় রাজ্যপালদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং ঐ ভূমিকা পালনের ব্যাপারে রাজ্যপালরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে কাজ করতে বাধ্য নন।

উপরোক্ত বক্তব্য সাংবিধানিক দিক থেকে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিচার করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিরা যৌথভাবে পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন—রাজা বা রানীর কাছে নয়। ১৭৮৩ সালের পর থেকে ব্রিটেনে কোন প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাকে রাজা বা রানী বরখাস্ত করেননি। এই ঘটনা সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতাই প্রমাণ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার অধিবেশনে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভাকে বাতিলের কোন প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় আসীন থাকা বা না-থাকা আইনকক্ষে স্থির হয়—শাসনবিভাগ তথা প্রধান শাসকের ইচ্ছা বা সন্তোষের দ্বারা নয়।

এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ব্যবস্থা

ভারতে ব্রিটেনের মডেল অনুসরণ করে কেন্দ্র ও রাজ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ শ্রীদুর্গাদাস বসু মনে করেন যে, সংবিধানের ১৬৪(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী (**...the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor**) রাজ্যপাল ব্যক্তিগতভাবে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে পারেন না। সংবিধানের ১৬৪(২) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, *The Council of Ministers shall collectively responsible to the Legislative Assembly of the State.* তিনি মনে করেন যে, আইনসভার কাছে মন্ত্রিদের যৌথ দায়িত্বের অর্থ হল এই যে, আইনসভার কক্ষে কোন মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ না পেলে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা যায় না; এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হ'লঃ আইনসভার কতজন সদস্য মন্ত্রিসভার স্বপক্ষে এ সম্পর্কে রাজ্যপালের মনগড়া হিসেবের ভিত্তিতে তিনি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন না (**The Governor cannot do so at his pleasure or his subjective estimate of the strength of the Chief Minister in the Assembly at any point of time, beacuse it is for the Legislative Assembly to enforce the collective responsiblity of the Council of Ministers to itself**)[১]

সংবিধানে কি আছে ?

উপসংহার

সুতরাং কেন্দ্রের প্রতি দায়িত্ব, দেশের সার্বিক স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে রাজ্যপালের এমন কোন ক্ষমতার প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য নয়, যা সংবিধান এবং সংসদীয় নীতি বিরোধী।

১. *Introduction to the Constitution of India*, P 22.

বরং বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলো স্বাধিকার (autonomy) ভোগের অধিকারী। ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বাধিকার (Autonomy) বলতে বিধানসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার স্বাধিকারকে বোঝায়—রাজ্যপালের সংবিধানিক কর্তব্য হ'ল মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলা।

সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলোর স্বাধিকারের সুস্থ, স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও তিনি শাসনতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা পালন করবেন এবং মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলবেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা যে রাজনৈতিক দল কর্তৃক পরিচালিত হোক না কেন, রাজ্যপালের সাংবিধানিক দায়িত্ব হ'ল দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে মন্ত্রিসভার পরামর্শমত নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে চলা এবং এই পদ্ধতিতে সংসদীয় ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি তথা রাজ্যের স্বাধিকারকে সংরক্ষণ করা। নির্বাচিত রাজ্যপালেয় পদ সৃষ্টি না করার কারণ ছিল এই যে, রাজ্যপাল যাতে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে না পড়েন এবং দ্বিতীয়ত তিনি যেন মন্ত্রিসভার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নিজেকে প্রকৃত শাসক মনে না করেন।

সুতরাং বলা যায় যে, অঙ্গরাজ্যের স্বাধিকার তখনই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে যখন রাজ্যপালেরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

আঠার : অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভা (Council of Ministers of a State)

ভারতের সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্যপালকে পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে মন্ত্রিসভা থাকবে। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে বা কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে কয়েকটি দলের 'কোয়ালিশন' গঠিত হয়। সেই দলের বা কোয়ালিশনের নেতাকে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। কয়েকটি দলের কোয়ালিশন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে রাজ্যপাল তার নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করার আগে এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ দেখা দিলে তিনি তাদের মন্ত্রিসভা গঠন করতে নাও দিতে পারেন। বস্তুত এরূপ ঘটনার নজীর ভারতে আছে। যাহোক, রাজ্যপাল কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে বা কোয়ালিশনের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করা হয় এবং তিনিই মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দেন।

মন্ত্রিসভা গঠন

মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মত রাজ্যেও তিন রকমের মন্ত্রী দেখা যায়। যাঁরা মন্ত্রিপরিষদ বা ক্যাবিনেটের সদস্য তাদের ক্যাবিনেট মন্ত্রী বলা হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী আছেন। সাধারণত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের অধীনে এক একটি দপ্তর বণ্টন করা হয় এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন এক বা একাধিক রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। মন্ত্রীদের রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয় এবং মন্ত্রী হবার সময়ে কোন কক্ষের সদস্য না থাকলে তাঁকে ছ মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হতে হয়।

মন্ত্রিসভা তাদের সকল কাজকর্মের জন্য যৌথভাবে আইনসভা বা বিধানমণ্ডলীর কাছে দায়ী থাকে। এ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কাজের জন্য রাজ্যপালের কাছে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন এবং বিধানমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করছে না, তবে তিনি তা রাষ্ট্রপতিকে জানাতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি তখন ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ঐ রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য রাজ্যমন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারেন।

দায়িত্ব

অনাস্থা প্রস্তাব

সংসদীয় গণতন্ত্রে তত্ত্বগতভাবে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, রাজ্যপালের পরামর্শ নিয়ে মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পরামর্শই রাজ্য-মন্ত্রিসভার শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশ রেখা (guide line) হিসেবে কাজ করে।

মন্ত্রিসভার কাজ

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়া তাঁর অন্যান্য সকল ক্ষমতার তদারক ও প্রয়োগ করা রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধান কাজ। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের হাতে শাসন সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত, অর্থ সংক্রান্ত যে ব্যাপক ক্ষমতা আছে তা মন্ত্রিসভার নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১. নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ঐ দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রিসভাকে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত যাতে দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর হয় তার জন্য সামগ্রিক দায়িত্বে থাকে মন্ত্রিসভা।

২. আইন প্রণয়ন

শুধুমাত্র শাসন বা নীতি নির্ধারণ নয়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যপালকে দিয়ে আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করানো থেকে শুরু করে আইনসভায় বিল উত্থাপন করা, আইন প্রণয়ন কর্মসূচী স্থির করা ইত্যাদি সব কিছু মন্ত্রিসভাকে করতে হয়।

৩. আয়-ব্যয় ও বাজেট

রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয় স্থির করা, বাজেট রচনা করা, কর ধার্য করা ইত্যাদি আর্থনীতিক দায়িত্ব মন্ত্রিসভা পালন করে। কল্যাণমুখী কর্মধারা প্রসারিত হবার ফলে ভারতে অঙ্গ রাজ্যগুলোর আর্থনীতিক কাজকর্ম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়

এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন (co-ordination) করে সরকারকে গতিসম্পন্ন, দক্ষ ও কার্যকর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। বিভিন্ন দপ্তরের কার্যধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

৫. সরকারী কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ

মন্ত্রিসভার অধীনে রাজ্যসরকারের যে বিরাট স্থায়ী সরকারী কর্মচারী বাহিনী থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের চাকরির শর্ত ও মাইনে, ভাতা ইত্যাদি স্থির করা মন্ত্রিসভার অন্যতম কাজ।

বর্তমান যুগে সরকারের কাজকর্ম বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় মন্ত্রিভার কাজেরও সম্প্রসারণ ঘটেছে। মন্ত্রিসভার কাজকর্মই শুধু সম্প্রসারিত হয়নি, পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, বর্তমান যুগে সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার ঐ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ ও ক্ষমতা দেখে অনেকে একে 'মন্ত্রিসভার একনায়কতন্ত্র' নামে অভিহিত করেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার দক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে মন্ত্রিদের যোগ্যতা, সততা, ঐক্য এবং সর্বোপরি মন্ত্রিসভার নায়ক মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর।

উনিশ ঃ অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister of a State)

প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণত রাজ্য বিধানসভার সদস্য হন, যদিও যে অঙ্গরাজ্যে বিধানপরিষদ আছে সেই রাজ্যের বিধানপরিষদের সদস্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে কোন বাধা নেই।

ভারতের কোন কোন রাজ্যে কখনও কখনও উপমুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রীজ্যোতি বসুকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল।

অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনের মধ্যমণি হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যবলী আলোচনা করা হল।

১. রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাজ্যপালকে পরামর্শ দানের জন্য ও সাহায্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। রাজ্য মন্ত্রিসভার নেতা মুখ্যমন্ত্রী, তাই তিনি রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা। মন্ত্রিসভার পক্ষে তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানান এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে অভিহিত করেন। রাজ্যপাল কোন পরামর্শ দিলে মুখ্যমন্ত্রী তা মন্ত্রিসভার গোচরে আনেন এবং যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারায় রাজ্যপালের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর কতকগুলো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। **প্রথমত**, রাজ্যের প্রশাসন এবং প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে ওয়াকিবহাল রাখেন। **দ্বিতীয়ত**, রাজ্যপাল রাজ্য প্রশাসন ও প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে মুখ্যমন্ত্রী সে ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। **তৃতীয়ত**, মন্ত্রিসভায় আলোচিত ও গৃহীত হয়নি এরূপ কোন বিষয়ে যদি কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে তা মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন। তা ছাড়া রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য কোন বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে মন্ত্রিসভায় পেশ করতে পারেন।

রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবশন আহ্বান করার, অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করার, কার্যকাল শেষ হবার আগেই মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন।

২. মন্ত্রিসভার নেতা

মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রধান এবং নেতা। তিনি ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করেন, মন্ত্রিসভা পরিচালনা করেন এবং মন্ত্রিসভাকে নেতৃত্ব দান করেন। তিনি রাজ্যপালের কাছে মন্ত্রিদের নাম সুপারিশ করেন এবং মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। বিভিন্ন মন্ত্রী এবং দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ঐক্য রক্ষা করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। প্রয়োজন হলেই মন্ত্রীরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। কোন ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন মন্ত্রীর মতপার্থক্য দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর মতই প্রাধান্য লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গুণের ওপর রাজ্যমন্ত্রিসভার ওপরে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে।

৩. আইনসভার নেতা

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নেতা। আইনসভার নেতা হিসেবে আইনসভার সুষ্ঠু পরিচালনা, বিল উত্থাপন, প্রশ্নের জবাবদিহি করা এবং বিরোধী পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা ও সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আইনসভার নেতা হিসেবে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা এবং প্রয়োজনে বিধানসভা ভেঙে দেবার ব্যাপারে তিনি রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন। রাজ্য সরকারের প্রধান নীতি ও সিদ্ধান্ত তিনি বিধানমণ্ডলীতে উপস্থিত করেন। আইনসভায় সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করা ছাড়াও সরকার-বিরোধী সমালোচনার জবাব দেওয়া তাঁর মুখ্য দায়িত্ব। আইনসভায় আলোচনা চলাকালে কোন মন্ত্রী অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাঁর সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বা রাজ্যপালের ভাষণকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনা হলে মুখ্যমন্ত্রীকে তার জবাব দিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিল আইনসভায় যাতে গৃহীত হয় তা দেখার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর।

৪. দলের নেতা

মুখ্যমন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভা বা আইনসভার নেতা নন—তিনি একটি রাজনৈতিক দলেরও নেতা এবং আইনসভায় নিজ দলের নেতা। সুতরাং আইনসভার ভেতরে ও বাইরে নিজ দলের ভাবমূর্তি ও সংহতি বজায় রাখা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। আইনসভার ভেতরে ও বাইরে নিজ দলের দলীয় নীতির সঙ্গে সরকারের নীতির সাযুজ্য রাখার ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। দলের কার্যক্রম প্রচার, দলের প্রতিপত্তি ও সুনাম বৃদ্ধি এবং জনপ্রিয়তা সৃষ্টির জন্য তাঁকে মনোনিবেশ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। নিজ দলের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা ও পরিষদীয় দায়িত্ব বণ্টনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সর্বোপরি নির্বাচনের সময় দল যে সকল প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলো যাতে কার্যকর হয় সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

৫ মুখ্যমন্ত্রী ও জনগণ

মুখ্যমন্ত্রী শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নেতা নন, তিনি রাজ্যের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। স্বভাবতই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। সরকারের সামগ্রিক নীতির প্রবক্তা ও মুখপাত্র হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারী নীতিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রে বিবৃতিদান, সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তিনি জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন। জনমতকে অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে নীতি পরিবর্তন করা তাঁর দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রী পদের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে দল ও সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করার জন্যে মুখ্যমন্ত্রীকে সচেতনভাবে কাজ করতে হয়।

৬. অন্যান্য ক্ষমতা ও কাজ

উপরোক্ত দায়িত্বগুলো ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে আরও অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাজ্যের আয়-ব্যয় বাজেট—অর্থাৎ রাজ্যের আর্থিক ব্যাপারে তাঁকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। **দ্বিতীয়ত**, সরকারের মৌলনীতি গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। **তৃতীয়ত**, রাজ্যের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। **চতুর্থত**, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এবং আঞ্চলিক পর্যদের সভায় যোগদান করতে হয়। **পঞ্চমত**, রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। **ষষ্ঠত**, অর্থ কমিশন ও অন্যান্য কমিশনের সামনে রাজ্যসরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তাঁকে বক্তব্য ও প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে হয়। **সপ্তমত**, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংহতি রক্ষার ব্যাপারে তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যাবলী ও ক্ষমতার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলো—তবে এটা সব নয়। রাজ্য সরকারের ক্ষমতা যেখানে এবং যতটা প্রসারিত মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতাও ততটা এবং ততদূর প্রসারিত।

মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর যে স্থান, রাজ্যমন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রীর স্থানও অনেকটা সে রকম। মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্য শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধান স্থপতি। একদিকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেন, অন্যদিকে রাজ্যপাল, রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও আইনসভার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। ভারতে অঙ্গরাজ্য মন্ত্রিসভাগুলোর কেন্দ্র-নির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পার্লামেন্টারী প্রথায় মন্ত্রিসভা (কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় মন্ত্রিসভাই) ক্রমশ অধিকতর ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠছে। রাজ্যমন্ত্রিসভার ঐ ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তির

বৃদ্ধি মূলত মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বস্তুত, বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভারতে সাংবিধানিক প্রথা গড়ে উঠেছে, তাতে দেখা যায় **মুখ্যমন্ত্রীরা রাজ্যগুলোর প্রকৃত শাসক হয়ে উঠেছেন।** রাজ্য বিধানসভার নেতা, বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, রাজ্য সরকারের পরিচালক, রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রধান সংযোগ রক্ষাকারী এবং সর্বোপরি রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্যের প্রকৃত শাসকে পরিণত হয়েছেন।

কি কি উপাদানের ওপর মুখ্যমন্ত্রির পদমর্যাদা নির্ভর করে

তবে মনে রাখতে হবে যে, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ও ভাবমূর্তি বহুলাংশে নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা, সহকর্মীদের সমর্থন, নিজের দলের সংহতি ইত্যাদি উপাদানের ওপর। ভারতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ব্যক্তিগত গুণের তারতম্য এবং নিজ দলীয় সংগঠনের ওপর প্রভাবের তারতম্য থাকার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা একই মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে বর্তমানে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ দলের কাছ থেকে যে ভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন তার ফলে তাদের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

কুড়িঃ মুখ্যমন্ত্রী কি রাজ্যের প্রকৃত শাসক? (Is the Chief Minister real ruler of the State ?)

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসন ও রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র। সংবিধানে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার বিস্তৃত বিবরণ নেই, কিন্তু সংসদীয় রীতি অনুযায়ী ভারতে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। প্রশাসন পরিচালনা, আইনসভায় নেতৃত্ব দান, সরকারী নীতি নির্ধারণ, মন্ত্রিসভা পরিচালনা করা, রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, সরকারের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি কারণে মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গরাজ্যের প্রধান সাংবিধানিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা লক্ষ্য করে অনেকে তাঁকে রাজ্যের প্রকৃত শাসক (Real ruler of a state) হিসেবে অভিহিত করেন। ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলোতে সংসদীয় শাসনকাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্যপালেরা নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের দায়িত্বে আসীন আছেন এবং মন্ত্রিসভার প্রধান ও নেতা মুখ্যমন্ত্রী প্রকৃত শাসকের ভূমিকা পালন করেন—সাধারণভাবে এ কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে অর্থে 'প্রকৃত শাসক' সেই অর্থে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের 'প্রকৃত শাসক' বলা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং ক্ষমতার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাঁর ক্ষমতা বিভিন্ন সাংবিধানিক, আধা-সাংবিধানিক, রাজনৈতিক এবং দলীয় সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমিত। এই সকল কারণে ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্ষরিক অর্থে 'প্রকৃত শাসক' বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে মতপার্থক্যের অবকাশ আছে বলে মনে করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার ব্যাপারে যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে নীচে সেগুলো আলোচনা করা হ'ল।

ক. সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা

রাজ্যের প্রশাসন ও রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে কয়েকটি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা রয়েছেঃ

১. রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাঃ সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় রাজ্যপালকে 'স্বেচ্ছাধীন' ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ঐ ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রাজ্যপালের সন্তোষের (Pleasure) ওপর নির্ভর করে। ফলে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের খাঁড়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করে বলে অনেকে মনে করেন।

২. সংবিধানে রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার স্বীকৃতিঃ ভারতের সংবিধানে সপ্তম তপশীলে

রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, রাজ্যের ঐ সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হওয়া সম্ভব নয়।

৩. আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা : বিধানসভায় শাসক দলের নিশ্চিত এবং সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার একটি অন্যতম শর্ত। যে মন্ত্রিসভার বিধানসভায় সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে সেই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী অনেক বেশী পরিমাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং তাঁর পক্ষে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ। কিন্তু বিধানসভায় দোদুল্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সাহসের সঙ্গে চলা সম্ভব নয়। কারণ সংবিধান-স্বীকৃত উপায়ে যে কোন সময়ে ঐ মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারে।

৪. জরুরী অবস্থা ঘোষণা : সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা জারী করে সেখানকার মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারেন। জরুরী অবস্থা জারীর আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পথে বিরাট বাধা।

খ. আধা-সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা

৫. রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক তাঁর প্রধান শাসক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। রাজ্যপাল যদি নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা পালন করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী যদি কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র হন তবে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রধান শাসক হবার ব্যাপারে রাজ্যপালের দিক থেকে কোন বাধা দেখা যায় না। কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী কোন দল যদি রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকে, তবে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ বা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগ দ্বারা মন্ত্রিসভা বাতিলের সম্ভাবনা সকল সময়ই মুখ্যমন্ত্রীকে শঙ্কিত করে।

৬. কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক : মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পথে আর একটি আধা-সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা হ'ল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রিসভা তথা মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক এবং ঐ মন্ত্রিসভার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পক্ষপাতহীন আচরণ এবং সহযোগিতা না পেলে কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বিশেষ করে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর দল এবং নিজ দলীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা ছাড়া প্রকৃত শাসক হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

গ. ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হল মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর অভাব। যে সকল মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, সদাচার এবং জনপ্রিয়তার অধিকারী তাঁদের পক্ষে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশেও প্রকৃত শাসকের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা সম্ভব।

ঘ. দলীয় সীমাবদ্ধতা : মুখ্যমন্ত্রীর নিজ দলের ওপর প্রভাব, রাজ্যে নিজ দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তীব্রতা, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আস্থা ইত্যাদির ওপরে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার ব্যাপকতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের অনেকেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ও দলীয় চক্রান্তের শিকার হন। এরূপ অবস্থায় কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন সম্ভব হয় না।

সর্বোপরি বলা প্রয়োজন যে, সংবিধানে (সপ্তম তপশীলে) রাজ্যের জন্য যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট হয়েছে তা এতই কম এবং সার্বিকভাবে রাজ্যপ্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর এত বেশী নির্ভরশীল থাকতে হয় যে অঙ্গরাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে 'প্রকৃত শাসক' হওয়া সম্ভব নয়। তবে অনুকূল পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অঙ্গরাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় প্রকৃত শাসক হওয়া হয়তো সম্ভব। এক সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বি. সি. রায়, কামরাজ, মোরারজি দেশাই, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, সম্পূর্ণানন্দ প্রমুখ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় প্রকৃত শাসক হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ এঁদের ওপর রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা রাষ্ট্রপতির

শাসনের খড়্গ উদ্যত ছিল না, এঁদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী নেতৃত্বে ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং এঁরা পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা, এঁদের সময়ে দলীয় অবস্থা ছিল অনুকূল এবং তাই এঁদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিব্রত থাকতে হয়নি। সর্বোপরি এঁদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত এবং জনমানসে ছিল উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। কিন্তু সম্প্রতিকালে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে 'প্রকৃত শাসক'-এর ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বরং দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যপালের আনুকূল্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা না পাওয়া সত্ত্বেও অ-কংগ্রেসী অনেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব এবং শৃঙ্খলার জন্য শাসক হিসেবে অনেক বেশী সাফল্যের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতার মধ্যেও কেরালায় নাম্বুদিরিপাদ, কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লা, পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু, তামিলনাড়ুতে এম. জি, রামচন্দ্রন, কর্ণাটকে রামারাও প্রকৃত শাসকের ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে অনেক বেশী সফল হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষে রাজ্যের প্রকৃত শাসক হওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা ব্যাপক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী। সুতরাং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেকাংশে পদাধিকারীর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে।

উপমুখ্যমন্ত্রী

ভারতের সংবিধানে অঙ্গরাজ্যের জন্য উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদের কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেই। তা সত্ত্বেও কোন কোন রাজ্যে কখনও কখনও উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। উপ-প্রধানমন্ত্রীর মত উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদটিও সংবিধানের বাইরে গড়ে উঠেছে বলে বলা যেতে পারে। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং জ্যোতি বসুকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হয়। ১৯৮১ সালে কেরালায় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় মহম্মদ কোয়াকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হয়। বিভিন্ন দলের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে ঐ কোয়ালিশনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য আপস সূত্র হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদের সৃষ্টি বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর জন্য কোন স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করা হয় না। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাছাড়াও তাঁর হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ন্যস্ত থাকে। যখন উপমুখ্যমন্ত্রীর কোন পদ সৃষ্টি হয় না তখন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত থাকে।

একুশ ঃ আইনবিভাগ (The Legislature)

গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভা সেখানকার জনসাধারণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করে। জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা বা জাতির সংকল্প প্রকাশ পায় তাদের আইনসভায়। জাতির সামনে প্রতিদিন যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য উপস্থিত হয়, বিভিন্ন দল ও শ্রেণীর মনে ঐ সকল সমস্যা যে আলোড়নের ঢেউ তোলে, তা প্রতিধ্বনিত হয় আইনসভায়। অধিকাংশ আইনসভায় দুটি কক্ষ বা পরিষদ থাকে। যথা, উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ। আবার কোথাও এক-কক্ষ বা এক পরিষদ-বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায়।

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেন্ট বা সংসদ। পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্ন-পরিষদের নাম লোকসভা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আইন-সভারও দুটি পরিষদ ছিল, উচ্চ পরিষদের নাম বিধানপরিষদ ও নিম্ন পরিষদের নাম বিধানসভা। **কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ কক্ষ বা দ্বিতীয় পরিষদ অর্থাৎ বিধানপরিষদকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।** তাই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার একটি কক্ষ বা পরিষদ বিধানসভা আছে। উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা কম। বিশেষত, অর্থ-সম্পর্কীয় আইন প্রণয়নে ইহা হস্তক্ষেপ করতে পারে না। উচ্চ পরিষদের সদস্যদের একটি অংশ নির্বাচিত হন, কিছু সংখ্যক সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু নিম্ন পরিষদের

সদস্যরা নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন। সাধারণত, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও মন্ত্রীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিম্ন পরিষদের ক্ষমতাই বেশি। যে আইনসভায় একটি মাত্র পরিষদ থাকে তাকে একপরিষদীয় ব্যবস্থা (Unicameralism) বলে (যেমন, পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা)। যে আইনসভায় দুটি পরিষদ থাকে তাকে দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা (Bicameralism) বলে (যেমন, ভারতের পার্লামেন্ট)।

আইনসভার কার্যাবলী

নীচে আইনসভার কাজকর্ম আলোচনা করা হল ঃ

১. আইনসভার প্রধান কাজ হল দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য আইন প্রণয়ন করা। ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রবক্তারা মনে করেন যে, আইন বিধিবদ্ধ করাই আইনসভার কাজ। গৃহীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ সেই আইন অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে। আইনসভা সরকারের প্রধান অঙ্গ। অনুপযোগী পুরাতন আইনগুলো বাতিল করা অথবা সংশোধন করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন আইন পাশ করা আইনসভার প্রধান কাজ।

২. আইন প্রণয়ন করা আইন পরিষদের প্রধান কাজ হলেও এর অন্যান্য কাজও আছে। সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা করা ও আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা আইনসভার আর একটি প্রধান কাজ। সরকারের আয় কি পরিমাণ হবে, কি কি কর ধার্য করা হবে, কি ভাবে কর আদায় করা হবে, কি ভাবে বাৎসরিক আয় বিভিন্ন বিভাগের জন্য ব্যয় করা হবে, আইনসভা ঐ সকল বিষয় আলোচনা করে এবং অর্থ মঞ্জুর করে।

৩. যে দেশে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, সে দেশে শাসনবিভাগ তাদের কাজকর্মের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। আইনসভা শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনসভা মন্ত্রীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করে এবং দরকার হলে অনাস্থাজ্ঞাপন করে মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদচ্যুত করতে পারে।

৪. অনেক সময় আইনসভার কিছু কিছু শাসন বিভাগীয় ক্ষমতাও থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী উচ্চপদে (যেমন, রাষ্ট্রদূত) রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন, তা আইনসভার উচ্চ পরিষদ সিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

৫. অনেক দেশে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান বিচারালয়ের বিচারকগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সংসদ এবং অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মিলিত ভোটে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও ভারতীয় সংসদের আছে।

৬. আইনসভা বহুক্ষেত্রে বিচার-সংক্রান্ত কাজও করে। নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা, রাষ্ট্রপতির বিচার ইত্যাদি কাজ আইনসভার বিচারমূলক কাজ। রাষ্ট্রপতি অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ঘটলে আইনসভায় তার বিচার হয়। ব্রিটেনে লর্ডসভা সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় আদালত হিসাবে কাজ করে।

৭. সংবিধান সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতাও আইনসভার হাতে। যেমন, ভারতের আইনসভা সংবিধানকে সার্বিক বা আংশিকভাবে পরিবর্তন করতে পারে; সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভা আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা।

নীতি নির্দেশ করবে কিন্তু আইন রচনা করবে না

৮. জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন যে, আইনসভার সকল সদস্য দেশের প্রতিটি সমস্যার খুঁটিনাটি নানাদিক সম্পর্কে খোঁজ রাখতে পারেন না, তাই তাঁদের হাতে আইন রচনার ভার ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে, আইন রচনার ভার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। আইনসভা কেবলমাত্র নীতি-নির্দেশ করে দক্ষ ব্যক্তিদের হাতে আইন রচনার ভার ছেড়ে দেবে—আধুনিক জগতে এই নীতি সকল আইনসভাই গ্রহণ করেছে। তাই প্রতিটি দেশে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন

(specialised) কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঐ বিষয়ে পারদর্শী সদস্যদের নিয়ে আইনসভার কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয় এবং তাদের দিয়ে ঐ সব কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বাইশ ঃ দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থা (Bicameralism)

বিভিন্ন দেশের আইনসভা বিভিন্ন নীতিতে গঠিত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে একটি কক্ষ নিয়ে আইনসভা গঠিত হয়, যেমন—ফিনল্যান্ড, পর্তুগাল, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি। তবে বেশির ভাগ দেশেই আইনসভার দুটি কক্ষ দেখা যায় (যেমন, মার্কিন কংগ্রেস, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, সোবিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোবিয়েত, ভারতের সংসদ)।

বস্তুত, স্তর-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা (stratified social system) থেকেই দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার উদ্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে যাজক, বিত্তবান ও অভিজাত শ্রেণীর জন্য লর্ড সভার উৎপত্তি হয়, অন্যদিকে সমাজের অন্যস্তরের ব্যক্তিরা কমন্সসভায় স্থান অধিকার করেন। ফ্রান্সে (ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও) যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের জন্য সেখানে দুটি স্বতন্ত্র পরিষদ (Estate) গঠিত হয়। সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা 'তৃতীয় পরিষদে' (Third Estate) পরিণত হয়।

আইনসভার কটি কক্ষ থাকা উচিত তা নিয়ে রাষ্ট্রনীতির পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক সময় তুমুল বিতর্ক চলত। আজও এই বিতর্কের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হয়নি। তাই দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি

দ্বি-পরিষদের আইনসভার স্বপক্ষে দু ধরনের যুক্তি দেখানো হয়ঃ **প্রথমত,** এককক্ষের ত্রুটিগুলি এবং **দ্বিতীয়ত,** দ্বি-কক্ষের নিজস্ব সুবিধাগুলো।

নীচে দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার স্বপক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করা হল ঃ

১. **এক পরিষদীয় ব্যবস্থার স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা ঃ** জন স্টুয়ার্ট মিল একপরিষদীয় ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ থাকলে পূর্ণ ক্ষমতালাভ করে তা অসীম ক্ষমতাশালী, দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দেবার জন্যই দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন। Bryce বলেন যে, *The necessity of two chambers is based on the belief that the innate tendency of an Assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of another House of equal authorities.*

২. **সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন ঃ** আইনসভার দুটি পরিষদ থাকলে প্রত্যেকটি আইন উপযুক্ত ভাবে বিবেচিত হতে পারে। প্রথম-কক্ষ তাড়াতাড়ি কোন আইন পাশ করলে দ্বিতীয় কক্ষে ভুলত্রুটি সংশোধন হতে পারে। দুটি কক্ষে দুবার বিল পাশ করতে যথেষ্ট সময় লাগে বলে সাময়িক উত্তেজনায় অথবা তাড়াহুড়ো করে আইন প্রণয়ন করার জন্য যে ত্রুটি থাকে পর্যাপ্ত সময় পাওয়ায় তা দূর করা সম্ভব হয়। অধ্যাপক লীককের **(Leacock)** মতে এক-পরিষদীয় ব্যবস্থায় আইন দ্রুত ও অসঙ্গতভাবে পাশ হয়। আবেগ ও ভাবের প্রাবল্যে ভেসে গিয়ে সদস্যারা অবাঞ্ছিত আইন রচনা করতে পারেন। দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থায় আবেগের পরিবর্তে আসে বিবেচনা ও সম্যক্ বিচারবুদ্ধি। তাই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

৩ **কাজের চাপ হ্রাস করা ঃ** একটি কক্ষ থাকলে তার [illegible]
থাকে। দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে ঐ কক্ষ প্রথম কক্ষের [illegible]
এর ফলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থায় একটি কক্ষের [illegible]

৪. **বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব** [illegible]
বিভিন্ন মতাবলম্বী ও সকল শ্রেণীর [illegible]

প্রতিনিধি, নানা স্বার্থের রক্ষকদের নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষটি গঠিত হতে পারে। অনেক যোগ্য ব্যক্তি হয়ত নির্বাচনে প্রবেশ করতে চান না, অথচ আইনসভায় তাঁদের থাকা প্রয়োজন, দ্বিতীয় কক্ষ ঐ সুযোগ সৃষ্টি করেঃ *It affords opportunities for the representation of sectional or minority interests and of the aristocratic or intellectual element in a society.*

৫. **যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষাঃ** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে দুটি পরিষদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। উচ্চ পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং তারা নিজেদের আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষা করতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক ফাইনারের ভাষায়, *Legislatures are bicameral for two broad and different reasons : as part of federalism and as the result of a desire to check the popular principle in the constitution.* সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপরিহার্য।

৬. **ক্রমবর্ধমান সরকারী কাজ সম্পন্ন করার জন্য দুটি কক্ষ প্রয়োজনঃ** বর্তমান যুগে সরকারী কাজকর্ম বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াসের জন্য বিভিন্ন ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা এবং অন্যান্য কারণে আইনসভার কাজকর্ম ক্রমশ বাড়ছে। একটি কক্ষের পক্ষে আইনসভার ক্রমবর্ধমান কাজকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং এ দিক থেকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বর্তমান যুগে অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

৭. **রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারঃ** আইনসভার আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয় এবং জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারের দিক থেকে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে অনেক উন্নত আলোচনার এবং বিতর্ক ঘটার সম্ভাবনা থাকে এবং দুটি কক্ষের আলোচনা ও বিতর্ক জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে।

দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তি

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয় এবার তা আলোচনা করা হ'ল।

১. **দ্বি-পরিষদ অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকরঃ** দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হল এই যে, ঊর্ধ্ব-কক্ষের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই, কারণ জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষ সঠিকভাবে জনগণের ইচ্ছা (**popular will**) প্রতিফলিত করে। ঐ গণ-ইচ্ছা অনুযায়ীই আইন প্রণীত হয়। দ্বিতীয় আর একটি কক্ষ গঠন করার অর্থই হল বিভাজন, বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি আহ্বান করা। একজন ফরাসী লেখক সমস্যাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'উচ্চকক্ষ কি প্রয়োজনে আসবে? যদি তা নিম্নকক্ষের সঙ্গে একমত হয় তবে তা অনাবশ্যক, আর যদি তা ভিন্নমত হয় তবে তা বিপজ্জনক।"

২. **অর্থ ও সময়ের অপব্যয়ঃ** দ্বি-পরিষদীয় আইনসভার পক্ষে একটি যুক্তি হল, নিম্নকক্ষের অকাম্য কাজকর্মের উচ্চকক্ষ প্রতিরোধ করে—এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আর উচ্চকক্ষ আইন-প্রণয়নে বিলম্ব ঘটাতে পারে, ফলে সুচিন্তিত আইন রচিত হতে পারে বলে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়, অধ্যাপক লাস্কির মতে তার কোনই সারবত্তা নেই। কারণ, আধুনিক যুগে সকল আইন নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক ও আলোচনা করা হয়। তাই লাস্কির মতে, 'উচ্চকক্ষের আলোচনার অধিকাংশই হল নিম্নকক্ষের আলোচনার পুনরাবৃত্তি। সুতরাং অযথা বিতর্কে সময়ের অপব্যয়ই ঘটান হয়। অর্থের অপব্যয়ও বিশেষ কম হয় না'। প্রতিটি বিভাগের উচ্চশিক্ষিত স্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণ অনেক চিন্তা করে আইনের যে-খসড়া মন্ত্রিসভার হাতে তুলে দেন, তাই মন্ত্রীরা আইনসভায় পেশ করেন এবং পাশ করান। এর মধ্যে আবার উচ্চকক্ষের প্রয়োজন কোথায়?

৩. **যুক্তরাষ্ট্রে অপরিহার্য নয়ঃ** যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষ গঠনের কোন প্রয়োজন নেই; সকল যুক্ত-

রাষ্ট্রেই অঙ্গরাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উচ্চকক্ষে নিজস্ব দলের নির্দেশে ভোট দেন, অঙ্গরাজ্যের স্বার্থের ভিত্তিতে নয়। দলীয় প্রথার চাপের এ সকল প্রতিনিধির রাজ্য বা অঞ্চলের স্বার্থরক্ষার কথা মনে থাকে না। তাই দলীয়ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রেও থাকার জন্য দুটি কক্ষ গঠন করে অংগরাজ্যের স্বার্থ রক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। তাই যুক্তরাষ্ট্রেও উচ্চকক্ষের কোন প্রয়োজন নেই।

৪. **দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে:** দ্বিপরিষদীয় আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, ফলে একে অন্যের প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। একটি গাড়ির দু দিকে দুটি বলদ বিপরীত দিকে গাড়িটাকে টানতে থাকলে স্বভাবতই এর গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এক কক্ষ অন্যের ওপর ক্রমাগত দোষারোপ করতে থাকে। অন্যদিকে আবার, এক কক্ষের সদস্যরা মনে করে যে অন্য কক্ষের সদস্যরা যথাযোগ্য বিবেচনা করবে—এ ধারণায় দুটি কক্ষের সদস্যরাই দায়িত্বহীন হয়ে উঠতে পারে।

৫. **আদর্শ দ্বি-কক্ষ গঠন সম্ভব নয়:** মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে আজ পর্যন্ত একটিও আদর্শ উচ্চকক্ষ গঠন করা সম্ভবপর হয়নি। আদর্শ আইনসভা হিসেবে উচ্চকক্ষটি এমন হবে যা গভীরভাবে আইনের বিষয় আলোচনা করবে অথচ নিয়ন্ত্রণ করবে না, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বাঁধ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবে অথচ উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায় হবে না, জনমত প্রতিফলিত করবে, কিন্তু তার ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হবে না। বাস্তবে এরূপ কক্ষ এখনও দেখা যায়নি—কোনদিন দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

৬. **অগণতান্ত্রিক:** আইনসভার প্রথম কক্ষ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু দ্বি-কক্ষ সাধারণত মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। অনেক দেশেই সমাজের বিত্তবান, সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, যাজক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বিতীয় কক্ষে মনোনীত করা হয়। দ্বি-কক্ষ গঠনের এই ব্যবস্থাকে সমালোচনা করা হয়েছে—কারণ এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

৭. **দায়িত্ব বিভক্ত করে:** আইনসভাকে দুটি কক্ষে বিভক্ত করলে আইনসভার দায়িত্ব দ্বিধা বিভক্ত হয় বলে মনে করা হয়। এর ফলে দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না এবং একটি কক্ষ অন্য কক্ষের ওপরে দায়িত্ব চাপাবার চেষ্টা করে নিজে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করে।

উপসংহার

লাস্কি মনে করেন, "এক-পরিষদীয় আইনসভা আধুনিক রাষ্ট্রের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে।" এর দ্বারা সরকারের গঠন পরিচালনা অনেক সরল হয় এবং প্রশাসনের ব্যয়ভার কমে। তাই কয়েকটি দেশে সম্প্রতি দ্বি-পরিষদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হয়েছে। ব্রিটেনের প্রাক্তন শ্রমিক-দলের সরকার ব্রিটেনে দ্বিতীয় কক্ষ লর্ডসভা তুলে দেয়ার কথা বলেছিল। ইউরোপে গ্রীস, বুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া এবং তুরস্কে এক-পরিষদীয় আইনসভা প্রচলিত হয়েছে। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, বেশির ভাগ দেশের আইনসভাই এখনও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

ব্রিটেনের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের (লর্ডসভার) বিলোপ না করে সংস্কার সাধন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষের (সিনেট) প্রতিনিধিদের নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোথাও কোথাও উচ্চকক্ষের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে—কিন্তু কোথাও উচ্চকক্ষের বিলোপ সাধন করে জাতীয় আইনসভাকে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা করা হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে গর্জন করলেও কেউ এর সত্যি সত্যি বিলোপ চান না।

তেইশঃ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ (The Parliament of India)

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, বেশির ভাগ দেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। **ভারতেও কেন্দ্রীয় আইনসভাও দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। উচ্চতর বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম রাজ্যসভা** (Council of States) **ও নিম্নতর বা প্রথম কক্ষের নাম লোকসভা** (House of People)। উভয় কক্ষ নিয়ে ভারতের সংসদ বা পার্লামেণ্ট গঠিত। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ, কখনই এর অবলুপ্তি ঘটে না। লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। (৪২তম সংশোধনী আইনে লোকসভার কার্যকাল ছ বছর করা হয়েছিল, কিন্তু ৪৪তম **সংশোধনীতে আবার পাঁচ বছর করা হয়েছে)**।

কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট

রাজ্যসভা

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। অর্থাৎ রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হতে পারবে না। বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৪৪ জন (২৩২ জন নির্বাচিত এবং ১২ জন মনোনীত)। বারো জনকে রাষ্ট্রপতি সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন করেন। বাকী অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের এক বিশেষ নির্বাচন সংস্থা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি অনুসারে নিজ নিজ 'কোটা' অনুযায়ী রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অর্থাৎ রাজ্যসভায় সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। সদস্যরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং কয়েকজন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী রাজ্যসভাকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সংস্থা। এর সদস্যগণ 'ছ' বছরেব জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি দু বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নবনির্বাচিত হয়ে আসেন। রাজ্যসভার সদস্যরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। এ ব্যাপারে কোন সাংবিধানিক বাধা নেই।

রাজ্যসভার গঠন

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রাজ্য-সভার সভাপতিকে চেয়ারম্যান বলে। রাজ্যসভার অধিবেশনের জন্য সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন।

রাজ্যসভার সভাপতি

লোকসভা

ভারতীয় সংসদের প্রথম কক্ষ বা নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। ৩১তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী লোকসভা অনধিক ৫৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে অনধিক ৫২৫ জন সদস্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে অনধিক ২০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি দুজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন। ১৯৭৯ সালের ১লা জুলাই লোকসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৪৪ জন।

লোকসভার গঠন

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে লোকসভায় কতজন সদস্য নির্বাচিত হবে তা আগের জনগণনার ভিত্তিতে স্থির করা হয়। **লোকসভার কার্যকাল পাঁচ বছর।** ৪২তম সংশোধনী আইন লোকসভার কার্যকাল বাড়িয়ে 'ছ' বছর করা হয়। কিন্তু ৪৪তম সংশোধনী আইনে লোকসভার কার্যকাল আবার পাঁচ বছর করা হয়েছে। পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন, আবার জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এর কার্যকাল এক বছর বাড়াতে পারেন। বিগত লোকসভার কার্যকাল ১৯৭৬ সালের মার্চে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভার কার্যকাল এক বছর বাড়িয়েছিলেন।

কার্যকাল

লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার এবং তাঁর অনুপস্থিতিকালে ডেপুটি স্পীকার। লোকসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার লোকসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। লোকসভার স্পীকারের পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসভার স্পীকার

সংসদের কার্যপদ্ধতি

সংবিধান অনুযায়ী সংসদের দুটি কক্ষের অধিবেশনই বছরে অন্ততপক্ষে দুবার আহ্বান করতে হবে। কোন অধিবেশনের শেষ সভা ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম সভার মধ্যে ছয় মাসের বেশি ব্যবধান থাকতে পারবে না। রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনানুযায়ী নির্ধারিত সময় ও স্থানে উভয় সভার বা কোন একটি সভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন, সভার অধিবেশন স্থগতি রাখতে পারেন এবং লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি সংসদের লোকসভায় অথবা উভয় সভায় সম্মিলিত অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করতে পারেন এবং এ উদ্দেশ্যে সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বিবেচনাধীন কোন বিল বা অন্য যে কোন ব্যাপারে যে কোন কক্ষে বাণী প্রেরণ করতে পারেন এবং যে সভায় এরূপ বাণী প্রেরিত হবে সেই সভা যথাসম্ভব শীঘ্র সেই বাণীর বিষয়বস্তু বিবেচনা করবে। সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন এবং সংসদের অধিবেশন আহ্বানের কারণ তাতে বিবৃত করেন।

প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রিরা সংসদের যে-কোন কক্ষে বা উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বা সংসদের যে সমিতির (Committee) তাঁরা সভ্য সেই সমিতির সভায় যোগদান এবং বক্তৃতা করতে পারেন। কিন্তু এরূপ অধিকারের বলে মন্ত্রিরা দুটি কক্ষেই ভোট দেবার অধিকারী হবেন না। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণ সংসদের যে কক্ষের সদস্য কেবলমাত্র সেই কক্ষেই ভোট দিতে পারবেন।

সাধারণ আইন পাশের ব্যাপারে সংসদের উভয়কক্ষ সমক্ষমতাসম্পন্ন। সাধারণ বিল উভয় কক্ষে পাশ হওয়া প্রয়োজন। দু কক্ষের মধ্যে কোন বিল নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করেন এবং ঐ যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা বিলটি পাশ করা হয়। কিন্তু অর্থসংক্রান্ত বিলের ব্যাপারে লোকসভার ক্ষমতা বেশি। অর্থবিল লোকসভায় পাশ হবার পরে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। রাজ্যসভা অর্থবিল অগ্রাহ্য করতে পারে না। রাজ্যসভা সুপারিশসহ বিলটিকে লোকসভায় ফেরত পাঠাতে পারে। রাজ্যসভার সুপারিশ লোকসভা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে।

মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে লোকসভার ক্ষমতা বেশি। মন্ত্রিসভা লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়, কিন্তু রাজ্যসভার অনাস্থা প্রস্তাব মন্ত্রিসভা গ্রাহ্য নাও করতে পারে। সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং পদচ্যুতির ব্যাপারে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

চব্বিশ ঃ ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the Indian Parliament)

ভারতীয় সংসদ হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা। সুতরাং আইন প্রণয়ন করাই সংসদের প্রধান কাজ হলেও সংসদকে আরও অনেক করতে হয়, বিভিন্ন ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি দেশের আইনসভাকেই বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয়। বিশেষ করে সংসদীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি মান্য করা হয় না বলে আইনসভাকে আইন প্রণয়নের বাঁধাধরা গণ্ডীর বাইরে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা চরিত্রগত দিক থেকে প্রশাসনিক। আবার লোকসভা হল জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা—গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছার প্রতীক হিসেবে একে ধরা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যসভা হ'ল রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা।

সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে মান্য করতে গিয়ে সংসদের ক্ষমতা ও কাজের ব্যাপ্তি ঘটেছে। যাহোক ভারতীয় সংসদের কাজগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হ'ল।

১. **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** সংসদের প্রধান এবং প্রথম কাজ হ'ল আইন প্রণয়ন করা। সংসদ কি কি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, অর্থাৎ সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রের পরিধি সংবিধানের ২৪৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সপ্তম তপশীলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সপ্তম তপশীলে প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হয়েছে ঃ ১. ইউনিয়ন তালিকাভুক্ত বিষয়, ২. রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় এবং ৩. যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়। ইউনিয়ন তালিকায় ৯৮টি বিষয় আছে ঐ সকল বিষয়ে সংসদ এককভাবে আইন প্রণয়নের অধিকার ভোগ করে। তাছাড়া যুগ্ম তালিকায় যে ৪৭টি বিষয় আছে সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ এবং অঙ্গরাজ্য আইনসভা যুগ্মভাবে ভোগ করে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদ প্রণীত কোন আইনের সঙ্গে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইনের বিরোধ দেখা দিলে সংসদ প্রণীত আইন বলবৎ থাকে এবং রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন বাতিল বলে পরিগণিত হয়।

ইউনিয়ন তালিকা ও যুগ্ম তালিকার ব্যাপারে

এ ছাড়াও ভারতীয় সংসদ রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে তিনটি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকার ভোগ করে। সংবিধানের ২৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব করে যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তবে সংসদ সে সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি দুই বা তার বেশী সংখ্যক রাজ্য বিধানমণ্ডলী মনে করে যে, রাজ্য তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয়ের ওপর সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তবে উপরোক্ত রাজ্যগুলের জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে (২৫২ নম্বর ধারা)। তৃতীয়ত, ২৫০ নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় সংসদ রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

রাজ্য তালিকার ব্যাপারে

সপ্তম তপশীলে লিপিবদ্ধ তিনটি তালিকার বাইরে যে সকল অবশিষ্ট বিষয় (Residuary Powers) আছে সেই সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ এককভাবে ভোগ করে।

অবশিষ্ট বিষয়

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সংসদের দুটি কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। তবে অর্থবিল সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার ক্ষমতা বেশী এবং রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যসভার ভূমিকা বেশী।

আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তত্ত্বগত দিক থেকে ভারতীয় সংসদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। তবে বাস্তবে সংসদ আইন প্রনয়ণের ব্যাপারে কিছুটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভোগ করে। এর কারণ দুটি ঃ প্রথমত, মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট-চালিত ব্যবস্থায় বাস্তবে মন্ত্রিসভা স্থির করে কোন্ আইন রচনা করা হবে এবং আইনের বিষয়বস্তু কি হবে। মন্ত্রিসভা-চালিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার পেছনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের সমর্থন থাকে বলে মন্ত্রিসভা রচিত আইন সহজেই সংসদে গৃহীত হয়। ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংসদ অনেকটা মন্ত্রিসভার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক কালে রাষ্ট্রকে ব্যাপক বিষয়ের ওপর আইন প্রণয়ন করতে হয়, অথচ ঐ সকল বিষয়ে সংসদ সদস্যদের অনেক সময়ই বিশেষীকৃত জ্ঞান (specialised knowledge) থাকে না। এ সকল কারণে সংসদ প্রতিটি আইনের রূপরেখা স্থির করে দেয় এবং ঐ আইনের রূপরেখা অনুযায়ী নিয়মাবলী (Rules) রচনার দায়িত্ব মন্ত্রিসভা তথা বিভাগের (department) ওপর অর্পণ করা হয়। একে বলা হয় হস্তান্তরিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা (delegated legislation)।

সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মূল্যায়ন

২. **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব সংসদে উপস্থিত করা হয় এবং সংসদ আয়-ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতা ভোগ করে। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার বিশেষ কোন সাংবিধানিক ভূমিকা নেই—বস্তুত সংসদের নামে হলেও লোকসভাই সরকারের আয়-ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতা ভোগ করে।

মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে অর্থবিল এবং সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব বা বাজেট লোকসভায় পেশ করা হয়। লোকসভায় আলোচিত ও গৃহীত হবার পরে তা রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। ১৪ দিনের মধ্যে ঐ প্রস্তাব রাজ্যসভা থেকে লোকসভায় ফেরত

অর্থ বিল অনুমোদন

পাঠাতে হয়। রাজসভা যদি ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন করে ঐ সময়ের মধ্যে তা লোকসভায় ফেরত পাঠায় তবে ঐ ব্যয়-বরাদ্দ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে। কিন্তু রাজ্যসভ্য যদি কোন সংশোধন প্রস্তাব করে তবে ঐ সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না-করা লোকসভার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। লোকসভা ঐ সংশোধনী গ্রহণ করলে সংশোধনীসহ ব্যয়-বরাদ্দ সংসদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে বলে ধরা হবে। কিন্তু লোকসভা সংশোধনী গ্রহণ না করলে যে অবস্থায় তা লোকসভার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল সেই অবস্থায় তা সংসদ দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে। রাজ্যসভা যদি ১৪ দিনের মধ্যে ব্যয়-বরাদ্দ প্রস্তাব লোকসভায় ফেরত না পাঠায় তবে ১৪ দিন পরে ঐ প্রস্তাব সংসদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

সরকার কতকগুলো ব্যয় করেন যা সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল নয় (charged expenditure)। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতি, লোকসভার স্পীকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতির বেতন এই শ্রেণীর ব্যয়। এগুলো সরকারের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India) থেকে ব্যয় করা হয়।

সরকারের আয়-ব্যয় যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব সংসদের। এই দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে যাতে পালিত হয় তার জন্য লোকসভা দুটি কমিটি গঠন করে। এগুলো হ'ল ঃ পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটি ও এস্টিমেটস্ কমিটি। পাবলিক

কমিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ

অ্যাকাউণ্টস্ কমিটির দায়িত্ব হ'ল সরকার যে ব্যয় করেন সে সম্পর্কে অডিটর ও কম্পট্রোলারের প্রতিবেদন বিবেচনা করে সংসদে একটি রিপোর্ট উপস্থিত করা। সরকারের ব্যয়-বরাদ্ধ পরীক্ষা করে ব্যয় সঙ্কোচ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে এস্টিমেটস্ কমিটি।

সংসদে পেশ করা বাজেট এবং বিভিন্ন অর্থবিল খুবই জটিল এবং টেকনিক্যাল চরিত্রের। এইসব জটিল ও টেকনিক্যাল বিষয় বিচার-বিবেচনার জন্য যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা অনেক ক্ষেত্রেই সংসদের থাকে না। তাছাড়া সংসদের আয়তন এত বড় যে সংসদের পক্ষে

আর্থিক ক্ষমতার মূল্যায়ন

কোন কিছু অনুসন্ধান এবং ধীর-স্থিরভাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। তাই অনেক সময় বাজেট আলোচনায় সাধারণ আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করে—আর্থিক বা টেকনিক্যাল বিষয় খুব বেশী গুরুত্ব পায় না। তবে সংসদের দুটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি—পাবলিক অ্যাকাউণ্টস্ কমিটি ও এস্টিমেটস্ কমিটি সংসদের পক্ষ থেকে সরকারের আয়-ব্যয় বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩. **মন্ত্রিসভা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ক্যাবিনেট-চালিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিদের সংসদের যে কোন একটি কক্ষের সদস্য হতে হয় এবং মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব সংসদের আস্থার ওপর নির্ভর করে। সংসদের আস্থা বলতে লোকসভার আস্থাকে বোঝায়। লোকসভা যদি মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে তবে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রিসভাকে যৌথভাবে তার কাজের জন্য লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। সুতরাং বলা যায়, মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সংসদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বিতর্ক, বাজেটের ওপর আলোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন, দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব উত্থাপন, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, বিভিন্ন বিলের ওপর আলোচনা এবং

এস্টিমেটস্ কমিটি ও পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির প্রতিবেদনের ওপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে সংসদ সদস্যরা মন্ত্রিসভার কাজ-কর্ম, নীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে পারে এবং মন্ত্রিসভাকে ভুল-ত্রুটির জন্য সমালোচনা করতে পারে। মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো সংসদ বা ক্যাবিনেট-চালিত ব্যবস্থায় সংসদের হাতে বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. **নির্বাচন ও পদচ্যুত করার দায়িত্ব ঃ** ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার জন্য একটি 'নির্বাচকমণ্ডলী' গঠিত হয় এবং সংসদের উভয়কক্ষ এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা এই নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের ব্যাপারে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণ উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। আবার রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত। এ ছাড়াও সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের, অডিটর ও কম্পট্রোলার জেনারেল প্রভৃতি পদাধিকারীদের পদচ্যুত করার জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত।

৫. **সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ঃ** ভারতের সংবিধান সংশোধনের জন্য দুটি পদ্ধতি আছে ঃ (১) ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন এবং (২) ৩৬৮ নম্বর ধারা প্রযোজ্য নয় এমন ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন। ৩৬৮ নম্বর ধারা প্রযোজ্য নয় এমন সব ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। আবার ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের জন্য দুটি পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে—(ক) একটিতে অঙ্গরাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন নেই, (খ) অন্যটিতে অর্ধেক সংখ্যক অঙ্গরাজ্যের অনুমোদন প্রয়োজন। উভয় পদ্ধতিতেই সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক বা তার বেশি সদস্যের উপস্থিতিতে এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সংসদই প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ভারতের সংবিধান সংসদকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু সংসদ-চালিত বা মন্ত্রিসভা-চালিত ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার পেছনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকে বলে মন্ত্রিসভা যা করে সংসদ মন্ত্রিভার সেই কাজ এবং ইচ্ছাকে আইনসম্মত করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এইজন্যই আইনসভার অবনয়নের দ্বারা মন্ত্রিসভার নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হচ্ছে। বিশেষ করে দলীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা সংসদকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংসদের ক্ষমতা মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় পরিণত হয়। সংসদীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থায় সংসদের কার্যাবলী অনেকটা আনুষ্ঠানিক—ক্ষমতার প্রকৃত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে মন্ত্রিসভা।

পচিশ ঃ ভারতীয় সংসদের মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (Parliamentary Control over the Executive)

ভারতীয় সংসদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতীয় সংসদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে।

১. নীতি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা

প্রথমত, ভারতের সংসদ মৌল নীতি নির্ধারণের প্রধান এবং সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে নীতি নির্ধারণের প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে এবং নীতি নির্ধারণের দ্বারা মন্ত্রিসভার ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

২. আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপন দ্বারা

দ্বিতীয়ত, আলোচনা, বিতর্ক ও প্রশ্ন উত্থাপনের সাহায্যে ভারতের সংসদ মন্ত্রিসভাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করে। এ ব্যাপারে ভারতীয় সংসদ নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী হয় ঃ

ক. সরকারী বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রির কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করা ;

খ. সরকারী বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করা ;

গ. জনস্বার্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দাবী করা এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ;

ঘ. জনস্বার্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ;

ঙ. মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভার বা কোন বিশেষ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ;

চ. সংসদে যে সকল বিল উত্থাপন করা হয় ঐ সকল বিল নিয়ে আলোচনার সময়ে বিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী কার্যাবলী আলোচনা করা ;

ছ. সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি যে ভাষণ দান করেন সেই ভাষণের উপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা।

সদস্যগণ কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত প্রশ্ন এবং আলোচনা মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার অমোঘ অস্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের সদস্যদের আলোচনা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজ ইচ্ছামত চলা মন্ত্রিসভার পক্ষে সম্ভব নয়। সংসদের ঐ সব আলোচনা শুধুমাত্র মন্ত্রিদেরই নিয়ন্ত্রণ করে না, সরকারী নীতি রূপায়ণের যারা পুরোধা সেই সরকারী কর্মচারীদেরও নিয়ন্ত্রণে রাখে। বস্তুত, সংসদের আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপনের ভয় অনেক সময় মন্ত্রিসভার সদস্যদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

তৃতীয়ত, সংসদে সরকার বাৎসরিক বাজেট উত্থাপন করে এবং বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা ছাড়াও প্রতিটি বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়। সাধারণভাবে

৩. বাজেট এবং হিসাব পরীক্ষা

বাজেট আলোচনাকালে এবং বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলোচনার সময়ে সদস্যগণ প্রশাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ পায়। সংসদ শুধু ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরই করে না, বরাদ্দকৃত ঐ অর্থ যাতে যথাযোগ্যভাবে ব্যয় করা হয় তার প্রতিও লক্ষ্য রাখে। সংসদ কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (**Comptroller and Auditor General**) মাধ্যমে সরকারী অর্থব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সরকার যে সব ব্যয় করে হিসাব পরীক্ষকের দপ্তর সেগুলোর হিসাব-নিকাশ ও পরীক্ষা করেন এবং এ সম্পর্কে সংসদে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ঐ রিপোর্টে সরকারী বরাদ্দগুলো যথার্থভাবে ব্যয় করা হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা এবং মন্তব্য থাকে। সংসদ ঐ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে এবং ব্যয় সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো নিয়ে কঠোর সমালোচনার দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

চতুর্থত, সংসদীয় কমিটিগুলোও মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদ এত বিরাট সংস্থা যে এর পক্ষে সব কাজ নিজেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

৪. সংসদীয় কমিটির দ্বারা

তাই বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন দেশে সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। ভারতীয় সংসদের এরূপ কয়েকটি কমিটি আছে। প্রথমেই পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি এবং এস্টিমেটস্ কমিটির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। বরাদ্দ অনুযায়ী সরকার যে টাকা খরচ করে তা এবং কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট পরীক্ষা করে পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি। সরকারী অর্থ সঙ্গত এবং যথার্থভাবে ব্যয় করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ঐ কমিটি সংসদের সামনে তার রিপোর্ট পেশ করে। এ ছাড়া সংসদের একটি এস্টিমেটস্ কমিটিও আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ আগামী বছরের খরচার যে হিসাব (estimate) প্রস্তুত করে এস্টিমেটস্ কমিটি সেগুলো পর্যালোচনা করে এবং তা যথার্থ কিনা সে সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। সরকার সংসদে বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলো কিছু পরিমাণে কার্যকর বা রূপায়িত হলেও তা যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে সংসদে বিবরণ পেশ করার জন্য একটি প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি

(Committee on Assurance) আছে। সরকারী উদ্যোগের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সংসদকে জানাবার জন্য সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Public Undertakings) আছে। এ ছাড়াও সংসদের আরও অনেক কমিটি আছে। সংসদের কমিটিগুলো সাধারণত সংসদের উভয় কক্ষের (লোকসভা এবং রাজ্যসভা) সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়।

ঐ কমিটিগুলোর দ্বারা ভারতীয় সংসদ সরকার তথা মন্ত্রিসভার কার্যাবলী পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী হয়। প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারতীয় সংসদের ভূমিকা আলোচনা করে লোকসভার একজন প্রাক্তন সেক্রেটারী এম. এন. কাউল বলেছেন যে, ঐ সকল কমিটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতার ওপরই নজর রাখতে সাহায্য করে না, উপরন্তু প্রশাসনকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করে। ঐ কমিটিগুলো থাকার জন্য মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দেবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যে সকল প্রতিশ্রুতি দেন সেগুলো যাতে পালিত হয় তার প্রতি নজর দেন। কমিটিগুলো থাকার জন্যই মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের কাছে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ঐ কমিটিগুলোর দ্বারা সংসদ যত বেশি কার্যকরভাবে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, ততই সংসদের কাছে প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা যে বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ নিজে প্রশাসন চালায় না, কিন্তু প্রশাসনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বর্তমান যুগে প্রশাসন বিশেষ জটিল এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় সংসদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল্যায়ন

বৃহদাকার সংসদের পক্ষে ঐ সকল টেকনিক্যাল বিষয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই এ দায়িত্ব পালনের জন্য কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঐ সকল টেকনিক্যাল ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সংসদ প্রশ্ন উত্থাপন, আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির সুযোগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতীয় সংসদ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণে কতটা কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছে।

বিখ্যাত প্রশাসনবিদ্ অ্যাপলবি (Paul H. Appleby) এ ব্যাপারে ভারতের সংসদের ভূমিকাকে সন্তোষজনক মনে করেন না (the performance of Parliament as lacking)। তাঁর মতে নিয়ন্ত্রণের নামে ভারতের সংসদ ছোটখাটো প্রশাসনিক ব্যাপারে বেশি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে, ফলে সরকারী কর্মচারীরা কোন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-দৃঢ়তার সঙ্গে কাজকর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হতে ভয় পায়।

মন্ত্রিসভা এবং আমলাতন্ত্র যাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে উঠে তা দেখা এবং তার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার প্রয়োগ করা নিশ্চয়ই সংসদের উচিত, কিন্তু সংসদের নিয়ন্ত্রণ যেন ছোটখাট এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রসারিত না হয় এবং নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা দ্বারা যাতে সরকারী কর্মচারীদের কাজ করার উদ্যোগ নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে সংসদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। কারণ সরকারী কর্মচারীদের যদি আত্মবিশ্বাস হ্রাস পায় এবং মনোবল ভেঙ্গে যায় তবে কোন প্রশাসনই দক্ষতার সঙ্গে কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পারে না।

ছাব্বিশ: লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার (The Speaker and the Deputy Speaker)

ব্রিটেনের কমন্সসভার (House of Commons) অনুকরণে ভারতে লোকসভার সভাপতিত্বের দায়িত্ব স্পীকার বা অধ্যক্ষের ওপর অর্পিত হয়েছে। লোকসভার সদস্যদের মধ্য থেকে স্পীকারকে নির্বাচন করা হয়। স্পীকারকে সাহায্য করার জন্য এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বা কোন কারণে তাঁর পদ শূন্য হলে স্পীকারের দায়িত্ব সাময়িকভাবে গ্রহণের জন্য একজন ডেপুটি স্পীকারও নির্বাচিত হন। সাধারণত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হলে বা তাঁদের মধ্যে কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে (স্পীকার ডেপুটি স্পীকারের কাছে এবং ডেপুটি স্পীকার

স্পীকারের কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন), বা অভিযোগমূলক প্রস্তাবের দ্বারা লোকসভা কর্তৃক তাঁরা অপসারিত হলে ঐ দুটি পদ শূন্য হতে পারে। শূন্য হওয়া মাত্রই শূন্যপদের জন্য নূতন স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করতে হয়।

সংবিধানে স্পীকারকে লোকসভার একজন দলমতনিরপেক্ষ সভাপতিরূপে পরিগণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর বেতন ও ভাতা সংরক্ষিত তহবিল থেকে দেয়া হয়। সংসদে ভোটাভুটির সময়েও তিনি সাধারণত ভোট দানে বিরত থাকেন, তবে যদি কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট প্রদত্ত হয়, তখন তিনি নিজস্ব একটি ভোট (casting vote) দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করেন। একমাত্র লোকসভার অধিকাংশ সভ্যের অভিযোগক্রমেই স্পীকারকে পদচ্যুত করা যায়। ব্রিটেনে স্পীকারের নিরপেক্ষতা এমন সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন ব্যক্তি দলীয় প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও একবার স্পীকার পদে নির্বাচিত হলে আজীবন তিনি স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; সরকারী ও বিরোধী সকল দলই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে। এবং তিনিও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। আমাদের দেশে স্পীকার পদে নির্বাচিত হবার পরে তাঁর কাছ থেকে নিরপেক্ষতা এবং সকল সদস্যের প্রতি সমব্যবহার প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি স্পীকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নানারূপ বাগবিতণ্ডা দেখা দিচ্ছে।

স্পীকারের কার্যাবলী

স্পীকারের পদটি খুবই মর্যাদাপূর্ণ, তাঁকে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্পীকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস দুটি ঃ ১. সংবিধান এবং ২. সংসদের কার্য-পদ্ধতির নিয়মাবলী **(Rules of Procedure of the Parliament)**।

স্পীকারের প্রধান প্রধান কাজ আলোচনা করা হল ঃ

স্পীকারের কাজ ও সাংবিধানিক মর্যাদা

১. স্পীকারের প্রধান কাজ হল লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা এবং সংসদের বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। বিতর্ককালে প্রত্যেক সদস্যের বক্তব্যের অধিকার, মত-প্রকাশের সুযোগ ইত্যাদি রক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব। এ বিষয়ে তাঁকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কোন সদস্যকে কোন বিষয়ে কতটা সময় বক্তৃতা করতে দেয়া হবে, কোন্ কোন্ প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক চালানো হবে, সভা মুলতুবি রাখা হবে কি না, কোন সদস্যের আচরণ সংসদীয় রীতিবিরোধী হলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এমন কি শাস্তিবিধান করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্পীকারকে দেয়া হয়েছে।

২. সংসদীয় বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের এবং সভাপতিকে স্পীকার মনোনীত করেন এবং সংসদীয় কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ কমিটির কাজে যে সকল তথ্য ও নথিপত্র প্রয়োজন তা সরবরাহ করার জন্য তিনি সরকারকে নির্দেশ দান করতে পারেন।

৩. স্পীকারের ব্যাপক প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে। সংসদীয় সচিবালয়ের (Secretariat of the Parliament) তিনি প্রধান কর্ণধার। সংসদীয় সচিবালয়ে যে সকল কর্মী কাজ করেন তাদের মুখ্য প্রশাসক স্পীকার। এ ছাড়া সংসদের সদস্যদের অধিকার রক্ষা ও সুখ-সুবিধা দেখা; লবি (Lobbies), দর্শক, সাংবাদিক, সংসদ-পাঠাগার ইত্যাদি তাঁর প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

৪. লোকসভার কোন সদস্য ভয়ে বা চাপে পড়ে পদত্যাগ করলে ঐ পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করার ক্ষমতা ৩৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনে স্পীকারকে দেয়া হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, পার্লামেণ্টারী বা সংসদীয় গণতন্ত্রে স্পীকার প্রভুত দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং অসামান্য মর্যাদার অধিকারী। ব্রিটিশ কমন্সসভার স্পীকারের থেকেও ভারতের লোকসভার স্পীকারের ক্ষমতা অধিকতর বলে মনে করা হয়।

লোকসভার অনুকরণে ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিম্ন-পরিষদ বা বিধানসভারও একজন করে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার আছেন। এঁদের কার্যাবলী ও মর্যাদা লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের মত।

সারাংশ ঃ ভারতের সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (Relation Between Two Houses of the Parliament)

ভারতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তন করা হয়েছে। শুধুমাত্র যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঞ্চলিক সরকারগুলোর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নয়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই উচ্চ কক্ষের প্রবর্তন করা হয়েছে ঃ বিলের পুনর্নিরীক্ষা, বিল পাশে বাধাদান, কালক্ষেপ ও সংশোধনী প্রস্তাবের দ্বারা সুবিবেচিত ও জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করাই দ্বিতীয় কক্ষের উদ্দেশ্য।

দুটি কক্ষের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

পৃথিবীর কোন দেশেই আইনসভার দুটি কক্ষের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চকক্ষে সেনেটের ক্ষমতা নিম্নকক্ষের কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বেশি ; ব্রিটেনে কমন্সসভার পাশে লর্ডসভাকে একেবারে নিরর্থক বলে মনে হয়। ভারতেও, ব্রিটিশ প্রথার অনুকরণে, নিম্নকক্ষ লোকসভাকেই উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা থেকে অধিকতর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

অর্থবিলের ব্যাপারে সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, অর্থ সংক্রান্ত বিল একমাত্র লোক-সভাতেই উত্থাপন করা যাবে। লোকসভায় কোন অর্থবিল পাশ হবার পর তা রাজ্যসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। **প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ অন্তত ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে ঐ বিল পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হবে।** ঐ সকল সুপারিশ গ্রাহ্য করা বা না-করা লোকসভার ইচ্ছাধীন। যদি অর্থবিল রাজ্যসভায় পাঠানোর ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা ঐ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন না করে, তা হলে যে-ভাবে লোকসভায় বিলটি পাশ হয়েছিল সে-ভাবেই তা বিধিবদ্ধ হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অর্থবিলকে বড় জোর চৌদ্দ দিন আটকে রাখা ছাড়া অর্থবিলের উত্থাপন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধনে রাজ্যসভার কোন ক্ষমতা নেই।

অর্থবিলের ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য

অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান। অর্থবিল ছাড়া যে-কোন বিল সংসদের যে-কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে এবং উভয় কক্ষের সম্মতি লাভ করে তা গৃহীত হয়। রাজ্যসভা কোন বিলের বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করলে সরাসরি তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা লোকসভার নেই। যদি এক কক্ষ কোন বিষয়ে আইন করতে বদ্ধপরিকর হয় এবং অন্য কক্ষও তা প্রত্যাখ্যান করতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তা হলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং একপ্রকার অচলাবস্থার (deadlock) সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে সংবিধানের ১০৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ঃ

অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা

১. সংসদের কোন এক কক্ষে কোন বিল পাশ হবার পর যদি অপর কক্ষে বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়, বা ২. বিলটির ওপর প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কে অপর কক্ষ আপত্তি জানায়, বা ৩. অপর কক্ষে বিলটি আসার পর ছ মাস অতিবাহিত হবার মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া না হয়, তা হলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করবেন। ঐ যুক্ত অধিবেশনে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে পাশ হলে স্বাভাবিকভাবেই তা আইনে পরিণত হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় যে, সংখ্যাধিক্যের জন্য যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার মতামতই প্রতিষ্ঠিত হবে।

উভয় কক্ষের বিরোধ ও অচলাবস্থা—সমাধানের উপায়

সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও লোকসভার কর্তৃত্ব অনেক বেশি। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী, রাজ্যসভার কাছে নয়। একমাত্র লোকসভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব বা কোন সরকারী প্রস্তাবের পরাজয়ের দ্বারাই সরকারের পতন ঘটতে পারে। কিন্তু রাজ্যসভাকে এরূপ কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তবে দেখা যায় যে, রাজ্যসভার সদস্যগণ সরকারী নীতির সমালোচনা, প্রশ্ন উত্থাপন বা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

সাধারণত দেশের অধিকাংশ রাজ্যগুলোতে যে দল ক্ষমতা লাভ করে কেন্দ্রের আইনসভার উভয় কক্ষে সেই দলের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উভয় কক্ষের কার্যবিধিও অনেকটা এক রকম।

রাজ্যসভায় আলোচনার সুবিধা

তবে সদস্য সংখ্যা কম বলে এবং সভার উত্থাপিত আইনের প্রস্তাব কম থাকায় লোকসভার তুলনায় রাজ্যসভায় আলোচনা ও বিচারবিবেচনার সুযোগ অনেক বেশি। রাজ্যসভায় প্রতি সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টা ছাড়াও প্রতি শুক্রবার সাধারণ সদস্যদের আলোচনা ও বক্তৃতার জন্য আলাদা সময় রাখা হয়।

মোটের ওপর এ কথা বলা চলে যে, ভারতের সংবিধান স্পষ্টতই লোকসভাকে অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত উভয় কক্ষের মধ্যে গুরুতর কোন বিবাদ দেখা দেয়নি—কিন্তু সেরূপ ঘটলে লোকসভার প্রাধান্যই বজায় থাকবে।

আঠাশ : পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা (West Bengal Legislative Assembly)

ভারতের সংবিধানের ১৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যের আইনসভার একটি বা দুটি কক্ষ থাকতে পারে। এতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার দুটি কক্ষ ছিল—বিধানসভা (Legislative Assembly) ও বিধান পরিষদ (Legislative Council)। **কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে** যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ঐ সরকারের উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট থেকে **পশ্চিমবঙ্গের বিধান-পরিষদের বিলোপ ঘটেছে।** সুতরাং এখন পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা বলতে বিধানসভাকে বোঝায়। বর্তমানে ভারতে **পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা,** আসাম, উড়িষ্যা, **পাঞ্জাব ও কেরলসহ** কতকগুলো **অঙ্গরাজ্যে আইনসভার একটি কক্ষ অর্থাৎ কেবলমাত্র বিধানসভা আছে,** অন্যান্য রাজ্যে আইনসভার দুটি করে কক্ষ (বিধানসভা ও বিধান-পরিষদ আছে)।

অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। পশ্চিমবঙ্গকে ২৯৪টি

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গঠন

নির্বাচন এলাকায় (Constitueneies) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি এলাকা থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জয়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা গঠিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৯৪ জন। রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধে দু জন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যকাল পাঁচ বছর। বিধানসভার কার্যকাল শেষ হবার আগে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে ভারতীয়

বিধানসভার মেয়াদ

সংসদ আইন করে বিধানসভার কার্যকাল এক বছর বাড়াতে পারে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার তারিখ শেষ হবার পর আর ছ মাসের বেশি বিধানসভার স্থিতিকাল বৃদ্ধি করা যাবে না।

বিধানসভার সদস্যপদপ্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। সদস্য হবার জন্য প্রার্থীর অন্তত পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে। প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার হতে হবে। তিনি সরকারের

সদস্যপদের যোগ্যতা

অধীনে কোন চাকরি করবেন না বা সরকারী কোন লাভজনক কাজে যুক্ত থাকবেন না। মন্ত্রীরা সরকারী তহবিল থেকে মাইনে পান এবং বিধানসভার সদস্যরা সরকারী তহবিল থেকে ভাতা পান—কিন্তু এটাকে সরকারের অধীনে চাকরি বা লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত বলে ধরা হবে না। কেউ দেউলিয়া, বিকৃতমস্তিষ্ক বা সংসদের কোন আইন কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত হলে নির্বাচনপ্রার্থী হতে পারবে না। কোন ব্যক্তি একই সময়ে সংসদ ও বিধানসভার বা একাধিক রাজ্যের বিধানসভার সদস্য থাকতে পারবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যদি একটি পদ ত্যাগ না করেন তবে তিনি সকল পদই হারাবেন। কেউ বিধান-সভার সদস্য নির্বাচিত হবার পর একাদিক্রমে বিনা অনুমতিতে ষাটদিনের বেশি বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে ঐ নিয়ম কার্যকর করা বা না-করা বিধানসভার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

প্রতি বছর অন্তত দুবার বিধানসভার অধিবেশন হতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে ছ মাসের বেশি ব্যবধান থাকতে পারবে না। বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকলেই বিধানসভার গণপূর্তি (Quorum) হয়েছে বলে ধরা হবে এবং সভার অধিবেশন চলতে পারবে। অর্থাৎ বিধানসভার এক-দশমাংশের কম সদস্য উপস্থিত থাকলে অধিবেশন স্থগিত থাকবে। বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য নির্বাচিত হবার পরে বিধিমত শপথ গ্রহণ করবেন। বিধানসভায় উত্থাপিত সকল প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হবে।

কার্য পদ্ধতি

বিধানসভার সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পীকার (Speaker) ও একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচন করা হয়। সভার পরিচালনা এবং শৃংখলা-রক্ষার সকল দায়িত্ব স্পীকারের ওপর এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকারের ওপর ন্যস্ত। বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে লোকসভার স্পীকারের ও ডেপুটি স্পীকারের সমান সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়। স্পীকার সাধারণত ভোট দেন না, তবে ভোটসংখ্যা সমবিভক্ত (tie) হলে তিনি ভোট দিতে পারেন।

বিধানসভা পরিচালনা : স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশনের (session) স্থান ও সময় নির্দেশ করেন। রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করতে এবং স্থগিত রাখতে পারেন। রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ (Address) দিতে পারেন। প্রতি বছর বাজেট অধিবেশনের শুরুতে তিনি আইনসভায় একটি ভাষণ দেন। তিনি বিধানসভায় কোন বিল বা অন্য কোন বিষয়ে বাণী (Message) পাঠাতে পারেন। রাজ্যপাল কোন বাণী পাঠালে ঐ বাণী সম্পর্কে ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব তৎপরতার সঙ্গে বিধানসভাকে গ্রহণ করতে হবে।

রাজ্যপাল ও আইনসভা

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা

রাজ্যতালিকাভুক্ত ও যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্য আইনসভার দ্বারা প্রণীত আইন যদি সংসদ প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তা হলে রাজ্য আইনসভার আইন বাতিল বলে পরিগণিত হবে। এ ছাড়াও কোন কোন বিষয়ে বিল বা আইনের খসড়া পেশ করার আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে হয়। যেমন, রাজ্যের মধ্যে বা আন্তঃ-রাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণকারী কোন প্রস্তাব, বা হাইকোর্টের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপনের আগে রাজ্যপালের অনুমোদন প্রয়োজন। রাজ্যসভায় দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি স্থির হয় যে, রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয় সাময়িকভাবে সংসদের এক্তিয়ারে রাখা হবে তা হলে ঐ সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী ঐ বিষয় সংক্রান্ত কোন আইন পাশ করতে পারবে না।

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি যদি কোন অঙ্গরাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন চালানো সম্ভব নয় মনে করেন এবং ঐ অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন সেই রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সকল ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত হতে পারে। যখন রাষ্ট্রপতি দেশের অবস্থা বিপন্ন বলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্যতালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে আইন রচনা করতে পারে। কোন বৈদেশিক চুক্তি বা আন্তর্জাতিক কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্যও কেন্দ্রীয় সংসদ রাজ্য-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সে সময়ে রাজ্যবিধানমণ্ডলীর আইন করার অধিকার থাকে না ; যদিও তখন বিধানমণ্ডলী ভেঙে যায় না, তার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

ঐ সকল বাধানিষেধ ছাড়া রাজ্যের বিধানসভা তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু রাজ্যের হাইকোর্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রীর আদালত সুপ্রীম কোর্ট কোন মামলা মোকদ্দমা বিচার করার সময়ে বিধানসভার দ্বারা গৃহীত আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে, রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক

গৃহীত কোন আইনের সঙ্গে সংবিধানের (লেখায় ও ভাবে) অসামঞ্জস্য দেখা দিলে ঐ বিচারালয়সমূহ সেই আইনকে অবৈধ বা অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে।

রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বা ব্যয়-বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করাও বিধানসভার কাজ। বিধানসভা অনুমোদন না করলে রাজস্ব ব্যয় করা যায় না। রাজ্যপালের সুপারিশ বাদে বিধানসভার কাছে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত করা যায় না। মন্ত্রিরাই কেবলমাত্র অর্থবিল বা বাজেট, কর-ধার্য ও ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব ইত্যাদি বিধানসভায় উত্থাপন করতে পারেন, অন্য কোন সদস্য পারেন না।

মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা আইনসভার প্রধান দায়িত্ব। মন্ত্রিরা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য এবং আইনসভার কাছে তাঁরা যৌথভাবে দায়ী। আইনসভার সদস্যগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে, মন্ত্রিদের কাজের সমালোচনা করে এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মন্ত্রিদের নিয়ন্ত্রণ করে। বিধানসভা নিম্নলিখিত উপায়ে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে পারে : ১. অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে ২. মুলতুবি প্রস্তাব পাশ করে ৩. কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবী হ্রাস করে বা তা মঞ্জুর না-করে ; ৪. কোন সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। বিধাননভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

উনত্রিশ : বিধানপরিষদের গঠন এবং এর অস্তিত্বের যৌক্তিকতা (Organization and Justification of the Legislative Council)

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, ভারতের অনেকগুলো অঙ্গরাজ্যের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট—সেখানে বিধানসভা ও বিধানপরিষদ আছে। আবার, পশ্চিমবঙ্গসহ ১৫টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট—সেখানে শুধুমাত্র বিধানসভা আছে, **পশ্চিমবঙ্গসহ ঐ সকল অঙ্গরাজ্যে বিধানপরিষদ** নেই। যেখানে বিধানপরিষদ আছে সেখানে বিধানপরিষদের সদস্যসংখ্যা সেই রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না। আবার কোনমতেই বিধানপরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম হতে পারবে না।

বিধানপরিষদের গঠন

সংসদ যতদিন কোন আইন প্রণয়ন না করছে, ততদিন বিধানপরিষদ নিম্নপদ্ধতিতে গঠিত হবে : ১. বিধানপরিষদের দু-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্বাচিত হবেন মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান থেকে, ২. ঐ রাজ্যে বসবাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের পুরাতন স্নাতক (graduate) অথবা সমযোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিধানপরিষদের মোট সদস্যের $\frac{1}{12}$ অংশের মত সদস্য নির্বাচিত করবেন, ৩. যাঁরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Secondary school) অন্তত পক্ষে তিন বছর কাল শিক্ষকতা করেছেন তাঁরা $\frac{1}{12}$ অংশ সভ্য নির্বাচিত করবেন, ৪. রাজ্য বিধানসভার সভ্যগণ $\frac{1}{3}$ অংশ সদস্য নির্বাচিত করবেন, কিন্তু তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে কেউ নির্বাচিত হতে পারবেন না, ৫. বাকী সদস্যরা রাজ্যপাল দ্বারা মনোনীত হবেন। রাজ্যপাল মনোনয়ন করবেন এমন সদস্যগণকে যাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন, সমাজসেবা ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। প্রথম তিন শ্রেণীর নির্বাচন হবে সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচকমণ্ডলীর (territorial constituency) দ্বারা।

বিধানপরিষদ রাজ্যসভার মত একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান—ইহা ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা নেই। প্রতি দু বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় বা অবসর গ্রহণ করবেন। ফলে বিধান পরিষদ কখনও ভেঙে যায় না—একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। বিধানপরিষদের প্রতিটি সদস্য ছ বছরের জন্য সদস্য থাকেন এবং তাঁরা পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন।

বিধানপরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি (Chairman) এবং একজন

সহসভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন। সভাপতির অবর্তমানে সহ-সভাপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কাজ পরিচালনা করেন।

বিধান পরিষদের সদস্য হতে হলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং কম পক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে।

বিধানপরিষদের যৌক্তিকতা

আইনসভার অঙ্গহিসেবে রাজ্য বিধানপরিষদ বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত কি-না (Justification of the Legislative Council) সে বিষয়ে বহুদিন থেকেই বিতর্ক চলছে। বিধানপরিষদের সদস্যরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন না, বিধানপরিষদ গঠিত হয় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মনোনীত সদস্যদের নিয়ে। এই কারণে বিধানপরিষদের হাতে বিধানসভার তুলনায় কম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। যাঁরা বিধানপরিষদ তুলে দিতে চান তাঁরা বলেন, যে সংস্থা মাত্র কয়েক মাস সময়ের জন্য বিলকে আটকে রাখতে পারে, অর্থবিল সংক্রান্ত বিষয়ে যে সংস্থার ক্ষমতা একান্তই সীমিত, শুধুমাত্র আলোচনা করা বাদে যার কোন কার্যকর ভূমিকা নেই—তার অস্তিত্ব বজায় রেখে লাভ কী?

আমাদের মত দরিদ্র দেশে দ্বিতীয় কক্ষের জন্য অর্থব্যয়কে অপব্যয় মনে করা হয়। বিধানপরিষদ থাকলে সুচিন্তিতভাবে বিল পাশ হয় বলে যে যুক্তি দেওয়া হয় তা ঠিক নয়। কারণ, বিধানসভা কোন ক্ষতিকারক বিল পাশ করলে বা জনমত তার বিরুদ্ধে গেলে বা বিধানসভা অবিবেচনাপ্রসূত ভাবে বা বিচার-বিবেচনা না করে দ্রুত কোন আইন পাশ করলে রাজ্যপাল ঐ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য বিধানসভায় ফেরৎ পাঠাতে পারেন। তা ছাড়াও মনে রাখতে হবে যে, দলীয় ব্যবস্থায় বিধানসভা ও বিধানপরিষদ উভয় কক্ষেই সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্য থাকে এবং দলীয় শৃংখলার জন্য এক কক্ষ অন্য কক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। সুতরাং এক কক্ষ অন্য কক্ষের হটকারিতাকে বাধা দেবে—এই প্রত্যাশা তত্ত্বগত দিক থেকে সঠিক মনে হলেও বাস্তবে সম্ভব নয়। সর্বোপরি, রাজ্যের বিধান-মণ্ডলীর এক কক্ষ ভুল করলে প্রতিবিধান করার জন্য রাজ্যপাল আছেন, রাষ্ট্রপতি আছেন—আছে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট, আছে জনমত। এ অবস্থায় বিধান পরিষদের আর কোন প্রয়োজন আছে কি-না সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

তুলে দেবার পক্ষে যুক্তি

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এমন অনেক শান্ত, বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের হাঙ্গামায় নিজেদের জড়াতে চান না, অথচ এঁরা নিজেদের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি দেশের আইনপ্রণয়ন ও শাসনকাজে নিয়োগ করতে পারেন। এরূপ ব্যক্তিরা রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হয়ে বিধানপরিষদে সদস্য থাকতে পারেন। এরূপভাবে আইনসভার সদস্য হয়ে তাঁরা মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য—এমন কি মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারেন। আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণী বা সকল স্বার্থের কথা আইনসভায় সমান ভাবে প্রকাশ না-ও পেতে পারে। বিভিন্ন জীবিকাগোষ্ঠী এবং শ্রেণী থেকে মনোনীত হয়ে সদস্যেরা দেশের শাসন-কাঠামোতে বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের (Functional Representation) সুবিধা আনতে পারেন। সর্বোপরি, দ্বিতীয় কক্ষ বজায় রাখার কারণ প্রধানত রাজনৈতিক। নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো বহু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নানাবিধ উপায়ে সাহায্য পায়, ঐ দলগুলো বিধানপরিষদে তাঁদের স্থান করে দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে পারে। প্রভাব প্রতিপত্তির ভাগাভাগির প্রয়োজনে দ্বিতীয় পরিষদের সদস্যপদ অনেকের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এরূপভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভাগ বাটোয়ারা করার প্রয়োজনেও ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিধানপরিষদকে টিঁকিয়ে রাখা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন।

তবুও বিধান পরিষদ কেন বজায় রাখা হচ্ছে

ভারতের কয়েকটি অংগরাজ্যে প্রথম থেকেই এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিমবংগ সহ কয়েকটি অংগরাজ্য বিধানপরিষদকে বিলুপ্ত করে এক-কক্ষবিশিষ্ট

আইনসভা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা বলতে কেবলমাত্র বিধানসভাকেই বোঝায়।

ত্রিশ ঃ ভারতে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Law Making in India)

ভারতে আইন প্রণয়ন পদ্ধতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা প্রয়োজন ঃ ক. ভারতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন এবং খ. অঙ্গরাজ্য আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন।

ক. ভারতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন

ভারতের সংসদে ও রাজ্যের আইনসভায় আইন প্রণয়নের পদ্ধতি মোটামুটি একই। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে যে দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত, রাজ্যে সেই দায়িত্ব রাজ্যপালের ওপর ন্যস্ত। সুতরাং সংসদ কিভাবে আইন প্রণনয় করে তা আলোচনা করলেই আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা যায়। আইনসভায় উত্থাপিত বিলগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, 'সাধারণ বিল' এবং 'অর্থ-সম্বন্ধীয় বিল'। উভয় বিল পাশ করার পদ্ধতি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১. সাধারণ বিল সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ঃ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং আইন প্রণয়ন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ সম্পর্কে সংবিধানের কতকগুলো নিয়ম আছে ঃ (১) অর্থবিল ছাড়া অন্য সকল বিল সংসদের যে-কোন কক্ষে প্রস্তাবিত ও উত্থাপিত হতে পারে ; অর্থসংক্রান্ত বিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা চলে। (২) সংসদের উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন বিলই সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। (৩) উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে মতবিরোধের মীমাংসা করতে হবে। (৪) অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, ইহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই এবং অর্থবিল লোকসভাতেই প্রথমে উত্থাপিত হতে হবে। লোকসভায় গৃহীত হলে অর্থ বিলটি রাজ্যসভায় পাঠান হবে। সম্মতি, অসম্মতি বা সংশোধনের সুপারিশসহ ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি পুনরায় লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হয় ; তা না হলে ১৪ দিন পরে তা অপরিবর্তিত অবস্থায় গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে। অর্থবিলে রাজ্যসভার সুপারিশ গ্রহণ করা বা না-করা লোকসভায় ইচ্ছাধীন। (৫) সবশেষে, সংসদে গৃহীত প্রতিটি বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় তাঁর সম্মতির জন্য। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে ঐ বিলে সম্মতি দিতে পারেন, না-ও দিতে পারেন, কিংবা নিজস্ব সুপারিশসহ বিল পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। তাঁর সুপারিশসহ অথবা আগের আকারেই বিলটি যদি সংসদের উভয় কক্ষে পুনরায় গৃহীত হয়, তা হলে রাষ্ট্রপতিকে ঐ বিলে সম্মতি দিতেই হবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া মাত্র বিলটি আইনে পরিণত হবে।

উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম ছাড়াও, প্রত্যেক বিলকে সংসদে গৃহীত হবার জন্য কতকগুলো পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

প্রথমত, বিল উত্থাপনের আগে সভাকে অবহিত করে সভার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। সংসদে কোন সাধারণ বিল উত্থাপন করতে হলে এক মাস আগে বিলটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। বিলটি উত্থাপন করার সময় বিলের প্রস্তাবককে বলতে হয় যে, (১) তখনই বিলটি বিবেচনা করা হোক, অথবা, (২) বিচার-বিবেচনার জন্য বিলটি নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হোক, অথবা, (৩) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানার জন্য বিলটি গেজেটে প্রচার করা হোক। কোন মন্ত্রীকে বিল উত্থাপনের জন্য আগে থেকে অনুমতি নিতে হয় না। বিল উত্থাপনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকে বিলের উত্থাপন এবং প্রথম আলোচনা (Introduction and First Reading) বলে। এই স্তরে বিলটি সম্পর্কে বিশদ বিবেচনা সম্ভব হয় না, কেবল নীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বিলের উত্থাপন ও প্রথম আলোচনা

বিলটিকে যদি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় তা হলে ঐ কমিটি বিলটি বিবেচনা করে কমিটির সুপারিশসহ বিলটি লোকসভায় পাঠায়। এই স্তরকে কমিটি-স্তর (Committee Stage) বলা হয়। এই স্তরের পর বিলটির উত্থাপক ঐ বিলটি দ্বিতীয় আলোচনার (Second Reading) প্রস্তাব করেন। এই দ্বিতীয় স্তরে বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং বিলটির ওপরে ভোট গ্রহণ করা হয়।

কমিটি স্তর ও দ্বিতীয় আলোচনা

সংখ্যাধিক্যের ভোট পেলে বিলের উত্থাপক বিলটির তৃতীয় আলোচনার (Third Reading) জন্য প্রস্তাব করেন এবং এই স্তরে মৌখিক সংশোধন ছাড়া অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

তৃতীয় আলোচনা

আইন প্রণয়ন সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতি জানা প্রয়োজন। **প্রথমত,** সাধারণ বিল সংসদের উভয় পরিষদে বিনা সংশোধনে অথবা উভয় পরিষদ কর্তৃক সংশোধনসহ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ বিল সংসদ কর্তৃক অনুমোদিন হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হয়েছে (prorogued) এরূপ ঘোষণার জন্য সংসদে প্রস্তাবিত কোন বিল বাতিল হয়ে যাবে না। লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি এরূপ কোন বিল রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকলে লোকসভা ভেঙ্গে গেলে সেই বিল বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, যে বিল লোকসভার বিবেচনাধীন আছে অথবা লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর যা রাজ্যসভার বিবেচনাধীন আছে, তা লোকসভা ভেঙ্গে দিলে বাতিল হয়ে যাবে।

২. **অর্থবিষয়ক আইন প্রণয়ন ঃ** সংবিধানে অর্থবিল প্রণয়ন সম্পর্কে সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ছাড়াও কতকগুলো অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ১১০ নম্বর ধারায় অর্থবিলের একটি ব্যাপক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অর্থসংক্রান্ত বিলের আওতায় পড়ে ঃ ১. কোন করের প্রবর্তন, রহিতকরণ, হ্রাস, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ ; ২. সরকারী ঋণসংক্রান্ত নিয়মকানুন, ভারতের সংরক্ষিত ও আপৎকালীন তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা ঐ তহবিলে অর্থসঞ্চয় ও প্রত্যাহার এবং তৎসম্পর্কিত আইনকানুন ইত্যাদি। অর্থসংক্রান্ত বিলের মধ্যে প্রধান হল বাজেট। কোন বিল অর্থবিল কি না সে বিষয়ে লোকসভায় স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

অর্থবিল কাকে বলে ?

অর্থসংক্রান্ত বিল পাশ করানোর পদ্ধতিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এ ধরনের বিল কেবলমাত্র মন্ত্রীরাই উপস্থিত করতে পারেন, অন্য কোন সদস্য পারেন না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থসংক্রান্ত বিল পেশ করা যায় না। বেসরকারী সদস্যরা কোন কর ধার্য করার প্রস্তাব তুলতে পারেন না। তাঁরা ব্যয় কমাবার প্রস্তাব করতে পারেন, কিন্তু ব্যয় বাড়াবার প্রস্তাব করতে বা ঐ উদ্দেশ্যে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন না।

অর্থবিলের বৈশিষ্ট্য

অর্থসংক্রান্ত বিল প্রথমে লোকসভায় আনতে হয়, রাজ্যসভায় প্রথমে অর্থবিল উত্থাপন করা যায় না। লোকসভার সাধারণ বিল পাশের পদ্ধতিতে অর্থবিল পেশ হবার পরেই তা আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়, অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন হয় না। বেসরকারী সদস্যরা একদিনের নোটিশ দিয়ে সরকারী প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী আনতে পারেন। এরূপ সংশোধনী প্রস্তাব তিন ধরনের হতে পারে ঃ **প্রথমত,** যদি কোন সদস্য সরকারী কোন বিভাগের অবলম্বিত নীতির বিরোধিতা করতে চান, তবে তিনি ঐ বিভাগের ব্যয় মঞ্জুরীর সময়ে প্রস্তাব করতে পারেন যে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ঐ বিভাগের জন্য মাত্র এক টাকা মঞ্জুর করা হোক। **দ্বিতীয়ত,** মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে কোন বিভাগের ব্যয় এতটা কমান হোক বা বিশেষ কোন প্রস্তাব বাদ দেওয়া হোক। **তৃতীয়ত,** কোন বিভাগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাব করা যায় যে, ঐ বিভাগের মোট ব্যয় থেকে একশ টাকা কমানো হোক।

'লোকসভায় কোন অর্থ বিষয়ক বিল গৃহীত হবার পর তা অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভার প্রেরিত হয় এবং রাজ্যসভা বিল প্রাপ্তির দিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে অনুমোদন বা সুপারিশসহ তা লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য। লোকসভা রাজ্যসভার কোন কোন সুপারিশ বা সকল সুপারিশ গ্রহণ অথবা বর্জন করতে পারে। যদি লোকসভা রাজ্যসভার কোন সুপারিশ গ্রহণ না করে তা হলে ধরে নেওয়া হবে যে, ঐ অর্থ সম্পর্কীয় বিলটি লোকসভায় যে আকারে গৃহীত হয়েছে সে আকারেই উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

লোকসভায় গৃহীত কোন অর্থ বিষয়ক বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যসভায় প্রেরিত হবার পর যদি ১৪ দিনের মধ্যে লোকসভায় তা ফেরৎ না আসে তা হলে ধরা হবে যে, লোকসভায় যে আকারে বিলটি গৃহীত হয়েছে, উভয় পরিষদ কর্তৃক তা ঠিক সেভাবেই অনুমোদিত হয়েছে। এর পরে ঐ বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠান হয়। সংবিধানে আছে যে, রাষ্ট্রপতি ঐ বিল অনুমোদন করতেও পারেন, না-ও করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে চালিত হন বলে তিনি স্বভাবতই বিল অনুমোদন করে থাকেন।

অর্থসংক্রান্ত আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভারই প্রাধান্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকসভার প্রাধান্য নামে মাত্র, ক্যাবিনেটই এ ব্যাপারে সর্বেসর্বা। রাষ্ট্রপতির অর্থবিলও আসলে ক্যাবিনেটের প্রস্তাব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যেমন উদ্যোগ নিয়ে আর্থিক ব্যাপারে নানাবিধ ব্যয়ের প্রস্তাব করতে পারে, ব্রিটেনের বা ভারতের পার্লামেণ্ট সেরূপ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, সংসদের পক্ষে প্রতিটি বিভাগের খুঁটিনাটি বিচার করা অসম্ভব। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার শক্তি, সময় ও সদিচ্ছা সাধারণত বেসরকারী সদস্যদের থাকে না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মত ভারতের সংসদও আর্থিক ব্যাপারে ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব মেনে চলে।

খ. ভারতে অংগরাজ্যের আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন

সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের উপরোক্ত পদ্ধতি অংগরাজ্য-আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পালন করা হয়। সংসদের মত, রাজ্য-আইনসভায় পাশ করার জন্য উপস্থাপিত বিল-গুলোকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ 'সাধারণ বিল' ও 'অর্থসম্বন্ধীয় বিল'।

যে অংগরাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষ আছে, সেখানে সাধারণ বিল উভয় পরিষদের যে-কোন একটিতে উত্থাপিত হতে পারবে। যেখানে বিধানপরিষদ (Legislative Council) আছে সেখানে উভয় পরিষদ কর্তৃক বিলটি গৃহীত হতে হবে। তারপর রাজ্যপালের

সাধারণ বিল

সম্মতি লাভ করলে তা আইনে পরিণত হবে। বিধানপরিষদে প্রস্তাবিত কোন বিল, যা বিধানসভায় কখনও পাশ হয়নি, তা বিধানসভা ভেঙ্গে যাবার ফলে বাতিল হয়ে যাবে না, কিন্তু যে বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছে অথবা পাশ হবার পর বিধানপরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে তা বিধানসভা ভেঙ্গে গেলে বাতিল হয়ে যাবে।

যে রাজ্যে বিধানপরিষদ আছে সেখানে কোন বিল বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়ে বিধান-পরিষদে প্রেরিত হবার পর তা যদি বিধানপরিষদ কর্তৃক গৃহীত না হয়, অথবা ঐ বিল বিধান-পরিষদে তিনমাস যাবৎ উপস্থাপিত থাকলেও যদি বিধানপরিষদে তা পাশ না হয়, অথবা বিধানপরিষদ কর্তৃক বিধানসভার অনুমোদনে সংশোধিত আকারে পাশ হয়, তা হলে বিধানসভা সেই অধিবেশনে বা পরবর্তী অধিবেশনে বিধান পরিষদের প্রস্তাবিত সংশোধন গ্রহণ করে বা বিনা সংশোধনে বিলটি পাশ করে বিধান পরিষদে পাঠাতে পারে।

এইভাবে দ্বিতীয়বার বিধানসভা কর্তৃক বিলটি পাশ হয়ে বিধানপরিষদে প্রেরিত হলে তা যদি বিধানপরিষদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, অথবা বিলটি বিধানপরিষদে উত্থাপিত হবার পর যদি একমাস অতিবাহিত হয়, অথবা বিধানসভার বিনা অনুমোদনে বিধানপরিষদ কর্তৃক যদি পাশ হয় তা হলে উক্ত বিল বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

অর্থসম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব বিধানপরিষদে উত্থাপিত হবে না। অর্থবিল আইনসভার নিম্ন পরিষদে অর্থাৎ বিধানসভার (Legislative Assembly) উত্থাপিত হবে। বিধানসভা কর্তৃক

অনুমোদিত হবার পর তা বিধানপরিষদে প্রেরিত হবে। বিধানপরিষদ ঐ বিল পাবার চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ বিল সম্বন্ধে তার সুপারিশ বিধানসভাকে জানাবে। বিধানসভা ঐ বিল সম্বন্ধে বিধানপরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করলে ঐ সুপারিশসহ অর্থসম্বন্ধীয় বিল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বিধানসভা ঐ বিলটি সম্বন্ধে বিধানপরিষদের সুপারিশ গ্রহণ না করে তা হলে বিল যে-আকারে বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল সেই আকারে উভয় পরিষদ কর্তৃক পাশ হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি বিধানপরিষদ অর্থসম্বন্ধীয় বিলের প্রস্তাব পেয়ে ১৪ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ তা বিধানসভায় প্রেরণ না করে, তবে যে-আকারে বিধানসভা কর্তৃক ঐ বিল অনুমোদিত হয়েছিল সেই আকারে উভয় পরিষদ কর্তৃক তা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

অর্থসম্বন্ধীয় বিল

গ. **পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বিধানসভা কর্তৃক বিল প্রণয়ন**

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ বা বিধান পরিষদকে অবলুপ্ত করায় পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট। ত্রিপুরা আইনসভাও এক-কক্ষবিশিষ্ট। ঐ এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নাম বিধানসভা। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরায় সকল আইন একমাত্র বিধানসভাতেই উত্থাপিত হবে এবং বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

বিধানসভায় বিলটি উত্থাপিত হবার জন্য সংসদের উত্থাপিত বিলের মত ঐ বিলকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এই স্তরগুলো হল বিল উত্থাপন করা, প্রথম আলোচনা, কমিটি স্তর, দ্বিতীয় আলোচনা, তৃতীয় আলোচনা, সবশেষে রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট হবার জন্য এখানে বিল নিয়ে দু কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। অর্থবিলের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, মন্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ অর্থবিল বিধানসভায় উত্থাপন করতে পারে না।

একত্রিশ : বিচারবিভাগের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organization and Functions of Judiciary)

প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের অধিকারকে বলবৎ করার জন্য বিচারবিভাগ রয়েছে। ব্রাইস বলেছেন : কোন শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় যোগ্যতা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই।[১] ব্রাইস আরও মনে করেন যে, কোন জাতি রাজনৈতিক সভ্যতার কোন স্তরে আছে, তা নির্ণয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল পরীক্ষা করে দেখা যে নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকগণের মধ্যে বিচার-ব্যবস্থা কতটা আইনানুমোদিত ও ন্যায়সঙ্গত। সিজউইকও (Sidgwick) প্রায় একই ভাষায় এ বক্তব্য রেখেছেন। বস্তুতপক্ষে গণতন্ত্রের সাফল্য বহুল পরিমাণে বিচারব্যবস্থার যোগ্যতা ও উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে। মনে রাখা প্রয়োজন, বিচারের বাতি নিভে গেলে, সে অন্ধকার খুবই ভয়ঙ্কর। লর্ড ব্রাইসের ভাষায় বলা যায় : *If the lamp of justice goes out in darkness, how great is that darkness!* বিচার ব্যবস্থাকে যদি দ্রুত, নিরপেক্ষ ও সুনিশ্চিত করা যায় তবেই বিচারবিভাগ তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। বিচার ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন না হলে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়, *justice delayed is justice denied.*

বিচারবিভাগের প্রয়োজন ও গুরুত্ব

বিচার বিভাগের সংগঠন

পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় সংগঠন একই নীতির দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকারের বিচারবিভাগীয় সংগঠন লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও

১. There is not better test of the excellence of a government than the efficiency of its judicial system.

বিচারবিভাগীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে মৌলিক নীতি মোটামুটিভাবে অনুসৃত হয় তা আলোচনা করা হল। বিচার বিভাগকে 'দেওয়ানি' ও 'ফৌজদারি' এই দুই ভাগে বিভক্ত করার নীতি প্রায় সকল রাষ্ট্রেই প্রচলিত। ব্যক্তিগত দাবী-দাওয়া ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে যে মামলা করা হয় তাকে দেওয়ানি মামলা (civil case) বলা হয়। যেখানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র মামলার একটি পক্ষে থাকে তাকে ফৌজদারি মামলা (criminal case) বলা হয়। উভয় শ্রেণীর আদালতই নিম্নতম থেকে একের পর এক ধাপে ধাপে সংগঠিত হয়ে একটি পিরামিডের আকার ধারণ করে থাকে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ছাড়াও বিশেষ অপরাধ বিচারের জন্য বিশেষ আদালত দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শাসন বিভাগীয় আদালত, সামরিক আদালত ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত ঐ সকল আদালতের ক্ষমতাও স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট থাকে।

বিচারালয়কে 'আপীল আদালত' (Court of Appellate Jurisdiction) ও সাধারণ আদালত বা মামলার আদি পত্তন আদালত (Court of Original Jurisdiction) এ দুই ভাগে বিভক্ত করার নীতি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। যে বিচারালয়ে নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করা যায় তাকে আপীল আদালত বলে। যে আদালতে মামলার আদি পত্তন বা প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হয় তাকে আদিপত্তন আদালত বলে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থায় সাধারণত দুই শ্রেণীর আদালত লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর আদালত অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য, অপর এক শ্রেণীর আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী

আইনের ভিত্তিতে বিরোধের মীমাংসা করা মূলত বিচারবিভাগের দায়িত্ব হলেও বিচার-বিভাগকে আরও কতকগুলো মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। সংবিধানকে সংরক্ষণ করা ও এর সঙ্গে কিছু কিছু দায়িত্ব বিচারবিভাগের অঙ্গীভূত হবার জন্য বিচারবিভাগের কাজেরও প্রসার ঘটেছে।

বিচারবিভাগের কার্যাবলী নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. বিচারবিভাগের প্রধান কাজ হল ন্যায়ের ভিত্তিতে সুবিচার করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইনকে ন্যায়ের ভিত্তিতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। এর জন্য বিচারককে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে অপরাধের প্রকৃত ঘটনা ও এর তাৎপর্য নির্ণয় করতে হয় এবং যথাযোগ্য আইন প্রয়োগ করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয়।

২. বিচারক শুধুমাত্র আইন প্রয়োগই করেন না, তিনি আইনের ব্যাখ্যাও করে থাকেন এবং এরূপ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করেন। এইভাবে 'বিচারক প্রণীত আইন' (Judge made laws) সৃষ্টি হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আইনের ভাষা দ্বার্থবোধক বা পরস্পরবিরোধী সেখানে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করা এবং তাকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বিচারক রায় দিয়ে থাকেন। এভাবে আইনের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা এবং তার ভিতর দিয়ে বিচারক প্রণীত আইন সৃষ্টি করা বিচারবিভাগের অন্যতম কাজ।

৩. যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অপরাধ সম্পর্কে আইন নীরব, সেখানে বিচারক চিরন্তন ন্যায়-নীতির আদর্শ বা Equity-র ভিত্তিতে বিচার করেন।

৪. আইনভঙ্গের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আগে থেকেই বিচারালয়ে আবেদন করলে, বিচারক এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলে "নিষেধাজ্ঞা" (Injunctions or Restraining Orders) জারি করে তা রোধ করতে পারেন।

৫. কোন কোন রাষ্ট্রে বিচারবিভাগ সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে। সংবিধানের কোন ধারা বা অংশ ভঙ্গ করে আইনসভা যদি কোন আইন তৈরী করে, সে ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ ঐ আইনকে বা তার অংশ বিশেষকে বাতিল করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়কে শাসনতন্ত্রের

মর্যাদা রক্ষার জন্য এ ধরনের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার (Judicial Review) ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেনে অবশ্য বিচারালয়ের এইরূপ কোন ক্ষমতা নেই। ভারতের বিচারালয় বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা আংশিকভাবে ভোগ করে।

৬. রাষ্ট্রের উচ্চতম বিচারালয়ের নিকট শাসনবিভাগ বা রাষ্ট্রপ্রধান আইনসংক্রান্ত বা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে পারেন, সে ক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। তবে শাসনবিভাগের পক্ষে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। এরূপ পরামর্শদানের ব্যবস্থা সব রাষ্ট্রে প্রচলিত নেই।

৭ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চতম বিচারালয়ের দায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের হাত থেকে অঙ্গরাজ্যগুলোর সংবিধান-নির্দেশিত অধিকারকে সুরক্ষিত করা।

৮. এ সকল ছাড়াও বিচারবিভাগকে কিছু কিছু শাসনবিভাগীয় কাজ করতে হয়। নাবালকের সম্পত্তির অছি (Guardian) নিয়োগ করা, ট্রাস্টি (Trustee) নিয়োগ করা, ঋণগ্রস্ত বা দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক (Receiver) নিয়োগ করা, মৃতের উইলের (Will) অনুমোদন করা ইত্যাদি কাজকর্ম বিচারবিভাগকে করতে হয়।

বত্রিশ : বিচারবিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)

বিচারবিভাগের স্বাধীনতার ওপরই গণতন্ত্রের সাফল্য ও বিচারবিভাগের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কারণ, বিচারকগণ যদি শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারেন তবে তাঁরা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ (যেমন, ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট রাজারা) বিচারালয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদিগকে নির্যাতিত করতেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং গোটা বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হয়। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইংলন্ডে এবং আজও পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে রাজা বা রাষ্ট্র-প্রধান বিচারকগণকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই ঐ সকল ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ বিচারবিভাগের ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হরণ করতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারকে সুনিশ্চিত করে বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা না থাকলে রাষ্ট্রের আইন যতই ভাল হোক না কেন এবং বিচারকেরা যত দক্ষই হোক না কেন, সুবিচার প্রাপ্তির আশা করা যায় না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে।

১. বিচারবিভাগকে প্রভাব মুক্ত রাখা : বিচারবিভাগকে শাসন ও আইনবিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। শাসনকর্তা যদি বিচারবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন বা তিনি যদি শাসক ও বিচারকের দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তবে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা লুপ্ত হতে বাধ্য।

২. বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি : বিচারকগণের নিয়োগের পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। বিচারকগণকে তিনটি উপায়ে নির্বাচন করা যায় : ক. জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, খ. আইনসভার দ্বারা মনোনীত এবং গ. শাসনবিভাগের দ্বারা নিয়োজিত।

ক. কোথাও কোথাও জনগণ দ্বারা বিচারক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হলে যাঁদের ওপর জনগণের আস্থা আছে তাঁরা বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন বটে, কিন্তু বিচারকের আইনজ্ঞান ও দক্ষতা প্রাধান্য লাভ করতে পারে না ; অর্থাৎ বিচারকের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রিয় ব্যক্তির তা নাও থাকতে পারে। তাই জনসাধারণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচনের পদ্ধতিকে লাস্কি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন।

খ. সোবিয়েত ইউনিয়নে আইনসভা উচ্চ আদালতের বিচারকদের নির্বাচন করে। কিন্তু এরূপ বিচারক নির্বাচনেও দলীয় স্বার্থ স্থানীয় স্বার্থ এবং অন্যান্য বিবেচনা প্রার্থীদের যোগ্যতার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে, জনসাধারণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচন করার তুলনায় আইনভা দ্বারা বিচারক নির্বাচন অপেক্ষাকৃত ভাল।

গ. অনেক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগ কর্তৃক আইনজীবীদের মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতি যদিও ত্রুটিপূর্ণ এবং সমালোচনার উর্ধ্বে নয় তা সত্ত্বেও তুলনামূলক বিচারে এই পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য।

৩. কার্যকাল নির্ধারণ ও কার্যে স্থায়িত্ব ঃ কোন কোন রাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিচারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। বিচারকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা এবং অক্ষমতা ও অপরাধের কারণ ছাড়া তাঁদের অপসারণ বন্ধ করতে পারলে বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা থাকে এবং বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা যায়।

৪. অপসারণ পদ্ধতি ঃ বিচারকগণ যদি সৎ, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও দক্ষ না হন তবে তাঁদের নিশ্চয়ই অপসারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অপসারণের ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিচার-বিভাগকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই বিচারককে অপসারণ বা পদচ্যুত করার আগে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচার (impeachment) করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৫. উপযুক্ত বেতন ঃ উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিরা যাতে বিচারক হিসেবে যোগদান করেন এবং সব রকম দুর্নীতি ও হীনতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন তার জন্য বিচারকদের উপযুক্ত বেতন দেওয়া উচিত। বিচারকরা উপযুক্ত বেতন না পেলে তাঁদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হবার আশংকা থাকে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর। কিন্তু লাস্কি মনে করেন যে, বিচারকগণ সাধারণত যে পরিবার এবং শ্রেণী থেকে আসেন তাতে তাঁদের পক্ষে রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে শ্রেণী স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠা বা শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগ করে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বক্তব্য হয়তো সকল সময় এবং সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, বিচারকগণ যথেষ্ট পরিমাণে নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করে থাকেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাঁরা শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারছেন না।

তেত্রিশ ঃ ভারতের বিচারবিভাগ ও এর সংগঠন (Indian Judiciary and its Organisation)

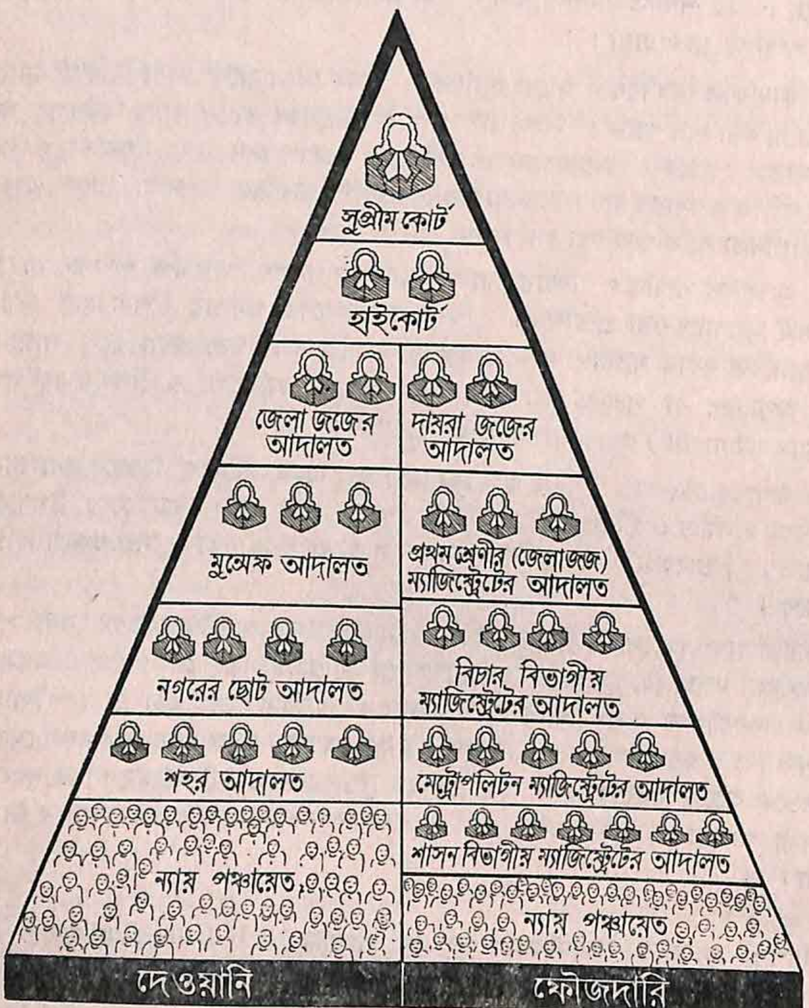
সমগ্র ভারতের জন্য একটিমাত্র বিচার ব্যবস্থা (United or Integrated Judiciary) প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যে স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু ভারত যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে সমগ্র দেশ একটি অখণ্ড বিচারব্যবস্থার অধীন।

ভারতের বিচারব্যবস্থা একটি পিরামিডের আকারে গঠিত। সর্বনিম্নে অসংখ্য ন্যায় পঞ্চায়েত এবং সর্বোচ্চে আছে একটি সুপ্রীম কোর্ট। মাঝখানে আছে শহর আদালত, মুন্সেফ আদালত, জেলা আদালত এবং হাইকোর্ট।

ভারতের বিচারব্যবস্থা দু শ্রেণীতে বিভক্ত—দেওয়ানি ও ফৌজদারি। জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিরোধের বিচার হয় দেওয়ানি আদালতে (Civil Judiciary)। মারামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম প্রভৃতি অপরাধের বিচার হয় ফৌজদারি আদালতে (Criminal Judiciary)—সেখানে মামলার একটি পক্ষ হল সরকার।

ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যাতে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয় সেজন্য একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হ'ল ঃ

ক. অধস্তন বিচারব্যবস্থা
খ. হাইকোর্ট
গ. সুপ্রীম কোর্ট



চিত্রে ভারতের বিচার ব্যবস্থার সংগঠন

এবার উপরোক্ত তিনটি বিচারব্যবস্থা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হ'ল।

চৌত্রিশ ঃ অধস্তন আদালত (Subordinate Courts)

ভারতের অধস্তন আদালত এবং বিচারব্যবস্থাকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি এই দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল।

১। **দেওয়ানী বিচারব্যবস্থা ঃ** এতদিন গ্রামাঞ্চলে দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে ইউনিয়ন কোর্ট ছিল। এগুলোই ছিল সর্বনিম্ন আদালত। ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পরে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েতের অধীনে **ন্যায় পঞ্চায়েত**

কোথাও কোথাও গঠন করা হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সকল জায়গায় ঐ বিচার ব্যবস্থা প্রসারিত করা হচ্ছে। ঐ সকল ন্যায় পঞ্চায়েত ছোট ছোট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার করে।

বড় বড় শহরে এরূপ ছোট ছোট দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য **ছোট আদালত** (Small Causes Court) আছে। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ইত্যাদি মেটরোপলিটন শহরে মাঝারি ধরনের দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য **নগর আদালত** (City Court) আছে। মহকুমা শহরে (কোথাও কোথাও অন্যান্য শহরেও) দেওয়ানি মামলা বিচারের জন্য **মুন্সেফ আদালত** আছে। নির্দিষ্ট অল্প মূল্যের সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা মুন্সেফের আদালতে বিচার হয়। মুন্সেফ আদালতের ওপরে আছে **সাব জজ ও জিলা জজের আদালত**। জেলার বিচার বিভাগের প্রধান হলেন জেলা জজ। মুন্সেফ ও সাব জজের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে আপীল করা হয়।

প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজধানীতে (কোথাও কোথাও একাধিক অঙ্গরাজ্যের জন্য) একটি করে **হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ** আছে। রাজ্যের হাইকোর্টই হল সর্বোচ্চ আদালত। জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে এবং বড় বড় শহরে ছোট দেওয়ানি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়। **সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ** হল দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়। কোন হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোট বা প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে কোথাও আপীল করা চলে না। তবে রাষ্ট্রপতির কাছে দণ্ডিত ব্যক্তি মার্জনা বা দণ্ড হ্রাসের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

২. **ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা ঃ** ফৌজদারি মামলার বিচারের সর্বনিম্ন আদালত হল ন্যায় পঞ্চায়েত। আগেই বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার পর থেকে ন্যায় পঞ্চায়েত ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার করে। এর ওপরে মহকুমা বা জিলা শহরে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট (Judicial Magistrate) ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। এ ছাড়া শাসনবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটরাও কয়েকটি নির্দিষ্ট ফৌজদারি আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার করেন। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরা ম্যাজিস্ট্রেটের সুপারিশে রাজ্য সরকারের বিচারবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হতে পারেন। অভিযুক্ত আসামীকে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও একমাস জেল দিতে পারেন; দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ২০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ছ মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন; প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও দু বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে এবং তাঁর কাছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি বড় বড় শহরে পুলিশ কোর্ট ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ফৌজদারি মামলার বিচার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে আপীলের শুনানী হয় জিলা ও দায়রা জজের কোর্টে; জিলা জজ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারেন। সেই মৃত্যুদণ্ড হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

কোন গুরুতর ফৌজদারি মামলা হলে (যেমন খুন বা অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি) ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শুনানীর পর দায়রা জজের কাছে ঐ মামলা পাঠান। দায়রা জজ জুরীর সাহায্যে ঐ মামলার বিচার করেন। বড় বড় নগরে হাইকোর্টে এ ধরনের মামলার বিচার হয়ে থাকে। ফৌজদারী মামলায় জিলা জজের কোর্টে আপীল করা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পঁয়ত্রিশ ঃ রাজ্যের হাইকোর্ট (High Court)

সংবিধান অনুসারে (২১৪ নম্বর ধারা) প্রত্যেক রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হল সেই রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ। পশ্চিমবঙ্গেও একটি হাইকোর্ট আছে এবং তা কলিকাতায় অবস্থিত। সংবিধানের ২০১ নম্বর ধারায় সংসদকে দুটি অথবা আরও বেশি সংখ্যক অঙ্গরাজ্যের জন্যও একটি

মাত্র হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠারও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সালে রাজ্যপুনর্গঠন আইনানুসারে সংসদ স্থির করে যে, নবপ্রতিষ্ঠিত মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডের জন্য একটি হাইকোর্ট থাকবে।

হাইকোর্টের গঠন

একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে কজন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বলে মনে করেন সে কজন বিচারপতি নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হয়। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন হাইকোর্টে মোট ২৭৮ জন স্থায়ী ও ৫০ জন অতিরিক্ত বিচারপতি আছেন।[১] রাষ্ট্রপতি সর্বাধিক দু বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতিও নিয়োগ করতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল বাষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময়ে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির আদেশে অন্য রাজ্যের হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে উন্নীত হতে পারেন। বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতিদের অন্যরাজ্যে বদলী করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং তাঁদের অন্তত দশ বছর বিচারক হিসেবে অভিজ্ঞতা অথবা এক বা একাধিক হাইকোর্ট আইন-ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

যোগ্যতা

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংবিধানে বিচারকদের অপসারণের এক বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বাষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ হলেও তার আগেই রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিতভাবে আবেদন করে যে-কোন বিচারক পদত্যাগ করতে পারেন। এছাড়া অসদাচারণ, দুর্নীতি ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মতই হাইকোর্টের বিচারপতিগণ পদচ্যুত হতে পারেন। সংসদে আনীত এবং উভয় পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের দু-তৃতীয়াংশের ভোটে অপসারণের প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। তবে বাস্তবে এরূপ করা সহজ নয়।

বিচারকদের অপসারণ

হাইকোর্টের বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের বেতনও আইনসভার ভোটে দেয়া হয় না। হাইকোর্ট অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হলেও সেখানকার আইনসভা হাইকোর্টের সংবিধান ও সংগঠনের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতনের পরিমাণ সংবিধানে নির্দিষ্ট এবং তাঁদের বেতন রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) থেকে দেওয়া হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক ৪০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের বেতন ৩৫০০ টাকা। সংসদীয় বিধান এবং সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের অন্যান্য ভাতা, ছুটি ও সুযোগ সুবিধাও স্থিরীকৃত। বিচারপতি পদে নিয়োগের পরে ঐ সকল সুযোগ-সুবিধার কোন পরিবর্তন করা চলে না।

বেতন

হাইকোর্টের কাজ ও ক্ষমতা

প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট সেই রাজ্যের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ে সর্বোচ্চ আপীল আদালত। তবে, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি প্রেসিডেন্সী শহরগুলোতে অবস্থিত হাইকোর্টের যুগপৎ আপীল ও মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার রয়েছে। মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার থাকার জন্য হাইকোর্ট সরাসরি কোন কোন মামলার বিচার করতে পারে। সংবিধানে রাজস্ব-সংক্রান্ত বিরোধও (যা আগে এই আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল) মৌলিক ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপীল আদালত হিসেবে রাজ্যের নিম্নতম আদালত থেকে প্রেরিত ফৌজদারি এবং অন্যান্য মামলার

১. রাজ্যসভায় ২৭. ৪. ৮১ তারিখে প্রশ্নোত্তর—Statesman, 29.4.81.

শুনানী গ্রহণ করে হাইকোর্ট। যদি হাইকোর্টের বিবেচনায় নিম্ন আদালতে চলতি কোন মামলায় সংবিধান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে বলে মনে হয়, তা হলে হাইকোর্ট ঐ মামলা স্বয়ং বিচার করতে পারে অথবা শুধুমাত্র সাংবিধানিক আইনের প্রশ্নটি বিচার করে মামলার অন্যান্য অংশের বিচারের ভার সংশ্লিষ্ট নিম্নতম আদালতে ন্যস্ত করতে পারে।

হাইকোর্টের ক্ষেত্রাধিকারসমূহের পরিবর্ধন বা সংকোচনের ক্ষমতাগুলো কেন্দ্রীয় সংসদকে দেওয়া হয়েছে। ওপরে উল্লেখিত ক্ষমতাগুলো ছাড়া (সংবিধানের ২২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী) সামরিক ট্রাইব্যুনাল বাদে নিম্নতম আদালতগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্ব করার অধিকারও হাইকোর্টকে দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট হেবিয়াস্ কর্পাস, ম্যান্ডামাস্, প্রহিবিশন, ওয়ারান্টো, সার্টিওয়ারি ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দেশনামা বা লেখ জারী করতে পারে। এ ছাড়া নিজের কর্মচারী নিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতাও হাইকোর্টের আছে।

সুপ্রীম কোর্টের মত হাইকোর্টও অভিলেখ-আদালত (Court of Record)। এর অর্থ হল এই যে, হাইকোর্টের সকল রেকর্ড রক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে তা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। কোন ব্যক্তি যদি আদালত অবমাননা করে কোন উক্তি করেন তবে আদালত অবমাননার অভিযোগে হাইকোর্ট তাকে দণ্ড দিতে পারে।

ছত্রিশ ঃ ভারতের সুপ্রীম কোর্ট (The Supreme Court of India)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে বিভক্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রধানত মিশ্র কাঠামো। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলোর মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিতে পারে। উভয় প্রকার সরকারই লিখিত সংবিধান থেকে ক্ষমতা পায় বটে, কিন্তু ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অথবা কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এরূপ মতবিরোধের সময় সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় এবং সেই ব্যাখ্যা যাতে সকলে মেনে নেয় তার জন্য একটি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান (Authority) থাকা দরকার। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ এরূপ একটি কর্তৃত্বসম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট তাই সংবিধানের রক্ষক। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় কর্তৃক নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা করা ভারতের সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান দিক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের গুরুত্ব

সুপ্রীম কোর্টের গঠন

সংবিধানের ১২৪ নং ধারা অনুযায়ী একজন বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন বিচারপতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠিত হবার কথা। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ বিচারপতির সংখ্যা বাড়াতে পারেন। ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬০ সালে পার্লামেন্টের নতুন আইনে প্রধান বিচারপতিসহ বিচারপতির সংখ্যা যথাক্রমে ১১ জন ও ১৪ জন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। *Supreme Court (Number of Judges) Act '76* দ্বারা বিচারপতির সংখ্যা আরও চারজন বৃদ্ধি করা হয়। **বর্তমানে সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং ১৭ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত।** সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন [১২৪(২) নম্বর ধারা]। নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টের যে সকল বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করবেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। সুপ্রীম কোর্টের

নিয়োগ

প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে কার্যত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যোগ্যতা

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হতে হলে কতকগুলো যোগ্যতা থাকা দরকার। তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হয় এবং একজন খ্যাতনামা আইনজ্ঞ হতে হয়। কোন হাইকোর্টে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য বিচারপতি থাকতে হয়, অথবা কোন হাইকোর্ট বা একাধিক হাইকোর্টে দশ বছর একটানা ওকালতি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়।

অপসারণ

আমাদের দেশে সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা কয়েকটি উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য সংবিধানে কোন নিম্নতম বয়সের সীমা উল্লেখ করা হয়নি, তবে একবার নিয়োগের পরে বিচারপতিগণ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকেন। সংবিধান নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে বিচারকদের পদচ্যুত করা যায় না। একমাত্র নিজ হাতে লিখিত পদত্যাগপত্র পেশ করলে এবং তা গৃহীত হলে বিচারক পদত্যাগ করতে পারেন। সংসদের উভয় কক্ষে কোন বিচারপতির অসদাচরণের জন্য অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে সেই বিচারপতি অপসারিত হন।

বেতন ও চাকরির শর্ত

বিচারপতিদের বেতন সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট। প্রধান বিচারপতি প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ ৪০০০ টাকা বেতন পান। বিচারকদের বেতন দেয়া হয় দেশের সংরক্ষিত তহবিল থেকে, বেতনের পরিমাণ এবং চাকরির শর্ত সংসদের ভোটাভুটির ওপর নির্ভর করে না। সংবিধানের ১২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, বিচারকদের চাকরির শর্ত; সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার তাঁদের নিযুক্ত হবার পর আর বদল করা যাবে না। একমাত্র আর্থিক জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতির আদেশবলে বিচারকদের বেতন হ্রাস করা যেতে পারে। সংবিধান প্রণেতারা এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন।

সুপ্রীম কোর্টের এলাকা, কার্যাবলী ও ক্ষমতা

পৃথিবীর বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় এবং অঙ্গরাজ্যের আদালতগুলো স্বাধীন। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্য সংক্রান্ত—এই দু কাঠামোতে বিচারব্যবস্থা বিন্যস্ত। কিন্তু ভারতের বিচার-সংগঠন এককেন্দ্রিক ধরনের, পিরামিডের সঙ্গে তুলনীয়। সুপ্রীম কোর্ট এই পিরামিডের চূড়ায় অবস্থিত, সুতরাং এর ক্ষমতাও অসামান্য। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট একটি অভিলেখ আদালত (Court of Record)। নিজের অবমাননার জন্য ইহা দণ্ড প্রদান করতে পারে।

সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের তিনটি ক্ষেত্রাধিকারের (jurisdiction) কথা বলা হয়েছে ঃ

১. মূল এলাকা (Original),

২. আপীল এলাকা (Appellate),

৩. পরামর্শ দান এলাকা (Advisory)

৪. সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারী করতে পারে (to issue directions, orders or writs)।

১. মূল এলাকা

সংবিধানের ১৩১ নম্বর ধারায় সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার ক্ষমতাসমূহ বর্ণিত হয়েছে ঃ ১. কেন্দ্র এবং এক বা একাধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে বিরোধ; ২. একদিকে কেন্দ্র এবং এক বা একাধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিরোধ এবং ৩. এক বা একাধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সংকোচন বা সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে যদি বিবাদ বাধে, তবে তা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকার বিষয় বলে গণ্য হবে—ভারতের অন্য কোন আদালতে তার বিচার হতে পারে না। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্ট ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোর সংরক্ষক। ঐ মৌলিক অধিকারগুলো-সংক্রান্ত

বিবাদ মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত, তবে রাজ্যের হাইকোর্টগুলোকেও এ বিষয়ে কিছু কিছু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

মৌলিক এলাকার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে ; যেমন ক. কোন অঙ্গরাজ্য জড়িত আছে এমন কোন চুক্তি, সংসদের কোন বিধান, আন্তঃরাজ্য জল-বিরোধ, অর্থ কমিশনের কাছে বিচারের জন্য প্রেরিত আর্থিক বিষয় সুপ্রীম কোর্টের ক্ষেত্রাধিকারের বাইরে। খ. নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও একমাত্র আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্যই সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা যায়, কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিরোধের মীমাংসা এখানে করা যায় না।

২. আপীল সংক্রান্ত এলাকা

সুপ্রীম কোর্টের আপীল এলাকাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ ক. সাংবিধানিক আপীল, খ. দেওয়ানি মামলা-সংক্রান্ত আপীল এবং গ. ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত আপীল।

ক. সাংবিধানিক আপীলঃ কোন মামলায় হাইকোর্টের রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায় যদি হাইকোর্ট এই মর্মে সুপারিশ (certificate) করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে। হাইকোর্ট এরূপ কোন সুপারিশ করতে অস্বীকার করলে সুপ্রীম কোর্ট এই ধরনের আপীলের বিচারের জন্য বিশেষ অনুমতি (special leave) দিতে পারে।

খ. দেওয়ানি আপীলঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট থেকে দেওয়ানি মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্টে পেশ করা যায় যদি হাইকোর্ট এই মর্মে সুপারিশ করে যে, ঐ মামলায় কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা জড়িত আছে, অথবা অন্য কোন কারণে আলোচ্য বিরোধটি সুপ্রীম কোর্টে বিচারের যোগ্য। তবে যদি নিম্নতর আদালতের রায় হাইকোর্টও বহাল রাখে তা হলে আপীল পাঠাবার জন্য হাইকোর্টকে আরও সুপারিশ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় গুরুতর আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে।

গ. ফৌজদারি আপীলঃ ফৌজদারি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় যদি হাইকোর্ট কোনো আসামীর মুক্তির আদেশ রহিত করে অথবা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিংবা নিম্নতর আদালতে বিচার চলাকালীন কোন মামলা সরাসরি তুলে এনে আসামীকে অভিযুক্ত এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, কিংবা মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে পুনর্বিবেচনার যোগ্য—এই মর্মে হাইকোর্ট সুপারিশ করে।

এ ছাড়াও ১৩৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের ইচ্ছামত আপীল-সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার পরিবর্ধনের সুযোগ রয়েছে। কেবলমাত্র প্রতিরক্ষাবাহিনীর জন্য আইন বলে সংগঠিত ট্রাইবুনাল ছাড়া অন্য যে কোন আদালতে চলতি যে-কোন মামলার আপীলের জন্য সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ অনুমতি (special leave) দিতে পারে। আবার ১০৮ নম্বর ধারা অনুসারে সংসদ সুপ্রীম কোর্টের এলাকা বা ক্ষেত্রাধিকার কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত সকল বিষয়ে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগপৎ সম্মতিক্রমে অন্য যে-কোন বিষয়ে সম্প্রসারিত করতে পারে।

ক্ষেত্রাধিকার পরিবর্ধনের সুযোগ

৩. সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ দান-সংক্রান্ত এলাকা

পরামর্শদান সংক্রান্ত এলাকা সম্পর্কে সংবিধানের ১৩৪ নম্বর ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। সাংবিধানিক আইন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন ও তথ্যের প্রশ্নে (questions of law and fact) রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শের জন্য কোন বিষয় পাঠাতে বাধ্য নয়। আবার রাষ্ট্রপতি কোন বিষয় পাঠালে এবং সে ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্ট কোনপরামর্শ দিলে ঐ পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক কি না সে বিষয়েও সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

পরামর্শদান সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার

৪. সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারীর ক্ষমতা

সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো যাতে বলবৎ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের জন্য সুপ্রীম কোর্টকে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ (Hebeus Corpus), চরমাদেশ

(Mandamus), আদালত প্রতিষেধ (Prohibition), অধিকার পৃচ্ছা (Quo-Warranto) এবং উৎপ্রেষণ (Certiorari) এই পাঁচটি লেখ (Writs) ও আদেশ জারীর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য ক্ষমতা

সবশেষে, সুপ্রীম কোর্টের আরো কয়েকটি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুপ্রীম কোর্টে গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যান্য সকল বিচারালয় মানতে বাধ্য। সুপ্রীম কোর্টের রায় ভারতের সকল হাইকোর্ট বা অন্যান্য নিম্ন আদালতে নজিররূপে গৃহীত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকেরা যে সকল রায় দেন তা আইনরূপে গণ্য হয়। অবশ্য প্রয়োজন বুঝলে ও ইচ্ছা হলে সুপ্রীম কোর্ট পরবর্তী মামলায় নিজেদের রায় পরিবর্তন করে নূতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের যেরূপ ব্যাখ্যা করবে তাই সবাই মানতে বাধ্য। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়ক কাজ করতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুপ্রীম কোর্ট কোন কোন বিষয়ে আইনসভা ও শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাধান্য

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ৪২তম সংশোধনী আইনে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস করা হয়েছিল। ৪৩তম ও ৪৪তম সংবিধান সংশোধন আইন ঐ সকল ক্ষমতার কিছু কিছু আবার সুপ্রীম কোর্টকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা ও স্থান

ভারতের শাসনব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচারালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য হল আইনসমূহ যথাযথভাবে প্রযুক্ত ও প্রতিপালিত হচ্ছে কি না এবং কোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থীকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এ উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টকে একটি এককেন্দ্রিক বিচার সংগঠনের শীর্ষদেশে আসন দেয়া হয়েছে, যতদূর সম্ভব এর স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর মূল উদ্দেশ্যগুলোকে কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। দেশের সমগ্র বিচার সংগঠনের শীর্ষদেশে থাকায় সুপ্রীম কোর্ট ঐক্যবন্ধনের সহায়ক (**unifying force**)। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত আইন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত দেশের সকল বিচারালয় মেনে নিতে বাধ্য। ফলে সারা দেশে এক সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বোপরি সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধান সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সংবিধান সংরক্ষণের দুটি তাৎপর্য : ১. যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধানে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সকল বিরোধের মীমাংসা করা এবং ২. নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করা।

সংবিধান সংরক্ষণ : মৌলিক অধিকার রক্ষা

এ দুটি কাজ করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই প্রণীত আইনসমূহের বৈধতা পরীক্ষা করতে হয়। একে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা (**Judicial Review**) বলে।

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বা **Judicial Review** কাকে বলে তা জানা প্রয়োজন। সোবিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড বা ব্রিটেন ইত্যাদি দেশের সংবিধানে স্পষ্ট করে লিখিত আছে বা প্রথা আছে যে, দেশের বিচারবিভাগ সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ঐ সকল দেশের আইনসভা যে কোন আইনই পাশ করুক না কেন, আদালত বলতে পারে না যে ঐরূপ আইন করিবার ক্ষমতা আইনসভার আছে কিনা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধান ব্যাখ্যা করার বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেখা হয়েছে। সেখানে, *the Constitution comes to mean what the Court says it means*. এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি মার্শাল বলেছেন যে, আমরা সংবিধানের অধীন, কিন্তু বিচারকেরা সংবিধানের যে ভাষ্য দেন তাই সংবিধান

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বা জুডিসিয়াল রিভিউ

(**We are under a constitution, but the constitution is what the judges say it is**) অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় বা অংগরাজ্যের কোন আইন দ্বারা সংবিধানে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে অথবা সংবিধানের নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে, তবে সুপ্রীম কোর্টে ঐ মর্মে মামলা উপস্থাপিত করলে রায় দেবার সময়ে সুপ্রীম কোর্ট ঐ আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের সঙ্গে সংগতি না থাকলে কোন আইন বৈধ হতে পারে না এবং ঐরূপ সংগতি আছে কি না তা বিচার করার ভার সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যস্ত। বিচারবিভাগ কর্তৃক কোন আইনের বৈধতা বিচারের এই ক্ষমতাকে 'জুডিশিয়াল রিভিউ' বলে।[1] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার কিছু ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আছে।

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা একেবারে পূর্ণ নয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা এত ব্যাপক যে, কংগ্রেসের অনেক প্রগতিশীল আইন সেখানকার সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। বিচারকদের রক্ষণশীল মতামত বা রাজনৈতিক প্রবণতা নূতন ও প্রগতিশীল আইন প্রণয়নে বাধা দিয়েছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও জমিদারী উচ্ছেদ আইনগুলোকে সংবিধান বিরোধী বলে রায় দিয়েছিল। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ফলে আইনসভার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং বিচারবিভাগ সার্বভৌম হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে বিচারবিভাগকে সার্বভৌম মনে করা হয় না। সেজন্য আমাদের দেশের সংবিধানে বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার সঙ্গে কতকগুলো রক্ষামূলক ব্যবস্থাও (**safeguard**) গৃহীত হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ৪২তম সংশোধনী আইনে কেন্দ্রীয় এবং অংগরাজ্যের আইনসভা প্রণীত কোন আইনের সাংবিধানিক যাথার্থ্য বিচার করার ক্ষমতা থেকে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তবে ৪৪তম সংশোধনী আইনে ঐ ক্ষমতা বিচারালয়কে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা (**guardian and interpteter of the constitution**)। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যের সরকার নিজ নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে কাজ করে কি না তা দেখার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা সুপ্রীম কোর্টের। সাংবিধানিক উপায় বহির্ভূত ভাবে কোন কাজ করা হলে বা কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তা প্রতিকার করে সুপ্রীম কোর্ট। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হল সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা। সংবিধানের যে ব্যাখ্যা সুপ্রীম কোর্ট দেবে তাই চরম এবং চূড়ান্ত।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ব্যাপক ক্ষমতা ও সাংবিধানিক ভূমিকা লক্ষ্য করে শ্রীদুর্গাদাস বসু যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, পৃথিবীর যে কোন দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে চরিত্র এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা বেশি (**…the jurisdiction and powers of our Supreme Court are in their nature and extent wider than those exercised by the Highest Court of any other country**)।

সাঁইত্রিশ : আমলাতন্ত্র (The Bureaucracy)*

সরকারের কর্মচারীদের, বিশেষ করে এর উপরতলাকে আমলা বা Bureaucrates নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হবার জন্য এবং জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা গৃহীত হবার ফলে সরকারের কাজকর্মের বহুল প্রসার ঘটেছে। স্বভাবতই এর জন্য

---

১. ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে একটি মামলার রায় দান প্রসংগে বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "A statute or law to be valid must in all cases be in conformity with the constitutional requirements and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not."

* ত্রিপুরা মাধ্যমিক বোর্ড-এর (+2) অধীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য।

সরকারী কর্মচারী বা আমলাদের সংখ্যা, দায়িত্ব, কাজকর্ম এবং গুরুত্বও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যুরোক্র্যাসী বা আমলাতন্ত্র কথাটির অর্থ ব্যুরো দ্বারা পরিচালিত সরকার (Government by Bureau or Desk Government)। সরকারী ক্ষমতাকে বিভিন্ন ব্যুরো বা বিভাগ কর্তৃক কেন্দ্রীভূত রাখা এবং সরকারী কাজে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অত্যধিক হস্তক্ষেপকে আমলাতন্ত্র নামে অভিহিত করা হয় (Bureaucracy signifies the concetration of administrative power in bureaus or departments and the undue interference by officials in matters outside the scope of state interference)। আমলা কথাটি দ্বারা যদিও সাধারণভাবে সরকারী কর্মচারীদের বোঝায়, তথাপি এই শব্দটির মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা, দীর্ঘসূত্রতা এবং ইচ্ছামত কাজকর্ম করার কিছুটা ইঙ্গিত নিহিত আছে। তাই এফ. এম. মার্কস (F. M. Marx) বলেছেন যে, 'আমলা' কথাটি বিকৃত হয়ে বর্তমানে কুৎসিত, খেয়ালখুশি, অপব্যয়, দপ্তরঘেঁষা অর্থে ব্যবহার করা হয় (through distortion and caricature the term 'bureaucracy' has come to imply bungling, arbitariness, wastefulness, officiousness and regimentation)। আবার অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি বোঝাবার জন্য আমলা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

আমলাতন্ত্র কাকে বলে ?

যাহোক, F. M. Marx চারটি বিভিন্ন অর্থে 'আমলা' শব্দটির ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। ঐগুলো হ'লঃ

বিভিন্ন অর্থে এর প্রয়োগ

১. আমলাতন্ত্র সরকারী প্রশাসন পরিচালনার জন্য সংগঠনের একটি রূপ। ই. এন. গ্ল্যাডেনের (E. N. Gladden) ভাষায় বলা যায় যে, আমলাতন্ত্র হ'ল বিভিন্ন দপ্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা সংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা।[১]

২. অনেকে মনে করেন যে, আমলাতন্ত্র হল উত্তম প্রশাসনকে ব্যর্থ করার একটি অসুস্থ সাংগঠনিক রূপ। লাস্কি এই মতের সমর্থন করে বলেছেন যে, আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল প্রশাসনিক নির্ঘণ্টের (routine) প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দান, নমনীয়তা বিসর্জন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা বিলম্ব এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রহণে অনীহা।

৩. বর্তমান যুগে সরকারের কাজের পরিধি অত্যন্ত প্রসারিত এবং একে বলা হয় বৃহদায়ত সরকার বা *Big Government*। বৃহদায়তন সরকার মানেই আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের এই ব্যাপক ভূমিকার জন্য বর্তমান যুগের রাষ্ট্রকে প্রশাসনিক রাষ্ট্র (Administrative State) আখ্যা দেয়া হয়েছে।

৪. আমলাতন্ত্রকে সরকারী কর্মচারীদের নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সরকার নামে অভিহিত করা হয়। (Government by the Civil Service for its own aggrandisement)। ফলে অনেকে আমলাতন্ত্রকে জনগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট করার হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেন।

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) আমলাতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেনঃ ১. সংগঠনের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করা ; ২. যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার জন্য ক্ষমতা বণ্টন ও ক্ষমতা অর্পণ করা ; ৩. উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা ; ৪. কর্তৃত্বের স্তরক্রম বা হায়ারার্কিকাল (Hierarchical) নীতিতে সংগঠন গড়ে তোলা ; ৫. মানবিক সমস্যা অবহেলা করে লিখিত নথিপত্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া ; ৬. কাজ পরিচালনার জন্য বাঁধা-ধরা নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রচনা করা ও ঐ নিয়মের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক (formal) ভাবে চলা।

---

১. "A regulated administrative system organized as a series of interrelated offiees."
—E. N. Gladden.

লাস্কি বলেছেন, সরকারী কৃত্যকের প্রধান বিপদ আমলাতন্ত্র। তাঁর মতে আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে দুটি কারণে ঃ প্রথমত, সকল ব্যাপারে অত্যধিক অনমনীয়তা অনুসরণ করা ; এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত দক্ষতা বা অন্যান্য গুণ বাদ দিয়ে নিছক চাকরির কাল (seniority) অনুযায়ী প্রমোশন দেয়ার নীতি গ্রহণ করা।

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে শুধু পণ্ডিতদের কেন সাধারণ মানুষেরও অভিযোগের শেষ নেই। আমলাতন্ত্র মানে যান্ত্রিকতা, লাল ফিতার বন্ধন, হৃদয়হীন প্রশাসন—এটাই অনেকের নির্মম অভিজ্ঞতা। সরকারী কৃত্যকের একটা অংশের যান্ত্রিকতা, অনমনীয়তা, হৃদয়হীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনাবশ্যক বিলম্ব, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি কারণে সরকারী কৃত্যককে আমলাতন্ত্র নামে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা যায়। এই সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়, এর অনেকটাই সত্য। কিন্তু সরকারী প্রশাসনে, বিশেষ করে সরকারী বিরাট কর্মযজ্ঞে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। হার্বার্ট মরিসন (Herbert Morrison) তো আমলাতন্ত্রকে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুরস্কার (Bureaucracy is the price of Parliamentary Democracy) নামে অভিহিত করেছেন। আমলাতন্ত্রের ত্রুটি আছে, অথচ সরকারের এই ব্যাপক প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য দক্ষ অভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ হাজার হাজার কর্মী প্রয়োজন—এ দুটি চরম সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। মানুষের জন্য প্রশাসন, নিছক প্রশাসনের জন্য প্রশাসন নয়—এই নীতি এবং আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে উঠবে। এর জন্য প্রয়োজন আমলাতন্ত্রের সংস্কার। যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমলাতন্ত্র যদি কিছুটা পরিমাণে অনমনীয়তার পরিবর্তে নমনীয়, যান্ত্রিকতার পরিবর্তে মানবিক এবং হৃদয়হীনতার পরিবর্তে হৃদয়বান হয়ে ওঠে তবে হয়তো আমলাতন্ত্রের অনেক ত্রুটি দূরীভূত হবে।

আমলাতন্ত্রের নমনীয়, মানবিক ও হৃদয়বান হওয়া উচিত

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব

প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে সরকারের ব্যাপক এবং বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কর আদায় করা, হিসাব রক্ষা করা, হিসাব পরীক্ষা করা, কলকারখানা পরিচালনা করা ও পরিদর্শন করা, জনসংখ্যা নির্ধারণ করা, ডাক ও তার বিভাগ সচল রাখা, রেলের চাকাকে গতিশীল রাখা ইত্যাদি হাজার হাজার ধরনের কাজ সরকারকে করতে হয় এবং ঐ সকল বিবিধ ধরনের কাজ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ও আমলা আবশ্যক। এরাই সরকারের গৃহীত নীতিকে বাস্তবে রূপ দেয়, সরকারের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে, সর্বত্র আইন-শৃংখলা রক্ষা করে আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত আমলা বাদে, সরকারী কর্মচারী বাদে কোন প্রকৃত সরকারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

সরকারী কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা

ভারত শাসিত হয় আমাদের রাষ্ট্রপতির নামে, ব্রিটেন শাসিত হয় সেখানকার রানীর নামে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাসিত হয় সেখানকার রাষ্ট্রপতির নামে। কিন্তু সরকারের নীতি নির্ধারণ, নীতি কার্যকর করা এবং দৈনন্দিন প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ কতটুকু ? সত্যিকথা বলতে কি উপরোক্ত প্রশাসনিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই বলা চলে। তবে কি মন্ত্রীরা সকল কিছু করেন ? মন্ত্রীদের বলা হয় রাজনৈতিক প্রশাসক (political executive) বা শৌখিন ও অপেশাদার (amateur) প্রশাসক। নির্বাচনে জয়ী হয়ে মন্ত্রিত্ব লাভ করে তাঁরা কিছুদিনের জন্য প্রশাসক হয়ে বসেন। মন্ত্রীদের মধ্যে কারো কারো ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগেরই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকলেও রাজনৈতিক আবর্তে এত বেশি তাঁরা জড়িত থাকেন যে, প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের অবসর থাকে না। সখ মিটলে বা মন্ত্রিত্ব চলে গেলে তাঁরা আবার নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে যান। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে, সরকারের নামে প্রতিটি দেশে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলে তা সম্পন্ন করার স্থায়ী দায়িত্ব কারা গ্রহণ করে।

প্রতিটি দেশে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে আমলারা। এঁরা মন্ত্রীদের মত অস্থায়ী ও অপেশাদার প্রশাসক নয়, এঁরা স্থায়ী এবং দক্ষ প্রশাসক। সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করা থেকে শুরু করে নীতি প্রয়োগ এবং সরকার নামক যন্ত্রকে সচল রাখার ব্যাপারে এঁদের নিরলস ভূমিকা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।

বস্তুত, বর্তমান যুগে সরকার মানেই হল পেশাগত প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত সরকার (**Government by professional administrators**)। সরকার পরিচালনায় আমলাতন্ত্রের গুরুত্বের মূল কারণ দুটি। প্রথমত, মুষ্টিমেয় অস্থায়ী ও অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রশাসক বা মন্ত্রীদের পক্ষে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, সরকারী কৃত্যকের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা ও স্থায়িত্ব প্রশ্নাতীত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে রাজনৈতিক প্রশাসকদের নেতিবাচক ভূমিকা এবং অন্যদিকে স্থায়ী প্রশাসকদের অস্তিবাচক ভূমিকা আমলাতন্ত্রকে গুরুত্ব দান করেছে।

লাস্কি যথার্থই বলেছেন যে, রাজনৈতিক প্রশাসকদের কাছে প্রশাসনটা একান্ত ভাবেই শৌখিন ব্যাপার যেহেতু তাঁরা অপেশাদার। তাঁদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগের মানদণ্ড দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা নয়, নিয়োগ ঘটে একান্তভাবে রাজনৈতিক কারণে। স্বভাবতই যে দপ্তরের প্রশাসনে তাঁরা নিযুক্ত হন সে ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা থাকে সামান্য। তাঁরা স্থায়ী নয়। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ অথবা দপ্তর পরিবর্তন প্রায় ঘটে বলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সময় ও সুযোগও তাঁদের থাকে না। এককথায় বলা যায়, এঁরা রাজনীতিতে যতই দক্ষ হন না কেন, প্রশাসনিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং অপেশাদার।[১]

অন্যদিকে প্রশাসন ক্রমশ টেকনিক্যাল (**technical**) এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ে পরিণত হয়ে উঠছে। তাই প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন—যা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে পারে। আমলারা প্রশাসনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় এবং স্থায়িভাবে এই কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা প্রশাসনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এ ছাড়া নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা তাঁদের বিচারবুদ্ধিকে যুক্তিসঙ্গত পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। ফলে সরকারী প্রশাসন পরিচালনায় তাঁরা অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। আমলারা যদি একটি দিনের জন্যও কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে সরকারের অস্তিত্ব অন্তত ঐ দিনের জন্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিগত একশ বছর এবং বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে জনপ্রশাসন বা সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমলাদের গুরুত্ব ও ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সরকারী কাজকর্মের পরিধি অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে আমলাদের কার্য-পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পরে ভারতে সরকারী কাজকর্ম ও সরকারী ব্যয় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবার জন্য আমলাদের সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনতান্ত্রিক দেশেও—যেখানে সরকারী কাজ ও উদ্যোগ সীমিত, সেখানেও সরকারের ব্যয় ঐ সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ বেড়েছে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে। এই সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও মর্যাদার ব্যাপক বৃদ্ধি লক্ষ্য করে অনেকে বলেছেন যে 'এই সকল দেশের সার্বিক উন্নতির দায়িত্ব বস্তুত আমলাদের হাতেই সমর্পিত হয়েছে.' আধুনিককালে প্রতিটি রাষ্ট্রেই আমলাতন্ত্র সরকারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং আমলাতন্ত্র বাদে কোন সরকারের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দিচ্ছে।

---

১. "The hallmark of democracy is dominance of government by politicians popularly oriented, chosen and accountable, and those skilled in popular politics are inevitably amateurish in everything else."

—Paul H. Appleby

নমুনা প্রশ্ন

1. আধুনিক সরকারের কাজকর্ম তিনভাগে বিভক্ত—আইন, শাসন ও বিচার—আলোচনা কর। (এক দেখ)
2. সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলো কি কি? এদের কার্যাবলী আলোচনা কর। (এক, চার, আঠার এবং সাতাশ দেখ) [T. S. B. '79]
3. ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি আলোচনা কর। ঐ নীতি কি গ্রহণযোগ্য এবং কাম্য? (দুই দেখ) [H. S. C. '78]
4. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। 'কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপর নয়; বাঞ্ছনীয়ও নয়।' উদাহরণ সহ উক্তিটি আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '80]
5. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। 'পূর্ণ ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নহে' এই মত কি তুমি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। (দুই দেখ) [H. S. C. '84]
6. সরকারের শাসনবিভাগ বলতে কি বোঝ? আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। (চার দেখ) [T. S. B. '79] [H. S. C. 80]
7. এক-শাসক ও বহু-শাসক কাকে বলে? (ছয় দেখ)
8. এক-শাসক ও বহু-শাসকের পার্থক্য নির্ণয় কর। এদের দোষগুণ আলোচনা কর। (ছয় দেখ) [H. S. C. '84]
9. ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? (আট দেখ)
10. ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসমূহ আলোচনা কর। (আট দেখ)
11. ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী বিষয়ক ক্ষমতাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর। (আট দেখ) [T. S. B. '79 and H. S. C. '85]
12. ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। (আট, নয় ও দশ দেখ) [H. S. C. '78, '81 and '83]
13. ভারতের রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। ভারতের রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হতে পারেন? (আট, নয় এবং এগার দেখ)
14. ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (আট দেখ) [H. S. C. '80, T. S. B. '79]
15. ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে টীকা লিখ। (চার দেখ)
16. কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। (তের দেখ)
17. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর। (চৌদ্দ দেখ) [H. S. C, '80 and '85]
18. অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও ভূমিকা আলোচনা কর। (ষোল ও সতের দেখ) [H. S. C. '79, '81 '83 and '85 and T. S. B. '79]
19. অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা কর। (উনিশ ও কুড়ি দেখ)
20. 'মুখ্যমন্ত্রী অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসক'—আলোচনা কর। (কুড়ি দেখ) [T. S. B. '80]
21. অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (আঠার দেখ)
22. দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কাকে বলে? এর পক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তি আলোচনা কর। (বাইশ দেখ) [H. S. C. '79 '81 and '84]
23. ভারতের পার্লামেণ্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (তেইশ ও চব্বিশ দেখ) [H. S. C. '78, '81 and '83] [H. S. C. 84]
24. রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর। (বিশ দেখ) [T. S. B. '79]
25. পার্লামেন্ট কি ভাবে মন্ত্রিপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে? (একুশ দেখ)
26. ভারতের পার্লামেন্টের দু কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। (সাতাশ দেখ) [H. T, C. '80]
27. লোকসভার স্পীকার সম্পর্কে টীকা লিখ। (ছাব্বিশ দেখ)
28. ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। (ত্রিশ দেখ)
29. অর্থবিল কাকে বলে? ইহা কি ভাবে পাশ করা হয়? (ত্রিশ দেখ) [T. S. B. 80]

30. পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা আইনসভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (আঠাশ দেখ)

31. পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা আইনসভায় কি ভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়? আলোচনা কর। (উনত্রিশ দেখ) [T. S. B. '79]

32. অঙ্গরাজ্যে বিধান পরিষদ গঠনের যৌক্তিকতা বিচার কর। (উনত্রিশ দেখ)

33. বিচার বিভাগের গঠন, কার্যাবলী ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (একত্রিশ দেখ) [H. S. C. '79]

34. বিচারবিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব কি এবং ইহা কি ভাবে রক্ষা করা যায় আলোচনা কর। (বত্রিশ দেখ) [H. S. C. '79 and '85]

35. ভারতের বিচারবিভাগের একটি রূপরেখা দাও। (তেত্রিশ দেখ)

36. "সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক"—আলোচনা কর। (ছত্রিশ দেখ)

37. ভারতের অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। (পঁয়ত্রিশ দেখ)

38. ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও বিভিন্ন কার্য আলোচনা কর। (ছত্রিশ দেখ) [T. S. B. '79 and H. S. C. '84]

39. ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন এবং কিভাবে তাঁদের পদচ্যুত করা হয়? (ছত্রিশ দেখ) [H. S. C. '79, and '83]

40. হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের পদ্ধতি আলোচনা কর। (পঁয়ত্রিশ দেখ) [T. S. B. '79]

41. অঙ্গরাষ্ট্রের হাইকোর্টের ক্ষমতা আলোচনা কর। (পঁয়ত্রিশ দেখ) [H. S. C. '85]

42. আধুনিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকার ওপর টীকা লিখ। (সাঁইত্রিশ দেখ) [T. S. B. '79]

43. ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সম্পর্ক আলোচনা কর। (দশ দেখ)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(i) সরকারের তিনটি বিভাগের নাম লিখ। (**শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচার বিভাগ**)

(ii) ভারতের সর্বোচ্চ শাসক কোন্ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন? (**রাষ্ট্রপতি পদে**)

(iii) অঙ্গরাজ্যগুলোর সর্বোচ্চ আদালতের নাম কি? (**হাইকোর্ট**)

(iv) কোন্ কোন্ ধারায় ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন? (**৩৫২, ৩৫৬ এবং ৩৬০ নম্বর ধারা**)

(v) ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের এলাকাগুলো কি কি? (**মূল এলাকা, আপীল এলাকা ও পরামর্শদান এলাকা**) [H. S. C. '78]

(vi) লোকসভার নেতা কে? (**প্রধানমন্ত্রী**)

(vii) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কয়টি স্তরে বিভক্ত? (**তিনটি**)

(viii) ভারতীয় সংসদ কটি কক্ষে বিভক্ত? ঐ কক্ষগুলোর নাম লিখ। (**দুটি কক্ষে—লোকসভা ও রাজ্যসভা**)

(x) ভারতের রাষ্ট্রপতি কার দ্বারা নির্বাচিত হন? (**সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ দ্বারা**) [H. S. C. '79]

(xi) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রধান প্রবক্তা কে? (**মন্তেস্কু**) [H. S. C. 79]

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও:

(i) ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে? (**রাষ্ট্রপতি**) [T. S. B. '79]

(ii) রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা কত? (**অনধিক ২৫০ জন**) [T. S. B. '79]

(iii) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা কত? (**৬৫ বছর**) [T. S. P. '79]

(iv) ভারতের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত, না সংসদীয় সরকার? (**সংসদীয় সরকার**) [T. S. B. '79]

(v) ত্রিপুরা / পশ্চিমবঙ্গ এককক্ষবিশিষ্ট, না দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ? (এককক্ষবিশিষ্ট) [T. S. B. '79]

3. বন্ধনীর মধ্য হইতে সঠিক শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(i) 1748 সালে প্রকাশিত —— পুস্তকে মন্তেস্কু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আলোচনা করেন। (লেভিয়াথান, লেকচারস্ অন জুরিসপ্রুডেন্স, দ্য স্পিরিট অব্ ল) গ্রন্থে।

(ii) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন একটি —— আছে। (সংসদ, মন্ত্রিসভা, কমিটি)

(iii) ভারতের রাষ্ট্রপতি —— বছরের জন্য নির্বাচিত হন। (চার, পাঁচ, ছয়)

(iv) অঙ্গরাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা সংবিধানের —— নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করতে পারেন। (৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০)

(v) রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে তাঁর কাজ পরিচালনা করেন ——। (স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি)

(vi) রাজ্যপাল প্রকৃত শাসক নন, তিনি —— শাসক। (রাজনৈতিক, নিয়মতান্ত্রিক)

(vii) লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা —— পদে নিযুক্ত হন। (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার)

(viii) অঙ্গরাজ্যের আইনসভার নেতাকে —— বলে। (রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী)

(ix) লোকসভা অনধিক —— জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। (৫০০, ৫২৫, ৫৪৫)

(x) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন —— (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী)

(xi) লোকসভার আয়ুষ্কাল —— বৎসর (৪, ৫, ৬) [H. S. C. '79]

4. বন্ধনীর মধ্যের সঠিক উত্তরে ✓ টিক দাও ঃ

(i) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রধান প্রবক্তার নাম (হব্‌স্, হেগেল, রুশো, মন্তেস্কু) [H, S. C. '79]

(ii) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকর হয়েছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে)

(iii) পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (সম্ভব, সম্ভবপর নয়) [H. S. C. '83]

(iv) বহুশাসক প্রথা দেখা যায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ভারতে, সুইজারল্যান্ডে)

(v) ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রকৃত শাসক, নিয়মতান্ত্রিক শাসক)

(vi) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন (সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ, সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং সকল রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ) [T. S. B. '79 and H. S. C. '78]

(vii) ভারতে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর বয়স (21, 24, **35**) বৎসরের অধিক হতে হবে।

(viii) হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন (রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি)

(ix) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, রাজ্যপাল)।

(x) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যৌথভাবে (রাষ্ট্রপতি, লোকসভা) এর কাছে দায়ী থাকে।

(xi) প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন (সংসদ, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা)

(xii) অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ, রাজ্যবিধানসভা, রাজ্যমন্ত্রিসভা) কর্তৃক নিযুক্ত হন। [H. S. C. '78 and '85 and T. S. B. '79]

(xiii) অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন (রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী) [H. S. C. '80]

(xiv) অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসক (রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী)।

(xv) ত্রিপুরা / পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা (এককক্ষ, দু-কক্ষ) বিশিষ্ট। [H. S. C. '80]

(xvi) ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষের নাম (লোকসভা, রাজ্যসভা)

(xvii) লোকসভার সভাপতিকে (স্পীকার, চেয়ারম্যান, উপরাষ্ট্রপতি) বলে।

(xviii) ভারতীয় সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ বা রাজ্যসভার সভাপতিকে (স্পীকার, চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি) বলে। [H. S. C. '78]

(xix) রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদে আসীন থাকেন (রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার)। [T. S. B. '79 and H. S. C. '85]

(xx) রাজ্যসভা একটি (স্থায়ী, অস্থায়ী) সভা।

(xxi) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য সংখ্যা (218, 244, **294**)।

(xxii) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সভাপতিকে বলা হয় (রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, স্পীকার)।

(xxiii) কোন বিল অর্থ বিল কিনা তাহা স্থির করেন (রাষ্ট্রপতি, অর্থমন্ত্রী, স্পীকার)।

(xxiv) ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম (সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট)।

(xxv) ভারতের সংবিধানের অভিভাবক (রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা, সুপ্রীম কোর্ট)।

(xxvi) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অধীনে (কেবলমাত্র মূল এলাকা ; মূল ও আপীল এলাকা ; মূল আপীল ও পরামর্শদান এলাকা) আছে। [H. S. C. '78, '81, '85]

(xxvii) লোকসভার কার্যকাল (চার বছর, পাঁচ বছর, ছয় বছর) [H. S. C. '79]

(xxviii) ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় (তিন, চার, পাঁচ) বার।

(xxix) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে (জনগণ, সংসদের সদস্যবৃন্দ, অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্যবৃন্দ, অঙ্গরাজ্যের বিধানসভাগুলোর নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যগণ)। [H. S. C. '78]

(xxx) লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থবিল রাজ্যসভা (বাতিল করিতে পারে, সংশোধন করিতে পারে, সুপারিশসহ ফেরত পাঠাতে পারে)।

(xxxi) ভারতের পার্লামেন্ট (লোকসভা ও রাজ্যসভাকে নিয়ে ; রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভাকে নিয়ে, লোকসভা, রাজ্যসভা ও মন্ত্রিসভাকে নিয়ে) গঠিত।

(xxxii) ভারতে অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীদের নিযুক্ত করে (রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, আইনসভার সদস্যগণ) [H. S. C, '84]

(xxxiii) পশ্চিমবঙ্গ / ত্রিপুরার আইনসভা (বিধানসভা ও বিধানপরিষদ নিয়ে, রাজ্যপাল ও বিধানসভা নিয়ে) গঠিত।

(xxxiv) সংসদীয় ব্যবস্থা বলতে বোঝায় যেখানে (একটি পার্লামেন্ট আছে, নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল একটি মন্ত্রিসভা আছে)। [H. S. C. '78]

(xxxv) ভারতের রাষ্ট্রপতি (জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে, পরোক্ষ পদ্ধতিতে) নির্বাচিত হন।

(xxxvi) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন, সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন, সংসদের উভয়কক্ষের এবং রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন)। [H. S. C. '79]

(xxxvii) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন) [H. S. C. '83]

(xxxviii) ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, সংসদ কর্তৃক, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক, লোকসভার স্পীকার কর্তৃক) নিযুক্ত হন। [H. S. C. '79 and '83]

(xxxix) ভারতের রাজ্যসভা হ'ল (অঙ্গরাজ্যগুলোর একটি কক্ষ, রাজ্যপালগণের একটি কক্ষ, ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি কক্ষ)। [H. S. C. '81]

(xl) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হলেন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, রাজ্যসভার সভাপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ)। [H. S. C. '81]

(xli) ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে (বাধ্য, বাধ্য নন) [H. S. C. 84]

"Although Party is often extra-Constitutional, it is an essential organ of every large scale democracy."

—MacIver

৫

জনমত ও রাজনৈতিক দল

Public Opinion and Political Parties

বেশীরভাগ দেশেই রাজনৈতিক দলের কথা বা এর স্বীকৃতি সংবিধানে থাকে না, অথচ রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রতি দেশেই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু অস্তিত্ব নয়, রাজনৈতিক দল এবং দলীয় ব্যবস্থা হ'ল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি। ঢেউ ছাড়া যেমন সমুদ্রের অতিত্ব কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি দলীয় ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ভাবা যায় না। দলীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি জনমতের অবিরাম কার্যপ্রবাহ গণতন্ত্রকে সচল এবং অর্থবহ করে তোলে।

এক : জনমত কাকে বলে? (What is Public Opinion ?)

সচেতন জনমত সৃষ্টি করেই গণতন্ত্রকে সফল করা যায়। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনমত সম্পর্কে অধিকতর বিশ্লেষণের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দল চেষ্টা করে জনমত গঠন করতে, আর সরকার পক্ষ চেষ্টা করেন জনমত জানতে। শাসকশ্রেণীর কাজকর্ম জনমতের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে জনমতের পরিবর্তন হলে সে অনুযায়ী শাসকদলও নিজস্ব নীতি পরিবর্তন করেন। এতে গণতন্ত্রের গতি অব্যাহত থাকে। ম্যাকাইভারের ভাষায় বলতে গেলে, *The incessant activity of popular opinion is the dynamics of democracy.*

সাধারণ অর্থে আমরা সব নাগরিকের মতকেই জনমত বলি। কিন্তু কোন বিষয়েই সকলে একমত পোষণ করে না। যে-কোন একটি বিষয়ে দেশের বিভিন্ন দলের লোকের, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকে। প্রায়ই আমরা দেখতে পাই যে, একটি বিষয় নিয়ে দুটি মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। সুতরাং সকলে একমত হলে তবে জনমত গঠিত হবে, এরূপ মনে করা ভুল। যে-কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপারে সবাই যদি একমত হয় তবে তা খুবই ভাল। কিন্তু কার্যত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি ও মানসিকতার জন্য কোন প্রস্তাবেই সকলে একমত হয় না। কোন বিষয়ে সকলে একমত না হলেও জনমত গঠন সম্ভব।

জনসাধারণের সবার মত এক নয়

অনেকে মনে করেন যে, অধিকাংশের মতই জনমত। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের দ্বারাই দেশ শাসিত হয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণের অধিকাংশের মতেই যে জনমত গঠিত হবে তা সঠিক করে বলা যায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি নিজেদের সুখ-সুবিধের জন্য দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, তবে তাকে জনমত বলা যায় না। জনসাধারণের মঙ্গল চিন্তা করে (এমন কি সংখ্যালঘুদের স্বার্থেও) কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সুগঠিত যে-মত দেশের বেশির ভাগ লোক পোষণ করে, তাই জনমত। রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে তাদের ঐ মতভুক্ত করার চেষ্টা করেন। এ ভাবেই জনমত গঠিত হয়। সকলেই যে কোন বিষয়ে একটি মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করবে, তা আশা করা যায় না। কিন্তু মতটির সারাংশ জনগণের একটি অংশ গ্রহণ করলেই জনমত গঠিত হতে পারে।

মত কাকে বলে ?

জনগণের সকল রকম মতকে জনমত বলা যায় না, জনমতের একটি বিশেষ চরিত্র আছে। কোন মতকে জনমতের পর্যায়ে উপনীত হতে হলে তাকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কল্যাণধর্মী, নির্দিষ্ট এবং দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জনগণের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টির নীতি যদি কোন রাষ্ট্রের জনগণের একটা বিশেষ অংশের সমর্থন লাভও করে তবু তাকে জনমত বলা যেতে পারে না। কারণ ঐ মত জনকল্যাণকর তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণভাবেই জনস্বার্থবিরোধী।

ফাইনারকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, জনমতের তিনটি উপাদান থাকা প্রয়োজন। **প্রথমত,** উপাদান তথ্য ; **দ্বিতীয়ত,** তথ্যের মূল্যায়ন এবং **তৃতীয়ত,** এর পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। সুতরাং **কোন বিশেষ সামাজিক, আর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা বা তা সমাধানের ব্যাপারে জনকল্যাণধর্মী বলে বিবেচিত কোন মত যদি জনগণের একটি ব্যাপক অংশ কর্তৃক সমর্থিত হয়, তবে তাকে জনমত বলে।** এইজন্যই বলা হয়, *Public Opinion to be public, must be public and opinion.*

জনমতের তিনটি উপাদান

জনমত কিভাবে গঠিত হয় ?

জনমতের চরিত্র ও এর উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রাইস বলেছেন : প্রথম স্তরে জনমত বিভ্রান্তপূর্ণ, এলোমেলো, অসম্বন্ধ ও আকারবিহীন অবস্থায় দেখা দেয়, এবং প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে এর পরিবর্তন হয়। কিন্তু ঐ এলোমেলো ও বিভ্রান্তিপূর্ণ রূপের মধ্য থেকে ক্রমে মতগুলো ঘনীভূত ও পরিষ্কার হয়ে একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। জনমতের গঠন প্রণালী গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখ যাবে যে, প্রাথমিক স্তরে জনমতের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট আকার ও বক্তব্য থাকে না। দেশপ্রেম, অন্ধবিশ্বাস, সংস্কার, শ্রেণীবিদ্বেষ ইত্যাদি উপাদানের মিশ্রণে নানা ধরনের অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন মতামত দেখা দেয়। এদের ভেতর যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা চলতে থাকে। ঐ পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে মতামতগুলো সুসংহতরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত এগুলো জনমতের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কারণ, জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক তখনও ঐ মত স্বীকৃতি লাভ করেনি। বক্তৃতা, খবরের কাগজের সম্পাদকীয়, পুস্তক, ইস্তাহার, পোস্টার, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারের ভেতর দিয়ে অবশেষে জনগণের

এক লক্ষণীয় অংশ যখন কোন একটি মতের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই মতটি জনমতের পর্যায়ে উপনীত হয়। সুতরাং যে মত এতদিন এলোমেলোভাবে ইতস্তত প্রচারিত হচ্ছিল, তা পরবর্তী স্তরে নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে জনমতে রূপান্তরিত হয়।

জনমত জনগণের নয়, মতও নয়

অনেকে মনে করেন যে, জনমত বলে বাস্তবে কিছু নেই। তাঁরা মনে করেন যে, **জনমত জনগণের নয় এবং তা মতও নয়** (Public opinion is neither public, nor opinion)। তাঁদের মতে বাস্তবক্ষেত্রে জনসাধারণের সাধারণত নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। জনমত বলে যা প্রচারিত হয় তা সাধারণত রাজনৈতিক দল এবং মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবিশেষের মত ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জনমত বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। জনমতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, জনমত এতই উদাসীন এবং ব্যস্ত, এত পরিবর্তনশীল ও ভাবপ্রবণ যে, এর ক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যেতে পারে, যদিও মাঝে মাঝে এক অস্থির দৈত্যের মত এর প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োগ ঘটতে পারে। রবার্ট পীল জনমত বলতে বোকামি, দুর্বলতা, কুসংস্কার, ভুল বোঝা, একগুঁয়েমি ও খবরের কাগজের সংবাদের এক যৌগিক সংমিশ্রণকে বুঝিয়েছেন।[১] জনমত সম্পর্কে ঐ সকল বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, জনগণের ইচ্ছা, চিন্তা ও বক্তব্য বেশ কিছুটা জনমতের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয় এবং সেজন্য জনমতের বাস্তব গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। জনমতের ঐ বাস্তব গুরুত্ব মনে রেখে বলা যেতে পারে যে, জনমত কি এবং জনমত বলে কিছু আছে কিনা এ ব্যাপারে তর্ক করে লাভ নেই। প্রচলিত প্রথার আলোতে বলা যায় যে, জনমত হ'ল মোটামুটিভাবে সমাজের ও জনগণের মত।[২]

জনমতের বৈশিষ্ট্য

জনমতের নিম্নলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়ঃ **প্রথমত,** কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে জনমতের উৎপত্তি হয় না। রাষ্ট্র বা জাতি বা জনজীবনের বৃহত্তর সমস্যাকে কেন্দ্র করে এবং ঐ সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত নিয়ে জনমত গঠিত হয়। **দ্বিতীয়ত,** দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য একই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকতে পারে। উভয় মতই যদি জনগণের এক একটি লক্ষণীয় অংশ দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে পরস্পরবিরোধী দুটি জনমতের অস্তিত্ব দেখা যায়। **তৃতীয়ত,** জনগণের যে কোন মতকে জনমত বলা যায় না। ঐ মত জাতীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকলে, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত নির্দেশ করলে এবং সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে পারলে জনমতের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। **চতুর্থত,** সাময়িক উত্তেজনার বশে জনগণের ব্যাপক অংশ কোন হটকারী মত প্রকাশ করতে পারে। এ মত জনগণের ব্যাপক অংশ কর্তৃক সমর্থিত হলেও সাময়িক উত্তেজনার বশে গৃহীত জনস্বার্থবিরোধী ও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট কোন মত জনমতের পর্যায়ে পড়তে পারে না। **পঞ্চমত,** কোন মতকে জনমতের মর্যাদা লাভ করতে হলে জনগণের একটি ব্যাপক এবং লক্ষণীয় অংশের সমর্থন লাভ করতে হবে। জনগণের কত সংখ্যক অংশের সমর্থন লাভ করতে পারলে তা জনমত বলে বিবেচিত হবে এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সংখ্যা অপেক্ষা জনমতের চরিত্র এবং আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। **ষষ্ঠত,** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমত প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

১, "The great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper paragraphs."
—Robert Peel

২. "There should be no question about what we mean by calling public opinion. By 'Public opinion' we mean, in the light of long established usage, that it is the opinion of the community, the opinion of the people."
—F, M, Sait

দুই : গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব (Importance of Public Opinion in Democracy)

বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে। গণতন্ত্রের প্রসার অনিবার্য ভাবেই জনমতের ভূমিকাকে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। যে যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজা জনগণের সকল ইচ্ছা ও মতকে উপেক্ষা করে শাসন চালাত, সে সময় জনমতের বিশেষ কোন গুরুত্ব বা ভূমিকা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জনমতই কার্যত প্রধান নিয়ামক। বস্তুতপক্ষে জনমতের ওপরই গণতন্ত্র নির্ভরশীল।

সুশিক্ষিত এবং সুগঠিত জনমতের সৃষ্টি না হলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। বিখ্যাত দার্শনিক রুশোও এই মত পোষণ করতেন। জনমতের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য তিনি বলেছেন, জনমতের মধ্য দিয়ে ভগবানের ইচ্ছাই প্রতিধ্বনিত হয় (**The voice of the people is the voice of God**)। এজন্যই রুশো বলেছেন যে, সার্বভৌমের উৎস ও ভিত্তি জনগণের ইচ্ছাশক্তিতেই নিহিত আছে। প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছেন যে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক জনসাধারণের শাসনকে গণতন্ত্র বলে। জনমতই গণতন্ত্রের পরিচালক। যে-রাষ্ট্রে সুগঠিত জনমত নেই, সেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন অচল, কারণ জাগ্রত জনমতই গণতন্ত্রের ভিত্তি।

সদাজাগ্রত জনমত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ

জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে বিরল। বিখ্যাত লেখক হেনরী মেইন্ বলেছেন যে, পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ প্রবল পরাক্রান্ত শাসক বলে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকেও জনমত মেনে চলতে হয়। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেনকে জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল। জনমতকে উপেক্ষা করে শাসন চালালে তা গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। মুসোলিনী ফ্যাসিস্ত দলের সাহায্যে ইতালীতে এবং হিটলার নাৎসীদলের সাহায্যে জার্মানীতে জনমত অবদমিত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে ঐ সকল দেশে ঐ সময়ের জন্য গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক, শ্রেণীগত, ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের ষড়যন্ত্রের বা বিদেশী চক্রান্তে জনমত সাময়িকভাবে দমিত থাকতে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য জনমতকে উপেক্ষা করা যায় না। গণতন্ত্র হল প্রকৃত জনমতের দ্বারা দেশ শাসন।

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনমত আরো দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দেশে সুস্পষ্ট মত প্রকাশের ব্যবস্থা থাকলে কোন শক্তির আধিক্য বা শাসনে বিকৃতি দেখা দিতে পারে না। সরকার হল শক্তির সংগঠন। গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাসনব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু গণতন্ত্রে নানা কেন্দ্রে ঐ শক্তি ছড়ানো থাকে। যেমন আইনবিভাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠী—ইত্যাদি নানা কেন্দ্রে শক্তি বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন মত তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে পাশাপাশি বিরাজ করে (**hospitality to plurality of ideas**)।

১. শক্তির আধিক্য দেখা দেয় না

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র হোক বা একনায়কতন্ত্রই হোক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলকথা হল : আমরা রাষ্ট্রের নির্দেশ মানি কেন (**the grounds of political obligation**)? এই চিরন্তন মৌলিক প্রশ্নটির উত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা খুঁজে চলেছেন। বলা হয়, যদি আমাদের চিন্তা ও ভাবনার কোন প্রভাব আইনের মধ্যে আমরা না দেখি, তবে আমাদের রাজনৈতিক আনুগত্যের কোন কারণ আমরা খুঁজে পাই না। জনমত যদি আইন গঠনে প্রভাব বিস্তার করে, তবেই নাগরিকদের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় আইন আমাদেরই চিন্তার ফল। আমরা আমাদের ইচ্ছা ও মতামতকে আইনের মধ্যে প্রতিফলিত দেখি বলেই আমরা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। তাই বলা হয় যে, জনমতের শাসন বিপ্লবকে রোধ করে এবং গণতন্ত্রকে স্থায়িত্ব দেয়।

২. রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নের সমাধান

কোন দেশের শাসনব্যবস্থা কতটা গণতান্ত্রিক তা ঐ দেশের জনমতের প্রভাব, শক্তি ও কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে। যে দেশে জনমতের প্রভাব যত বেশি, সেখানকার শাসনব্যবস্থা তত বেশি গণতান্ত্রিক। যেখানকার সরকার জনমতের উপর শ্রদ্ধাশীল এবং জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে গণতন্ত্র অধিক পরিমাণে বিকাশলাভ করে। অন্য দিকে, যে রাষ্ট্রে জনমত সতর্ক ও সচেতন নয়, সেখানকার সরকার সর্বদা জনকল্যাণমূলক নীতি অনুসরণ নাও করতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, শক্তিশালী জনমত গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ।

জনমত গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখানো যেতে পারে যে, প্রবল জনমতের চাপে সরকার অনেক নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ১৮৩২ সালের ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় সংস্কার আইনের কথা উল্লেখ করা যায়—যা প্রবল জনমতের চাপেই তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছু দিন আগে আমাদের দেশে 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি' প্রস্তাব প্রবল জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে জনমতের শক্তি ও প্রভাবকে তুলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনমত যদি সত্যি সত্যিই জনগণের লক্ষণীয় অংশের সমর্থন লাভ করে দানা বেঁধে উঠতে পারে, তবে তা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। গণশক্তি ও গণসমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমত সম্পর্কে নীরব, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। তাই গণতন্ত্রে শক্তিশালী, সতর্ক ও সচেতন জনমতের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

জনমতের চাপের উদাহরণ

তিন : জনমত গঠনের উপাদান (The Agencies for Formation of Public Opinion)

দেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের কাজকর্মের বিষয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে। তাদের মনে কোন বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে পারলে সে বিষয়ে জনমত গঠিত হতে পারে। যে সকল উপায়ে জনসাধারণের মনের ঔদাসীন্যের বেড়া ভেঙে দেয়া যায় বা উদ্দীপনা (excitement) সৃষ্টি করা যায়, তা আলোচনা করা দরকার। নানা ভাবে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। নানা রকম বাহনের দ্বারা জনমত গঠিত ও ব্যক্ত হয়।

যে সকল উপাদান জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবার সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. সংবাদপত্র

বর্তমান যুগে সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা জনমত গঠন যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। প্রতিদিনের খবর ও রাজনৈতিক ভাষ্য নিয়ে সংবাদপত্র সহজেই সকলের দরজায় প্রতিদিন উপস্থিত হতে পারে বলে জনমত গঠনে এর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষাবিস্তার ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের ব্যাপারে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন ইংরেজ লেখক সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের 'তৃতীয় নয়ন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। সংবাদপত্র শুধু সংবাদই পরিবেশন করে না, এর সাহায্যে আমরা নানা প্রকার মন্তব্য পাঠ করি। পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদক ও দেশের লোকমান্য নেতাদের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত পড়ে পাঠকগণও নিজেদের মতামত গঠন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কিছুদিন আগে আসামে যে বাঙালী বিরোধী জেহাদ দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করে ও সম্পাদকীয় লিখে সংবাদপত্র জনমত গঠন করেছিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সরকারের যে-কোন ভুলত্রুটি সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় সমালোচনা করা সম্ভব। এইভাবে কর্তৃপক্ষ জনমতের গতি বুঝতে পারে ও সংগে সংগে জনমত অনুযায়ী নিজেদের কর্মধারা সংশোধন করে নিতে পারে।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা সর্বদা প্রশংসনীয় নয়। সংবাদপত্র প্রকাশন একটি ব্যবসায় এবং মুনাফা লাভই এর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিটি সংবাদপত্রমালিক জানে, তার সংবাদপত্রের ক্রেতাগোষ্ঠীর রুচি ও ইচ্ছা কি। সেই রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী সংবাদ, মতামত ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে। বিরোধী মতামত প্রকাশ করলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে। তাই সংবাদপত্র সে দিকে মোটেই অগ্রসর হয় না। **দ্বিতীয়ত,** বেশির ভাগ সংবাদপত্রই কোন-না কোন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি, তাই এদের পক্ষে সঠিক ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

কেন বিকৃত হয়েছে

তৃতীয়ত, বড় বড় শিল্পপতিদের বিজ্ঞাপন থেকে সংবাদপত্রের মুনাফা হয়। সুতরাং সংবাদপত্রগুলো এমন জনমত গঠনে অগ্রসর হয় যাতে বিজ্ঞাপনদাতারা সন্তুষ্ট হয়। এই সকল কারণে বর্তমানে সংবাদপত্রকে আর জনমতের সঠিক দর্পণ মনে করা চলে না। অনেকে এই জন্য বলেন যে, সংবাদপত্রগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। কিন্তু তা যে গণতন্ত্রের পক্ষে আরও বিপজ্জনক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংবাদগুলো যাতে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন থাকে এবং কোন কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

২. সভা-সমিতি

জনমত গঠনে সভা-সমিতির যথেষ্ট মূল্য আছে। দেশের নেতারা বা খ্যাতনামা বক্তারা যখন জনসভায় বক্তৃতা করেন, তখন তাঁদের বক্তৃতায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল লোকই প্রভাবিত হয়ে থাকে। সভা সমিতির বক্তৃতায় সমাজের সমস্যার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয় এবং তা লোকের মতামত গঠনে সহায়তা করে। সভাসমিতিতে বিভিন্ন বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বক্তৃতার মাধ্যমে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করে জনমত গঠনে সহায়তা করে। দার্শনিক ব্রুটাসের বক্তৃতা সাময়িক প্রশংসা পায়, কিন্তু সুচতুর বাগ্মী এণ্টনীর বক্তৃতা জনচিত্ত আলোড়িত করে ইতিহাসের গতিপথ নির্ণয় করে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্কুল, কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। শৈশব এবং কৈশোর, ছাত্রজীবনে যে-শিক্ষা পাওয়া যায় মনের মধ্যে তা চিরস্থায়ী ছাপের সৃষ্টি করে। দেশের যাঁরা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা তাঁরা প্রায় সকলেই শৈশব এবং যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন। আজ যে ছাত্র বা ছাত্রী, আগামী দিনে সেই দায়িত্বজ্ঞানশীল নাগরিক হবে। হয়তো একদিন সে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠকালে ছাত্র যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তাই ভবিষ্যতে তার রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত হয়। এজন্য হিটলার ও মুসোলিনী তাঁদের একনায়কত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য নিজ নিজ দেশের স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্য দিয়ে দলের গুণাগুণ প্রচার করেছিলেন। স্কুল কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল অসত্য বা অর্ধসত্য শেখানো নয়, ছাত্রদের মনে ঔৎসুক্য জাগানো, তাদের মনে অনুসন্ধানের মনোভাব, জিজ্ঞাসা এবং বিচার-ক্ষমতা জাগিয়ে তোলা। তাই এই সময়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে তাদের মনে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারক্ষমতা গড়ে ওঠে। তাই বলা হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের এক বিরাট অংশের মতামত তৈরী করতে সাহায্য করে।

৪. রাজনৈতিক দল

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন কর্মপন্থা উত্থাপন করে। বক্তৃতার দ্বারা, প্রচারপত্র দ্বারা এবং সংবাদপত্র দ্বারা তারা জনমত গঠনে সহায়তা করে। লাওয়েলের (Lowell) ভাষায় বলতে গেলে, রাজনৈতিক দলেরা বিভিন্ন মতামতের ফেরিওয়ালা (parties are the brokers of ideas)। রাজনৈতিক দলের মারফত দেশের নানা সমস্যার কথা লোকেরা জানতে পারে। বিভিন্ন দলের কর্মপন্থা জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসারে সহায়তা করে। এইভাবেই জনমত গঠিত হয়। জনমতের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক মত গড়ে ওঠে।

৫. বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও থিয়েটার

বর্তমান জগতে টেলিভিশন, বেতার, চলচ্চিত্র ও যাত্রা-থিয়েটার জনমত গঠনের শ্রেষ্ঠ বাহন। কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকেরাই সংবাদপত্র পড়েন, কিন্তু বেতার, চলচ্চিত্র ও যাত্রার আবেদন সমাজে সকল শ্রেণীর লোকের কাছে। তা ছাড়া বর্তমান জগতের সদাব্যস্ত জীবনযাত্রায় সংবাদপত্র পাঠের সময়টুকুও মানুষের নেই। আজকাল বেতারবার্তা ও চলচ্চিত্র লোকের প্রিয় হয়ে উঠছে। বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারকগণ বেতার এবং টেলিভিশনে বক্তৃতার দ্বারা জনগণের মতামত গঠনের সহায়তা করেন। আজকাল অনেকে বলেন যে, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের সংস্পর্শ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এর ফলে আমরা প্রায় অতীতের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কাছাকাছি পেঁছে গিয়েছি।

৬. আইনসভা

দেশের জনসাধারণের মতামত তাদের প্রতিনিধির মারফত আইনসভায় ব্যক্ত হয়। আইন পরিষদে দেশের প্রায় সকল দলেরই প্রতিনিধি থাকেন। আইনসভায় তাঁদের বক্তৃতা ও আলোচনা পড়ে জনগণ বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে পারে ও মতামত গঠন করতে পারে। আইনসভার তর্ক-বিতর্কের ধারা অনুধাবন করে লোকে নিজস্ব ধারণা গঠন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। আইনসভায় দলের প্রতিনিধিরা বক্তৃতার সময়ে কেবলমাত্র আইনসভার প্রতিনিধিদেয় উদ্দেশ্যেই বক্তৃতা করেন না। তাঁরা সারা দেশের নাগরিকদের উদ্দেশ্যেই কথা বলেন। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তাঁরা আইনসভায় থেকেও জনসাধারণের কাছাকাছি আছেন বলে অনুভব করতে পারেন।

৭. অন্যান্য উপাদান

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ মাধ্যমগুলো ছাড়াও জনমত গঠনের কতকগুলো অপ্রধান উপাদান আছে। সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য পত্র-পত্রিকা, দেয়াল-পোস্টার, ইস্তেহার পুস্তক, বিচারকদের রায়, বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন ইত্যাদি উপাদানগুলো আধুনিক যুগে জনমত গঠনে সাহায্য করে।

জনমত গঠনের প্রক্রিয়া

প্রশ্ন হল, জনমত গঠনের ঐ সব উপাদানের মাধ্যমে জনমনে মতামত গঠিত হয় কি ভাবে? মানুষ তার পরিবেশ থেকে নিজের মনে সঠিক ধারণা কিরূপে গড়ে তোলে? মানুষ তার আশেপাশের নানা সূত্র থেকে খোঁজ-খবর পায়, সেই খোঁজখবরের ভিত্তিতে তার রাজনৈতিক মত গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন কাজ করলে বা নিজে উপস্থিত থাকলে প্রত্যক্ষ খবর পেতে পারে। কিন্তু মানুষ তো সকল ঘটনার সামনে উপস্থিত থাকতে পারে না। তাকে তাই দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের সংবাদ সরবরাহের উৎসের ওপর ভরসা করতে হয়, যেমন— রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি। কিন্তু প্রতি স্তরের সংবাদদাতারাই নিজ নিজ ইচ্ছা বা প্রবণতা অনুযায়ী প্রকৃত সংবাদটিকে অল্প একটু অদল বদল করতে থাকে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা মালিকদের ইচ্ছা ও প্রবণতা অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরী করেন। রেডিওতে কোন তথ্য পরিবেশিত হবার আগে বাছাই করা হয়। স্মৃতিশক্তি, কল্পনা, সংস্কার, আবেগ ও ইচ্ছাকৃত বিকৃতি—এ সব কিছু মিলে মিশে নাগরিকদের সামনে যা পরিবেশিত হয়, তার ভিত্তিতে ব্যক্তির পক্ষে প্রভাবমুক্ত কোন মতামত তৈরী করা সম্ভব হয় না। নাগরিকরা অসম্পূর্ণ তথ্যের বিকৃত-জগতে বাস করে। ফলে তাদের বিচার যুক্তিনিষ্ঠ হয় না, তাদের মতামত যুক্তির দ্বারা গঠিত হয় না, আশেপাশের প্রতিবেশীদের বা কর্মস্থলের সহকর্মীদের মতামতই তাদের মত হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি জোরের সঙ্গে প্রচার করে যে এটাই তার নিজস্ব মত। তার পরিবেষ্টনীকে সে-ও প্রভাবিত করে, আবার সে নিজেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। একছাঁচে, ঢালা-গড়া মানুষের মতামতকেই সে নিজের স্বাধীন মত বলে মনে করতে থাকে। অচল চিন্তার কতকগুলো ছাঁচ (stereotype) বস্তুজগতের প্রকৃত চিত্র বিকৃতি করে, ফলে বিভিন্ন প্রচারের কবলে পড়ে মানুষ তার প্রকৃত বিচার ক্ষমতা অনেক সময় হারিয়ে ফেলে।

চার : রাজনৈতিক দল কাকে বলে ? (What is a Political Party ?)

যখন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কোন বিষয়ে একই মত পোষণ করে এবং সেই মতের সমর্থনে সম্মিলিত হয় তখন তাকে দল বলে। বিভিন্ন বিষয়ে লোকে ঐক্যমত হতে পারে কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক ঐক্যমত হলেই তাকে রাজনৈতিক দল বলে না। বার্কের (Burke) মতে যখন কিছু সংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টার দ্বারা সর্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে কতকগুলো জাতীয় নীতি সম্বন্ধে একমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাকে রাজনৈতিক দল বলে।[১] সুতরাং বার্কের মতে জনকল্যাণ সাধন করাই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ম্যাকআইভার (MacIver) বলেছেন যে, কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনসমাজ, যা বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করে, তাকে রাজনৈতিক দল বলে।[২] সুতরাং বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের জনসমাজের একটি লক্ষণীয় অংশ যদি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ঐক্যমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয় এবং নিজস্ব আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী প্রচারকার্য চালিয়ে বৈধ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে বা ক্ষমতা দখল করে তা পরিচালনা করে, তা হলে জনসমাজের সেই সংঘবদ্ধ সংস্থাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। বার্কার বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো যদিও এক একটি বিশেষ মতের ধারক, তবুও এরা সাধারণ জাতীয় স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী উত্থাপন করে নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভে সচেষ্ট থাকে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

সুতরাং ওপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল গঠন করতে হলে **প্রথমত,** জনগণের একটা লক্ষণীয় অংশকে একটি বিশেষ নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ; **দ্বিতীয়ত,** জনগণের কল্যাণ সাধন করাই তাদের নীতি হবে ; **তৃতীয়ত,** তারা নিজেদের নীতি ও আদর্শকে জনগণের মধ্যে প্রচারের দ্বারা বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টা করবে ; **চতুর্থত,** শাসনক্ষমতা দখল করতে পারলে দলীয় নীতি ও আদর্শকে সরকারের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করবে ; এবং **পঞ্চমত,** ক্ষমতা লাভ করতে না পারলে দায়িত্বশীল বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করবে।

রাজনৈতিক দল গঠনের শর্ত

জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে অনৈক্য থাকার জন্যই একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। সকল রাজনৈতিক দল একই নীতি, আদর্শ ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী নয়—তাই এক একটি আদর্শ, নীতি ও কর্মপন্থাকে রূপদানের জন্য এক একটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে। নীতি, কর্মসূচী ও আদর্শের ভিত্তিতে **রাজনৈতিক দলগুলোকে বামপন্থী, মধ্যপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।**

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে উপদলের পার্থক্য আছে। যখন দেশের মঙ্গল ভুলে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু সংখ্যক লোক ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাকে দল না বলে **উপদল বলাই** উচিত। উপদল জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। আবার একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেও উপদল, চক্র, গোষ্ঠী ইত্যাদি থাকতে পারে।

দল ও উপদল

রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

আধুনিককালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, বিশেষ করে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ সকল গোষ্ঠী বিভিন্ন

---

১. "Party is a body of men united fo promoting, by their joint endeavours the national interest upon some particular principle in which they are all agreed." —Burke

২. "We may define a political party as an association organised in support of some principle or policy which by constitutional means endeavours to make the determinant of Government." —MacIver

আর্থনীতিক বা পেশাগত বা ধর্মীয় বা অন্য কোন সমস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন, শ্রমিক সংঘ, কৃষক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, ছাত্র সংঘ, চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলের মত এরাও সংগঠিত গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের মত প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে না, বা সরকার গঠনের চেষ্টা করে না। এরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরা নিজেদের পছন্দমত এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কয়েকটি সাম্প্রতিক ধারণা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক আলোচনায় রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, সদস্যপদের চরিত্র এবং রাজনৈতিক দলের ব্যবহৃত পন্থার পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলের আলোচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেকে রাজনৈতিক দলকে এদের সাধারণ লক্ষ্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার কথা বলেন।

রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা। যোশেফ সুম্পিটার মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক ও প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতায় আসার জন্য বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। স্যামুয়েল এল্ডারস্ভেল্ডের (Sumuel Eldersveld) মতে, রাজনৈতিক দল হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটা ফলপ্রসূ এবং নির্দিষ্ট ছাঁচে প্রবাহিত কার্যকলাপের ব্যবস্থা (The political party is a social group, a system of mea$_n$ingful and patterned activity within the larger society).

সমসাময়িককালে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলোচনায় ফরাসী পণ্ডিত মরিস্ দ্যুভর্জার (Maurice Duverger) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক দল হল বিশেষ কাঠামো বিশিষ্ট একটি গোষ্ঠী (A party is a community with a particular structure)।

রাজনৈতিক দলের মার্কসবাদী সংজ্ঞা

এবার আমরা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে পারি। কার্ল মার্কস এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রবক্তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বিচার করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, সমাজে ব্যাপক আর্থনীতিক অসাম্য থাকার জন্য পরস্পরবিরোধী স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণী-স্বার্থ জন্মলাভ করে। **প্রতিটি রাজনৈতিক দলই এক একটি শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।** এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক দলগুলোকে আর্থনীতিক শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে দেখতে হয়। উপাদানের মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তার স্বার্থ নিশ্চয়ই সম্পদহীন ব্যক্তি, যিনি শ্রমদানের পরিবর্তে কোন রকমে অন্নসংস্থান করে জীবনধারণ করেন, তার সমান হতে পারে না। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, একটি দেশে জমিদার, কৃষক, মালিক, শ্রমিক ইত্যাদি বিভিন্ন আর্থনীতিক শ্রেণী থাকতে পারে। ফলে সেই দেশে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের উদ্ভব ঘটে। কোন একটি রাজনৈতিক দল জমিদার ও কৃষক—এই দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, বা মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ একই দল রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাজনৈতিক দল

সুতরাং জনগণের কল্যাণ সাধনের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে অনৈক্য থাকার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয় না—**বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে।** এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও আলোচনা করা প্রয়োজন। ম্যাকআইভার বলেছেন যে, রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভের জন্য সংবিধান-সম্মত বা বৈধ উপায়ে প্রচেষ্টা চালায়। এই মতবাদের সঙ্গেও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির

বিভিন্ন দল গঠনের কারণ

পার্থক্য রয়েছে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, ক্ষমতাশীল শাসকশ্রেণী নিজেদের শাসন এবং শোষণের সুবিধার জন্য সংবিধান ও আইন রচনা করে। ঐ আইন ও সংবিধান মান্য করে কোনদিনই কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করা যায় না। তাই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল কর্তৃক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে মার্কস এবং তাঁর সমর্থকেরা মনে করেন।

ভারতে দলীয় অবস্থা

স্বাধীনতার পর থেকে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত ভারতে দলীয় অবস্থায় একটা স্থিতাবস্থা বিরাজ করছিল। ভারতে ঐ সময়ে সর্বভারতীয় চারটি দল ছিলঃ জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, ভারতীয় জনসংঘ। এদের মধ্যে শক্তি ও প্রভাবে জাতীয় কংগ্রেসই ছিল সবার ওপরে। কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলোতে জাতীয় কংগ্রেসই সরকার গঠন করে। ভারতের বহুদলীয় ব্যবস্থায় কার্যত একটি দলের (জাতীয় কংগ্রেস) এই প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থাকে বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষায় *Dominant Party System* নামে অভিহিত করা যায়।

বিগত দু দশক ধরে ভারতে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক ভাঙচুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, নকশালপন্থী দল, এ. আই. সি. পি এবং অন্যান্য কয়েকটি ছোট দল গঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস ভেঙ্গে কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (এস) গঠিত হয়। সমাজতন্ত্রী দলও বিভক্ত হয়। কয়েকটি দলের সমন্বয়ে জনতা দল গঠিত হয় এবং পরে ঐ দল ভেঙ্গে লোকদল, ভারতীয় জনতা দল ইত্যাদি গঠিত হয়। বর্তমানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই), মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, জনতা দল, ভারতীয় জনতা পার্টি, লোকদল দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও আছে কয়েকটি ছোট ছোট সর্বভারতীয় দল এবং অনেকগুলো রাজ্যদল।

পাঁচ ঃ দলীয় ব্যবস্থা (Party System)

প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার **(Political system)** সঙ্গে দলীয় ব্যবস্থা জড়িত এবং দলীয় ব্যবস্থার ওপর তা নির্ভরশীল। অ্যালমণ্ড **(Almond)** দেখিয়েছেন যে, সমষ্টিবাদী **(Totalitarian)** বা গণতান্ত্রিক, উন্নত বা উন্নয়নশীল, বড় বা ছোট প্রতিটি জাতিরই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটা আবশ্যক সংগঠন হিসাবে রাজনৈতিক দল এবং দলীয় ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দলীয় ব্যবস্থায় ভোটের গুরুত্ব

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রসার ঘটেছে। এবং দলীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে সরকার গঠনের প্রবণতা বেড়েছে। দলীয় ব্যবস্থায় কোন্ দল সরকার চালাবে এবং কি নীতি অনুযায়ী চালাবে তা স্থির হয় ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকদের দ্বারা। গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিকই সার্বভৌম ক্ষমতার অতি ক্ষুদ্র খণ্ডের অধিকারী। খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঐ ছোট ছোট সার্বভৌমত্বের অংশগুলোকে একত্র করে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ভোটাররা যাদের সমর্থন করে তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে পড়ে। দুধ থেকে মাখন তুলে আনার মত ক্ষমতার ঐ প্রশস্ত আধার থেকে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে আনা দরকার। ঐ উদ্দেশ্যে যে মন্থন যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাই রাজনৈতিক দল।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থে পারস্পরিক বিরোধ থাকায় সমাজে চাঞ্চল্য ও সংঘাত দেখা দেয়। ঐ সকল সংঘাতের **(tensions)** মধ্য থেকেই রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর উদ্ভব ঘটে। ঐ সকল সমস্যাই রাজনৈতিক দলগুলোর উপজীব্য। এদের কেন্দ্র করে দল গঠন করা, সমস্যাগুলো সমাধানের উপযোগী কর্মসূচী জনসমক্ষে প্রচার করা, নির্বাচনে জয়লাভ করা এবং সরকারী ক্ষমতা দখল করা রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত বিপুল সংখ্যক নাগরিকদের হাতে ভোটাধিকার এসে পড়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম আজকাল প্রতিষ্ঠানগত রূপ নিয়েছে, তা আর প্রাচীনকালের ব্যক্তিগত লড়াই-এ আবদ্ধ নেই। সংগ্রামী ঐ

প্রতিষ্ঠানগুলোর নামই রাজনৈতিক দল। সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং দলীয় প্রথার যুগে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, *they are inevttable, like the tides of the ocean.*

দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদের বক্তব্য ও ইস্তাহার নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচকমণ্ডলী যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁরা সরকার গঠন করে। কোন দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে সমমনোভাবাপন্ন একাধিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোয়ালিশন (coalition) সরকার গঠন করে। নির্বাচনের সময়ে যে ইস্তাহারের সাহায্যে তাঁরা জয়লাভ করে, সরকার গঠনের পরে সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁদের হাতে এসে পড়ে। অপরপক্ষে যে দল বা দলগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারার ফলে সরকার গঠন করতে পারে না, তাঁরা বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে এবং পরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন যাতে করতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট থাকে।

দলীয় ব্যবস্থায় সরকার পক্ষ

দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষ

এইভাবে গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংঘাত (নির্বাচনের সময়) এবং সহঅবস্থানের (নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে) মাধ্যমে দলীয় প্রথা সচল থাকে। অনেকে মনে করেন যে, যেখানে মুখ্য দুটি রাজনৈতিক দল আছে (যেমন ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সেখানে দলীয় প্রথা অনেক বেশি সুস্থ ও কার্যকর হয়। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যাহোক ফাইনারকে (Finer) অনুসরণ করে বলা যায় যে, গণতন্ত্র তার আশা-নিরাশা নিয়ে দলীয় ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল থাকে। দলীয় ব্যবস্থাই রাজনৈতিক মাধ্যাকর্ষণের মধ্যবিন্দু।[১]

এ তো গেল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা। এমনকি সমষ্টিবাদী দেশে, যেমন হিটলারের জার্মানী বা মুসোলিনীর ইতালীতে নাৎসী বা ফ্যাসী দলের গুরুত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সাম্যবাদী দেশে এক দল থাক বা একাধিক দল থাক, সেখানেও কমিউনিস্ট দলের গুরুত্ব ও ভূমিকা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে আছে।

ছয়ঃ রাজনৈতিক দলের কাজ (Functions of Political Parties)

লর্ড ব্রাইস রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম আলোচনা করে বলেছেন যে, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের দুটি প্রধান কাজ—বিতর্কের মাধ্যমে দলীয় নীতি প্রচার করা এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা। নির্বাচনে জয়লাভ করাই রাজনৈতিক দলের মূল কাজ হলেও বর্তমানে রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। নীচে রাজনৈতিক দলগুলোর মূল কাজকর্ম আলোচনা করা হলঃ

প্রথমত, রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হল দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং বিভিন্ন বিষয় (issue) সম্পর্কে দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান-কল্পে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের দলীয় নীতি এবং কার্যসূচী স্থির করতে হয়। দলের কর্মসূচী রচনার সময়ে দেখতে হয় যেন পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থে অনেকটা মিল থাকে। জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধিতা যেন কর্মসূচীর মাধ্যমে অন্তত সাময়িকভাবে ঐক্যমতে উপনীত হতে পারে (temporary consensus)।

১. দলীয় নীতি স্থির কথা

দ্বিতীয়ত, দলের কাজ হল কর্মসূচী স্থির করে দলের নীতি ও কর্মপন্থা নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূলে গঠন করার জন্য প্রত্যেক দলকে নানা কৌশলে প্রচারকার্য চালাতে হয়। জনসাধারণ নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কোন আন্দোলন শুরু করতে বা জনমত গঠন করতে পারে না, সেরূপ ক্ষমতা তাদের নেই।

২. দলীয় নীতি প্রচার করা

---

১. "(Democracy) rests, in its hopes and doubts, upon the party system, There lies political centre of gravity."

তারা জনমতকে অনুসরণ করতে পারে। জনসাধারণ বলতে বহু বিচিত্র ব্যক্তি, শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে বোঝা যায়। তাদের সামনে দলীয় নীতি এবং কর্মপন্থা প্রচার করে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হয়। সাধারণ মানুষের উপযোগী স্লোগান রচনা করতে হয়, যে-স্লোগানে বেশির ভাগ লোক সাড়া দিতে পারে সেরূপ স্লোগান প্রচার করতে হয়। জনসাধারণ যেন ঐ সকল স্লোগানে নিজেদের অস্পষ্ট এবং অবুঝ আবেগের সান্ত্বনা খুঁজে পায়। নেতৃত্বহীন জনতা দুর্বোধ্য ও অর্থহীন চীৎকার বা শব্দসমষ্টি সৃষ্টি করতে পারে মাত্র, নেতৃত্বাধীন ঐ জনসমষ্টি অর্থবহ কোন ঐক্যবদ্ধ বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। সেই নেতৃত্ব দেওয়াই হল রাজনৈতিক দলের কাজ। যত বেশি সংখ্যক লোক ঐ প্রচার কাজের ফলে দলের নীতিতে আস্থাবান হয়, ততই দলের সমর্থক ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

৩. নির্বাচনে অংশ গ্রহণ

তৃতীয়ত, আইনসভার নির্বাচনের সময়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার জন্য প্রত্যেকটি দল তাদের প্রার্থী মনোনয়ন করে। এর পরে তারা নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। জনমনে প্রভাব বিস্তারকারী সকল পথ এরা গ্রহণ করে। এরা চটকদার প্রার্থী-মনোনয়ন, বইপত্র, পুস্তিকা প্রকাশ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন, সভাসমিতির অনুষ্ঠান, উগ্র বক্তৃতা সকল কিছু পন্থা গ্রহণ করে; অবাস্তব ও অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেয়, বহু সত্য-অসত্য ভাষণ দেয়। যুক্তি, বিচার-বিবেচনা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে যে, লক্ষ্য সাধনের জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে (no doubt they are convinced that the end justifies the means)।

৪. সরকার গঠন

চতুর্থত, নির্বাচনের পরে কোন রাজনৈতিক দল যদি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে তবেই তার প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন শাসনক্ষমতা অধিকার করে তারা তাদের দলীয় নীতি ও কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। তারা প্রতিশ্রুত নীতি গ্রহণে সচেষ্ট হয় এবং ঐ সকল নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে দেশের সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়। নির্বাচনের সময়ে দলের নেতারা নির্বাচকদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, ক্ষমতাসীন হয়ে তা রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

রাজনৈতিক দলের উপরোক্ত চারটি কাজ সম্পর্কে ফাইনার বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো নীতি স্থির করে, ঐ নীতিকে প্রচার করে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে পারলে সরকার গঠন করে (They make policies, create platforms, obtain seats in the legislative assemblies, and if they attain a majority, their policies tend to become laws)। তিনি আরও মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোর সকল কাজ-কর্মের উদ্দেশ্য হ'ল নির্বাচনে জয়লাভ করা। তাঁর ভাষায় ওটাই হল *the first commandment of a political party.*

৫. বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন

পঞ্চমত, নির্বাচনে কোন দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারে, তবে ঐ দলকে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে হয়। বিরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, সমালোচনা ইত্যাদির দ্বারা সরকারকে কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ রাখে এবং সুযোগ পেলে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার চেষ্টা করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জনগণের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ইত্যাদি তাঁরা তুলে ধরেন এবং তীব্র সমালোচনার দ্বারা মন্ত্রিসভাকে সাবধানে চলতে বাধ্য করেন। এর ফলে মন্ত্রিরা স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। ব্রিটেনে বিরোধী দলকে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' (Shadow Cabinet) বলা হয়। কারণ সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটলে বিরোধী দলকে যে কোন সময় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

ষষ্ঠত, জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন

কাজকর্মের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনমত সৃষ্টি করে। সরকার কর্তৃক শাসন পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনমতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারী সরকারও জনমত অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোই বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য উপস্থিত করে এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তা সমাধানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে জনমত সৃষ্টি করে। লাওয়েল (Lowell) বলেছেন যে, বিভিন্ন ব্যাপারে জনমত গঠন করা এবং জনমতকে তুলে ধরা রাজনৈতিক দলের কাজ এবং এর জন্যই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব।

৬. জনমত গঠন

সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী কি সে সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অ্যালান বল (Alan Ball) মনে করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা করা, স্বার্থের সমষ্টিকরণ (interest aggregation), সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগসাধন, জনগণকে সংগঠিত করা, রাজনৈতিক মতাদর্শগত আলোচনা চালানো হল রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী। অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল (Almond and Powell) বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলের কাজ হ'ল ঃ ১. রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ (political recruitment), ২. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (socialization), ৩. স্বার্থের সমষ্টিবন্ধকরণ (aggregation) এবং গ্রন্থন (articulation)।

সাম্প্রতিক মত

সাত ঃ দলীয় শাসনের দোষগুণ (Merits and Demerits of Party System)

গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য হলেও এ ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত নয়। নীচে দলীয় ব্যবস্থার দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করা হ'ল ঃ

দলীয় প্রথার গুণ

প্রথমত, দলীয় ব্যবস্থার প্রধান গুণ হল যে, রাজনৈতিক দলগুলো বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট জনমতকে সুগঠিত ও সুস্পষ্ট করে তোলে (out of a chaos of multitude of voters party brings order and system)। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ লোকের কোন স্পষ্ট মতামত থাকে না। মতামত থাকলেও জনসাধারণ নিজেরা তা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। রাজনৈতিক দল সমাজের মধ্য থেকে ঐ সকল চিন্তাকে পরিস্রুত আকারে রূপ দেয়।

১. জনমতকে সুস্পষ্ট করে তোলে

দ্বিতীয়ত, দলগুলো জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা ও সমাধানের পন্থা তুলে ধরে জনগণকে ঐ বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করে। এতে জনসাধারণের মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং দেশবাসীর প্রতি তাদের কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দল জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দানের একটি প্রধান মাধ্যম।

২. রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যম

তৃতীয়ত, দলপ্রথা না থাকলে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হতে পারে না। কারণ, সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠরা বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। এর জন্য প্রয়োজন দলীয় ব্যবস্থা। তাই দলপ্রথা না থাকলে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সরকারের পেছনে যদি সংগঠিত কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন না থাকে তবে শাসনকাজ পরিচালনা করা যায় না। কারণ, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোট না পেলে কোন সরকারই ক্ষমতাশীল থাকতে পারে না। দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয় বলে আইনসভার সদস্যরা দলের শৃঙ্খলার জন্য একযোগে ভোট দেয়। আইন পরিষদের সদস্যরা যদি তাদের দলের আদেশমত না চলে খুশিমত ভোট দেয় তবে সরকারের পতন ঘটে।

৩. সংসদীয় গণতন্ত্রে দল অপরিহার্য

চতুর্থত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা ও পরিচালনা করতে হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। তা না হলে, যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একবার শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে, সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে একমাত্র বলপ্রয়োগ ছাড়া, অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হত না। রাজনৈতিক দল থাকায় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হয়।

৪. গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন

পঞ্চমত, দলীয় ব্যবস্থার ফলে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। বর্তমান যুগে দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের শাসনকার্য পরিচালনার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, প্রতিটি দল আশা করে যে, কোন এক সময়ে নির্বাচনে তাদের দল আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শাসনক্ষমতায় আসীন হবে। এরূপ পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শাসনকার্য ভালভাবে চলতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করে, কিন্তু সব সময়ই বিরোধী দলের ভয়ে তারা জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। এজন্য দলীয় শাসন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্বেচ্ছাচারী হতে সাহস পায় না।

৫. স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করে

ষষ্ঠত, বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট জনমত গঠন ও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলোই নিজ নিজ নীতি ও বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য উপস্থিত করে প্রত্যক্ষভাবে জনমতকে প্রভাবিত এবং গঠন করে।

৬. জনমত গঠন করে

সপ্তমত, গণতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল জাতীয় ঐক্য গঠন এবং সাধারণের কল্যাণসাধন। গণতন্ত্রে অনেক বিরোধ থাকে ঠিকই, কিন্তু গঠনতন্ত্র ঐ সকল বিরোধের ঊর্ধ্বে সাধারণ স্বার্থের একটি যোগসূত্র খুঁজে বের করে। রাজনৈতিক দলগুলো সরকার চালাবার সময় ভৌগোলিক ও সংকীর্ণ আর্থনীতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর এক জাতীয় স্বার্থ সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চোখে তারা সমগ্র জাতির মূর্তি এঁকে দেয়। ভারতেও কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে জাতীয় ঐক্য রক্ষায় নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়।

৭. জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে

দলীয় প্রথার ত্রুটি

দলীয় প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কারণে তীব্র সমালোচনা উপস্থিত করা হয়ে থাকে। সমালোচনার মূল কারণ হল এই যে, দলীয়-ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই দলগুলো দলীয় বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেয়। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে দলের সদস্যরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ভুলে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে, দলকে জাতির ঊধ্বে স্থান দেয়। এ কথা স্মরণ করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক মনে করেছিলেন। এক বিদায় অভিভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনও বলেছিলেন যে, দলীয় মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক সরকারের সবচেয়ে বড় শত্রু। এর আগে রুশোও বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী থাকলে সেই দেশের গণইচ্ছা বা প্রকৃত জনমত নিজেকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারে না, গোষ্ঠী স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করে। ফলে অনেক সময়েই রাজনৈতিক দল আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে।

১. জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন

দ্বিতীয়ত, দলের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অনেক সময় দলীয় সদস্যদের মতামত অবহেলা করা হয়। দলের শক্তি রক্ষা করার জন্য সদস্যদের ভিন্ন মত গ্রহণ করতে দেয়া হয় না। দলের নীতি প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হয়। ফলে দলের সদস্যরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে না, বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না।

২. স্বাধীনতা, বিবেক বিসর্জন

দলীয় স্বার্থের বেদীমূলে ব্যক্তির সম্মান, বিবেক, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে বলি দিতে হয়। বিবেকের বিরুদ্ধেও দলের আদেশ মান্য করতে হয়।

৩. যে-কোন উপায়ে নির্বাচনে জয়লাভ

তৃতীয়ত, দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। যে-কোন উপায়ে নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার জন্য রাজনৈতিক দল যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। ফলে দলীয় ব্যবস্থার জন্য দেশের জনগণের এক বিরাট অংশের নৈতিক অধঃপতন ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৪. যোগ্য ব্যক্তি মর্যাদা পায় না

চতুর্থত, যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক দলের সকল বক্তব্য অনেক সময় মানতে পারেন না, বা দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করতে পারেন না। তাই তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করতে দ্বিধাবোধ করেন। ফলে অনেক যোগ্য ব্যক্তি শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন এবং দেশও তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও যোগ্য সেবা লাভের সুযোগ পায় না। উপরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করার জন্য সম্মান ও যোগ্যতা বিচার না করে মন্ত্রিত্ব ও অন্যান্য ক্ষমতা দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। ফলে, দলের বাইরের বা অন্য দলভুক্ত যোগ্য ব্যক্তিরা সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এতে দেশের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৫. বিরোধী দল বাধা সৃষ্টি করে

পঞ্চমত, দলীয় ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী দল সর্বদাই সরকারী কাজের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে ক্ষমতাসীন দলের দোষ অন্বেষণ করে এবং সকল রকম সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। এরূপ বাধা সৃষ্টি এবং আত্মকলহের ফলে জাতীয় কল্যাণমূলক কাজকর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. জাতি বিভক্ত হয়

ষষ্ঠত, দলীয় ব্যবস্থায় আইনসভা কয়েকটি দলীয় শিবিরে বিভক্ত হয়। কেবল আইনসভাই নয়, দলগুলো গোটা জাতিকে কয়েকটি বিরোধী শিবিরে পরিণত করে। এর ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং নোংরা দলাদলির উদ্ভব ঘটে; এর পরিণতি হিসেবে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, হানাহানি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক খুন পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এমনকি আর্থনীতিক সংকট বা বৈদেশিক আক্রমণের মুখেও দলগুলো তাদের ছোটখাটো বিবাদ ভুলে একত্র হতে পারে না। অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক দলগুলো এমনভাবে বিভক্ত থাকে যে দেশ গড়া বা আর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে মিলিত হবার প্রেরণাও তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না।

৭. বিত্তশালীরা দল নিয়ন্ত্রণ করে

সপ্তমত, রাজনৈতিক দল পরিচালনার জন্য বিত্তশালীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে চাঁদা আদায় করা হয়। ক্রমে তারাই দলকে করায়ত্ত করে দলের নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। বাঁশীওয়ালাকে যে টাকা দেয়, সে-ই বাঁশীর সুর নির্ধারণ করে। রাজনৈতিক দলগুলোকে যারা টাকা দেয় তারা একে একপ্রকার ব্যবসায়িক বিনিয়োগ বলে মনে করে। দলগুলোও সাময়িক লোভে নীতি বা সম্মানবোধ বিসর্জন দিয়ে ঐ দান গ্রহণ করে।

আট : দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করবার উপায় (Means of Removing the Defects of the Party System)

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, দলীয় ব্যবস্থা ত্রুটিহীন নয়। দলীয় ব্যবস্থার উপরোক্ত ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে সুস্থ অবস্থায় দলীয় ব্যবস্থা চলতে পারে।

১· শাসনব্যাপারে একটি দল যাতে প্রভুত্ব লাভ করতে না পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। জনসাধারণের মত অনুযায়ী যদি শাসনকাজ পরিচালিত হয় তবে একদলীয় প্রভুত্ব বা

কর্তৃত্ব থাকার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। তা করতে হলে আইন রচনায় গণভোট গ্রহণের পদ্ধতি (Referendum) প্রবর্তন করা প্রয়োজন। গণউদ্যোগ (Initiative) অনুযায়ী আইন সৃষ্টি হলে জনসাধারণের আধিপত্য বজায় থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ একটি দলের প্রার্থী হিসেবে আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে প্রলোভনে পড়ে ঐ দল পরিত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিতে চায়, একে বলে দলত্যাগ (defection)। ভারতে দলত্যাগের ব্যাপকতা দলীয়ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। এরূপ অবস্থায় দলত্যাগীদের সদস্যপদ খারিজ করার মত আইন থাকা প্রয়োজন। যদি কোন প্রতিনিধি নির্বাচকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করে, তাঁকে প্রত্যাবর্তনের (Recall) নির্দেশ দেবার অধিকার জনসাধারণের থাকা উচিত। এই সব ব্যবস্থা থাকলে জনসাধারণ ক্রমশ আরও অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবে এবং দলীয় ব্যবস্থার কিছু কিছু ত্রুটি দূর হবে।

গণভোট, গণউদ্যোগ ও প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা

২. সরকারী চাকরি ও সম্মান বিতরণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করার জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, একমাত্র যোগ্যতা ছাড়া অন্য কোন কারণে যেন কেউ সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হতে না পারে বা সরকারী অনুগ্রহ লাভ করতে না পারে। সুতরাং একটি নিরপেক্ষ সরকারী কৃত্যকের হাতে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩. দেশের শাসনতন্ত্র যথাসম্ভব অনমনীয় রাখা উচিত। কারণ তা হলে শাসকবর্গ নিজেদের খুশিমত ও স্বার্থমত শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

৪. জনসাধারণের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রের সাহায্যে সুরক্ষিত রাখা আবশ্যক, যাতে দলীয় স্বার্থে শাসকেরা তার উপর আঘাত হানতে না পারে।

৫. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারক থাকলে শাসনভার প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে সাহস পারে না। বিচারালয় স্বাধীন হলেই চলবে না, বিচারপতিগণকে নিরপেক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তবেই সুবিচার সুনিশ্চিত এবং জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হবে।

৬. সরকারী কর্মচারিগণ যাতে নিরপেক্ষভাবে ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে কাজ করতে পারে, সেজন্য তাদের চাকরিতে নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত।

৭. সংখ্যালঘু দলগুলোর অধিকার ও স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্যও শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৮. শিক্ষাবিস্তার করে এবং উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের সাহায্যে যদি নাগরিকদের রাজনীতিতে সচেতন করে তোলা যায়, তবে তারা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়।

উপরোক্ত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করলে দলীয় ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি দূর করা সম্ভব।

নয়ঃ দলীয় ব্যবস্থা সাফল্যের শর্ত (Conditions for the Success of Party System)

দলপ্রথার উল্লিখিত ত্রুটিগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলপ্রথার বিলোপ সাধন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ দলপ্রথা বিলোপের সঙ্গে পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা জড়িত রয়েছে। সেজন্য দলপ্রথা সাফল্যের জন্যই আমাদের সচেষ্ট হতে হবে— দেখতে হবে যে, দলপ্রথা সাফল্যের শর্তগুলো যেন প্রতিপালিত হয়। দলপ্রথার সাফল্য কি কি শর্তের ওপর নির্ভর করে তা আমাদের বিচার করা প্রয়োজন।

প্রথমত, দেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে গঠিত দুটি মাত্র শক্তিশালী দলের অস্তিত্ব দলপ্রথার সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত ; দুটি সুগঠিত শক্তিশালী দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

সরকার গঠন করে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু অথচ শক্তিশালী অন্য দলের অস্তিত্বই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় বাধ্য করে। তা ছাড়া দুটি দল থাকলে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনমত গঠন সহজ হয়। দেশে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকলে তাদের নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রচারে জনমত বিভ্রান্ত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই দল গঠন করা প্রয়োজন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে দল গঠন করা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বাধীন কোন সেনাবাহিনী গঠন বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের নামে আধা-পুলিশ বাহিনী গঠন করা দলপ্রথার সাফল্যের পরিপন্থী। কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সামরিক শক্তির সাহায্যে ক্ষমতা দখলের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা গণতন্ত্রের আদর্শ বিরোধী। রাজনৈতিক দলকে সকল সময় যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনমতকে স্বপক্ষে আনতে সচেষ্ট হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রে জনমতই তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

চতুর্থত, শাসনযন্ত্রের দৈনন্দিন পরিচালনায় রাজনৈতিক দলগুলোর হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নয়ন, শাস্তি ইত্যাদির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করে তা একটি নিরপেক্ষ সংস্থার মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এবং হস্তক্ষেপে শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি প্রবেশ করতে পারে। এতে শাসনযন্ত্র দুর্বল হয় এবং সরকারের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক দলগুলোর পরমতসহিষ্ণুতা থাকা আবশ্যক। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রতিটি দলই নিজ নিজ নীতি ও কর্মপন্থা কার্যকর করতে গিয়ে অন্য দলগুলোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর যদি সহিষ্ণুতা না থাকে, তবে দেশে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দলীয় ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলোর সহিষ্ণুতা দলীয় প্রথা সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দলগুলো যাতে আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে তা নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য।

সপ্তমত, দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান শর্ত হ'ল উপযুক্ত দলীয় নেতৃত্ব। দলগুলোর নেতারা যদি উদার, সহিষ্ণু, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, বিবেচক ও মানবতাবাদী না হন, তবে দলগুলোর ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। অনেক সময় মহান্ আদর্শ ও নীতির পৃষ্ঠপোষক হয়েও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাজনৈতিক দল সাফল্য লাভ করতে পারে না। সেইজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর যোগ্য নেতৃত্বের ওপর দলীয় ব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

অষ্টমত, শক্তিশালী জনমতের অস্তিত্ব দলীয় শাসনব্যবস্থায় সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সচেতন এবং সক্রিয় জনমত রাজনৈতিক দলগুলোকে যথাযথ কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারে ও দলীয় রাজনীতির জন্য জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেবার যে কোন প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারে।

দশ ঃ দলীয়ব্যবস্থার সাফল্যের শর্তগুলো ভারতে আছে কি না ? (Are the Conditions Present in India ?)

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কয়েকটি শর্ত প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত শর্তগুলো ভারতে কতটা আছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, অনেকে মনে করেন যে, কোন দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে দলীয়

ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করতে পারে না। ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ আছে এবং ঐ শ্রেণীস্বার্থ-গুলোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে। সুতরাং ভারতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা না থাকলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হবে এ কথা স্বীকার করতে অনেকে প্রস্তুত নন।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক কালে ভারতে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনায় ক্ষমতাসীন দল এবং দলের সমর্থনে সাংবিধানিক ক্ষমতা-বহির্ভূত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর (extra constitutional centre of power) হস্তক্ষেপ খুবই প্রকট হয়েছিল এবং ঐ ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে যে কোন দেশের গণধান্ত্রিক ভিত্‌কে দুর্বল করতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক আদর্শ এবং দর্শন দল গঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দল গঠন করা এবং ঐ ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হবার প্রবণতা খুব বেশি। ঐ ধরনের প্রবণতা গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তবে আশার কথা হল এই যে, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল এ ধরনের জাত-পাত, সম্প্রদায় বা অঞ্চলগত রাজনীতির তীব্র বিরোধী।

চতুর্থত, ভারতে পরমতসহিষ্ণুতার খুবই অভাব দেখা যাচ্ছে, ফলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ইত্যাদি অনেক সময়ই সংঘটিত হচ্ছে। এ ধরনের অশুভ কার্যকলাপ গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে দুর্বল করে।

পঞ্চমত, ভারতে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক দলত্যাগের (defection) ঘটনাবলী দলীয় ব্যবস্থার সাফল্যের সামনে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছিল এবং গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তবে এ বছরের (১৯৮৫) গোড়ার দিকে দলত্যাগ বিরোধী বিল গৃহীত হওয়ায় আশা করা যায় দলত্যাগের তীব্রতা হ্রাস পাবে।

সর্বোপরি, স্বাধীন ও বলিষ্ঠ জনমত গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে কাজ করে। ভারতের বেশির ভাগ জনগণ দারিদ্র ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এরূপ অবস্থায় তাদের পক্ষে স্বাধীন এবং শক্তিশালী কোন মতামত সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এদেশে স্বার্থান্বেষী শ্রেণী ও গোষ্ঠী জনমত সৃষ্টির উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং নিজেদের স্বার্থে জনমত গঠন করে। ভারতের গণতন্ত্রের অস্তিত্বরক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুবই বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

সুতরাং বলা যায়, ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলোর অনেকগুলোই নেই বা থাকলেও দুর্বল অবস্থায় আছে। এজন্য ভারতের গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানা সহজ। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার শক্তিগুলোও ভারতে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এ জন্যই আশা করা হয়তো অন্যায় হবে না যে, ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো ক্রমশ আরও জোরদার হয়ে উঠবে এবং গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলোকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবে।

এগার ঃ একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System)

একদলীয় ব্যবস্থা কি এবং কোথায় কোথায় আছে

যে সকল রাষ্ট্রে বিধিবদ্ধভাবে বা বাস্তবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে তাকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংসদীয় (**Parliamentary**) শাসনব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার ফলে ইউরোপের কয়েকটি দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত জার্মানী ও ইতালীর নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নেও একমাত্র কমিউনিস্ট দলকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে নাৎসী দল অন্যান্য দলকে ধ্বংস করে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইতালীতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসীবাদী দলের উত্থান হয়। সেখানেও বলপ্রয়োগে অন্যান্য দলের বিলোপসাধন করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিককালে কয়েকটি রাষ্ট্রে একদলীয় শাসনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যারা একদলীয় শাসনের সমর্থক তারা বলেন যে, ১. জাতির সকল নাগরিকরাই যদি একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাতে দেশে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। আজ সোবিয়েত দেশে একটি দলের শাসন আছে বলেই সেই দেশ সকল বিষয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। নাৎসী দলের নেতৃত্বে জার্মানীর জাতীয় শক্তি অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ২. বহুদলীয় প্রথায় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন হওয়ায় সরকারী নীতিরও ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। শাসননীতির স্থিরতা না থাকায় স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং নানাপ্রকার দুর্নীতি দেখা দেয়। ৩. একাধিক দলের অস্তিত্ব কৃত্রিম বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করে জাতীয় শক্তি ও সংহতি নষ্ট করে। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় এরূপ হয় না। ৪. একদলীয় ব্যবস্থা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ৫. একদলীয় ব্যবস্থায় কর্মদক্ষতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর।

স্বপক্ষে যুক্তি

যাঁরা একদলীয় সরকার সমর্থন করেন না তাঁরা বলেন যে, ১. জনসমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভক্ত হলেই জাতীয় একতা নষ্ট হয়ে যায় না। ২. একদলীয় প্রথায় জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয়, রাজনৈতিক অধিকার খর্ব হয় ও বল প্রয়োগের সাহায্যে একনায়কের প্রতি আনুগত্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা গণতান্ত্রিক প্রথার বিরোধী। ৩. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ একদলীয় ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে, দলব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না। কারণ দলব্যবস্থার প্রচলন না থাকলে দেশের বিভিন্ন মতও প্রকাশিত হতে পারে না এবং নির্বাচনের সময় জনগণের সামনে গ্রহণযোগ্য বিকল্প কোন নীতি বা কর্মপন্থা উপস্থিত করা যায় না। সুতরাং গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য।

বিপক্ষে যুক্তি

বার : একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (One Party System and Democracy)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গণতন্ত্রকে যথার্থভাবে কার্যকর ও সফল করতে হলে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একান্ত অপরিহার্য। কারণ তাঁরা মনে করেন যে, একাধিক রাজনৈতিক দল না থাকলে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের পক্ষে বিকল্প কোন দলকে ভোট দেওয়া সম্ভবপর হয় না, এর ফলে একদলীয় স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় এবং গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ব্যর্থ হয়। একাধিক রাজনৈতিক দল থাকলে সরকার বিরোধী দল বা দলসমূহ বিকল্প কর্মপন্থা উপস্থিত করে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে পারলে সরকারী ক্ষমতায় আসীন দলকে নির্বাচনে পরাজিত করতে পারে অথবা পরাজয়ের ভয় দেখিয়ে সংযত, দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণমুখী করতে পারে। কিন্তু একটি দল থাকলে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশ লাভ করতে পারে না এবং এর ফলে গণতন্ত্রের মৌল আদর্শের বিসর্জন ঘটে এবং দলীয় একনায়কতন্ত্র সৃষ্টি হয়। সুতরাং একদলীয় শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত গণতন্ত্র থাকতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রসহ একদলীয় শাসনব্যবস্থা যে সকল দেশে আছে ঐ সকল দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত

অন্যদিকে মার্কসবাদীদের মতে একটি রাষ্ট্রে কটি রাজনৈতিক দল থাকবে তা একান্তভাবে নির্ভর করে সে দেশের শ্রেণীগত অবস্থার ওপর। মূল প্রশ্ন হ'ল, রাজনৈতিক দল কাকে বলে? এক-একটি রাজনৈতিক দল হল মূলত এক-একটি আর্থনীতিক শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ। অর্থাৎ এক-একটি রাজনৈতিক দল এক-একটি শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও দেশে যদি পরস্পরবিরোধী আর্থনীতিক স্বার্থসম্পন্ন দুটি শ্রেণী থাকে, তবে সেখানে দুটি শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে দুটি

মার্কসবাদীদের মত

রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হবে। কারণ ঐ দুটি শ্রেণীর স্বার্থ এক হতে পারে না, তাই কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তাই যে দেশে জমিদার বা জোতদার, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী থাকে, সেই দেশে ঐ সকল শ্রেণীগুলোর স্বার্থ দেখার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকবেই। ধনতান্ত্রিক দেশে জনগণের সবার স্বার্থ এক নয় বলে এক-একটি স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে এক-একটি দল গড়ে ওঠে।

একনায়কতন্ত্রে যে একদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় (যেমন, হিটলার ও মুসোলিনীর সময়ে যথাক্রমে জার্মানী ও ইতালীতে) সেখানে বিভিন্ন মত ও দলকে জোর করে উচ্ছেদ করে একটি মাত্র দল অস্তিত্ব বজায় রাখে। সেখানে বিভিন্ন দলের উচ্ছেদ ঘটলেও বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অস্তিত্ব থেকে যায়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ থাকার জন্য সুযোগ পেলেই ঐ দলগুলো আবার আত্মপ্রকাশ করে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, অন্যদিকে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শোষণের হাতিয়ার না থাকার জন্য সেখানে শেষপর্যন্ত জনগণ একটি শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। তাই সেখানে একাধিক দল থাকতে পারে না।

পশ্চিমী গণতন্ত্র

মার্কসবাদীদের মতে, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর গণতন্ত্র হল রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত সংখ্যালঘিষ্ঠের গণতন্ত্র। সুতরাং ঐ সকল দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক সম্প্রদায় (যারা রাষ্ট্রের জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশও নয়) গণতন্ত্রের ফসল ভোগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত সম্প্রদায়ের ওপর গণতন্ত্রের নামে শাসক শ্রেণীর একনায়কত্ব চাপিয়ে দেয়। তাই লেনিন (Lenin) একে নিয়ন্ত্রিত, ভ্রান্ত ও কাল্পনিক গণতন্ত্র অ্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশে যে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের কথা বলা হয় তার কোন বাস্তব মূল্য নেই।

সোবিয়েত গণতন্ত্র

অন্যদিকে মার্কসবাদীদের মতে, সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই জনের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বাকি শতকরা দশজন যারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারার জন্য ষড়যন্ত্র ও দেশদ্রোহিতামূলক কাজে লিপ্ত তাদের ওপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর যে একনায়কতন্ত্রের কথা বলা হয়, তা গণতন্ত্রের আর এক রূপ। কারণ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র মানে শতকরা নব্বই জনের একনায়কতন্ত্র। মার্কসবাদীরা মনে করেন, যে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দেশের শতকরা নব্বই জন জড়িত তার চেয়ে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র আর কী হতে পারে?

তের: দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System)

কাকে বলে ও কোথায় আছে

যে-রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মূলত দুটি রাজনৈতিক দল অবস্থান করে তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় প্রধান দুটি দল ছাড়া আরও দু-একটি ছোট ছোট দল থাকতে পারে, কিন্তু তাদের কোন বাস্তব গুরুত্ব বা ভূমিকা না-থাকার জন্য কার্যত দুটি দলই প্রাধান্য লাভ করায় দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে কার্যত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলত রিপাবলিকান (Republican) এবং ডেমোক্র্যাটিক (Democratic) - এই দুটি দল আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও দু-একটি ছোট ছোট দল আছে, কিন্তু নির্বাচন উপরোক্ত দুটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ব্রিটেনে আগে রক্ষণশীল (Conservati ve) এবং উদারনৈতিক (Liberal) এই দুটি দল ছিল। বর্তমানে উদারনৈতিক দলের আর বিশেষ কোন অস্তিত্ব নেই, তার স্থান দখল করেছে শ্রমিকদল (Labour Party)। ব্রিটেনেও রাজনৈতিক দল বলতে তাই রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলকে বোঝায়।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণ

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার স্বপক্ষে লাস্কি বলেছেন, যে শাসনব্যবস্থায় দুটি বড় দলের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার যত বেশি প্রকাশ ঘটবে, সেই শাসনব্যবস্থায় তত বেশি সন্তোষজনক

(A political system is the more satisfactory, the more is able to express through antithesis of two great parties)। এর কারণ হিসাবে বলা হয়ঃ

প্রথমত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় যে কোন একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হয় বলে এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী সহজে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু বহুদলীয় প্রথায় বিভিন্ন দলীয় প্রার্থী এবং বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্ম পদ্ধতি জনগণের সামনে উপস্থিত হবার ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং তাদের পক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচন করা কঠিন হয়।

তৃতীয়ত, বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন একটি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ অবস্থায় বহুদলের সমর্থনে যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় তার কোন সুনির্দিষ্ট নীতি, একতা ও কর্মদক্ষতা থাকতে পারে না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয় না। তাই এই ব্যবস্থায় স্থায়ী (stable), কর্মদক্ষ, একতাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট নীতিসম্পন্ন সরকার গঠিত হয়।

চতুর্থত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। এখানে একটি দল সরকার গঠন করে অপর দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। এই ব্যবস্থা অনেক সুস্থ এবং স্বাস্থ্যকর।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত নয়। এই ব্যবস্থারও কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে। এবার আমরা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি আলোচনা করব।

প্রথমত, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলা হয় যে, এ ব্যবস্থায় জনগণের বিভিন্ন মত ও বক্তব্য প্রতিফলিত হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মৌলিক নীতির ভিতর খুব বেশি গুণগত এবং মূলগত প্রভেদ নেই। সুতরাং সেখানে যারা উক্ত দল দুটির কোনটির নীতিকে সমর্থন করে না তাদের পক্ষে কার্যত বিকল্প কোন নীতির সমর্থক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন মতকে প্রতিফলিত করার এই সীমাবদ্ধতার জন্যই এই ব্যবস্থাকে তীব্র সমালোচনা করা হয়। তাই রামজে মুর (Ramsay Muir) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, একটি জাতি মাত্র দুটি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিভক্ত এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কারণ কোন দেশে মাত্র দুটি চিন্তা-স্রোত আছে এরূপ মনে করা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।[১] সুতরাং বহু চিন্তা, মত ও পথের সমর্থক জনগণকে কেবলমাত্র দুটি চিন্তার যান্ত্রিকতায় বাঁধা সমীচীন নয়। **দ্বিতীয়ত,** দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় একটি দলের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সুনিশ্চিত থাকে। ফলে ক্ষমতায় আসীন দল পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের জন্য আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারে বলে সরকারের ঘন ঘন পতনের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তাই বলা হয় যে, এরূপ অবস্থায় সরকার স্বেচ্ছাচারী ও একনায়ক হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করে বলে মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব ও কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

চোদ্দ ঃ বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-party System)

যখন কোন দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, দেশের আইনসভার নানা দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং আইনসভার সদস্যরা নানা দলে বিভক্ত থাকে তখন তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা

১. "The division of a whole nation into only two political parties must obviously be more or less unreal or arbitrary since it would be absurd to suggest that there could be only two schools of thought in a nation."

বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আজকাল অনেক রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র ফরাসী দেশেই প্রায় ১৫টি রাজনৈতিক দল আছে। ভারতেও পাঁচটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল আছে, দলীয় পরীক্ষানিরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে অনুন্নত দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা স্তিমিত হলে ছোট ছোট দলগুলি বিলীন হয়ে যায় এবং প্রধান দু-তিনটি দল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (Political system) দানা বেঁধে ওঠে।

বহুদল প্রথা কি ?

বহুদল প্রথার উপকারিতা

প্রথমত, এ কথা মনে করা হয় যে, বিভিন্ন মত, পথ ও আদর্শের প্রকাশ ও বিকাশই গণতন্ত্রের প্রাণ। তাই বহুদলীয় ব্যবস্থায় জনমত সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয়ে গণতন্ত্রের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক সমাজ হ'ল নানাবিধ শ্রেণী-স্বার্থের মিশ্রণ। একটি বা দুটি দলের মধ্য দিয়ে সকল শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত হয় না। বহুদল থাকলে, বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রকাশিত হতে পারে। **তৃতীয়ত,** বহুদলীয় ব্যবস্থায় আইনসভা জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিনিধিমূলক হয়। বিভিন্ন দল ভোটদাতার সামনে বিভিন্ন কর্মধারা ও আদর্শ উপস্থাপিত করে। ফলে, এই ব্যবস্থায় বহু মত প্রতিফলিত হয় এবং জনগণের পক্ষে সহজেই নির্বাচনের সময় কোন একটি মত বা প্রার্থী পছন্দ করা সহজ হয়। **চতুর্থত,** বহুদল ব্যবস্থায় কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আধিপত্য খর্ব হয় এবং কোয়ালিশন সরকারের মাধ্যমে সংখ্যালঘু দলগুলো শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। একটি মাত্র দল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভার চেয়ে বহুদল-সমর্থিত মন্ত্রিপরিষদ দেশের জনমতকে ভালভাবে অনুসরণ করতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে পারে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি

প্রথমত, তত্ত্বের দিক থেকে বিশুদ্ধ হলেও বহুদল-প্রথায় বাস্তবে সরকার পরিচালনার কাজ দুরূহ হয়ে পড়ে। লাস্কি বলেছেন, *It is fatal to government as a practical art.* এই ব্যবস্থায় সাধারণত কোন একটি দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। ফলে, শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ গঠন করা সম্ভব হয় না। কয়েকটি দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে, সামান্য মতের গরমিল হলে এবং একটি কি দুটি দল বিপক্ষে গেলেই সেই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যায়। সম্মিলিত সমর্থনের উপর সর্বদা নির্ভর করতে হলে মন্ত্রিসভা দুর্বল হয় এবং যে কোন মুহূর্তে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যেতে পারে। এই জন্যই মন্ত্রিপরিষদ সবসময় অস্থায়ী থাকে, সব সময়ই মন্ত্রীদের অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির ওপর নির্ভর করে কাজকর্ম করতে হয়। কোয়ালিশন সরকারের কোন নীতি গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বহু সময় অতিবাহিত হয়, তাই কোন বিষয়েই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। **দ্বিতীয়ত,** কোয়ালিশনে ঘন ঘন মন্ত্রিপরিষদ গঠন ও পতন হয় বলে শাসনকার্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এক সময়ে এই কারণে ফরাসী দেশে মাসে গড়ে প্রায় একবার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন হত। কারণ, পঞ্চম রিপাবলিকের আগে ফরাসী দেশে ছিল অসংখ্য দল এবং কোয়ালিশন অন্তর্ভুক্ত কোন দলের সমর্থন হারালেই তাসের ঘরের মত সেখানে মন্ত্রিসভার পতন ঘটত। এরূপ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে কোন স্থায়ী নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। **তৃতীয়ত,** বহুদলীয় ব্যবস্থা থেকেলে ভোটদাতারাও বহু দল ও মতের মধ্যে কোন্‌টি সমর্থন করবে তা বুঝে উঠতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়।

দ্বি-দলীয় প্রথায় নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্থায়িত্ব, সরলতা ও দক্ষতার জন্য অনেকে বহুদল প্রথার চেয়ে দু-দল প্রথা বেশি উপযোগী বলে মনে করেন। কিন্তু তারা এই সরল বাস্তব সত্যটিকে অনুধাবন করতে অসমর্থ হন যে, কোন দেশের জনগণ মাত্র দুটি আদর্শ ও দর্শনের কোন একটির

সমর্থক নাও হতে পারে। যেমন, ধরা যাক ভারতে কংগ্রেস ও জনতা দলকে নিয়ে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হল (বস্তুত ভারতে কিছুদিন আগে এরূপ প্রচেষ্টার কথা উচ্চারিত হয়েছিল)। কিন্তু এরূপ অবস্থায় যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস করেন তাঁদের মত ও চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করার মত কোন রাজনৈতিক দল থাকবে না। স্বভাবতই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দিলেও তা টিকবে না।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা

পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য বলে মনে করা হলেও, দ্বি-দলীয় অথবা বহুদলীয়—কোন্‌টি হওয়া কাম্য সে ব্যাপারে ঐক্যমত খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পীঠস্থানে আমরা দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখতে পাই। অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত, ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় উভয় ব্যবস্থার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো আমরা আগে আলোচনা করেছি।

গণতন্ত্রে দ্বি-দলীয় ও বহু-দলীয় উভয় ব্যবস্থা আছে

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, দ্বি-দলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি ভাল এ সম্পর্কে চিরন্তন ও চরম সত্য হিসেবে কিছু বলা যায় না। ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে গড়ে উঠেছে। ঐ দেশগুলোতে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব নয় এবং করলে তা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে।[১] তেমনি ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ফলশ্রুতি হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে। এখানে বারবার চেষ্টা করা হয়েছে—ছোট মাঝারি দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে বাস্তবে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অবস্থানের জন্য তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং প্রতিটি রাষ্ট্রের শ্রেণীগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে একদলীয় বা দ্বি-দলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থা। এর সঙ্গে ভালমন্দের সম্পর্ক খুব একটা থাকে না।

উপসংহার

পনের : বহুদলীয় ব্যবস্থার আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (Classification of Multi-Party Systems)

কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বা কোন দেশে কটি দল আছে তার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে শ্রেণীবিভক্ত করাই হ'ল সাবেকী এবং প্রচলিত পদ্ধতি। যেমন, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি দল থাকে তাকে একদলীয় ব্যবস্থা, দুটি দল থাকলে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা এবং বহুদল থাকলে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলা হয়। কিন্তু আধুনিক অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই শ্রেণীবিভাগকে অসম্পূর্ণ মনে করেন এবং সেই কারণেই এই শ্রেণীবিভাগকে তাঁরা সন্তোষজনক মনে করেন না।

তাই একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি. এ. অ্যালমন্ড (**G. A. Almond**) তাঁর *A Functional Approach to Comparative Politics* বই-এ দলীয় ব্যবস্থাকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :

ক. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা : ১. অস্পষ্ট দ্বি-দল ব্যবস্থা
(উদাহরণ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড)
২. সুস্পষ্ট দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা
(উদাহরণ : ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া)

---

১. বস্তুত ব্রিটেনে কয়েকটি রাজনৈতিক দল আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুটি দল প্রাধান্য বিস্তার করায় এখানে মূলত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

খ. বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ ৩. কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা (উদাহরণ ঃ নরওয়ে, সুইডেন)
৪. অস্থায়ী বহুদল ব্যবস্থা (উদাহরণ ঃ ইতালী, ফ্রান্স)
৫. প্রাধান্যবিস্তারকারী বহুদল ব্যবস্থা
(উদাহরণ ঃ ভারত, মালয়)

গ. একদলীয় ব্যবস্থা ঃ ৬. একদলীয় ব্যবস্থা (উদাহরণ ঃ মিশর, স্পেন)
৭. সমগ্রতাবাদী দলীয় ব্যবস্থা
(উদাহরণ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন, নাৎসী জার্মানী)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এ্যালমণ্ড বহুদলীয় ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

১. **কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা** (Working Multi-Party System)
২. **অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা** (Unstable Multi-Party System)
৩. **প্রাধান্যবিস্তারকারী দলীয় ব্যবস্থা** (Dominant Party System)

অ্যালান বলও (Alan Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* গ্রন্থে উপরোক্ত শ্রেণীবিভাজনকে অনুসরণ করেছেন, যদিও তিনি ঐ সঙ্গে বলেছেন কোন শ্রেণীবিভাজনই যথার্থ হতে পারে না (will lack precision)। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐ বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থার উপরোক্ত শ্রেণীবিভাজনকে বাদ দিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলেছেন *to offer a less dogmatic approach and to elaborate the complexity of the problems of classification and conceptualisation.*

যাহোক, অ্যালমণ্ড বহুদলীয় ব্যবস্থার যে শ্রেণীবিভাজন করেছেন সেটাই বর্তমানে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। বহুদলীয় ব্যবস্থার উপরোক্ত তিনটি রূপকে নীচে আলোচনা করা হ'ল ঃ

১. **কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ** কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবে দু'য়ের বেশি রাজনৈতিক দল থাকলেও কার্যত ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি সরকারের স্থায়িত্বের ব্যাপারে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মত আচরণ করে তবে তাকে কার্যকর বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। যেমন, নরওয়ে ও সুইডেন। উভয় দেশেই বাস্তবে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল থেকে শুরু করে মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে। নির্বাচনে দেখা যায় যে, হয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল, নয় তো মধ্য-দক্ষিণপন্থী দলগুলোর আঁতাত আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করে। সুতরাং বহু দল থাকা সত্ত্বেও ঐ দুটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার মত একটি দল বা অন্য দলগুলোর আঁতাতের জয়কে সুনিশ্চিত করে এবং স্থায়ী (stable) সরকার গঠন নিশ্চিত করে।

২. **অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা ঃ** কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি অনেকগুলো ছোট ও দুর্বল রাজনৈতিক দল থাকে তবে ঐ ব্যবস্থাকে অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে। এরূপ বহু ছোট ছোট দুর্বল দলের অস্তিত্ব থাকার জন্য কোন দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে না। ফলে তারা জোড়াতালি দিয়ে যে সরকার গঠন করে তা স্থায়ী হয় না—মাঝে মাঝেই সরকারের পতন ঘটে। ইতালী ও ফ্রান্সে বামপন্থী থেকে শুরু করে দক্ষিণপন্থী পর্যন্ত এরূপ বহু রাজনৈতিক দল দেখা যায়। ইতালীর আইনসভায় অন্তত আটটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে—এর মধ্যে একটিও বিগত যুদ্ধের পর থেকে আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে ১৯৪৭ থেকে ইতালীতে বহুদলীয় সম্মিলিত সরকার গঠিত হয়েছে বহুবার—কিন্তু ঐ সরকারগুলো গড়ে ন' মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ফরাসী দেশের অবস্থাও প্রায় এক। তবে সেখানে সংবিধান পরিবর্তন (পঞ্চম প্রজাতন্ত্র) করে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

৩. **প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা ঃ** যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু দলের অস্তিত্ব থাকে এবং দলগুলোর মধ্যে আইনসভায় আসন দখলের প্রতিযোগিতা থাকে, কিন্তু সকল সময়েই অন্যদল-

গুলোকে পেছনে ফেলে একটি দলই আইনসভায় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় তখন ঐ ব্যবস্থাকে প্রাধান্যকারী দলীয়ব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহুদল থাকে, তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং আইনসভায় কিছু আসনও পায়, কিন্তু একটি দলই সকল সময় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হ'ল ভারত। ভারতে বহু রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে একটি রাজনৈতিক দলই (জাতীয় কংগ্রেস) একটানা প্রতিটি নির্বাচনে লোকসভায় চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে আবার তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে আসে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু দলের অস্তিত্ব আছে। এদের অনেকেরই সংসদে প্রতিনিধিত্ব আছে, এবং এমন কি এদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কোন অঙ্গরাজ্যে ক্ষমতায় পর্যন্ত আসীন হয়েছে (যেমন, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন)। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে তিনটি বছর বাদে সকল সময়ই একটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য চলছে। ভারত ছাড়াও মালয় এবং মেক্সিকোতেও এরূপ প্রাধান্য বিস্তারকারী বহুদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়। অ্যালান বল অবশ্য মনে করেন যে, প্রাধান্য বিস্তারকারী বহুদলীয় ব্যবস্থা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরণকালীন অস্থায়ী ব্যবস্থা (often transitory)।

ষোল : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব (Importance of Political Parties in a Democracy)

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দলই কেন্দ্রবিন্দু। ফাইনার (Finer) ঠিকই বলেছেন, *Democracy rests in its hopes and doubts, upon the party system. There is the political centre of gravity.* নানা বিপরীত মতাবলম্বীর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে সংগঠিত হবার পূর্ণ অধিকার গণতন্ত্র ঘোষণা করে। গণতন্ত্রের মূল কথা বিভিন্ন ভাবধারাকে সাদরে আহ্বান করা (*hospitality to a plurality of ideas*).

১. বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন দলে আশ্রয় লয়

প্রতিটি ভাবধারা, মতবাদ ও স্বার্থ নিজেদের বাহন খুঁজে পায় কোনো একটি দলের মধ্যে। রাজনৈতিক দল ঐ সকল ভাবধারা ও মতবাদকে গ্রহণ করে প্রচারে নামে, নিজ নিজ আদর্শে বিশ্বাসী লোকজনকে নিজের পতাকার তলে সংগঠিত করে তোলে। দল না-থাকলে ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এক একটি অ্যাটম—অসংগঠিত এবং একে অন্যের অপরিচিত। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ চিন্তাধারাগুলো ঘষে-মেজে রাজনৈতিক দল বহুব্যক্তিকে একে অন্যের কাছাকাছি, গ্রহণীয় ও সহনযোগ্য করে তোলে।

২. গণতন্ত্র জনমতের শাসন, দল সেই জনমত গঠন করে

গণতন্ত্র জনমতের শাসন। কিন্তু এই জনমত গঠন করা, কার্যসূচী প্রণয়ন করা, প্রচার করা ও ভোটের বাক্সে সেই জনমতকে নিঙড়ে যত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়ে সরকার গঠন করার জন্য একটি যন্ত্র প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল সেই যন্ত্রের কাজ করে। লাওয়েলের ভাষায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের প্রধান কারণ *bringing public opinion to a focus and forming issues for the popular verdict.* অসংখ্য ভোটদাতা বা নির্বাচকমণ্ডলীর বিশৃংখলার মধ্যে রাজনৈতিক দল শৃংখলা ফিরিয়ে আনে। সমাজে অসংখ্য বিক্ষিপ্ত 'পাবলিকের' মতামত সংগ্রহ করে রাজনৈতিক দল সেগুলোকে সরকারী যন্ত্রে প্রবেশ করায়। ম্যাকআইভার ঠিকই বলেছেন, *It is the agency by which public opinion is translated into the public policy.*

গণতন্ত্রের ভিত্তি হল জাতীয় ঐক্য ও সার্বিক কল্যাণের ধারণা। ঐ ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে দল প্রয়োজন। সমাজে আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা আছে, আর্থনীতিক শ্রেণীবিরোধ

ও ভাষাবিরোধ আছে, ধর্মীয় বিরোধ আছে, পরস্পরবিরোধী আর্থনীতিক শ্রেণীবিরোধ আছে। রাজনৈতিক দল 'জাতীয়' স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় বলে ঐ সকল বিরোধের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে তোলে। দল সকল সময় বিরোধ মেটাতে পারে না, কিন্তু বিরোধের তীব্রতা হ্রাস করে, যাতে ঐ বিরোধ ফেটে পড়ে সমগ্র জাতীয় ঐক্যে ফাটল না ধরায়। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচকমণ্ডলীকে 'জাতীয়' করে তোলে। ফাইনারের ভাষায়, *They garher up the whole nation into fellowships, and they lead, in the sense of bringing to the individual citizen a vision of the whole nation.*

৩ রাজনৈতিক দল জাতীয় ঐক্য গঠন করে

রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক শিক্ষাদানের দায়িত্বও পালন করে। রাজনৈতিক বিতর্ককে একেবারে পথে-ঘাটে টেনে এনে তারা জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা-দীক্ষার সাধারণ মান উন্নত করে তোলে। দলের প্রচার কোনো কোনো নির্বাচককে সক্রিয় করে, অনেক মূক নির্বাচককে মুখর করে, অন্যান্যদের শিথিল মতামত ও সমর্থনকে সুদৃঢ় করে তোলে, অনেক বিরোধীর মতামত পরিবর্তিত করে নিজের পক্ষে টেনে আনে। জনতার একটা বিরাট অংশ মূলত অলস এবং নানা বিরোধে বিভক্ত থাকে। রাজনৈতিক দল জনগণের অনীহা, আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে দিতে পারে। দলপ্রথার প্রধান গুণই হল সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কে নির্বাচকদের আগ্রহী করে তোলা।

৪. জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলে

অন্যান্য ধরনের সরকারের তুলনায় গণতন্ত্রের বিশেষ গুণ হল জনগণের কাছে প্রশাসনের দায়িত্বশীলতা। সরকারের কাজের সমালোচনা ও বিরোধিতার অধিকারকে রাজনৈতিক কার্যধারায় নিয়মসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করা। এই গণতান্ত্রিক রীতির ওপর রাজনৈতিক দল নির্ভর করে। বাস্তবে দলপ্রথাই সরকারকে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল রাখে। বিরোধী দলের কাজ কেবল বিরোধিতা করা নয়, বিরোধী দল হ'ল সরকারের সদাজাগ্রত সমালোচক। জনসাধারণ কর্তৃক সরকারী দলকে সমর্থনের প্রতিটি দুর্বল ছিদ্র এরা খুঁজে বের করে, সকল সময় সরকারী দলকে জনমতের দরবারে হাজির করে তার নীতিগুলোকে কষ্টিপাথরে বিচার করাতে সচেষ্ট থাকে। সরকারী দল কোন বাধার সম্মুখীন না-হলে সরকার দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। দলপ্রথায় সরকারী ও বিরোধী উভয় দলই পর্যায়ক্রমে প্রশাসন চালায়, ক্ষমতার অংশ ভাগ করে ভোগ করে। একদল প্রশাসনে, অপর দল বিরোধিতায়--ইহাই সরকারকে দায়িত্বশীল করে ও ক্রমশ বেশি পরিমাণে গণতন্ত্রী করে তোলে।

৫. দল জনসাধারণের কাছে প্রশাসনকে দায়িত্বশীল করে

সবশেষে মনে রাখা দরকার যে, দলপ্রথা ছাড়া পার্লামেণ্টারী সরকার চালান অসম্ভব। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রীরা সাধারণভাবে, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভ্য হয়। একটি দল সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে, অন্যান্য দল ঐ দলের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আইনসভার আস্থা যতদিন বজায় থাকে, দল ততদিন সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসন চালায়। আইনসভার সদস্যের আস্থা বজায় রাখার দায়িত্ব দলের। দলীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা থাকে বলেই আইনসভার সদস্যরা সকল সময় সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে বিরোধীদের হাত থেকে সরকারের পতনকে বাঁচাতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং দল না থাকলে পার্লামেণ্টারী প্রথা চলতেই পারে না।

৬. দল পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা সফল করে

নিউম্যান মনে করেন যে, কোন দেশের শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বও সে দেশের রাজনৈতিক দলের টিকে থাকার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। দলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে ভি. ও. কী (**V. O. Key**) বলেছেন যে, রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটা মৌল উপাদানে পরিণত হয়েছে (**Political Parties constitute**

সাম্প্রতিক মত

a basic element of democratic institutional process)। তাই সাম্প্রতিক কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলের বিকাশের সঙ্গে গণতন্ত্রের বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

নমুনা প্রশ্ন

1. জনমত কাকে বলে? জনমত কিভাবে গঠিত ও প্রকাশিত হয়? (এক দেখ) [H. S. C. '78]
2. জনমত গঠনের প্রধান উপাদানগুলো কি? উপাদানগুলোর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। (তিন দেখ)
3. জনমত বলতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব আলাচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '78, '84 and T. S. B. '79]
4. গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব আলোচনা কর। (এক এবং দুই দেখ)
5. জনমত গঠনের উপাদানগুলো আলোচনা কর। (তিন দেখ)
6. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী আলোচনা কর। (চার ও ছয় দেখ)
7. দলীয় ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি আলোচনা কর। ত্রুটিগুলো কিভাবে দূর করা যায়? (সাত এবং আট দেখ) [T. S. B. '70]
8. দলপ্রথার সাফল্যের শর্তগুলো আলোচনা কর। এই শর্তগুলো ভারতে আছে কি? (নয় এবং দশ দেখ)
9. একদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? এ ব্যবস্থার দোষগুণ বিচার কর। (এগার দেখ)
10. একদলীয় ব্যবস্থা কি গণতন্ত্রবিরোধী? যুক্তিসহ আলোচনা কর। (বার দেখ)
11. দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থার দোষগুণ আলোচনা কর। এদের মধ্যে কোন্ ব্যবস্থা তুমি পছন্দ কর এবং কেন কর? (বার এবং তের দেখ) [H. S. C. '79]
12. দ্বি-দলীয় এবং বহু দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক আলাচনা কর। (তের এবং চৌদ্দ দেখ)
13. দ্বি-দলীয় এবং বহু দলীয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর। (তের এবং চৌদ্দ দেখ) [H. S. C. '84]
14. বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে? এই ব্যবস্থার দোষ-গুণ আলোচনা কর। (চৌদ্দ দেখ)
15. বহুদলীয় ব্যবস্থার আধুনিক শ্রেণী বিভাগ আলোচনা কর। (পনের দেখ)
16. গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (ষোল দেখ) [H. S. C. '79, '85 ard T. S. B. '79]
17. রাজনৈতিক দল বলতে তুমি কি বোঝ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। (চার এবং ষোল) [H. S. C. '81 এবং '83]

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরে টিক্ (✓) দাও:
   (i) জনমত গঠনের অন্যতম উপাদান (রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল)
   (ii) রাজনৈতিক দলকে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি মনে করেন (ভাববাদীরা, মার্কসবাদীরা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা)
   (iii) ভারতে (একদলীয়, দ্বি-দলীয়, বহুদলীয়) ব্যবস্থা দেখা যায়। [H. S. C. '80 and '83]
   (iv) পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে (একদলীয়, দ্বিদলীয়) ব্যবস্থায় গণতন্ত্র সফল হতে পারে।
   (v) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (ব্রিটেন, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন)-এ দেখতে পাওয়া যায়।

"The electorate is not only the body of citizens which in most democratic states determines in the last analysis the form of government of the state and chooses those who guide and direct its affairs, but in modern democracies, it has......acquired the character of an organ of government itself."

—Dr. Garner

৬

প্রতিনিধিত্ব ও ভোটাধিকার
Representation and Suffrage

ভোটাধিকার, নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্যাস বলে মনে করা হয়। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থারও প্রসারণ ঘটছে। অন্যদিকে প্রতিনিধিত্বকে কিভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে আরও গণতান্ত্রিক করা যায় এবং এর দ্বারা বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করা যায় সেটাও গণতন্ত্রের একটা মৌল সমস্যা বা জিজ্ঞাসা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এক : প্রতিনিধিত্ব কাকে বলে ? (What is Representation ?)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক হলে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আসে না, কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ওপর নির্ভরশীল বলে ভোটাধিকারের সঙ্গে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগ পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগ। পরোক্ষ গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা বাস্তবে কার্যকর করার প্রধান উপায় হল নির্বাচকমণ্ডলী স্থির করা ও আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠানো।

একনায়কতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করা বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন প্রয়োজন হয় না, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকলেই এই সকল সমস্যার উদ্ভব হয়। গণতন্ত্রে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হল জনসাধারণ। জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভায় প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে সেই সার্বভৌম শক্তি তাঁদের হাতে অর্পণ করে। নির্বাচনের অর্থ হল ভোটদান ও প্রতিনিধি প্রেরণ, এই কাজের মধ্য দিয়েই গণ-সার্বভৌমত্ব নিজেকে প্রকাশ করে। এই কারণেই গণতন্ত্রের অগ্রগতির বাস্তব উপায় হল ভোটের অধিকার প্রসার। আজকাল প্রায় সকলে এটা মেনে নিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত।

সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা যত বাড়ছে ততই সরকারের আইন-কানুন জনস্বার্থের প্রতি নজর রেখে রচিত হচ্ছে। প্রাচীন কালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নগর রাষ্ট্রের নাগরিকেরা প্রত্যেকে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারত। পরবর্তীকালের বৃহদাকার রাষ্ট্রগুলোতে সরকারী কাজে সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাগরিকগণ কর্তৃক প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ঐ সকল প্রতিনিধি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের বিশ্বাস, চিন্তা ও ধারণাগুলো আইনসভায় পেঁছে দেয়ার বাহন। জনসাধারণ সচেতনভাবে এদের আইনসভায় পাঠায়, তাই এদের কাজকর্ম মেনে নিতে জনগণ বাধ্য থাকে এবং মনে করা হয় যে এরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব (Representation) করছেন।

প্রতিনিধিত্বের মূল কথা হল সরকারের দায়িত্বশীলতা। এই কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের (Represnetative Government) অন্য নাম দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government)। প্রতিনিধি-প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল সরকারের উপর দায়িত্ব আনা। কোন প্রতিনিধি তাঁর কাজের জন্য নিজের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী, এভাবে সরকার দেশের সমগ্র জনসাধারণের নিকট দায়ী। অন্যদিকে নিজেদের প্রতিনিধিরা যে আইন তৈরী করে তা মেনে নেয়াও জনসাধারণের দায়িত্ব।

দুই : প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন বা সার্বিক ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage)

ভোটের অধিকারের দাবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বহু বিপ্লব ও রক্তপাত ঘটেছে। অতীতে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, জনসংখ্যার নির্দিষ্ট একটি অংশ ভোট দিতে পারত। ক্রমশ ভোটের অধিকার দেশের অধিকতর নাগরিকদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে। এভাবে বর্তমান যুগে, ভিক্টর হুগোর ভাষায়, সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যক্তির মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে তাকে নাগরিক করেছে (Adult suffrage has crowned man as the citizen)। ঊনবিংশ শতকে ক্রমশ বেশি সংখ্যক ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভোটাধিকার প্রসারের এই ধারা দ্রুততর হয়েছে। অধ্যাপক গার্নারের ভাষায় বলতে গেলে : বিগত শতকে গণতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সংকীর্ণ, অসম, অপ্রত্যক্ষ এবং সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ, সম ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রবর্তন। এতদিন ধর্ম, জাতি, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি কারণে যে বাধানিষেধ তৈরী করা হয়েছিল গণতন্ত্রের জোয়ারে তার অধিকাংশই লুপ্ত হয়েছে। বিংশ শতকে গণতন্ত্রের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্বজনীন ভোটাধিকার আরও সম্প্রসারিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও পৃথিবীর সকল জায়গায় সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী গ্রহণযোগ্য কিনা এ ব্যাপার এক সময়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। একটা রাষ্ট্রের সমগ্র জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা যে কাম্য নয়, এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের বিশেষ কোন অবকাশ নেই। নাবালক, উন্মাদ, দেউলিয়া, শাস্তিপ্রাপ্ত আসামী ইত্যাদিকে যে ভোটাধিকার দেয়া উচিত নয় এ ব্যাপারেও সকলেই একমত। কিন্তু এরা ছাড়া অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেয়ার ব্যাপারে মতভেদ থাকবার জন্যই প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

নির্বাচকমণ্ডলী কাদের নিয়ে গঠিত হবে এ প্রশ্নে একদল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করেন। অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, ভোটাধিকার সর্বজনীন হওয়া উচিত নয়,—এই অধিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ এবং নারী-পুরুষের ভিত্তিতে প্রদান করা উচিত।

জন স্টুয়ার্ট মিল সম্পত্তি এবং বিশেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন (**universal teaching must precede universal enfranchisement**)। যাদের সম্পত্তি আছে তারা দায়িত্বশীল এবং তারা কর প্রদান করে বলে সরকারের আয়, ব্যয় ও নীতি নির্ধারণে একমাত্র তাদেরই ভূমিকা থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। সুতরাং মিল ভোটাধিকারকে সঙ্কুচিত করে শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে ঐ মতের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, সম্পত্তির মালিকানা মনুষ্যত্ব বা যোগ্যতার মানদণ্ড নয়। **দ্বিতীয়ত** ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য যে বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা প্রয়োজন তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নেই—শিক্ষা-নিরপেক্ষ বা অশিক্ষিত ব্যক্তিরও ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা থাকতে পারে।

শিক্ষা এবং সম্পত্তি মানদণ্ড

তাই শিক্ষা ও সম্পত্তিকে যোগ্যতার মানদণ্ড না ধরে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটাধিকার প্রদান করার দাবী জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। একেই বলে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার। আঠারোর শতকে স্বাভাবিক অধিকার, জনকল্যাণ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি যুক্তিতে সর্বজনীন ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের দাবী লক, রুশো ও অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দ্বারা সোচ্চার হয়।

স্বপক্ষে যুক্তি

যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা এবারে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের সরকার বোঝায়। তাই জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের-ই ভোটের অধিকার থাকা উচিত। রুশো (**Rousseau**) বলেছেন, "সার্বভৌম শক্তি জনসাধারণের মধ্যে নিহিত; তাই প্রত্যেক নাগরিকেরই ঐ সার্বভৌম শক্তি পরিচালনা করার অধিকার আছে। ভোট দেবার জন্মগত অধিকার এরই অপরিহার্য পরিণতি।"

জনগণের সার্বভৌমত্ব

দ্বিতীয়ত, সরকারের আইন-কানুন সবাইকে সমানভাবে স্পর্শ করে, তাই প্রত্যেকেরই ভোটের অধিকার থাকা দরকার (**what touches all must be decided by all**)। ঐ অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যক্তি সরকারী আইন-কানুন প্রণয়নকে প্রভাবিত করতে পারে।

আইন সকলকে সমভাবে স্পর্শ করে

তৃতীয়ত, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভোটের অধিকার যদি নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে কার্যত দেশ সেই শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী শাসিত হবে। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহৃত হবে। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সরকার সর্বসাধারণের কল্যাণে দেশ শাসন করবে না। ভোটের অধিকার না পেলে সরকারের সুবিধেগুলো হতেও তারা বঞ্চিত হবে। অধ্যাপক লাস্কির ভাষায় বলা যায় যে, ভোটদানে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থ ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা।[১] ইতিহাসে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো যায় যে, জনগণের রাজনৈতিক অধিকার না থাকলে আইন-কানুন তাদের স্বার্থে রচিত হয় না।

শ্রেণীস্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র যাতে ব্যবহৃত না হয়

১, "Exclusion from power means exclusion from the benefits of power"

চতুর্থত, নাগরিকের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ সম্ভব সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে। মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ প্রসার লাভ করে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে যদি সে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। নাগরিক ভোটের অধিকার পেয়ে সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করলে সে রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা ভাবনার অংশীদার হয়। তাই সর্বজনীন ভোটাধিকার দেশে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

নাগরিকদের যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য

পঞ্চমত, বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। সর্বজনীন ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদানের দ্বারা জনগণের সর্বজনীন রাজনৈতিক সাম্য নিশ্চিন্ত করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা

বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু ব্লুনৎস্লি, হেনরী মেইন, মিল, মেকলে, লেকী প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা উপরোক্ত যুক্তিগুলো মানতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। প্রথম, অভিজাততান্ত্রিক যুক্তির ভিত্তিতে মেকলে, লেকী ও স্যার হেনরী মেইন প্রমুখরা মনে করেন যে, অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকার দেয়া অবিজ্ঞোচিত এবং বিপজ্জনক। মেকলে বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করলে পেঁচা ও শিয়ালদের সংগে কিছু অর্ধ-নগ্ন ধীবর দেশটাকে ভাগ করে নেবে **(a few half-naked fishermen would divide with the owls and foxes the ruins of the greatest of European cities)।**

অভিজাততান্ত্রিক যুক্তি

লেকী তাঁর *Democracy and Liberty* বই-এ সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসনে দেশের প্রগতি কোন মতেই সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, অজ্ঞ ও অক্ষম জনতা রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হয়ে দেখা দেবে যা মানুষের অতীত ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

স্যার হেনরি মেইনের মতে সর্বজনীন ভোটাধিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তিনিও বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলনের আগেই বিজ্ঞানের প্রধান আবিষ্কারগুলো হয়ে গিয়েছে, এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যজনক।

এই সকল যুক্তি অতিশয়োক্তি তাতে সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এমন বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে। তবে ঐ সকল সমালোচনার নির্যাস হ'ল যে, জনসাধারণের হাতে শাসনভার অর্পণ করার আগে তাদের শিক্ষিত ও যোগ্য করে তোলা দরকার। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে **সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন (universal education must precede universal enfranchisement)।**

দ্বিতীয়ত, অনেকেই মনে করেন যে, ভোটদানের অধিকার তাদেরই থাকা উচিত যাদের সম্পত্তি আছে এবং যারা রাষ্ট্রকে কর দেয়। এই যুক্তির দুটি কারণ; (ক) ধরা হয় যে, সম্পত্তিবানরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত এবং তাই ভোটদানের তারা যোগ্য; (খ) সম্পত্তি নাই এরূপ ব্যক্তিরা সাধারণত কর দেন না, তাই সরকারের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে তারা দায়িত্বহীন হন। কর না দিলে রাষ্ট্রের আয়ব্যয়, পরিচালনা সম্পর্কে তাদের কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়। করদান-গত যোগ্যতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যারা কর দেন না তাঁরা অপরের দেওয়া কর-এর দ্বারা পুষ্ট অর্থভাণ্ডার নিয়ে শাসন চালালে অপব্যয়ী হবেন এবং মোটেই ব্যয়-সংকোচের চেষ্টা করবেন না।

সম্পত্তিগত মানদণ্ড

সাধারণভাবে বলা যায় যে, উপরের ঐ যুক্তিটি খুবই প্রতিক্রিয়াশীল। সমাজে কঠোর শ্রেণী-পার্থক্য থাকার জন্য দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী সমাজের বিত্তবান শ্রেণীই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। কোন ব্যক্তির

দারিদ্র্য তার রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। করদানের যোগ্যতা থাকা উচিত এই যুক্তি অনেকাংশে সঠিক। রাষ্ট্র কর পেতে পারে, কর না পেলে সরকারের ব্যয় মিটানো সম্ভব নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের-ই দেখা উচিত, প্রতিটি নাগরিক যাতে কর দেবার মত উপযুক্ত আয় করতে পারে। সেই বিষয়ে লক্ষ্য না রেখে ভোটাধিকার সংকোচন করা উচিত কি?

তৃতীয়ত, অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ভোটদানের অধিকারের ভিত্তি করতে চান। এর স্বপক্ষে শক্তিশালী প্রবক্তা হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি বলেছেন, যে লিখতে ও পড়তে জানে না, সাধারণ অংক জানে না এইরূপ লোক ভোটাধিকার পাবে—এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

স্টুয়ার্ট মিলের এই বক্তব্যের বিপক্ষে বলা হয় যে, রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি নিছক স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের ওপর নির্ভর করে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ নির্ধারিত হয়, গ্রাহাম ওয়ালাসের (Graham Wallas) ভাষায় বলা যায়, প্রবণতা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা (intuitions, passions and desires)। অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক চেতনাই ভোটদাতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। সুতরাং তথাকথিত শিক্ষার অভাবের জন্য নাগরিককে ভোটদানের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

শিক্ষাগত মানদণ্ড

চতুর্থত, অনেকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকার মানলেও মনে করেন যে, স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত নয়। কারণ স্ত্রীলোক নাকি ভোটাধিকার প্রয়োগের অযোগ্য, রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন, পুরুষদের দ্বারা সহজে প্রভাবিত এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানের অনুপযুক্ত। ঐ সকল যুক্তিতে অনেকে এখনও স্ত্রীভোটাধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। স্ত্রীভোটাধিকারের সবচেয়ে সমর্থক ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি ঐ সকল যুক্তি খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে, স্ত্রীলোকেরা যোগ্যতাহীন নয়, ভোটের অধিকার পেলে তাদের রাজনৈতিক চেতনা আরও বাড়বে। নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

নারীদের ভোটাধিকার থাকা উচিত

সর্বজনীন ভোটাধিকার সর্ববাদিসম্মত হলেও আজকাল অনেক রাষ্ট্রেই কিছু কিছু লোককে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। যেমন, সর্বজনীন ভোটাধিকার থাকলেও নাবালক, উন্মাদ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, দেউলিয়া, ভবঘুরে, কতকগুলো বিশেষ পদাধিকারী, যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত সৈনিক ইত্যাদি স্তরের লোকদের সাধারণত অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ভোটাধিকার দেয়া হয় না।

তিন : নারীজাতির ভোটাধিকার (Women Suffage)

সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী যদি বা স্বীকৃত হল, তখন নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিল নারীজাতির ভোটাধিকার থাকা উচিত কি না। অর্থাৎ নারীজাতিকে বাদ দিয়ে সর্বজনীন ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা উঠল। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে, নারীজাতির ভোটাধিকার থাকা উচিত কি না তাকে একটা বিতর্কিত বিষয় হিসেবে আমাদের আজ বিশের শতকের শেষে আলোচনা করতে হচ্ছে। এবং এটা আরও লজ্জার কথা যে, এমনকি তথাকথিত গণতন্ত্রের পীঠস্থান সুইজারল্যাণ্ডেও নারীজাতির ভোটাধিকারের দাবী কিছুদিন আগে পর্যন্ত উপেক্ষিত ছিল। তবে সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডে নারীজাতির ভোটাবিকার স্বীকৃত হয়েছে।

বিপক্ষে যুক্তিসমূহ

নারীজাতিকে ভোটাধিকার দেয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের মধ্যে একসময় তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। যারা নারীজাতিকে ভোটাধিকার দিবার পক্ষপাতী নহেন তাঁদের বক্তব্য ও যুক্তিগুলি প্রথমে আলোচনা করা হল।

প্রথমত, অনেকে বলেন যে, নারীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতায় নিকৃষ্ট এবং ফলে তাঁরা দেশের রাজনৈতিক জীবনে, এবং দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে বিশেষ কোন প্রভাব আনতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁরা সাধারণভাবে উদাসীন। তাঁদের ভোটের অধিকার দিলেও তাঁরা ঐ অধিকার যথার্থভাবে ব্যবহার করবেন না।

তৃতীয়ত, যদি বা তাঁরা ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেনও, তবুও ঐ ভোটাধিকার তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে না। কারণ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতেই নিজেদের মতামত স্থির করেন। তাই স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেয়া এবং বাড়ির পুরুষদের দুটি করে ভোটাধিকার দেয়া একই কথা।

চতুর্থত, আরও বলা হয় যে, ভোটের অধিকার তাঁরাই পেতে পারেন, যারা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে সক্ষম এবং রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। রাষ্ট্রকে রক্ষায় স্ত্রীলোকের শক্তি বা সামর্থ্য নেই, তাই তাঁদের ভোটাধিকার দেয়া উচিত নয়।

স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ

নারী জাতির ভোটাধিকারের স্বপক্ষেও বহু যুক্তি দেখান হয়েছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার বহু বিদুষী রমণী নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে দীর্ঘকাল আন্দোলন করেছেন। বিখ্যাত ইংরাজ মনীষী জন স্টুয়ার্ট মিল নারীজাতির ভোটাধিকারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে কোন ব্যক্তি স্ত্রীলোক না পুরুষ এটা একান্তই গৌণ—ব্যক্তির উচ্চতা, চুলের রঙ ইত্যাদি বাহ্য চিহ্ন দ্বারা তার নৈতিক ও চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সম্পর্কে কিছু বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সরকারের নীতি ও কাজকর্ম দেশের পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদেরও সমানভাবে প্রভাবিত করে, তাই যে প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করবেন তাঁদের নির্বাচনে স্ত্রীলোকদেরও সমান অধিকার থাকা দরকার। মিলের ভাষায় বলা যায় যে, শাসিত হবার জন্য নয়, যাতে কুশাসিত না হয় তার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভোটাধিকার থাকা প্রয়োজন ((Men, as well as women need political rights not in order that they may govern but in order that they may not be misgoverned)।

তৃতীয়ত, বিদ্যা, বুদ্ধি ও মননশীলতায় স্ত্রীলোকেরা কোন দিক থেকেই পুরুষের চেয়ে হীন নয়। তাঁরা সম্পত্তি রক্ষা করেন, কর দেন, ব্যবসায় পরিচালনা করেন এবং সকল বিষয়েই পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন। নারীজাতি বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট এরূপ অর্থহীন অহমিকা প্রচারের কোন ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি আছে কি? বর্তমান যুগে নারী চন্দ্রলোকে পাড়ি দিয়েছেন; অনেক দেশে নারী প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে যোগ্যতার সঙ্গে নিজ নিজ জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন; জ্ঞান, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, খেলাধুলা ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমানপূর্ণ প্রমাণ করছেন। সুতরাং ভোটের অধিকার নারী জাতি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে না, এ কথা বলা ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

চতুর্থত, কিছু স্ত্রীলোক পুরুষদের মতামতে প্রভাবিত হন ঠিকই, কিন্তু অনেক পুরুষও তাঁর স্ত্রী-বন্ধু বা অন্যের মত অনুসারে ভোট দেন। সুতরাং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার সম্ভাবনার জন্য নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে অনেক পুরুষকেও একই কারণে বঞ্চিত করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, বলা হয় যে, স্ত্রীলোকেরা সাধারণত রাজনীতি এবং ভোটাভুটির ব্যাপারে উদাসীন এবং নিস্পৃহ থাকে। কিন্তু অনেক পুরুষও রাজনীতি এবং ভোটদানকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা ঝঞ্ঝাট বলে মনে করেন। ভোটাধিকার লাভ করে প্রথম দিকে স্ত্রীজাতি ভোটের বিষয়ে উৎসাহ না দেখালেও ক্রমশ তাঁরা রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং উৎসাহ ও যোগ্যতার সঙ্গে এই অধিকার প্রয়োগে সমর্থ হবেন।

সর্বোপরি, দেশের সকল মানুষকে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক হতে হয় না, যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ঘরে-বাইরে বিপুল সংখ্যক জনগণকে কাজ করতে হয়। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক

না হয়েও স্ত্রীলোকেরা রাষ্ট্রকে যুদ্ধের সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে এবং বাস্তবে সাহায্য করে।

মিলের মতে, পুরুষের স্বার্থপরতা এবং দুরারোগ্য সংস্কার'-এর জন্যই তাঁরা নারীজাতির ভোটাধিকারের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, কার চামড়ার কি রং হবে তা যেমন ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে না, তেমনি নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাও কারো ইচ্ছাধীন নয়। তাই তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, বর্তমান প্রজন্ম (generation) অতিক্রান্ত হবার আগেই নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার দুর্ঘটনা তাঁদের পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকার লাভ ও নাগরিক হিসেবে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অন্তরায় হিসেবে আর কাজ করবে না।

উপসংহার

নারীর ভোটাধিকার থাকা উচিত কিনা এটা কোন আলোচনার বিষয় বলে আমরা মনে করি না। নারী এবং পুরুষ উভয়েই মানুষ এবং ভোটাধিকার মানুষের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা যে অধিকারগুলো অর্জন করেছি, সে সকল নব নব মহান্ সৃষ্টির দ্বারা আমরা নতুন নতুন দিগন্ত রচনা করেছি—তাতে নারী ও পুরুষ সমান অংশীদার। নজরুলের ভাষায় বলা যায়,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

চার : ভোট দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Implications of the Right to Vote)

ভোট দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দান করা নাগরিকের একটি অবশ্য কর্তব্য; ভোটদাতার ঐ অধিকার অর্জন করার এবং যথাযথ ভাবে ঐ দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা থাকা চাই। যাদের ঐ ক্ষমতা নেই, তাদের ভোটদানের অধিকার দেয়া অনুচিত। এজন্যই প্রত্যেক সভ্যদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত ও বিদেশীদের ভোটাধিকার দেয়া হয় না। জনমতের ওপরেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি। জনমত কাজে পরিণত করার উপায় সর্বজনীন ভোটদান। এর মাধ্যমে জনসাধারণ শাসনকার্যে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। ঐ সম্মতি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

ভোটাধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তি

সুতরাং জনসাধারণের ভোটাধিকার না থাকলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। শাসনকর্তারা যাতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে না ওঠে এবং যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে না পারে সেজন্য জনগণের ভোটাধিকার থাকা একান্ত আবশ্যক। ভোটদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করে নূতন সরকার গঠন করতে পারে।

কাকে ভোট দিলে ব্যাপক সংখ্যক নাগরিকের স্বার্থ রক্ষিত হবে তা বিচার করে তবে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। হুজুগের বশে, ভয়ে, অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে ভোট দেয়া গুরুতর অপরাধ। এরূপ গর্হিত কার্য যে করে সে নাগরিক হওয়ার অনুপযুক্ত। এর জন্য সে আইনের চক্ষে অপরাধী না হলেও নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী এবং কর্তব্যহীন বলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিবেচিত হয়। ভোটপ্রার্থীদের দোষ ও যোগ্যতা সূক্ষ্মভাবে বিচার করে যে প্রতিনিধি হবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তাকে ভোট দেয়াই প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাষ্যভাবে ও সুবিবেচনার সঙ্গে ভোটাধিকার ব্যবহার করার ওপর।

অনেকে মনে করেন যে, ভোট দেয়া একটি সাধারণ কাজ। খুশিমত কাকেও ভোট দিলেই কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। ভোটাধিকারের একটা গভীর অর্থ ও

তাৎপর্য আছে। প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার মধ্যেই বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি স্থাপিত। গণতন্ত্রকে বলা হয় "জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণ কর্তৃক, জনসাধারণের শাসন"। এই কথাটার সত্যতা নির্ভর করে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথার ওপর।

গণমতের সক্রিয় প্রকাশ

বর্তমান যুগের বড় বড় রাষ্ট্রে প্রাচীন কালের গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রের মত সকল নাগরিক একত্রে মিলিত হয়ে প্রকাশ্য সভায় ভোট দিয়ে আইন পাশ করতে পারে না। এজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাদের মুখপাত্র হিসেবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ঐ প্রতিনিধি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের সকল ভোটদাতার পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছা এবং মতামত আইনসভায় প্রকাশ করে এবং সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিতর্কে যোগ দিয়ে ও যুক্তি দেখিয়ে অন্যান্য সভ্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে।

সুতরাং ভোট দেওয়ার মধ্যে জনসাধারণের হাতে শাসননীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিহিত আছে। দেশের শাসনক্ষমতা কার ওপর ন্যস্ত থাকবে, কি আইন পাশ হলে অথবা বাতিল হলে অথবা সংশোধিত হলে জনসাধারণের কল্যাণ হবে, কি কি জনহিতকর কার্যে সরকার মনোযোগ দিবে, আর্থিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য কি কি নীতি অবলম্বন করা উচিত হবে, ইত্যাদি সব বিষয়েই ভোটদাতা ভোটাধিকারের মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে। বর্তমান যুগে সকলেই স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রের নাগরিকের সমষ্টিই সার্বভৌম শক্তির প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে এই ভোটাধিকার প্রয়োগের ভিতর দিয়েই নাগরিকদের সেই সার্বভৌম শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফরাসী দার্শনিক রুশো সর্বজনীন ইচ্ছাকে (General Will) রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। ভোটদানের মাধ্যমে ঐ শক্তির বাস্তব প্রকাশ ঘটে।

পাঁচ : ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage in India)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে আইনসভার সদস্যদের ওপর মন্ত্রিসভা গঠন করে শাসনকাজ পরিচালনার ভার দেয়া হয়েছে।

ভারতে জাতি, ধর্ম বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতে ভোটদাতা হতে হলে : ১ ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, ২. ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে, ৩. বিকৃতমস্তিষ্ক বা দেউলিয়া ব্যক্তি এবং দুর্নীতি বা নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে ; এবং ৪. ভোটদাতা যে অঞ্চলের ভোটার-তালিকাভুক্ত হয়েছে সাধারণভাবে তাকে সেই অঞ্চলে বাস করতে হবে।

সংসদ বা রাজ্যের বিধানসভার কোন কক্ষে প্রার্থী (candidate) হিসেবে দাঁড়াবার যোগ্যতাও এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার। লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচন প্রার্থীদের বয়স কমপক্ষে ২৫ বছর হওয়া চাই। রাজ্যপরিষদ ও বিধান পরিষদে প্রার্থীদের বয়স অন্যূন ৩০ বছর হতে হবে। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হওয়া দরকার।

দেশের সকল ভোটদাতা কর্তৃক পাঁচ বছর অন্তর নূতন করে কেন্দ্রের ও রাজ্যের আইনসভা-গুলোর সকল সদস্যদের একযোগে নির্বাচনকে **"সাধারণ নিবাচন'** (General Election) বলে। কেন্দ্রীয় সংসদ বা অঙ্গরাজ্য বিধানসভার একটি বা দুটি সভ্যপদ শূন্য হলে পূরণ করার জন্য যে-নির্বাচন হয় তাকে **'উপ-নির্বাচন'** (by-election) বলে। যিনি ভোট দেন তাঁকে বলা হয় 'ভোটদাতা' (voter)। সকল ভোটদাতাকে একত্রে নির্বাচকমণ্ডলী (electorate) বলা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় ; এক একটি অঞ্চলের ভোটদাতাগণ কেন্দ্রে ও রাজ্যে নির্দিষ্ট-সংখ্যক প্রতিনিধি (representative) নির্বাচন করেন। এরূপে এক-একটি অঞ্চলকে 'নির্বাচনক্ষেত্রে' বা 'নির্বাচনী এলাকা' (constituency) বলা হয়।

দশ বছর অন্তর যে আদম-সুমারী (লোকগণনা বা census) হয় তার ভিত্তিতে জনসংখ্যা হিসেবে নির্বাচনী এলাকা ভাগ করা হয়। **লোকসভার নির্বাচনে** ৭ লক্ষ ২০ হাজার অধিবাসীর

জন্য একজন সদস্য ; আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ৭৫ হাজার অধিবাসীর জন্য একজন সদস্য ; মোটামুটি এই হিসেব অনুসারে নির্বাচন এলাকার সীমানা নির্ধারিত হয়। তফসিলী উপজাতির জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকে। ঐ আসনে তফসিলী জাতি বা উপজাতির (Scheduled Castes or Tribes) প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবে না। বলা হয়েছিল যে, সংবিধান শুরু হওয়ার দশ বছর পর আর সংরক্ষিত আসনের (reservation of seats) ব্যবস্থা থাকবে না। অবশ্য বর্তমানে এরূপ আসন-সংরক্ষণের সময় বর্ধিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের ব্যক্তিদের (Anglo-Indians) উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নেই, তা হলে তিনি লোকসভায় দুজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করতে পারেন।

প্রত্যেক 'নির্বাচনী এলাকা'তে (constituency) যত ভোটদাতা (voter) আছেন তাঁদের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাকে **'নির্বাচক তালিকা'** (voter list) বলে। ঐ নির্বাচক-তালিকায় নাম না থাকলে কেউ ভোট দিতে পারে না। একই ভোটদাতা লোকসভা ও বিধানসভা উভয় সভাতেই প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারী। সেই সঙ্গে ঐ ব্যক্তির নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকলে, যে অঙ্গরাজ্যে বিধানপরিষদ আছে সেখানে তিনি বিধানপরিষদের স্নাতক নির্বাচনক্ষেত্র, শিক্ষক নির্বাচনক্ষেত্র ও স্বায়ত্ত শাসন নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটদাতা হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, একই ধরনের নির্বাচনক্ষেত্রে কোন ভোটদাতা কোনক্রমেই একটির বেশি নির্বাচন তালিকাভুক্ত থাকতে পারে না। যেমন, কলিকাতার কোন অঞ্চলের নির্বাচনী এলাকায় তালিকাভুক্ত ভোটদাতা বীরভূম বা এরূপ অপর কোন অঞ্চলের নির্বাচন এলাকায় তালিকাভুক্ত হতে পারবেন না।

নির্বাচনের সময়-সূচী ঘোষিত হবার পর নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক ভোটদাতাগণ মনোনয়নপত্র (nomination paper) দাখিল করেন এবং নির্দিষ্ট দিনে রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) সব মনোনয়ন-পত্র গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তা বিচার (scrutiny) করেন। তার পর ভোট গ্রহণের তারিখ ও ভোটকেন্দ্রগুলো (polling centre) ভোটদাতাদের জ্ঞাত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। যদি কোন কেন্দ্র থেকে দুজন প্রার্থী নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা থাকে তা হলে তাকে দ্বি-আসনযুক্ত নির্বাচন এলাকা (double seated constituency) বলে। যে সকল নির্বাচনী এলাকা থেকে দুজন সদস্য নির্বাচিত হন সেখানে প্রত্যেক ভোটদাতার দুটি করে ভোট থাকবে। কোন ভোটদাতা একজন প্রার্থীকে একটির বেশি ভোট দিতে পারেন না।

ভোটদাতাগণ নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ভোটপত্র বা ব্যালট পেপার (ballot paper) সংগ্রহ করে যে প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চান সেই প্রার্থীর নামের পাশে চিহ্ন দেন। নির্বাচনের পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল প্রার্থীকে নির্বাচনের হিসেব দাখিল করতে হয়। ভোটগ্রহণকালে কোন প্রার্থীর দুর্নীতি আদালতে প্রমাণ হলে অথবা নির্বাচনে কোন বে-আইনী ব্যয় প্রমাণিত হলে তাঁর নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েক বছর সেই ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না।

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটদাতাদের তালিকা প্রণয়ন, ভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য শাসনতন্ত্রে একটি নির্বাচন কমিশন (Election Commission) স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। **নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ভারতে সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।** নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় নির্বাচন কমিশনের ওপর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সদস্যসংখ্যা স্থির করে দেন এবং একজন মুখ্য নির্বাচনকর্তা (ইলেকশন কমিশনার) নিয়োগ করে থাকেন। কোন নির্বাচন সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হলে, তা মীমাংসার জন্য 'নির্বাচনী আদালত' স্থাপনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

নমুনা প্রশ্ন

1. প্রতিনিধিত্ব কাকে বলে ? (এক দেখ)
2. সর্বজনীন বা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তসহ আলোচনা কর। (দুই দেখ) [H. S. C. '78 and '85]
3. "সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা দরকার"—আলোচনা কর। (দুই দেখ) [T. S. B. '79]
4. সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় কেন ? (দুই দেখ) [H. S. C. '83]
5. নারীজাতির ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো দেখাও। (তিন দেখ) [H. S. C. '79]
6. ভোটদানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (চার দেখ)
7. ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ রচনা কর। (পাঁচ দেখ)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

1. (i) জন স্টুয়ার্ট মিল ভোটাধিকারের মানদণ্ড হিসেবে কোন্ দুটি মাপকাঠির কথা বলেছেন ? (সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা)
   (ii) ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার, না সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার স্বীকৃত ? (সর্বজনীন ভোটাধিকার)
   (iii) ভারতের সাধারণ নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করে কোন্ সংস্থা ? (নির্বাচন কমিশন) (H.S,C. '79)
   (iv) ভারতে ভোটদাতার ন্যূনতম কত বয়স প্রয়োজন ? (২১ বৎসর)
   (v) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বিক ভোটাধিকার (অপ্রয়োজনীয়, একান্ত প্রয়োজনীয়) [H. S. C. '84]

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র

১৯৭৮

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক?

২। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ব্যাখ্যা ও সমালোচনা কর।

৪। 'জাতীয়তাবাদ' কথাটির অর্থ কি? ইহা কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী? যুক্তি দাও।

৫। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা কর। এই নীতিগুলোর তাৎপর্য কি?

৬। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অংগগুলো কি কি? উহার যে কোন একটির গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

অথবা, 'আইন'-এর সংজ্ঞা দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

খ বিভাগ

নিম্নোক্ত যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর

৭। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝ?

৮। নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপের পদ্ধতিগুলো কি কি?

৯। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে?

১০। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি?

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং উহা লেখ ঃ

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক, প্রাকৃতিক, নৈতিক) বিজ্ঞানের একটি শাখা।

(খ) ভোটাধিকার একটি (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) অধিকার।

(গ) নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা (5, 11, 15)।

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ) পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা (এককক্ষ, দুইকক্ষযুক্ত) আইনসভা।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্য পার্থক্য নির্দেশ কর এবং উভয়ের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর।

২। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বটি আলোচনা ও বিচার কর।

৫। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতাবলী আলোচনা কর।

৬। জনমত বলতে কি বুঝ ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি ? কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয় ?

অথবা, গণতন্ত্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলোর আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা বলিতে কি বুঝ ? দৃষ্টান্তসহ উত্তর লিখ।

৮। 'প্রজাতন্ত্র' কাহাকে বলে ? নিম্নলিখিত দেশগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি প্রজাতন্ত্র, তাহা কারণসহ আলোচনা কর :

(ক) বৃটেন

(খ) ইউ. এস. এ

৯। ভারতীয় পার্লামেণ্টের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১০। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া সেই উত্তর-সহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ :

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন

(i) পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ, (ii) সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য, (iii) পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ এবং সকল রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সকল সদস্য, (iv) পার্লামেণ্টের উভয়কক্ষের এবং সকল রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ।

(খ) ভারতীয় পার্লামেণ্টের ঊর্ধ্বতম কক্ষের সভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁহাকে বলা হয় :

(i) স্পীকার (অধ্যক্ষ), (ii) চেয়ারম্যান (সভাপতি), (iii) রাষ্ট্রপতি, (iv) উপ-রাষ্ট্রপতি।

(গ) সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বুঝায় এমন একটি শাসনব্যবস্থা :

(i) যেখানে একটি পার্লামেণ্ট (সংসদ) আছে, (ii) যেখানে নির্বাচিত একটি আইনসভার নিকট দায়ী একটি মন্ত্রিসভা আছে, (iii) যেখানে বংশানুক্রমে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজতন্ত্র ও একটি নির্বাচিত পার্লামেণ্ট (সংসদ) আছে, (iv) যেখানে একটি মন্ত্রিসভার সহায়তায় এবং পরামর্শে একজন রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(ঘ) ভারতের যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল :

(i) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, (ii) ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন, (iii) ঐ রাজ্যের মন্ত্রিসভা কর্তৃক মনোনীত হন।

(ঙ) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এমন একটি বিচারালয় যাহার :

(i) কেবলমাত্র মূল এলাকা আছে,

(ii) কেবলমাত্র আপীল এলাকা আছে,

(iii) মূল ও আপীল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই,

(iv) মূল এলাকা, আপীল এলাকা ও পরামর্শদান এলাকা আছে।

১৯৭৯

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা চলে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায়?

২। রাষ্ট্র কাহাকে বলে? রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নিরূপণ কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে বিবর্তনবাদ আলোচনা কর এবং এই মতবাদ সম্পর্কে তোমার মতামত বিবৃত কর।

৪। জাতীয় জনসমাজ ও জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ কর। এদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও। জাতীয় জনসমাজের প্রধান উপাদানগুলো উল্লেখ কর।

৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৬। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ কি?

অথবা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলতে কি বুঝায়?

খ বিভাগ

নিম্নোক্ত যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর

৭। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি একটি রাষ্ট্র? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, আইনের উৎসগুলো বর্ণনা কর।

৯। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং তা লেখ—

(ক) রাষ্ট্রের (কেবল আভ্যন্তরিক, কেবল বাহ্য, আভ্যন্তরিক এবং বাহ্য উভয় প্রকার) সার্বভৌমিকতা থাকে।

(খ) (রুশো, লক, হবস) 'লেভিয়াথান' গ্রন্থটির প্রণেতা।

(গ) রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র। কে বলেছেন? (আরিস্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস, গ্রীণ)।

(ঘ) সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়)।

(ঙ) ভোটদানের অধিকার একটি (পৌর, রাজনৈতিক) অধিকার।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। তুমি কি মনে কর যে ভারতের সংবিধান কেবলমাত্র গঠনের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু কার্যত ইহা এককেন্দ্রিক ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রপতি-শাসিত ও পার্লামেণ্ট-শাসিত শাসনব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ কর এবং প্রথমটির দোষ ও গুণগুলো আলোচনা কর।

৩। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলো বিশদভাবে আলোচনা কর। এই শর্তগুলো বর্তমান ভারতে আছে কি ?

৪। আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায় ?

৫। বর্তমান ভারতে রাজ্যপালের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। দ্বি-দল ও বহু-দল ব্যবস্থার দোষ ও গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা কর।

অথবা, নারীজাতির ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইনসভার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৮। ভারতে লোকসভার অধ্যক্ষের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

৯। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন এবং কিভাবে তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায় ?

১০। চরম ও শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ:

(ক) ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হইয়াছিল

(i) ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ (ii) ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ (iii) ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ (iv) ১লা মার্চ, ১৯৫২ হইতে।

(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

(i) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

(ii) সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

(iii) সংসদের উভয়কক্ষের এবং রাজ্যবিধানমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

(iv) জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন।

(গ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সর্বপ্রধান প্রবক্তা ছিলেন

(i) হবস্, (ii) লক্, (iii) মণ্টেস্কু (iv) রুশো।

(ঘ) লোকসভার কার্যকাল

(i) পাঁচ বছর (ii) ছয় বছর (iii) চার বছর

এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

(i) কেন্দ্রীয় সরকার (ii) রাজ্য সরকার (iii) 'নির্বাচন কমিশন'-এর তত্ত্বাবধানে।

(ঙ) ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

(i) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন। (ii) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। (iii) সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। (iv) লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হন।

১৯৮৩

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজবিদ্যার সহিত ইহার কি সম্পর্ক ?

২। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে বলপ্রয়োগ মতবাদ বিবৃত কর। মতবাদটির মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কি ? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

৪। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করা যায় ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৬। ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বর্ণনা দাও। মৌলিক অধিকারসমূহের সহিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য দেখাও।

খ বিভাগ

নিম্নোক্ত যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর

৭। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৮। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৯। অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

১০। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে নাও এবং তাহা লেখ :

(ক) একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের) সদস্য হতে পারে।

(খ) 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থটির প্রণেতা (হবস, লক, রুশো)।

(গ) নিরাপত্তা পরিষদের (সকল সদস্যের, কেবল অস্থায়ী সদস্যদের, কেবল স্থায়ী সদস্যদের), 'ভেটো' প্রয়োগের ক্ষমতা আছে।

(ঘ) কর্মের অধিকার একটি (রাজনীতিক, আর্থনীতিক) অধিকার।

(ঙ) ভারতের সংবিধানে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার (একটি মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নয়)।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কি ভাবে তুমি সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করবে ?

২। যুক্তরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর।

৩। একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর।

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। 'কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়'—উদাহরণ সহকারে উক্তিটি আলোচনা কর।

৫। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

৬। জনমত বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব নির্ধারণ কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর।

৮। একক-পরিচালক ও বহু-পরিচালক বিশিষ্ট শাসনবিভাগ বলতে কি বোঝায় ?

৯। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১০। লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যাহা জান লিখ।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লেখ ঃ

(ক) ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা

(i) যুক্তরাষ্ট্রীয় (ii) এককেন্দ্রিক (iii) আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়।

(খ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন

(i) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল (ii) রাষ্ট্রপতি (iii) প্রধানমন্ত্রী।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা

(i) এককক্ষবিশিষ্ট (ii) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।

(ঘ) ভারতবর্ষে

(i) একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে (ii) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে (iii) বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(ঙ) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

(i) অপ্রয়োজনীয় (ii) একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

১৯৮১

ক বিভাগ

যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ?

২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে সার্বভৌমিকতার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। তোমার কাছে এই মতবাদ কি গ্রহণযোগ্য ?

৪। জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলো কি কি ? ভারতকে কি একটি জাতি বলা যায় ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। ইহার উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়েছে ?

অথবা, আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক দেখাও।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর

৭। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলো আলোচনা কর।

৮। জাতীয়বাদ ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক আলোচনা কর।

৯। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য আলোচনা কর।

১০। কি কি কারণে নাগারিকতা বিলুপ্ত হয় ?

গ বিভাগ

১১। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত বিকল্পগুলো হইতে সঠিক উত্তরটি খুঁজিয়া বাহির কর এবং তাহা লিখ ঃ

(ক) সার্বভৌমিকতা (হস্তান্তরযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য নয়)

(খ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ একটি (বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক) মতবাদ।

(গ) বর্তমানে আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা (১৫, ২৫, ২৭, ৩২)।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলো আদালত কর্তৃক (বলবৎযোগ্য, বলবৎযোগ্য নয়)।

(ঙ) ভোটদানের অধিকার একটি (সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক) অধিকার।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২। সংসদ-শাসিত (পার্লামেন্টীয়) ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদ-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

৩। ভারতের পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

৫। রাজনৈতিক দল বলতে তুমি কি বোঝ ? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৬। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

খ বিভাগ

যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) বলে অভিহিত করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৮। দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা বর্ণনা কর।

১০। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত কোন রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া, সেই উত্তরসহ নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লেখ ঃ

(ক) ভারতের রাজ্যসভা হইতেছে

(i) অঙ্গরাজ্যগুলোর একটি কক্ষ। (ii) রাজ্যপালগণের একটি কক্ষ।
(iii) ভারতীয় পার্লামেন্টের একটি কক্ষ।

(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইতেছেন

(i) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। (ii) রাজ্যসভার সভাপতি।
(iii) লোকসভার অধ্যক্ষ।

(গ) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এমন একটি বিচারালয় যাহার

(i) কেবলমাত্র মূল এলাকা আছে। (ii) কেবলমাত্র আপীল এলাকা আছে।
(iii) মূল ও আপীল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন এলাকা নাই।
(iv) মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা আছে।

(ঘ) ভারতের বর্তমান সংবিধানে 'শিক্ষা' বিষয়টি

(i) কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত। (ii) যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। (iii) রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

(ঙ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর সংখ্যা হচ্ছে

(i) ২১ (ii) ২২ (iii) ২৩।

১৯৮২

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস ও অর্থবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর।

৩। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি ?

৪। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় ? আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে কি কি যুক্তি দেয়া হয় ?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর। সংক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৬। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত যে কোন তিনটি মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

খ বিভাগ

যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। একজন নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

৮। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য সমূহ আলোচনা কর।

৯। জাতীয়তাবাদ কি আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? উত্তরের অনুকূলে যুক্তি দেখাও।

১০। ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ ঃ

(ক) (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ) একটি রাষ্ট্র।

(খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯১৯, ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৭) সালে।

(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সামাজিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক) বিজ্ঞানের একটি শাখা।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি (মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নহে)।

(ঙ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র (ঈশ্বরের সৃষ্টি, চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট, মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল)।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। 'সংবিধান' বলতে কি বোঝায়? লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য যথোপযুক্ত উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।
২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনা কর।
৩। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে কি কি যুক্তি দেখানো হয়? গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী কি কি?
৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর।
৫। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।
৬। আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠনের বিভিন্ন মাধ্যমের বিবরণ দাও।

খ বিভাগ

যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। ভারতীয় পার্লামেন্টে আইনপাশের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
৮। দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচনা কর।
৯। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।
১০। আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ :
(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী (সুপ্রীম কোর্ট, রাষ্ট্রপতি, লোকসভা) দ্বারা নিযুক্ত হন।
(খ) ভারতের শাসনব্যবস্থা (রাষ্ট্রপতিশাসিত, সংসদীয়)।
(গ) লোকসভার কার্যকাল (চার, পাঁচ, ছয়) বছর।
(ঘ) (ভারতবর্ষ, গ্রেট বৃটেন) একটি প্রজাতন্ত্র।
(ঙ) ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, নির্বাচন কমিশন) এর তত্ত্বাবধানে।

১৯৮৩

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর।
২। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর।
৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনমূলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির কোন মূল্য আছে কি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
৪। রাষ্ট্রের সীমারেখা কি জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উচিত? তোমার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দাও।
৫। জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস) সাধারণ সভার গঠন আলোচনা কর। সাধারণ সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর।
৬। ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের পার্থক্য দেখাও।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।

৮। নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৯। আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার বলিতে কি বোঝায়? কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর।

১০। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ:

(ক) একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক (রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের) সদস্য হইতে পারে।

(খ) (আরিস্টটল, রুশো, হেগেল, মার্কস, গ্রীণ) বলেন: "রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র।"

(গ) সম্পত্তির অধিকার একটি (রাজনীতিক, আর্থনীতিক) অধিকার।

(ঘ) কর্মের অধিকার ভারতের সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত (একটি মৌলিক অধিকার, মৌলিক অধিকার নহে)।

(ঙ) অছি পরিষদ জাতিপুঞ্জের একটি (অংশ, অংশ নহে)।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?

৩। সংসদীয় বা পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংসদীয় সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?

৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

৫। ভারতীয় পার্লামেণ্টের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

খ বিভাগ

যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ কর।

৮। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কি ভাবে নিযুক্ত হন? তাহাদের কিভাবে পদচ্যুত করা যায়?

৯। ভারতীয় অংগরাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর।

১০। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর। এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় কেন?

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ:

(ক) পূর্ণ ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ (সম্ভবপর, সম্ভবপর নহে)।

(খ) ভারতে (একদল ব্যবস্থা, দ্বিদল ব্যবস্থা, বহুদল ব্যবস্থা) আছে।

(গ) ভারতে (২০/২২/২৪টি) অংগ রাজ্য আছে।

(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত, পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত) হন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা) কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১৯৮৪

প্রথম পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থবিদ্যার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর।

৩। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি?

৪। জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বোঝায়? ইহা কি আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী?

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন্‌স) সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা কর।

৬। সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি? ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

৮। "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি"—এই ধারণা তোমার কতদূর গ্রহণযোগ্য মনে হয়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৯। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) (হেগেল/রুশো/হব্‌স) "সামাজিক চুক্তি" গ্রন্থটির প্রণেতা।

(খ) আন্তর্জাতিক বিচারালয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি (অঙ্গ/অঙ্গ নহে)।

(গ) কর্মের অধিকার একটি (রাজনীতিক/আর্থনীতিক) অধিকার।

(ঘ) ভারতের সংবিধান শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত (করে/করে না)।

(ঙ) ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার/নির্দেশমূলক নীতি)।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য নির্ধারণ কর এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ও গুণাবলীর আলোচনা কর।

২। "ভারতীয় সংবিধান আংশিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আংশিকভাবে এককেন্দ্রিক"—এই মতবাদ পর্যালোচনা কর।

৩। একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বোঝায় ? একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর।

৪। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। "পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে"—এই মত কি তুমি সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৫। দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পর্যালোচনা কর।

৬। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।

খ বিভাগ

যে-কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

৭। ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন তাহা বর্ণনা কর।

৮। রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর।

৯। জনমত বলিতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব কি ?

১০। দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার সুবিধাগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :

(ক) যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (থাকে/থাকে না)।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (রাষ্ট্রপতি শাসিত/সংসদ শাসিত) সরকার আছে।

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে (বাধ্য/বাধ্য নহেন)।

(ঘ) ভারতের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন (ভারতের রাষ্ট্রপতি/সেই রাজ্যের রাজ্যপাল/রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ)।

(ঙ) প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (অপ্রয়োজনীয়/একান্ত প্রয়োজনীয়)।

১৯৮৫

ক বিভাগ

যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা দাও। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য করা যায় ? তোমার উত্তরের সমর্থনে কারণ দেখাও।

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক মতবাদটি আলোচনা কর এবং এই মতবাদের মূল্যায়ন কর।

৩। জাতীয় জনসমাজ বলিতে কি বোঝায় ? জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য উপাদানগুলি আলোচনা কর।

৪। নাগরিকত্ব বলিতে কি বোঝায় ? যে সকল উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় সেগুলি বর্ণনা কর।

৫। জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস্) উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি আলোচনা কর। ইহার প্রধান অঙ্গগুলি কি কি ?

৬। অধিকার বলিতে কি বোঝায় ? আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের পৌর ও রাজনীতিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর।

খ বিভাগ

যে কোনও **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। ভারতীয় নাগরিকের অন্ততঃ চারিটি মৌলিক অধিকার উল্লেখ কর। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি কিভাবে সংরক্ষিত হয় ?

৮। "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত"—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৯। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি যে সকল কারণে সমালোচিত হইয়াছে সেই কারণগুলি বিবৃত কর।

১০। আইনসম্মত সার্বভৌমত্ব ও রাজনীতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

অথবা

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত কর।

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় **লিখ** ঃ

(ক) ভোট দানের অধিকার একটি (সামাজিক / রাজনীতিক / পৌর / আর্থনীতিক) অধিকার।

(খ) ভারতীয় সংবিধান অনুসারে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার একটি (মৌলিক অধিকার / মৌলিক অধিকার নয়)।

(গ) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (হস্তান্তরযোগ্য / হস্তান্তরযোগ্য নয়।)

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক (বলবৎ যোগ্য / বলবৎযোগ্য নয়)।

(ঙ) জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে (সকল সদস্য রাষ্ট্র / কেবলমাত্র অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো / কেবলমাত্র স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো) ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে।

দ্বিতীয় পত্র

ক বিভাগ

যে কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

১। ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। সংসদীয় (পার্লামেণ্টীয়) সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

৩। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি বিশদভাবে আলোচনা কর। এই শর্তগুলি বর্তমান ভারতে আছে কি ?

৪। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

৫। বর্তমান ভারতে রাজ্যপালের পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

খ বিভাগ

যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও

৭। ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) বলিয়া অভিহিত করা যায় ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

১০। ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা আলোচনা কর।

অথবা

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?

গ বিভাগ

১১। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ ঃ

(ক) ভারতে (২০, ২২, ২৪)টি অঙ্গরাজ্য আছে।

(খ) ভারতের যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন / ঐ রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হন / ঐ রাজ্যের মন্ত্রিসভা কর্তৃক মনোনীত হন।

(গ) ভারতের বর্তমান সংবিধানে 'শিক্ষা' বিষয়টি (কেন্দ্রীয় তালিকার / রাজ্যতালিকার / যুগ্ম তালিকার) অন্তর্ভূক্ত।

(ঘ) (রাষ্ট্রপতি / উপরাষ্ট্রপতি / স্পীকার) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন।

(ঙ) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের (কেবলমাত্র মূল এলাকা / কেবলমাত্র আপীল এলাকা / মূল ও আপীল এলাকা আছে কিন্তু অপর কোন এলাকা নেই / মূল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামর্শদান এলাকা আছে)।

ত্রিপুরা বোর্ড (+২)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র

১৯৮৫

প্রথম পত্র

১। যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে হবস্, লক্ ও রুশোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা কর।

(খ) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—উক্তিটির মধ্যে যে মতবাদ নিহিত আছে তার মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

(গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন, কার্যাবলী ও ভূমিকা বর্ণনা কর।

(ঘ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ত্রিপুরা কি একটি রাষ্ট্র? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ—

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর।

(গ) ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(ঘ) "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত।"—ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

(চ) ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা ব্যাখা কর।

৩। যে কোন **চারটির** উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—

(ক) জনগণের সার্বভৌমিকতা।

(খ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।

(গ) নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য।

(ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি।

(ঙ) রাষ্ট্রদর্শন।

(চ) শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব।

দ্বিতীয় পত্র

১। যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

(ক) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায়? ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল্য ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর।

(খ) মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকারের বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা কর। এই ব্যবস্থার সাফল্যের অপরিহার্য শর্তগুলি কি কি?

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।

(ঘ) সার্বিক ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২। যে কোন **চারটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ ঃ—

(ক) সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কোন্‌ কোন্‌ ভিত্তিতে সংবিধানকে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে দেখাও।

(খ) আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(গ) আধুনিক রাষ্ট্রে আইনবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর।

(ঘ) লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কি কি উপায়ে রক্ষিত হতে পারে দেখাও।

(চ) ভারতীয় সংবিধানের যে কোন **চারটি** বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩। যে কোন **চারিটির** উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—

(ক) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র।

(খ) রাজ্যপালের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধতি।

(গ) জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ।

(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি।

(ঙ) ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা।

(চ) ত্রিপুরা বিধানসভার গঠন।
